মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আল-কুরআনের আলোকে

উন্নত জীবনের আদর্শ

আল-কুরআনের আলোকে

উন্নত জীবনের আদর্শ

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র : বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন : ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল
১ প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৮০ ইং
৫ম প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০৮ ইং
জমাদিউস সানি ঃ ১৪২৯
আষাঢ় ঃ ১৪১৫

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা শহীদুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল্লাহ যুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ,
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস,
২৬, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা

ISBN 984-8455-17-X

ভূমিক

মানুষ আশরাফুল মখলুকাত— আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি। সমগ্র প্রাণী জগতে মানুষের অবস্থান সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। তার আকার-আকৃতি যেমন অনন্য, তেমনি তার বিচার-শক্তিও অতুলনীয়। তাই গোটা প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই আল্লাহ্‌র খলীফা— তাঁর প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃত। এটা মানুষের জন্যে এক পরম গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গৌরবটা কোনো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়; মানুষ আপনা থেকেই এর অধিকারী হয় না। এটি মানুষকে চেষ্টা করে অর্জন করতে হয় এবং নিরন্তর সাধনা বলে একে ধরে রাখতে হয়। কিন্তু মানুষ এই চেষ্টা ও সাধনা করবে কোন ধারায় ? কিভাবে সে অর্জন করবে 'সেরা সৃষ্টি'র কাঙ্ক্ষিত শিরোপা ? লাভ করবে খিলাফতের মর্যাদা ? এ প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্ববহ। এর সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হলে মানুষের কোনো চেষ্টা-সাধনাই ফলপ্রসূ হতে পারে না, তার ললাটেও অঙ্কিত হতে পারে না কাঙ্ক্ষিত গৌরবের জয়লেখা।

দুনিয়ার তাবৎ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা মানব জীবনের সার্থকতা খুঁজেছেন বৈষয়িক উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে। বিত্ত বৈভবের বিপুল সমাহার ও ভোগ-সম্ভোগের বিচিত্র উপকরণের মধ্যেই তারা সন্ধান করেছেন জীবনের প্রকৃত মহিমা। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেরিত জীবন দর্শন আল-কুরআনের মতে, জীবনের প্রকৃত সার্থকতা বিষয়-বৈভবে নয়, বরং দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র উচ্ছানুরূপ জীবন যাপনের মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত। দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে; তাকে চিন্তা-শক্তি ও বিচার-ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সে মহত্তম উদ্দেশ্যেই। কাজেই মানুষ যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করে আপন চিন্তা-শক্তি ও বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে, তাহলেই সে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে; সে অর্জন করতে পারে; 'সেরা সৃষ্টি'র কাংক্ষিত গৌরব ও মর্যাদা আর এটাই হচ্ছে দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব।

এই খিলাফতের সূচনা হয় জীবন ও জগত সম্পর্কে আল্লাহ্-প্রদত্ত ধারণা বা জ্ঞান থেকে। মানুষ যখন সে জ্ঞানকে হৃদয়ের মর্মমূলে দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস রূপে গ্রহণ করে, তখনই তার মধ্যে সৃষ্টি হয় 'ঈমান'— জীবন ও জগত সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ও নিশ্চিত্ত ধারণা। এই ঈমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে মানুষের ইচ্ছাকে একাকার করে দেয়; মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে

আত্মসমর্পন করে। এখান থেকেই শুরু হয় মানব জীবনের এক ইতিবাচক অভিযাত্রা। আল্লাহ্‌র প্রতি পরম নির্বরতার কারণেই মানুষ চিরতরে মুক্ত হয় জীবন সম্পর্কে সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তা থেকে; এমন কি, সে মৃত্যু-ভয়কেও জয় করে অবলীলাক্রমে। এর ফলে মানুষের প্রতিটি কাজই হয় গঠনমূলক ও সৃজনধর্মী। সে প্রতিটি পদক্ষেপই গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কল্যাণের পথে মঙ্গলের দিকে।

মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) মানব জীবনে ঈমানের এই ইতিবাচক ভূমিকাটাই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান যে মানব জীবনকে কি গভীরভাবে প্রভাবিত করে, তার চরিত্রকে মহিয়ান ও গরিয়ান করে তোলে, এ গ্রন্থে তার এক বিস্তৃত রূপ-রেখা তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুনিপুনভাবে। এই গ্রন্থে তিনি পবিত্র কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহই শুধু উল্লেখ করেননি, সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেছেন এক অনুপম ভঙ্গিতে। তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে প্রতিটি বিষয়ই হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। এককথায়, মুমনি জীবনের একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা হয়েছে এ গ্রন্থে। পবিত্র কুরআনের বিষয় ভিত্তিক তফসীর রচনার ক্ষেত্রেও গ্রন্থটি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এই অনন্য গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৮০ সালে— গ্রন্থকারের জীবদ্দশায়— এবং তা নিঃশেষ হয়ে যায় অত্যল্প কালের মধ্যেই। পাঠকদের বিপুল চাহিদা সত্ত্বেও নানা কারণে গ্রন্থটির পুণমুদ্রণ সম্ভবপর হয়নি আমাদের পক্ষে। বর্তমানে 'খায়রুন প্রকাশনী'র সৌজন্যে গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এবার মুদ্রণ-পারিপাট্য যতাসম্ভব উন্নত এবং মুদ্রণ ব্যয় অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটির মূল্য যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যেই রাখা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস. গ্রন্থের এ মুদ্রণটি পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খেদমত কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন, এ-ই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

চেয়ারম্যান

মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

পূর্বভাস

জীবনের উন্নতি বা উন্নত জীবন মানুষ মাত্রেই কাম্য। কিন্তু সে জীবনের উন্নতি, উন্নত জীবন বলতে কি বোঝায় এবং তা লাভ করার সঠিক ও কার্যকর পন্থা কি হতে পারে, সে সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে যথেষ্ট মতবিরোধ বিদ্যমান। মতবিরোধের কারণ দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শিক বিভিন্নতা। আর বিভিন্নতা যে সর্বকালের ন্যায় বর্তমান সময়েও অত্যন্ত প্রকট, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আধুনিক মানবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই উৎকর্ষ হোক, এই পর্যায়ে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো চূড়ান্ত কথা বলা আজও সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এই মতবিরোধের অবসান ও এ-ব্যাপারে পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলিক ঐকমত্য অর্জন কি আদৌ সম্ভব নয়? .... চিরদিনই কি তা মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যায়? .... অথচ তা মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

মানব জীবনের মৌলিক বিষয়াদি একটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে মহান সৃষ্টিকর্তার সর্বশেষ অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন। বর্তমান গ্রন্থে সেই কুরআনী বিশ্লেষণই উপস্থাপিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। এ হচ্ছে কুরআনের মর্মবাণী, কুরআনের দার্শনিক ভাবধারা। আর তার সাথে সংযোজিত হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের অনস্বীকার্য যুক্তি ও প্রমাণ এবং এ কালের বড় বড় দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।

কুরআন মজীদকে যাঁরা নির্ভুল জ্ঞান-তত্ত্ব ও তথ্য-সম্ভার বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা তো বটেই, যারা তা স্বীকার করতে নারাজ, তাঁরাও এই গ্রন্থে উন্নত জীবনের একটা স্পষ্ট চিত্র দেখতে পাবেন এবং তা অর্জনের উপায় ও পন্থার সঠিক ও কার্যকর পথ-নির্দেশও পাবেন এই গ্রন্থে— এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আল-কুরআন প্রদর্শিত পথে জীবনের উন্নতি সাধনে এবং নির্ভেজাল উন্নত জীবন অর্জনের সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার আহ্বানই হচ্ছে এই বিরাট গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। আল্লাহ্ তা'আলা এই পৃথিবীতে আমাদের সেই জীবনের তওফিক দিন— এই হচ্ছে আমার একমাত্র কামনা ও প্রার্থনা।

(মওলানা) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
অক্টোবর, ১৯৮০
মুস্তফা মন্‌জিল
২০৮, পশ্চিম নাখালপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

সূচী

আল-কুরআনের আলোকে

উন্নত জীবনের আদর্শ

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈমান ও জীবন

ঈমান বা বিশ্বাসের ব্যাপারটা কিছুমাত্র গুরুত্বহীন নয়। আমরা তাকে সামান্য বা নগণ্য মনে করতে পারি না, পারি না তার প্রতি কিছুমাত্র উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে অথবা বিস্মৃতির অতল সাগরে তা ডুবিয়ে দিতে। তার কারণ, ঈমানের সম্পর্ক মানুষের সত্তা ও তার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে স্থাপিত। সত্যি কথা, ঈমান হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষের পরিণতি বা পরিণাম ঈমানের ভিত্তিতেই নির্ধারিতব্য।

চিরন্তন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের দৃষ্টিতেই ঈমানের নবতর মূল্যায়ন। তা-ই মানুষকে দিতে পারে চিরকালীন জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। এ কারণে প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই কর্তব্য ঈমানের ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, ঈমানের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সামগ্রিক প্রভাবকে সক্রিয় মনে স্মরণ করা।

দুনিয়ার জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন মানুষেরা সর্বকালে সর্বস্থানে এ নিয়ে যথাসাধ্য চিন্তা-বিবেচনা করেছেন। এবং নিজেদের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণায় একটা না একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

কেউ কেউ বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্যরূপ ও তার গণ্ডী অধ্যয়নের চেষ্টা করেছে। কান পেতে শুনেছে বিশ্বপ্রকৃতির নিঃশব্দ ঘোষণা ঃ

أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ – (ابرٰهيم : ١٠)

আল্লাহ্র ব্যাপারে সন্দেহ? তিনিই তো আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর উদ্গাতা প্রতিষ্ঠাতা।

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا – (الروم : ٣٠)

আল্লাহ্র প্রকৃতি তো তা-ই, যার উপর তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দিয়েছেন।

কেউ কেউ কার্যকারণ পরম্পরা নীতির উপর নির্ভর করেছে। তাদের মন বলেছে, প্রত্যেকটি কাজের কারক ও প্রত্যেকটি ঘটনার সংঘটক অবশ্যম্ভাবী।

প্রত্যেকটি সৃষ্টি জন্য স্রষ্টা, প্রত্যেকটি গতির জন্য গতিদানকারী— চালিকাশক্তি এবং প্রত্যেকটি ব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থাপক অপরিহার্য। এই কথাটি অতীব সহজসাধ্য। এর মধ্যে কিছুমাত্র জটিলতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই।

অনেকে সোজা হিসাবে বলেছে ইহ-জীবন ও পরবর্তীকালের জীবনের জন্য নিরাপত্তা লাভের উপায় হচ্ছে আল্লাহ্‌, পরকাল ও প্রতিফল বিশ্বাস করা। আর গণিতবিদ দার্শনিকের মত হলো ঃ

হয় তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ্ আছেন, নয় বিশ্বাস করবে না। এ দুটোর একটা তোমাকে বাছাই করে নিতে হবে। কিন্তু তোমার বিবেক-বুদ্ধি সে বাছাই করার কাজ করতে অক্ষম। আসলে তোমার ও বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে একটা ছিনিমিনি খেলা চলছে। উভয়-ই নিজ নিজ তীর নিক্ষেপ করছে। এ দুয়ের মাত্র একটাই লক্ষ্য ভেদ করতে পারে। এখন কোনটা লক্ষ্য ভেদ করবে, আর কোনটা ব্যর্থ হবে, তার তুলনামূলক বিচার করতে হবে তোমাকে। তুমি যদি তোমার যথাসর্বস্ব আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর ন্যস্ত করে দাও, তাহলেই চিরন্তন কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারো।

বস্তুত আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাস করলে বৈষয়িক জীবন হারাতে হবে ও কেবল পরকালের শাশ্বত জীবনই লাভ করা যাবে এমন কথা সত্য নয়। আসলে এই ঈমান দ্বারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেরই প্রকৃত ও অসীম কল্যাণ এবং সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা তাই ঘোষণা করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - (النسآء : ١٣٤)

যে লোক কেবল দুনিয়ার সুখ ও স্বার্থ পেতে চায় (সেতো বোকা) আল্লাহ্‌র কাছে তো ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেরই সুখ-স্বার্থ ও কল্যাণ রয়েছে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ - (النحل : ٣٠)

এ দুনিয়ায় যারাই কল্যাণময় কাজ করবে তাদের জন্যই রয়েছে কল্যাণ। আর পরকালের ঘরতো মহাকল্যাণময় হয়ে রয়েছে।

দ্বীন-ইসলাম যে-সব এবাদত ফরয করেছে তা সবই মুমিনের নফসের পরিচ্ছন্নতা বিধান ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের উপায়। আর যে-সব জিনিস হারাম ঘোষণা করেছে, তা হারাম করে মুমিন তার বিবেক-বুদ্ধি, চরিত্র, মন এবং ধন-সম্মান ও বংশের সংরক্ষণ করছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ - (الاعراف : ١٥٧)

আদেশ করে তাদের ভালো কাজ করার, নিষেধ করে তাদের যা কিছু মন্দ ও ঘৃণ্য। তাদের জন্য হালাল করে যাবতীয় পবিত্র পুষ্টিপূর্ণ দ্রব্যাদি, তাদের প্রতি হারাম করে সব খারাপ-মন্দ ঘৃণ্য-ক্ষতিকর জিনিস। আর তাদের উপর যেসব দুর্বহ বোঝা ও অবাঞ্ছিত বন্ধন-শৃঙ্খল চেপে বসেছে তা দূর করে দেয়।

শুধু তাই নয়, দ্বীন-ইসলাম যদি একটি জিনিস হারাম করেছে, তাহলে তদস্থলে অধিক ভালো ও কল্যাণময় জিনিস হালাল করে দিয়েছে। তা সেই হারাম জিনিসের যাবতীয় ক্ষতিকর বা খারাপ অংশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

সত্য কথা, মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌র এবাদত অবলম্বন করে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। হারায় না কিছু আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিস পরিহার করলে। তখন বরং হেদায়েতের কল্যাণ ও সত্য ন্যায়ের উপর অবিচল দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। সে পারে কল্যাণ লাভ করতে, অকল্যাণকে অতিক্রম করতে। দুষ্প্রবৃত্তিকে সে পরাজিত করে দেয়, নফসের হেদায়েত লাভ ও জীবনের গভীর প্রশান্তি লাভে সে হয় সার্বিকভাবে ধন্য ও সমৃদ্ধ।

আমাদের এ যুগটা লাভ-লোকসান হিসেবের যুগ। কিসে লাভ আর কিসে ক্ষতি, স্থুল দৃষ্টিতে সেই বিচারেই এ যুগের মন-মানস তন্ময়। একালের মানুষের মনোবৃত্তিটা পুরাপুরি ব্যবসায়ী। শুধু তা-ই নয়, একালের মনোবৃত্তি হলো, 'যাতে লাভ তা-ই সত্য'। 'যা সত্য ও বাস্তব তাতেই লাভ'— একালের মানুষ এই কথায় বিশ্বাসী নয়। যা যুক্তিসংগত বিবেকসম্মত তাতেই সত্য নিহিত— আজকের মানুষ তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এই হচ্ছে এখনকার সমাজ।

এ মনোবৃত্তি যে দার্শনিক মত রচনা করেছে, তাহলো ঃ লাভই সত্যের মাপকাঠি। প্রত্যেকটি ব্যাপারের ফলপ্রাপ্ত ও পরিণতিই হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব জীবনের উপর যার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিতব্য, তা-ই অধিক লক্ষণীয়। যা বাস্তব তা-ই যথার্থ নয়— যাতে সুবিধা তাই সত্য। কাজেই তারা প্রত্যেকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ফলাফলের দৃষ্টিতে। সে ফলাফল স্বার্থানুকূল হলে তাই বিবেচিত হবে আমাদের জন্য ভালো। অন্যথায় তা হবে নিতান্তই মন্দ, মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যথক্ষণ ফল দেখা না যাবে ততক্ষণ কোনো কাজকে ভালো বা মন্দ, কোনো কথাকে সত্য বা মিথ্যা বলে অভিহিত করা চলে না। এই হলো যুগের দৃষ্টিভঙ্গি। একেই বলে Pragmatism বাস্তবধর্মিতা, বাস্তব শিক্ষা

লাভার্থে কার্যকারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভালো-মন্দ বিচার, ফলাফল দ্বারা যুক্তি বা নীতির বিচার— প্রয়োগবাদ।

কিন্তু এ মত যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা এটা সমর্থন করি না। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, যা প্রকৃত সত্য ও যথার্থ, তা-ই কল্যাণবহ। আর যা বাতিল অন্যায়, তা-ই ক্ষতিকর। কুরআন মজীদে এই কথাটি একটি রূপক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে, সত্য প্রবাহমান পানির মতো, কল্যাণকর খনিজ পদার্থের মতো। আর বাতিল, অসত্য ও মিথ্যা হচ্ছে পানির উপরে সঞ্চিত ফেনার মতো। খনিজ পদার্থ কোনো কিছুতে ঢালাই করবার উদ্দেশ্যে যখন অগ্নুত্তাপে তরলীত করা হয়, তখন তার উপরে যে ফেনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে— বাতিল ও অসত্য ঠিক সেই ফেনার মতো। এ দৃষ্টান্ত দেয়ার পর কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج وَاَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ الْاَمْثَالَ - (الرعد : ١٧)

এমনি করেই আল্লাহ তা'আলা সত্য ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দেন। যা ফেনারূপে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তা উবে মিলিয়ে যায়। আর যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর, তা-ই পৃথিবীতে টিকে থাকে। আল্লাহ দৃষ্টান্তগুলো এমনি করেই পেশ করেন।

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী যা-ই পৃথিবীতে টিকে থাকে তা-ই সত্য। সত্যই শাশ্বত। কুরআন একেই কল্যাণকর ঘোষণা করেছে। বলেছে ঃ مَايَنْفَعُ النَّاسَ —যা-ই মানুষকে কল্যাণ দেয়। বস্তুত সত্য মানুষকে কল্যাণ দেয়। বস্তুগত, বৈষয়িক ও প্রকৃতভাবে, মানুষের দেহ, বিবেক-বুদ্ধি, দিল-অন্তর-হৃদয় সর্বদিকেই তার কল্যাণ অফুরন্ত। মানুষের প্রতি সত্যের কল্যাণময় অবদান ব্যক্তিগতভাবেও যেমন সামষ্টিক সামাজিকভাবেও তেমনি। এ কল্যাণ কেবল ইহকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পরকালের অনন্ত জীবন পর্যন্তও পরিব্যাপ্ত।

এ আলোচনায় মোটামুটিভাবে কল্যাণের সাথে আমাদের গভীর পরিচিতি সংযোগ হলো। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কল্যাণ সম্পর্কিত ধারণায় বস্তুবাদীদের সাথে আমাদের প্রবল মতবিরোধ রয়েছে। কল্যাণের স্বরূপ নির্ধারণেও আমাদের দৃষ্টিকোণ অভিন্ন নয়। জিনিসের বস্তুত্ব ও পরিমাণে কোনো কল্যাণ নিহিত, আমরা তা মনে করি না। আমরা বরং কল্যাণ-অকল্যাণের বিচারের পরিমাণ, গুণাগুণ, বস্তুত্ব, প্রাণশক্তি, ব্যক্তি ও সমষ্টি এই সব কিছুই সামনে রাখার অপরিহার্যতা বিশ্বাস করি।

উপরন্তু কল্যাণকে আমরা কেবল এই জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করি না। এ ক্ষেত্রে আমরা সব সময়ই পরকালকে গুরুত্ব সহকারে সামনে রাখি। কেননা পরকালীন জীবনই চূড়ান্ত এবং চিরন্তন। মানুষের জন্য এই ইহকালীন জীবন নির্দিষ্ট এবং মানুষও নির্দিষ্ট এই ইহকালীন জীবনের জন্য।

এ কয়টি কথা নিতান্তই ভূমিকা স্বরূপ বলা হলো। ঈমান ও জীবন অন্য কথায় উন্নত জীবনের আদর্শই হলো এ পর্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। দ্বীন-ইসলাম মানুষের জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করে, কিরূপ প্রতিফলন ঘটায় এবং উন্নত জীবন রচনায় ঈমানের ভূমিকা কি এ গ্রন্থে তা আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই। দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাসের দিকটিও অবশ্যই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এক আল্লাহ্, রিসালাত, পরকাল, পরকালীন হিসাব-নিকাশ ও সওয়াব আযাব প্রভৃতিই হলো দ্বীন-ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ব্যাপার ও বিষয়। অবশ্য ধর্ম সমাজের জন্য ক্ষতিকর বা ধর্ম জীবনের জন্য দুর্বহ প্রভৃতি প্রলাপোক্তির বিশ্লেষণও এ গ্রন্থে দেয়া হবে।

বস্তুত যারা কেবল বস্তুগত কল্যাণ ও সুবিধা-অসুবিধার দৃষ্টিতেই দ্বীনকে বিচার করে এবং যারা বৈষয়িক কল্যাণ ও পার্থিব সুখ-সুবিধা ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিতে দ্বীনের মূল্যায়ন করতে রাজি নয়, তাদের আমরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও আদর্শহীন মানুষ বলে মনে করি। আমরাও যদি তাদের মতোই চিন্তা করতাম তাহলে আমরাও দ্বীনকে একটা দুর্বহ বোঝা মনে করতাম। কিন্তু সেরূপ চিন্তাকে আমরা গ্রহণ করিনি বরং অগ্রাহ্য করেছি, কেননা ইতিহাসে ও মানবীয় প্রচেষ্টা অনুসন্ধান তৎপরতা একথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, মানুষের জন্য দ্বীন অপরিহার্য। দ্বীন ছাড়া মানুষের কোনো গতি নেই, উপায়ান্তর নেই। তা যেমন প্রয়োজনীয় ব্যক্তির জন্য, তেমন অপরিহার্য সমাজ ও সমষ্টির জন্য। ব্যক্তি এই দ্বীন গ্রহণ করেই অন্তরের স্থিতি, স্থৈর্য ও চরম-পরম সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। পারে তার নিজ মন-মগজ চরিত্র ও জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে। তেমনি সমাজ সমষ্টিও এই দ্বীনের ভিত্তিতে পারে পরম স্থিতি, দৃঢ়তা, সংহতি, যাবতীয় কল্যাণ ও উৎকর্ষ লাভে ব্যাপক ও গভীরভাবে ধন্য মহান হতে।

দ্বীন ও ঈমানহীন ব্যক্তি বাতাসের মুখে শুষ্ক পাতার মতো মূল্যহীন, গুরুত্ব বঞ্চিত। কোনো একটি অবস্থায়ই তা স্থিতি লাভ করতে অক্ষম। তার জীবনের গতি দিকভ্রষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে বাধ্য। দ্বীন ও ঈমানহীন ব্যক্তির কোনো মূল্যই থাকতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি নিজের সত্তা ও জীবনের পরিচয় থেকে চিরকালই বঞ্চিত থেকে যায়। সে জানতে পারে না, সে কোত্থেকে কেমন করে এখানে এসেছে, কে তাকে পরিয়ে দিল জীবনের পোশাক, কেনই বা তাকে এখানে আনা

হলো, এখান থেকে কিছুকাল পর তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, কেনই বা নিয়ে যাওয়া হবে— তা সবই তার অজানা থেকে যায়। দ্বীন ও ঈমানহীন ব্যক্তি তো নিতান্ত জন্তু, হিংস্র শ্বাপদ বিশেষ। তার থাকতে পারে না কোনো সভ্যতা, সংস্কৃতি বা আইন ও বিধান। তখন তার হিংস্রতা থেকে রক্ষা পাওয়া অন্য মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আর সমাজ সমষ্টি যদি হয় দ্বীন ও ঈমানহীন, তাহলে তা হিংস্র শ্বাপদসংকুল নিবিড় অরণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। সভ্যতার আলোকচ্ছটা তাতে বিচ্ছুরিত হলেও তা বন্যতা ও হিংস্রতারই প্রবৃদ্ধি সাধন করে মাত্র। এরূপ সমাজে জীবন ও স্থিতি সম্ভব কেবল তাদের জন্য, যারা অধিকতর শক্তিমান, ক্ষমতাশালী। যারা চারিত্রিক ও মানবিকতায় উত্তম, সমধিক বিনয়ী ও আল্লাহ্ ভীরু তাদের জীবন সেখানে অসম্ভব। এ সমাজ ও সমষ্টি নিতান্তই নির্মম নিষ্ঠুর। তাতে সামাজিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যত উপায় উপকরণই সঞ্চিত হোক, তার নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা কখনোই বিলুপ্ত বা নিঃশেষ হবে না। কেননা এ সমাজের লোকেরা পেটের ক্ষুধা ও যৌন তাড়নার উর্ধ্বে উঠতে পারে না কখনো। এ ধরনের সমাজ সমষ্টি সম্পর্কেই রূপক ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ -

ওরা সুখ ভোগ করে, খায়-দায় ঠিক যেমন খায়-দায় ও সুখ ভোগ করে চতুষ্পদ জন্তুকুল।

বস্তুগত জ্ঞান ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রেও পরিসর যতই প্রশস্ত হোক, তা মানুষের জন্য নিবিড় গভীর শান্তি ও সৌভাগ্যের সন্ধান দিতে সক্ষম হতে পারে না কখনো। এ জ্ঞান-গবেষণা এ যুগের মানুষের জন্য বিপুল জীবন-জীবিকা, উপায়-উপকরণ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে এ কথা ঠিক; কিন্তু মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। সেসব জিনিস মানুষের বাহ্যিক জীবনের চাকচিক্যের সামগ্রী বটে। কিন্তু তা মানুষের জীবনের গভীরতম অনুভূতিতে সঞ্জীবিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর মানুষ এসব বাহ্যিক উপায়-উপকরণ পেয়ে এমনভাবে মগ্ন হয়েছে যে, তাতেই মানুষ জীবন লক্ষ্যের কথা ভুলে গিয়ে অবচেতন অবস্থায় পড়ে আছে— যেন মানুষ নয়, মানুষের লাশ। মানুষ মূল মগজ ফেলে দিয়ে শুধু ছাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

বস্তুজ্ঞান মানুষকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, কিন্তু তাতে মূল্য দেয়নি একবিন্দু। মানুষের সামনে সংস্থাপন করেনি কোনো বৃহত্তম মহত্ত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কেবল দ্বীন-ই মানুষের সামনে উজ্জ্বল, উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ লক্ষ্য উপস্থাপিত করতে সক্ষম। কেবল তা-ই হতে পারে মানুষের জন্য উন্নত জীবনের একমাত্র আদর্শ।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না, এমন অনেক দার্শনিক চিন্তাবিদ আমরা দেখেছি; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস না করলেও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের গুরুত্ব ও কল্যাণের প্রতি তারা যথেষ্ট বিশ্বাসী। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ব্যক্তির মনে ও সমাজ জীবনে যে শুভ প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটায়, তা তারা অস্বীকার করতে পারে নি। তাদের কেউ কেউ এতদূর বলেছে যে, আল্লাহ যদি নাও থেকে থাকে তবুও আমাদের তাঁকে সৃষ্টি করে নিতে হবে। আমাদের জন্য এমন এক সত্তা একান্তই জরুরী, যাঁকে আমরা বিশ্বাস করব, যার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা চেষ্টা চালাব, যাঁর কাছে জবাবদিহিকে আমরা ভয় করব। যেমন আমাদের মন-অন্তর-হৃদয় সদা প্রকম্পিত, বিনয়-অবনত ও আইন বিধান অনুসরণকারী হয়ে থাকে তাঁর দেয়া নৈতিক বিধান অনুযায়ী যেন আমাদের সমাজ চরিত্র গড়ে উঠতে পারে।

অন্যরা বলেছে, আরে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছ ? তিনি যদি না-ই থাকবেন, তাহলে আমার স্ত্রীর আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত, আমার চাকর আমার ঘরে চুরি করত।

এসব উক্তি মোটেই সৌজন্যমূলক নয়। সুষ্ঠু চিন্তা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না এ সব উক্তির মধ্যে। এ ধরনের হাস্যরসাত্মক উক্তি যারা করতে পারে, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব কতটা আছে, তা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সন্ধান চালানো ছাড়া জানবার উপায় নেই।

আসল কথা হলো, যা সত্য— সত্য বলে প্রমাণিত, তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, মেনে নিতে ও অনুসরণ করে চলতে হবে। পরিণাম বা ফলাফল তার যাই হোক-না কেন। পক্ষান্তরে যা বাতিল, অসত্য, মিথ্য— তা পরিহার্য, প্রত্যাহারযোগ্য, তার পরিণাম যত ভালো বা খারাপই হোক-না কেন।

সত্য তার নিজ গুণ বৈশিষ্ট্যেই সম্মানার্হ। বৈষয়িকতার দৃষ্টিতে তার কোনো ফায়দা যদি নাও থাকে কিংবা কোনো ক্ষতি তার দ্বারা প্রতিরুদ্ধ নাও হয়, তবুও সত্য বাদ দিয়ে মানুষের কোনো স্বার্থ বা সুবিধা থাকতে পারে না, সত্য পরিপন্থী জিনিস মানুষকে কোনো কল্যাণই দিতে সক্ষম নয়। মিথ্যা স্বতঃসিদ্ধ। সত্যকে নিছক নির্ভেজাল সত্যরূপে গ্রহণ করাই বিধেয়।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সত্য। তিনি তার একক সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য, কর্তৃত্ব ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা শক্তির অধীন করে রেখেছেন সমগ্র বিশ্বলোককে। অতএব সমস্ত সৃষ্টিকুলের কাছে এবাদত দাসত্ব ও আনুগত্য পাওয়ার নিরংকুশ অধিকার কেবল তাঁরই। দুনিয়ার মানব সমাজের প্রতি নবী রাসূল পাঠাবার নিয়ম তিনিই

কার্যকর করেছেন— পাঠিয়েছেন। মানুষের পরকালীন জীবন সম্পর্কে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তিনি যে খবরপাঠিয়েছেন— তা সবই সত্য। এই সব কথার সত্যতা ও যথার্থতার অকাট্য দলির-প্রমাণ রয়েছে অজস্র। সে সবের সত্যতায় ঈমান আনা কর্তব্য শুধু এজন্যে যে, তা-ই সত্য। আর এ সত্য দ্বারাই মানুষের ও সমাজের বাহির ও ভেতর, দেহ ও আত্মার, ব্যক্তি ও সমাজ সমষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন সঠিক কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব।

মানুষের মনে ও জীবনে ঈমানের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যখন কথা বলি তখন আমরা প্রকৃত ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ের কথাই মনে করি। মনে করি, এ ধরনের ঈমানই সমগ্র হৃদয়কে সমুদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। দুর্বল ও টলটলায়মান ঈমান কখনোই আমাদের লক্ষ্য নয়। কেননা তা থাকলেও তা নিদ্রিত, সমাহিত, প্রাণ-শক্তিহীন। অথচ আমাদের প্রয়োজন জীবন্ত ঈমানের। যদিও এ ধরনের ঈমান ও ঈমানদার লোক খুব বেশি পাওয়া যায় না। ঈমানের যথার্থ মূল্যায়নে সন্দেহপরায়ণ বস্তুবাদীদের সাথে আমরা যে বিতর্কে লিপ্ত হই তা শুধু এজন্য যে, তারা যেন জানতে-বুঝতে পারে যে, যে ঈমানের বিরুদ্ধতা তারা করছে, তা যখন হৃদয়ের গভীর কন্দরে পৌছতে পারবে, হৃদয় মনের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে, তখন তা ব্যক্তি সমষ্টি ও সমগ্র জীবনকে আলোকে উদ্ভাসিত করে দিতে পারবে।

এই হলো সাধারণ ঈমান সম্পর্কে কথা। প্রকৃত ইসলামী ঈমান তো আরো অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার ফলও অনেক ব্যাপক, গভীর ও কল্যাণকর। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস বস্তু ও প্রাণ-শক্তি উভয়কেই পরিব্যাপ্ত করে আছে। এ হলো তওহীদের আকীদা। এ আকীদাই সত্য, শক্তিশালী, দ্বীন ও বিজ্ঞানের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। এ আকীদা অ-খোদা শক্তির কাছে বিনয় গ্রহণকেও কুফর, ফিস্‌ক্ ও জুলুম মনে করে। পরস্পর পরস্পরকে 'খোদা' বানিয়ে নিতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে। এই হচ্ছে সত্যিকার ঈমান। এই ঈমানই কাম্য। বাঞ্চনীয় সকলের জন্য। বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে এই ঈমানের অপরিহার্যতা অনুধাবনীয়। কেননা যে শক্ত তালা খুলবার জন্য একটা নির্দিষ্ট চাবি রয়েছে, কেবল সেই নির্দিষ্ট চাবি দ্বারাই সে তালা খোলা যেতে পারে, অন্য চাবি দিয়ে নয়। সঠিক চাবি ছাড়া তালা খুলতে যত চেষ্টাই করো-না কেন, তালা খুলতে পারবে না। সে চাবির পরিবর্তে অন্য কোনো চাবি দিয়ে অন্য ছাঁচে তৈরী চাবি দিয়ে সে তালা খুলতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আর মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের সৌভাগ্য ও সার্বিক কল্যাণের বন্ধ তালা খুলতে হলে তার জন্য একমাত্র কার্যকর চাবি হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম—

দ্বীন-ইসলামের প্রতি পূর্ণ ঈমান। এ-ই হচ্ছে ইসলামের আকীদা। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ দ্বীন ও ঈমানের দৃষ্টিতে যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে এ ঈমান ও দ্বীনের সঞ্জীবনী সুধা দিয়েই তাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। অন্য কোনো 'কোরামিন' সে জন্য কাজ দেবে না।

এই ইসলামী ঈমান-আকীদা নিয়েই একদিন মুসলমানরা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। প্রথম পর্যায়ে সমগ্র আরব দেশ তার পদানত করে নিয়েছিল। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্ধ বিশ্বের উপর উড্ডীন করেছিল তার চাঁদ-তারা খচিত ও পত পত করে ওড়া বিজয় কেতন। এ ঈমান আকীদা সম্পন্ন মুসলিমরা যখন এক মহাপ্লাবনের মতো বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন অনেক বিপরীত শক্তি তার প্রতিরোধে বুক পেতে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার প্রতিরোধ চেষ্টাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তার মুকাবিলায় কিছুই টিকতে পারে নি, কেউ টিকতে পারে নি। আসলে মুসলমানরা ঈমানদার জাতি। ঈমান-ই হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির একমাত্র ভিত্তি। তাদের শক্তি সাহসিকতা ও দুর্জয়তারও মূল উৎস এ ঈমানেই নিহিত। এ ঈমানকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। নেই অন্য কোনো পরিচয়। মুসলমানদের প্রথম দিনের পরিচয় ছিল তারা মুমিন। আজও তাদের এটাই একমাত্র পরিচয়। এ পরিচয় হারিয়ে, এ পরিচয়কে তুচ্ছজ্ঞানে উপক্ষো করে অন্য যে-কোনো পরিচয়ই গ্রহণ করা হোক-না কেন তা মুসলমানের পরিচয় হবে না। কেননা মুসলমানদের 'মুমিন' 'ঈমানদার' ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়ই থাকতে পারে না। আর এই ঈমানী জীবন-ই হচ্ছে 'উন্নত জীবনের আদর্শ'।

এই ঈমান ও আকীদার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থখানি রচনার দুরূহ কাজে হাত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ই একে সম্পূর্ণ করাতে পারেন।

ঈমানের অর্থ ও তাৎপর্য

এই গ্রন্থে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঈমান। কিন্তু কোন ঈমান ? 'ঈমান' বলে আমরা কি বোঝাতে চাই ? কোন ঈমান হতে পারে উন্নত জীবনের আদর্শ ? আমাদের মন ও জীবনকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে আমাদের যে ঈমান, তা কি ?

একজন লোক মুখে যদি বলে, 'আমি মুমিন, আমার ঈমান আছে' তাহলে শুধু এ মৌখিক দাবি ও ঘোষণাতে মেনে নেয়া যেতে পারে না যে, সে সত্যিই মুমিন এবং প্রকৃত ঈমানই তার রয়েছে। বস্তুত ঈমান নিছক মৌখিক দাবির বিষয় নয়। কেননা অনেক মুনাফিকও সত্যিকারভাবে ঈমান না এনে মৌখিক দাবি করেছে ঈমানের। নিজেদের মুমিন বলে প্রচারও করেছে। কিন্তু তাতেই তার ঈমান স্বীকৃতি লাভ করেনি, তারা সমাজে মুমিনরূপে বরিত হয়নি। বরং তারা উন্নত জীবনের আদর্শ অর্জন করতেও সম্পূর্ণ অসমর্থই রয়ে গেছে।

ঈমান বলতে নিছক সে সব কাজ বা আচার-আচরণও বুঝায় না, যা সাধারণত মুমিন লোকদের করতে দেখা যায়। কেননা অনেক দজ্জাল লোকও খুব ভালো-ভালো কাজ-কর্ম করে থাকে। কিন্তু তার দ্বারাই তারা ঈমানদাররূপে গণ্য হতে ও মর্যাদা পেতে পারে না। ঈমানের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়-মন দিয়ে জানতে পারা বা শুধু উপলব্ধি করাকেও ঈমান বলা যায় না। কেননা এ রকম উপলব্ধি তো অনেকেই লাভ করে, কিন্তু তবু তারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়। কারণ অনেক সময় ঈমানের সে অনুভূতি ও উপলব্ধি বাস্তবে প্রতিফলিতও হয় না। অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ ও দুনিয়ার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রেম-প্রীতি ঈমানের বাস্তব প্রতিফলনের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উন্নত জীবনের মহান আদর্শ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে অনেক দূর।

বস্তুত ঈমান নিছক মুখে উচ্চারণের কাজ নয়। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে করার কাজও নয়, নয় তা কেবলমাত্র মানসিক উপলব্ধি। ঈমান মানব-মনের গভীরতর অনুভূতি। মন এই অনুভূতিতে গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়। তা-মনের সমগ্র দিককে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। হৃদয়-অনুভূতি, ইচ্ছা ও সচেতন উপলব্ধি— এই সবই হচ্ছে ঈমানের প্রতিফলন।

প্রথমে প্রয়োজন ঈমানের তীব্রতার অনুভূতি। তার অস্তিত্ব হৃদয়ের পরতে পরতে কম্পন জাগিয়ে দেবে। সমগ্র হৃদয়লোক ঈমানের নির্ভুল চেতনা ও

উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এই বুদ্ধি-বিবেকগত অনুভূতি সুদৃঢ় প্রত্যয় ও ঐকান্তিক বিশ্বাসে হবে অবিচল, অনড়, অটল। তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় একবিন্দু স্থান পাবে না। কুরআন মজীদে এ ঈমানের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا – (الحجرة : ١٥)

নিঃসন্দেহে মুমিন হচ্ছে কেবলমাত্র সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর তারা কোনোরূপ সন্দেহের প্রশ্রয় দেয়নি।

এই অনুভূতির উপলব্ধি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। ইচ্ছা শক্তি তার অনুগত হবে। যাঁর প্রতি ঈমান আনা হয়েছে, তাঁর প্রতি হবে চিন্তা-অবনত, তাঁর সব আদেশ-নিষেধ মেনে নেবে ঐকান্তিক সন্তোষ-সদিচ্ছা ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা সহকারে।

কুরআনে এরূপ ঈমানের পরিচয় দেয়া হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিতে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا – (النساء : ٦٥)

তোমার আল্লাহ্‌র নামে শপথ। এই লোকেরা কখনোই ঈমানদার বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাকে (হে নবী!) তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারীরূপ মেনে নেবে। অতঃপর তোমার দেয়া ফয়সালা ও সিদ্ধান্তে তারা কোনোরূপ দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করবে না। আর তোমার ফয়সালাকেই তারা অকুণ্ঠ মনে ধারণ করে নেবে।

ঈমানের এই উপলব্ধি-অনুভূতি ক্রমশ মানসিক উচ্চতা ও তেজস্বিতা লাভ করবে এবং ব্যক্তিকে সে ঈমানের দাবি অনুযায়ী কর্মে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। এরূপ ঈমানই প্রতিফলিত হবে চরিত্রে, নিত্যকার আচার-আচরণে। এ ঈমানই তাকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত করবে। সে জিহাদ হবে ধন-মাল আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার মাধ্যমে। সে জিহাদ হবে নিজেকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত করার কঠোর কাঠিন্যকে সহ্য করে। কুরআন এরূপ ঈমানের পরিচয় দান পর্যায়ে ঘোষণা করেছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ

اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا - (الانفال : ٢-٤)

নিশ্চিতরূপে মুমিন কেবলমাত্র সেসব লোক, আল্লাহ্‌র উল্লেখ হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত (কুরআনের বাণী) কিংবা তাঁর কুদরতের কোনো নির্দশনের আলোচনা হলেই তাদের ঈমান বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করে এবং তারা সব সময়ই তাদের আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরতা রাখে। এ সেসব লোক, যারা রীতিমতো নামায কায়েম করে, আর আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক থেকে তারা ব্যয় করে। এরাই সত্যিকারভাবে মুমিন।

কুরআন ঈমানকে সব সময় জীবন্ত চরিত্র ও সুষ্ঠ কাজ-কর্মের প্রতীকরূপে উল্লেখ করেছে। কেননা এই কুরআনের সাহায্যেই প্রমাণিত হয় প্রকৃত ঈমানদার লোক কাফের ও মুনাফিক থেকে স্বতন্ত্র সত্তা ও মর্যাদার অধিকারী । নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই বিষয়টি বিধৃত ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ -

(المؤمنون : ١-٥)

প্রকৃত কল্যাণ লাভ করেছে সেসব ঈমানদার লোক— যারা তাদের নামাযে ভীত সন্ত্রস্ত বিনীত, যারা অর্থহীন নিষ্ফল কাজ থেকে বিরত, যারা যাকাতের কার্য সম্পাদনে নিরত, যারা তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণে সদা সতর্ক।

প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানদার লোকদের পরিচয় দান প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ - (الحجرات : ١٥)

প্রকৃত ও মুমিন সেসব লোক— যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর একবিন্দু সন্দেহকে তারা প্রশ্রয় দেয়নি আর নিজেদের সত্তা ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যিকার ঈমানদার লোক।

প্রকৃত ঈমান বলতে কি বুঝায় এবং প্রকৃত ঈমাদার লোকদের অনিবার্য গুণ পরিচয় কি, তা উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ একত্রিত করে বিবেচনা করলেই

স্পষ্টভাবে বুঝায় যায়। প্রথমত, ঈমান হতে হবে আল্লাহ্‌র প্রতি, সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি এবং এই ঈমানে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। কেবল আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করলেই হবে না, তাঁর রাসূলের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। আর সে ঈমানকেও হতে হবে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ও দ্বিধা-সংকোচের উর্ধ্বে।

দ্বিতীয়, ঈমানের ক্ষেত্রে রাসূলের প্রতি বাস্তব আনুগত্য ও তাঁর অনুসরণ সমধিক গুরুত্বের দাবিদার।

তৃতীয়ত, আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ মাত্রই অন্তর ভীত-কম্পিত হতে হবে। আল্লাহ্‌র নিদর্শন বা আয়াত সেই ঈমানকে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি দান করবে। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত নির্ভরতা রাখবে— আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপর একবিন্দু ভরসা করবে না। তারা রীতিমত নামায কায়েম করবে এবং আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক, ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ সাধারণভাবে জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবে।

চতুর্থত, তারা লোক দেখানো নামায পড়বে না। নামাযে দাঁড়ালে তাদের হৃদয়-মন আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পিত, সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। বাস্তব জীবনে তারা সর্বপ্রকার শরীয়ত বিরোধী, অর্থহীন নিষ্ফল ও বেহুদা কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে। তারা সব সময় নিজেদের পরিচ্ছন্ন পবিত্রকরণের কাজে লিপ্ত থাকবে। ধন-সম্পদের যাকাতও তারা এ উদ্দেশ্যই আদায় করতে থাকবে। তারা নৈতিকতার সংরক্ষণ করতে কোনো প্রকার নৈতিক স্খলনকে প্রশ্রয় দেবে না। তারা নিজেদের পূর্ণসত্তা দিয়ে নিজেদের ধন-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে লিপ্ত থাকবে, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

এক কথায়, ঈমানীয় বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিক অকুণ্ঠ বিশ্বাস থেকে শুরু করে দ্বীনের জন্য জিহাদ করা পর্যন্ত সবকিছুই এই ঈমানের মধ্যে শামিল— ঈমানের অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর কোনো একটা বাদ পড়লে ঈমান হবে না, ঈমান তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নিয়ে বহাল থাকবে না। কুরআন মজীদের ঘোষণাবলী থেকেই ঈমানের এ তাৎপর্য প্রমাণিত ও প্রতিভাত। এসব উপাদান-উপকরণ নিয়েই গড়ে ওঠে ঈমান। এরূপ হলেই বলা যায়, সত্যিকার ঈমান— যথার্থ ঈমান। এর কোনো একটা দিক বা অংশ বাদ পড়লে তখন তাকে 'ঈমান' নামে অভিহিত করা চলবে না। তখন যা থাকবে, তাকে একটা 'মতবাদ' বা 'অভিমত'ই বলা যেতে পারে, আর কিছু নয়। কেননা প্রকৃত ঈমান তো হচ্ছে তা-ই, যার দিগন্ত উজ্জ্বলকারী সূর্য 'মন ও জীবনে'র সমগ্র দিক ও

আনাচে-কানাচে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করে তুলবে। তার তীব্র রশ্মি ও কিরণ হৃদয়লোকের জীবন ক্ষেত্রকে আলোকমণ্ডিত সঞ্জীবিত ও উত্তাপসম্পন্ন করে দেবে। এ ঈমান জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক, দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করবে, কর্মশক্তি কর্মপ্রেরণাকে উজ্জীবিত করবে, মন ও মানসকে সক্রিয় করে দেবে। ইচ্ছা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কর্মতৎপর করে তুলবে। এ ঈমানই মানুষকে উন্নত জীবনের শিখরে উন্নীত করতে পারে।

বস্তুত একটা মত বা মতবাদ-মতাদর্শ এবং ঈমানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কোনো বিষয়ে তোমার যখন একটা মত বা মতবাদ গড়ে ওঠে, তখন তা তোমার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলো বলে বুঝা গেল। আর যখন তুমি কোনো বিষয়ে ঈমান আনলে— বিশ্বাস স্থাপন করলে তখন তা শুধু জ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয় হয়ে থাকল না, তখন তা জ্ঞানের সীমানা অতিক্রম করে তোমার মন-মগজ ও রক্তবিন্দুতে অর্থাৎ রক্তের ধারা-প্রবাহে শামিল হয়ে গেছে মনে করতে হবে। তখন তা তোমার অস্তিমজ্জায় ও তোমার অন্তরের গভীরতর গহনে স্থান করে নিয়েছে বুঝতে হবে। মতের অধিকারী ব্যক্তি একজন দার্শনিক মাত্র। সে বলতে পারে, আমি সবদিক বিচার বিবেচনা করে এই মত গ্রহণ করেছি, যদিও বাস্তবতার বিচারে তা বাতিল ও অসঙ্গত প্রমাণিত হয়ে যায়। যার সত্যতা সম্পর্কে আজ হয়ত যুক্তি দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু কালই যখন তার বিপরীতের সত্যতা প্রমাণকারী দলিল পাওয়া যাবে, তখন তা হবে ভ্রান্তিপূর্ণ। দার্শনিকের মত চিরসত্য হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তার কথা হলো, এটা আমার মত। আর এ মত কখনো সত্য হতে পারে, আবার কখনো ভুলও হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু বিশ্বাসীর কথা এরূপ হয় না। বিশ্বাসী যাতে একবার বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাতে সে দৃঢ় অবিচল হয়ে থাকে চিরজীবন। কোনোরূপ অমূলক ধারণা, শোবাহ-সন্দেহ তাতে একবিন্দু স্থান পেতে পারে না। অবস্থা যাই হোক না কেন, তার বিশ্বাস সত্য। তা সত্য যেমন আজ, তেমনি তা সত্য কালও, অতীতেও তা সত্য ছিল। তা অনাগত ভবিষ্যতের অনন্ত কাল ধরেও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য থাকবে। সত্য স্বতঃস্ফূর্ত, চির সমুজ্জ্বল। যুক্তি জালের কাটা ছেড়ায় তা যেমন ক্ষুণ্ন হয় না কখনো, তেমনি সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে তা ডুবেও যেতে পারে না। এই হলো ঈমানের প্রকৃত রূপ। এরূপ ঈমানের বলে বলিয়ান হয়েই একজন লোক ঘোষণা করতে পারে ঃ

لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِىْ يَمِيْنِىْ وَالْقَمَرَ فِىْ شِمَالِىْ عَلٰى اَنْ اَدَعْ هٰذَا الَّذِىْ جِئْتَ بِهٖ مَاتَرَكْتُهٗ -

আমি যে বিধান ও 'মিশন' নিয়ে এসেছি তা ছেড়ে দেব এ উদ্দেশ্যে ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য তুলে দেয় এবং বাম হাতে দেয় চন্দ্র, তবুও আমি তা ত্যাগ করব না।

মত বা মতাদর্শ একটা লাশ— নিষ্প্রাণ দেহ। তাতে যতক্ষণ ঈমান ও বিশ্বাসের 'রূহ' ফুঁকে দেয়া না হবে, তাতে কখনোই জীবনের সঞ্চার হবে না। মত অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর মাত্র— বিশ্বাস সূর্যের রশ্মি বিকীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা কখনো আলোকোদ্ভাসিত হতে পারে না। আর বিশ্বাস ও ঈমান হলো যেন প্রশান্ত মহাসাগর। সেখানে অন্ধত্ব ও সন্দেহের ফেনা জমতে ও জমে টিকে থাকতে পারে না। ঈমান ও বিশ্বাস অচলায়তন পর্বতের ন্যায়। তা চির অবিচল, সদা সমুন্নত। ঈমান ইস্পাতের মতো কঠিন, দুর্জয়। কোনোকিছুই তাকে টলাতে বা দুর্বল করতে পারে না।

ঈমানের ব্যাপকতা

এই ঈমান ও বিশ্বাসই বিশ্বলোক ও মানুষের অস্তিত্বের বৈধতা প্রমাণ করে। জীবন ও মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্যোদ্ঘাটন করে এই ঈমান। মানব মনের স্বাভাবিক ও স্বতঃই জেগে ওঠা জটিল প্রশ্ন— আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, শেষ পর্যন্ত কোথায় যাব ? কেন এই আসা ও যাওয়া ? এসকল প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দিতে পারে এই ঈমান।

ইসলাম ঈমানী বিষয়রূপে যে কয়টি জিনিস পেশ করেছে, তা তার নবোদ্ভাবিত নয়, হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই এগুলো নিজস্বভাবে পেশ করেছেন, তা এমন নয়। ঈমান ও বিশ্বাসের এ বিষয়গুলো স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম থেকেই সব নবী-রাসূলকে এ বিশ্বাসের বিষয়গুলো দিয়েই পাঠিয়েছেন। আসমানী সব কয়খানি কিতাবে এ ঈমানী বিষয়গুলো বিধৃত। এ গুলোই চিরন্তন সত্য ও শাশ্বত। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের অবকাশ নেই। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদেরকে এসব বিষয়েই শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ) তাঁর সময়ের জনগণের কাছে এগুলো পেশ করে ঈমান আনবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। হযরত হুদ ও সালেহ নবী আদ ও সামুদ জাতিকে তা-ই বলেছেন। হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক প্রমুখ নবী-রাসূলগণেরও এছাড়া অন্য কোনো দাওয়াত ছিল না। হযরত মূসার প্রতি অবতীর্ণ তওরাত কিতাব এগুলোই উপস্থাপিত করেছে। হযরত দায়ূদের পেশ করা 'জাবুর' ও হযরত ঈসার 'ইঞ্জীল' কিতাবেরও দাওয়াত ছিল এসব বিষয়ে ঈমান আনবার।

হযরত মুহাম্মাদ (স) এ ঈমানের দাওয়াতকে অধিকতর সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন ও সর্বপ্রকার আবর্জনামুক্ত করে পেশ করেছিলন। কেননা এ বিশ্বাস কয়টিতে অজ্ঞতার সুযোগে অনেক শিরকী আকীদা অনুপ্রবেশ করেছিল। ইসলামী ঈমানের মূল কথা ও প্রাণশক্তি হলো তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ব— তা জাহিলিয়াতের অন্ধকার অমানিশার এই সময়ে ব্যাহত, অস্পষ্ট ও শিরকের আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ত্রিত্ববাদ অর্থাৎ তিন খোদার ধারণা, শাফায়াত করে সব পাপীদের রেহাই দেয়া, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক রূপে মেনে নেয়া প্রভৃতি শিরকী আকীদা মিলেমিশে এককার হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্র প্রতীক দাঁড়িয়েছিল অনেক। মানুষের দোষত্রুটি অক্ষমতা ও সসীমতা আল্লাহ্তে আরোপ করার চেষ্টাও শুরু হয়েছিল। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এসব বাতিল বিশ্বাসকে নির্মূল করে ইসলামের মূল আকীদাকে সর্বপ্রকার আবিলতা থেকে মুক্ত, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দুনিয়ার সামনে পেশ করেছেন। কিন্তু তবু এসব কোনো নতুন জিনিস নয়। এ সবই শাশ্বত, চিরন্তন— সৃষ্টির শুরু থেকে এই হচ্ছে একমাত্র ঈমানের বিষয়।

ইসলামী ঈমানের প্রধান ও মূল বিষয় হলো তিনটি ঃ

– এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান

– নবুয়ত ও রিসালাত এবং সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান

– পরকালের প্রতি ঈমান

এই তিনটিকে (condenced) করে বলা যায় ঃ

আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও পরকালের প্রতি ঈমানই হচ্ছে ঈমানের মূল বিষয়। আর আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের তিনটি দিক ঃ আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তায় ঈমান, আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর অংশীদার মুক্ত সমতুল্যহীন হওয়ার ঈমান এবং আল্লাহ্র পূর্ণত্বের প্রতি ঈমান।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব

এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, এই দুনিয়া— এই বিশাল বিশ্বলোকের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে সবকিছু সৃষ্টি করে একে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে চালিয়ে নিচ্ছেন, একে নিজের ইচ্ছামূলক নিয়ম মাফিক প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরই একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব এর উপর অপ্রতিহতভাবে চির প্রতিষ্ঠিত। এতে কখনো কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না, ঘটতে পারে না। ব্যতিক্রম ঘটলে এসব কিছুই নিমেষের মধ্যে খান

খান হয়ে যেত। না আমি থাকতাম, না তুমি থাকতে, না বিশ্বলোকের কোনো কিছু।

চিন্তাবিদ দার্শনিকেরা এ সত্তার নানা নাম দিয়েছে। কেউ বলেছে 'প্রথম কারণ'। কেউ নাম দিয়েছে প্রথম বিবেক, আবার অন্যরা নাম দিয়েছে প্রথম গতিদানকারী। আর আসমানী কিতাবসহ কুরআন মজীদ তাঁর নাম দিয়েছে আল্লাহ। এ নামে তাঁর শক্তি-সামর্থ, ক্ষমতা-দাপট-প্রতাপ এবং তাঁর মহৎ গুণাবলী সুন্দরভাবে সমন্বিত।

আল্লাহ্ এক উচ্চতর মহান শক্তি। মানবীয় চিন্তাশক্তি তাঁর সঠিক রূপ কল্পনায় আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্র সত্তা মূলত যে কি, তার ধারণা করা মানবীয় শক্তি-সামর্থের আওতা-বহির্ভূত ব্যাপার। এটা বিচিত্র নয়। বস্তুজগতের ও বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির কালেও এমন অনেক জিনিসই রয়েছে যার বস্তুত্ব (Realityt) অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইথার, মাধ্যাকর্ষণ ও পরমাণু ইত্যাদি এই পর্যায়ে ধরা যায়। পরমাণু অতিশয় সূক্ষ্ম। অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও পরমাণু দেখা যায় না। তাপ, আলো, শব্দ ইত্যাদির অস্তিত্ব টের পাওয়া গেলেও ওজন বা অনুভব করা যায় না। ওজন বা অনুভব করা না গেলেও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, দেখা না গেলেও আছে— এটা প্রমাণিত, এমন জিনিস অসংখ্য। বুঝবার জন্য বলা যায়, আল্লাহ্র অস্তিত্ব আছে অনুভব করা যায়; কিন্তু নিজ চোখে দেখা যায় না। তাহলে আল্লাহ্কে দেখতে পাওয়া বা আল্লাহ্ কি, তা অনুধাবন করা না গেলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আল্লাহ তাঁর পূর্ণ শক্তি নিয়ে আছেন, এটাই আসল কথা। কুরআন মজীদ আল্লাহ্র পরিচয় দান প্রসঙ্গে একটি আয়াতে বলেছে ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

- لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَيُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -(الانعام: ١٠٢-١٠٣)

এই হচ্ছে মহান আল্লাহ— তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তিনি ছাড়া ইলাহ কেউ নেই। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা। অতএব তোমরা তারই বন্দেগী স্বীকার করো। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য দায়িত্বশীল। তাঁকে চক্ষুসমূহ দেখতে পেতে পারে না। তিনিই সব চক্ষুকে দেখেতে পান। তিনি অতীব সূক্ষ্ম ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

এমনিভাবে কুরআনের বহুতর আয়াতে আল্লাহ্র অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে অকাট্যভাবে নানা যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে।

১. বিশ্বচরাচরের চারদিকে বিস্তৃত অসংখ্য নির্দশন এমন, যা চিন্তা-বিবেচনা করলেই মানব-মন নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারে যে, এই সব-কিছুর অন্তরালে এক মহান শিল্পী মহাস্রষ্টা ও সুবিজ্ঞানী পরিচালক বর্তমান। কার্যকারণ বিধানের প্রথম সূত্রই একথা স্পষ্ট করে দেয়। এজন্য বিশেষ কোনো দলিল বা প্রমাণের আবশ্যক করে না। সেই কার্যকারণের সূত্র হিসেবে কুরআন মজীদের এই আয়াতটি বিবেচ্য ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ - (البقرة : ١٦٤)

নিঃসন্দেহে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত্র দিনের আবর্তন, নদী-সমুদ্র, জনকল্যাণকর দ্রব্যাদি বহনকারী চলমান জাহাজ–নৌকা, উর্ধ্বলোক থেকে আল্লাহ্‌র বৃষ্টি বর্ষণ ও তার দরুন মৃত জমির পুনরুজ্জীবিত হওয়া, পৃথিবীতে জীব-জন্তুর বংশবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে আটকে থাকা ঝুলমান মেঘমালা ও বাতাসের প্রবাহ— এ সবই সুস্পষ্ট নিদর্শন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের তাদের জন্য, যারা জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তা অনুধাবন করতে প্রস্তুত।

এই বিশাল সৃষ্টিলোকের জন্য একজন স্রষ্টা একান্তই অপরিহার্য। কোনো ব্যবস্থাই ব্যবস্থাপক ছাড়া চলতে পারে না, এ কথা স্পষ্ট বোধগম্য (obvious) কুরআন প্রশ্ন তুলেছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ - اَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

(الطور : ٣٥-٣٦)

তারা কি কোনো বস্তু ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে ? না তারা নিজেরাই স্রষ্টা ? তারাই কি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে ?

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى - قَالَ رَبُّنَا الَّذِىٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -
(طٰهٰ : ٤٩-٥٠)

ফিরাউন জিজ্ঞেস করল, হে মূসা! তোমরা দুজন কাকে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বলে মেনে নিয়েছ ? মূসা বললেন, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো সেই

মহান সত্তা, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টি-উপকরণ দান করেছেন, অতপর তাতে নিয়ম-বিধান প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করে দিয়েছেন।

২. মানুষের সুস্থ প্রকৃতি ও বিবেক এ কথা নিঃসন্দেহে অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে যে, তার একজন রব্ব অর্থাৎ স্রষ্টা ও প্রতিপালক সংরক্ষক রয়েছেন যিনি মহাশক্তিমান, যিনি সব কিছুর সংরক্ষণ করেন ও সব কিছুর প্রয়োজন যথাযথভাবে পরিপূরণ করেন। সেই মহান আল্লাহ্‌তেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার আহবান জানিয়ে কুরআন বলেছে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الروم : ٣٠)

তোমার পূর্ণ সত্তাকে সমর্পিত করে দাও সেই বিধানের জন্য সর্বদিক দিয়ে মুখ ফিরিয়ে। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বানানো প্রকৃতি যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা মানবকুলকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টি নিয়মে কোনোরূপ রদ-বদল হতে পারে না। আর এই হচ্ছে সুদৃঢ় অবিচল অপরিবর্তনীয় বিধান। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের তীব্র অনুভূতি এবং তাতেই নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করাই যে মানব প্রকৃতি নিহিত সত্য কথা, তা মানুষ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করতে পারে। আনন্দ স্ফূর্তির আবিলতায় ক্ষণিকের তরে মানব প্রকৃতির এ অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও কঠিন ও ভয়-বিহবলতার আঘাতে সে আবিলতার কুয়াশা মিলিয়ে যায়, অনুভূতি সূর্য স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মিথ্যার কুহকজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, মানুষের আসল রূপ তখন প্রকাশ পায়। মানুষ তখন কান্না ভারাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়। কুরআন মজীদে একটি সুন্দর রূপক দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই কথাটি বলা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاۤءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاۤءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ - (يونس : ٢٢)

সেই মহান আল্লাহ্‌ই তোমাদের চলাচল করান স্থলভাগে ও জল পথে, এমন কি তোমরা যখন নৌকা-জাহাজে আরোহী থাকো, আর তোমাদিগকে

পরিচালিতও করি মৃদুমন্দ বাতাসের সাহায্যে, তখন সবাই তার দরুন খুব আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু পরে যখন প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে, চতুর্দিক থেকে উত্তাল উর্মিমালা আসতে থাকে তখন তারা ধারণা করে যে, তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এই সময় তারা এক আল্লাহ্কে ডাকে, তারই আনুগত্যের ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রকাশ করে, বলে— হে আল্লাহ! তুমি যদি এবার আমাদের রেহাই দাও, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমার শোকর আদায়কারী হব।

মানব সত্তায় ঘুমিয়ে থাকা এ প্রকৃতিই স্বরূপে জেগে ওঠে ও সঠিক কথা বলে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, এ বিশ্ব প্রকৃতির উৎস কি ? স্রষ্টা কে ? কে এর পরিচালক-নিয়ন্ত্রক ? তখন তারা স্পষ্ট ভাষায় একটি মাত্র শব্দই উচ্চারণ করতে বাধ্য হয় ঃ 'আল্লাহ'।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ-

(العنكبوت : ٦١)

তুমি যদি লোকদের জিজ্ঞেস করো, কে সৃষ্টি করেছে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ? চন্দ্র সূর্যকে নিজ নিজ কক্ষে কে বন্দী করে রেখেছে ? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ আল্লাহ।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ-

আল্লাহ বলেছেন ঃ ওদের জিজ্ঞেস করো, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছে ? কে তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক ও দাতা ? জীবন্ত জিনিস কে বের করে মৃত থেকে, মৃতকে বের করে জীবন্ত থেকে— এই সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণকারী কে ? তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ 'আল্লাহ'। এখন বলো, এই যদি হয় তাহলে সে আল্লাহ্কে কি তোমাদের ভয় করা উচিত নয় ? আসলে তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের স্রষ্টা-প্রতিপালক, মহাসত্য। তাহলে সে মহাসত্য আল্লাহ্কে বাদ দিলে চরম বিভ্রান্তি ও গুমরাহী ছাড়াও আর কিছু থাকে কি ? —তাহলে তোমাদের কোন দিকে ঘুরানো ফিরানো হচ্ছে। (সূরা ইউনুস ঃ ৩১-৩২)

কুরআন মজীদ মানুষের ইতিহাস থেকেও প্রমাণ করেছে, এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করাই মানুষের জন্য একমাত্র মুক্তি সনদ। আর আল্লাহ্‌র প্রতি বেঈমানী ও উপেক্ষা এবং তাঁর রাসূলের অমান্যতাই মানুষের সার্বিক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের আসল কারণ। নূহ নবীর কওম এ কারণেই ডুবে মরেছিল, রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল কেবল তারা যারা হযরত নূহের প্রতি ঈমান এনেছিল। (আল-আরাফ ঃ ৬৪)

হুদ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (الاعراف : ٧٦)

হুদ নবী এবং তাঁর সঙ্গীদের আমরাই রক্ষা করেছি আমাদের দেয়া অনুগ্রহের সাহায্যে। আর পিছনে পড়ে থাকা যেসব লোককে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি যারা আমাদের নিদর্শনাদিকে অবিশ্বাস করেছিল— তারা আদৌ ঈমানদার ছিল না।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ -

সালেহ নবীর লোকদের ঘরবাড়ি উল্টে-পাল্টে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল এ কারণে যে, তারা জুলুম করেছিল। অবহিত লোকদের জন্য এতে রয়েছে উজ্জ্বল নির্দশন। (সূরা নামল ঃ ৫২-৫৩)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

এ-ই হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্থায়ী নিয়ম। যারা আল্লাহ ও তাঁর নবী-রাসূলগণকে অমান্য করে চলতে চায়, তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে থাকা নিদর্শনাদি দেখেও যারা ঈমান আনে না, তাদের এ অপরাধের কারণে কঠিন প্রতিশোধমূলক বিপদের সম্মুখীন হতে হয় নিশ্চিতভাবে এবং এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিশ্চিত সাহায্য পায়— পেয়ে রক্ষা পায় শুধু সেসব লোক যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানদার। (সূরা রুম ঃ ৪৭)

আল্লাহ্ এক— লা-শরীক

আল্লাহ আছেন, তিনি শাশ্বত চিরন্তন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তিনি এক ও একক এবং লা-শরীক। তাঁর সত্তা সাদৃশ্যহীন, তাঁর গুণাবলী অতুলনীয়, তাঁর কাজকর্ম অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নিরংকুশ, অপ্রতিরোধ্য, আমোঘ।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ لا وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - (الاخلاق : ١-٤)

বলো, আল্লাহ এক, একক। আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষীহীন। তিনি জাত নন, কেউ নেই তাঁর জাত। তাঁর সমতূল্য কেউ হতে পারে না— কখনোহয়নি।

এই বিশ্বলোকে যা কিছু আছে, যে ব্যবস্থাই চলছে এ বিশ্বলোকব্যাপী, তা সবই অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে— এই সব কিছুর স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক এক ও একক। তার সাথে এ কাজে শরীক কেউ নেই– হতে পারে না। এ বিশ্বলোকের স্রষ্টা যদি একাধিক হতো তাহলে বিশ্বালোকে নিহিত এ সাদৃশ্য সম্ভবপর হতো না। এ বিশ্বলোকের পরিচালক ব্যবস্থাপক যদি বহু হতো, তাহলে এ শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা কিছুতেই চলতে পারত না, সর্বাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়া হতো একান্তই অনিবার্য।

আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি ও সৃষ্টিলোকের লালন-পালন ও প্রয়োজন পূরণেরও এক ও একক। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসের প্রয়োজন পূরণ করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ দাবি করতে পারে না এ সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা হওয়ার, প্রতিপালক হওয়ার, রিযিকদাতা হওয়ার। একবিন্দু পরিমাণ জিনিস সৃষ্টি করার সাধ্য কারুর নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা এক ও একক ইলাহ্। অতএব মানুষের এবাদত পাওয়ার একমাত্র অধিকার সেই এক আল্লাহ্রই। অন্য কারো সেই অধিকার নেই— থাকতে পারে না। ভয় করার যোগ্য কেবল তিনিই, তিনি ছাড়া কেউ নয়। নতি স্বীকার করতে হবে একমাত্র তাঁরই কাছে, তিনি ছাড়া আর কারো কাছে নয়। কোনো কিছু পাওয়ার আশা পোষণ করতে হবে কেবল তাঁরই কাছ থেকে। তিনি ছাড়া আর কেউ তো দিতে পারে না কিছু। নির্ভর করতে হবে একমাত্র তাঁরই উপর। তিনি ছাড়া অন্য কারুর উপর নির্ভর করলে কোনো ফল পাওয়া যাবেনা। কেননা কোনো কিছু করার সত্যিকার ক্ষমতা আর তো কারো নেই। মেনে চলতে হবে একমাত্র তাঁরই আদেশ-নিষেধ, তাঁরই আইন-বিধান। কেননা সমস্ত মানুষই সমান, তারা নবী-রাসূল, রাজা-বাদশাহ্, নেতা-কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, আলেম-পীর— যা-ই এবং যে-ই

হোক-না কেন, তারা সবাই এক সঙ্গে আল্লাহ্র বান্দা মাত্র। বান্দাহ হওয়া হিসাবে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা তারতম্য নেই। দ্বিতীয় এই মানুষ সে যে-ই হোক-না কেন— নিজেরই লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকার, জীবন বা মৃত্যু, উত্থান বা পতন কোনো কিছুরই কর্তৃত্ব সম্পন্ন নয়। তাহলে এদের একজনকে 'ইলাহ' বানাবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, তার যৌক্তিকতা যেমন কিছু নেই, ইহকালীন-পরকালীন ফায়দাও নেই কিছু।

ঠিক এ কারণেই সাধারণভাবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের প্রতি এবং বিশেষভাবে আহলে কিতাব ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কুরআনের উদাত্ত আহ্বান হলো ঃ

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ - (ال عمرن : ٦٤)

(হে লোকেরা!) আসো তোমরা এমন একটা বাণীর দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সম্পূর্ণ সমান-সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তাহলো এই যে, আমরা ও তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই বন্দেগী করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করব না। আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমরা পরস্পরকেও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক— মালিক-মুরব্বী-বিধানদাতা-আনুগত্য পাওয়ার যোগ্যা মেনে নেব না।

হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল, ইসলামের নবী। তিনি এ দাবি করেন নি যে, কুরআন তাঁর নিজের রচিত কিতাব। তিনি একজন রাসূল মাত্র। তাতেও তার অভিনবত্ব কিছুই নেই। তাঁরই মতো আরও অনেক নবী-রাসূল তাঁর পূর্বে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন। অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ন্যায় তিনি নিজেকে 'আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল' রূপেই দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করেছেন। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে দাওয়াত মানুষকে দিয়েছেন, তার দাওয়াত ঠিক তা-ই, অন্য কিছু বা অতিরিক্ত কিছু নয়। কুরআন এই কথাই ঘোষণা করেছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ - (النحل : ٣٦)

প্রত্যেক সময়কার লোকদের কাছেই আমরা রাসূল পাঠিয়েছি এই দাওয়াত সহকারে যে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ্র দাসত্ব গ্রহণ করো, আর সব আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে পরিহার করো।

উপরে যা বলা হলো, এ প্রেক্ষিতেই ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ঈমান একটা বিরাট মহান বাণীর রূপ গ্রহণ করেছে। মুসলিম সমাজে তা 'তাওহীদ' নামে পরিচিত। আর এ তাওহীদের কলেমা হলো ঃ

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ -

নেই কোনো ইলাহ্ আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্ রাসূল।

বস্তুত কলেমা তাওহীদের এ বাণীটি দুনিয়ার সব স্বেচ্ছাচারী, আল্লাহ্দ্রোহী ও আল্লাহ অমান্যকারীদের সামনে এক মহাবিপ্লবী ঘোষণা। মানুষের কল্পিত ও মনগড়া ভাবে গ্রহীত দেব-দেবী উপাস্য-অরাধ্য নমস্য-মানবীয়— সবকিছুর বিরুদ্ধে এই ঘোষণা উচ্চারিত। এ ঘোষণা বিশ্বজনীন, বিশ্বমানবিক (Universal) বিশ্বমানবকে আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুর দাসত্ব ও আনুগত্যের শৃঙ্খলকে সার্বিকভাবে ও পরিপূর্ণভাবে নিষ্কৃতিদানের উদ্দেশ্যে একই উদাত্ত আহবান। এ আহবান বিশ্বমানবকে এক নবতর আদর্শ, নতুন জীবন পথ ও পদ্ধতির সামনে উপস্থাপিত করে দিয়েছে। এ কালেমা কোনো চিন্তাবিদ-দার্শনিক-রাজনীতিবিদ বা আলেম-পীর-মুর্শিদের রচিত নয়। এ ঘোষণা আল্লাহ্র। এ ঘোষণা সমস্ত মানুষকে অন্যান্য সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহমুখী বানিয়ে দেয়। অন্যান্য সব মত-ধারণা-বিশ্বাস ও পথ-পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বনকারী ও তার একান্ত অনুগত এবং অনুসারীদের আল্লাহনুগত বানিয়ে দেয়। সকলের মন ও মগজকে অবনত অনুগত বানায় কেবল এক আল্লাহ্র আইন ও বিধানের— তাঁর আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের। এখানে সব মানুষ এক, অভিন্ন। আল্লাহ্র বান্দারূপে সব মানুষ একাকার।

মানুষের এই একত্ব ও এককত্বই হচ্ছে প্রকৃত মানবতার অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের মর্মকথা। এতেই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, আসল সম্মান ও মর্যাদা। কেননা আব্দ ও মাবুদ অর্থাৎ দাস ও প্রভুর মাঝে ভ্রাতৃত্বের ধারণা করার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। মানুষকে প্রভুর আসনে বসালে মানুষের স্বাধীনতা ও সম্মান বলতেও থাকতে পারে না কিছু। মানুষ যদি মানুষের সামনে নতি স্বীকার করতে— মানুষের অধীনতা করতে বাধ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে সিজ্দা করে— সিজ্দা করতে বাধ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে মাবুদ-প্রভূ বা সার্বভৌম বানায়— বানাতে বাধ্য হয়; তাহলে বুঝতে হবে, সেখানে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই, অবশিষ্ট নেই মানুষের কোনো মর্যাদা ও সম্মান।

হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব নাজ্জাশীর রাজ-দরবারে উপস্থিত হলেন অন্যান্য মুহাজির মুসলমান সমভিব্যাহারে। দরবারের চিরাচরিত প্রথা মতো তাঁরা বাদশাহ্কে সিজ্দা করলেন না। মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শাহী

দরবারের রেওয়াজ মতে এটা ছিল তাঁদের একটা অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁদের এ আচরণ দরবারের উপস্থিত সকল লোককে স্তম্ভিত ও প্রকম্পিত করে দিল। রাজার কাছে অভিযোগ পেশ হলো। জবাবে হযরত জাফর নির্ভীক কণ্ঠে বললেন ঃ لانسجد الاالله —'আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করি না— অন্য কারো সামনে নতি স্বীকার করি না।' ইসলামী ইতিহাসের সেই প্রাথমিককালীন একটি ঘটনা। সেই থেকে চিরকালের জন্য সারা দুনিয়ার মুসলমানের 'মটো' (মর্ম) হয়ে গেছে ঃ لانسجد الاالله —'এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করি না— কারুর সামনে মাথা নত করি না, কারুর অনুগত হই না।'

আল্লাহ্‌র পূর্ণত্ব

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও মনে স্থান দিতে হবে যে, তিনি তাঁর উপযোগী সব মহান পবিত্র পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীতে পরোপুরি ভূষিত। তিনি পবিত্র সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা, মুখাপেক্ষিতা, পরনির্ভরতা, পরাধীনতা ও সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর এককত্ব ও তাঁর গুণ-পূর্ণতা একই মূল ঈমানের অবিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ। এর প্রত্যেকটি অংশ অপর প্রত্যেকটি অংশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। একটি অংশের প্রতি ঈমান আনলে অপরাপর অংশের প্রতিও ঈমান আনতে হয় অনিবার্যভাবে। নতুবা সে ঈমানের কোনো অর্থ হয় না। ঈমান বলেই গণ্য হতে পারে না তা।

আল্লাহ তা'আলা মহান। তিনি সবকিছু জানেন। তাঁর কাছে গোপন বা অজানা বলতে কিছু নেই। তিনি সৃষ্টিকুলের অতীত জানেন, জানেন ভবিষ্যত আর বর্তমান তো আর সম্মুখে শুভ্রমহল। যা প্রকাশ্য তাও জানেন, যা অপ্রকাশিত, অন্তরালবর্তী তাও তার কাছে দিবালোকের মতোই ভাস্বর। তাঁর ইল্‌ম অসীম, অপার। তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করবার সাধ্য কারো নেই।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ -
(البقرة : ٢٥٥)

তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সমুখে, যা আছে তাদের পিছনে। আর তাঁর জ্ঞানের একবিন্দু জিনিস তারা আয়ত্ত করতে পারে না— তবে যা তিনি নিজেই ইচ্ছা করেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ - (آل عمرٰن : ٥)

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের কোনো কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে অজ্ঞাত বা গোপনী নেই— থাকতে পারে না।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ -

সমস্ত অদৃশ্য জগত সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানের চাবিকাঠি কেবল তারই কাছে সংরক্ষিত, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থলভাগে ও জলভাগে যা কিছু আছে, তা সবই তিনি জানেন। কোনো একটা পাতা পড়ে না, নড়ে না তাঁর জ্ঞানের বাইরে। মাটি-গর্ভের অন্ধকারে যে বীজ বপিত হয়, যা শুষ্ক, যা সিক্ত তাজা, তা সবাই সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। (সূরা আল-আনয়াম ঃ ৫৯)

তিনি সর্বজয়ী, যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন। তাঁর প্রতিরোধক কেউ নেই। কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাকে কেউ নিয়ন্ত্রিত বা অবদমিত করতে পারে না।

তিনি সুবিজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী, নিরতিশয় যুক্তিবাদী। তিনি কোনো জিনিসই অযৌক্তিক অসঙ্গত উদ্দেশ্যহীন অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করেন না। তিনি করেন, যে বিধানই কার্যকর করেন, তা সুস্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে, বৃহত্তর কল্যাণকে সামনে রেখে। তবে তা কেউ বোঝে না। ফেরেশতারা মানবসৃষ্টি নিহিত রহস্য সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ - (البقرة : ٣٢)

হে আল্লাহ, তুমিই মহাজ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।

যে কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিশ্বব্যবস্থার অলৌকিকত্ব দেখে ও সৃষ্টিকুলে গভীরতর মাহাত্ম্য অনুধাবন করে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠবে ঃ

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَابَاطِلًا ج سُبْحَانَكَ - (اٰل عمرٰن : ١٩١)

হে আল্লাহ! তুমি এর কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করনি, নিরর্থক ভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করা থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

তিনি বড়ই দয়াবান, করুণানিধি। তাঁর দয়া ও রহমত তাঁর ক্রোধ ও অসন্তোষকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যপ্ত। ফেরেশতাদের মুখে এ মহান সত্য ধ্বনিত হয়েছে এ ভাষায় ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا - (المؤمن : ٧)

হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি রহমত ও ইল্‌ম দ্বারা প্রত্যেকটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রেখেছ।

আল্লাহ্‌র কালাম শুরুই হয়েছে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দিয়ে। এর অর্থ, আল্লাহ্‌র রহমতের কোনো সীমা নেই। এই বলে তিনি সমস্ত বান্দাকে আশান্বিত করেছেন তাঁর রহমত পাওয়ার ব্যাপারে, তারা যতবড় গুনাহেই নিমজ্জিত থাকুক না কেন। তিনি নিজেই আহবান জানিয়ে বলেছেন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (الزمر : ٥٣)

হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অত্যাচার-অনাচার করেছ, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব গুনাহই মাফ করে দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াবান।

আল্লাহ্‌র এই পরিচয় পেশ করেছে কুরআন মজীদ। তিনিই হচ্ছেন কুরআনের আল্লাহ, ইসলামের আল্লাহ। ইসলামের আল্লাহ্ এই বিশ্বলোক থেকে বিচ্ছিন্ন নন, নন তিনি এর মধ্যে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এই আল্লাহ্‌র পরিচয় জানতেন না। তিনি তো আল্লাহ্‌র নাম দিয়েছেন First mover —প্রথম গতিদানকারী; First cause —প্রথম কারণ। এরিস্টটলের বর্ণনায় এ আল্লাহ্‌র জন্য দেয়া সব কয়টি গুণই নৈতিবাচক (Negative) —কার্যকারিতা নেই, নেই কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। বিশ্বলোকের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই, এখানকার ব্যবস্থাপনায় তাঁর কোনো দখল নেই। এরিস্টটলীয় দার্শনিকদের আল্লাহ নিজেকে ছাড়া কিছু জানে না। এই বিশাল বিশ্বলোকের কোথায় কি আছে কি হচ্ছে— সে বিষয়ে নেই তার কোনো জ্ঞান, কোনো অবহিতি। সে আল্লাহ এ বিশ্বলোককে 'নাই' থেকে 'আছে' করেনি, অস্তিত্বহীনকে দেয়নি অস্তিত্ব। সে দর্শনে এ বিশ্বলোককে বলা হয়ছে শাশ্বত, চিরন্তন, অসৃষ্ট, চিরদিন আছে, চিরদিন থাকবে। এই আল্লাহ্‌র সাথে এ জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানকার কোনো কিছুই সে করে না। এ আল্লাহ্ এমন নয়, যার প্রতি কোনো কিছুরই আশা পোষণ করা যেতে পারে, যাকে ভয় করা যেতে পারে। দার্শনিকদের পেশ করা আল্লাহ্‌র ইতিবাচক বা নৈতিবাচক কোনো শক্তি-ক্ষমতা নেই, নেই কোনো গুণ। এই হলো মানবীয় চিন্তার চরম ব্যর্থতার স্পষ্ট নিদর্শন। মানুষ যত বড় জ্ঞানী-গুণী-চিন্তাশীল হোক-না কেন, আল্লাহ্‌র পরিচয় কল্পনা করে বের করতে গেলে অ-আল্লাহ্‌কেই আল্লাহ বলে অবিহিত করতে বাধ্য হবে এমনিভাবে।

আল্লাহ্‌কে কল্পনা করে জানা যায় না, মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের কাল্পনিক আল্লাহ হবে মানস দেবতা মাত্র। আল্লাহ্‌র পরিচয় আল্লাহ্ নিজেই দিতে পারেন। তিনি নিজেই নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন— তা-ই তাঁর সঠিক পরিচয়। সেই পরিচয়ের আল্লাহ্‌কেই আল্লাহ্ বলে মানতে হবে। কুরআন মজীদ প্রকৃত আল্লাহ্‌র কালাম। তিনি এই কালামেই তার নিজের পরিচয় দিয়েছেন প্রকৃতরূপে বিশদভাবে। একটি আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى - اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى - لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى - (طٰهٰ : ٤-٦)

তিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি অতীব দয়াপরায়ণ আরশে সমাসীন। যা কিছু আকাশমণ্ডলে, যা কিছু ধরিত্রীতে, যা এ দুয়ের মাঝখানে, যা মাটির তলদেশে তা সবই একমাত্র তার-ই জন্য।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - (البقرة : ٢٥٥)

মহান আল্লাহ্ নেই কোনো মান্য তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, চির বর্তমান। নিদ্রা বা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সবকিছুই তার, তার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর কাছে শাফায়াত করতে সাহস পাবে এমন কে আছে ?

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ - (البقرة : ٢٥٥)

তাঁর কর্তৃত্বের আসন সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর প্রতিষ্ঠিত। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সংরক্ষণ তাকে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত-শ্রান্ত করতে পারে না। তিনি মহান উচ্চ, তিনি বিরাট সর্বাত্মক।

ইসলাম আল্লাহ্‌র যে পরিচয় দিয়েছে, তাতে তিনি প্রত্যেকটি জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক জীবন্ত সত্তার রিযিকদাতা, সবকিছুর নিয়ামক, ব্যবস্থাপক। সবকিছু তিনি জানেন, সংখ্যায় গুণতে পারেন তিনি তাঁর অসংখ্য অগণনীয় সৃষ্টিকে। তিনি সৃষ্টি করেছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন, পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, বিধান দিয়েছেন, তিনি সব শুনেন, সব দেখেন, সব জানেন।

সৃষ্টি তাঁর, বিধানও তাঁর। তারই হস্তে সবকিছুর মালিকানা। রাতকে দিনের সময়সীমার মধ্যে নিয়ে আসেন তিনি, দিনকে রাতের সময়সীমায় প্রবেশ করিয়ে দেন তিনি। মৃত্যু থেকে জীবন্ত, জীবন্ত থেকে মৃত্যু বের করেন তিনি। যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রিযিক দেন তিনি। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা তাঁরই নিয়ম বিধানের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে সদা কর্মনিরত করে রেখেছেন তিনি। তিনিই বাতাস প্রবাহিত করেন, এ বাতাস দিয়ে পুঞ্জীভূত মেঘমালাকে সারা আকাশে বিস্তীর্ণ করে দেন, তাঁরই নিয়মে বৃষ্টিপাত হয়। নদী-সমুদ্রের নৌকা-জাহাজ ভাসে-চলে তাঁরই বিধান মতো।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর দাসানুদাস ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ তাঁরই অধীন। মানুষ ও জ্বিনকে ইচ্ছামত ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ্। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর ইচ্ছা, নিয়ম ও প্রভুত্বের সীমার বাইরে যেতে পারে না কখনো। তাদের জীবন ও মৃত্যুর উপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই। আল্লাহ্‌র বিধান মতোই সব হয়। সেই বিধানেরই অনিবার্য পরিণতিতে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে। হাযির হতে হবে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র সমীপে দুনিয়াবী জীবনকালের সব কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য এবং শুভ প্রতিফল বা শাস্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

নবুয়্যতের প্রতি ঈমান

ইসলামের দ্বিতীয় ঈমানের বিষয় হলো নবুয়ত ও রিসালাত। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের পর-পরই এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঈমান আনতে হয় আল্লাহ্‌র নবুয়ত ও রিসালাত ব্যবস্থার প্রতি। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর পূর্ণত্ব, তাঁর যুক্তিশীলতা, দয়া, অনুগ্রহশীলতা ও বিশ্ব ব্যবস্থার কর্তৃত্বকারিতার প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত ব্যবস্থার প্রতি ঈমান এক অনিবার্য পরিণতি বিশেষ। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে এই বিশ্ব নিখিল তাদের অধীন ও করায়ত্ত করে দিয়ে আদেশ-নিষেধ সমন্বিত কোনো কর্মবিধান না দিয়ে এমনিতেই বাধা-বন্ধন নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন আর মানুষকে এখানে যা ইচ্ছা করবার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন— এটা কোনোক্রমেই কল্পনা করা যায় না। কেননা তিনি তো আল-হাকীম— মহাবিজ্ঞানী, অতি উচ্চ ও সর্বাধিক যুক্তিবাদী। কোনোরূপ আইন-বিধান ছাড়াই কাউকে শুধু ক্ষমতা দেয়া যে কতটা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক কাজ, তা বলে বুঝানোর প্রয়োজন করে না। বস্তুত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের বিচারে একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে কর্মক্ষমতা দিয়ে সেই সঙ্গে এখানে সে ক্ষমতা চালিয়ে কাজ করার বিধানও দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি যেমন মানুষের এই দুনিয়াবী জীবনের কর্মবিধান

দিয়েছেন, তেমনি মানুষের পরবর্তী পরকালীন জীবনের কথাও বলে দিয়েছেন বিশদভাবে।

আল্লাহ তা'আলা এখানে মানুষকে যেমন বৈষয়িক ও দৈহিক জীবনের নিয়ম-বিধান দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক ও কর্মময় জীবনেরও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। কেননা মানুষ তো শুধু দেহ সর্বস্ব নয়, শুধু দেহ সত্তারই নাম মানুষ নয়। দেহকে আশ্রয় করে আছে যে আত্মা, যে আত্মার অবস্থিতির কারণে মানুষ একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত সত্তা। সেই আত্মার অবলম্বন ও পাথেয় হিসাবে একটা বিধান দেয়া অতীব স্বাভাবিক। মানুষের এই আত্মার প্রভাব ও সক্রিয়তাই মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মতৎপরতার মূল উৎস। আর এই হচ্ছে মানুষের নৈতিক আচরণ, নৈতিক জীবন সাধনা।

এই নৈতিক জীবন সাধনার জন্যই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বিধান পাঠিয়েছেন ওহীর মাধ্যমে। এই ওহী নাযিল করেছেন যেসব ব্যক্তিদের উপর তাঁরাই হচ্ছে আল্লাহ্র নবী ও রাসূল। বস্তুত আল্লাহ যেমন বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা মৃত মাটি সঞ্জীবিত করেন, অনুরূপভাবে ওহী নাযিল করে মানুষের আত্মা তথা নৈতিকতার জীবন ভূমিকে চিরসঞ্জীবিত রাখার ব্যবস্থাও করেছেন।

মানুষকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-কলহ করে এবং সামাজিক-সমষ্টিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মত ও পথের সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নাস্তানাবুদ হবার জন্য ছেড়ে দেবেন, এমনকথা যুক্তি ও বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বরঞ্চ মানুষ যাতে করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে জীবনের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তার জন্য হেদায়েত পাঠানোই অতীব যুক্তিসঙ্গত। যেন মানুষ আল্লাহ্র অনুগত হয়ে জীবন যাপনের বিধান পেতে পারে, যেন মানুষ পারস্পরিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ আচার-আচরণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর তা আল্লাহ্র বিধান ব্যতিরেকে কখনোই সম্ভব নয়। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা জনসমাজের মধ্য থেকেই স্বীয় বাছাই-পছন্দ অনুযায়ী নবী ও রাসূল নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁদের কাছে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কর্ম-বিধানও দিয়েছেন দুনিয়ার মানুষের জন্য। নবী-রাসূলগণ বিশ্বমানবের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই অতীব কল্যাণময়, তা-ই সঠিক মানুষের অনুসরণীয় সুষ্ঠ কর্মবিধান। হযরত নূহ (আ) তাই বলেছিলেন ঃ

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ - (الاعراف : ٦١-٦٢)

হে আমার সম্প্রদায়! আমি কোনো গুমরাহী নিয়ে আসিনি। আমি মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। আমি তো তোমাদের কাছে আমার আল্লাহ্‌র রিসালাত পৌঁছে দেই মাত্র। আর তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর বিষয়ের উপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন সব ইল্‌ম লাভ করেছি, যে সব বিষয় তোমরা আদৌ কিছু জানো না।

বস্তুত নবী-রাসূলগণ সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে এমন সব বিষয়ের বিশদ ইল্‌ম লাভ করেন, যা মানুষ জানে না, জানতে পারে না। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা শক্তি তাদের যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, নবী-রাসূলগণ সেসব কথাই মানুষকে জানিয়ে দেয়। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা-ই জানতে পারে, তা-ই জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। তাদের নিজেদের থেকে কিছু বাড়িয়ে দেন না, নিজেদের ইচ্ছামত তাতে কিছু শামিলও করেন না, ভিন্ন রকম কিছু পৌঁছান না। এ ব্যাপারে তাঁদের বিশ্বস্ততা আল্লাহ্‌র কাছে যেমন প্রমাণিত, পরিবেশের সমস্ত মানুষের কাছেও তা অনস্বীকার্য, প্রতিভাত।

আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের বিভিন্ন স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযোগী হেদায়েত দেয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন। এই কারণে আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়েত ও ওহীও কয়েক পর্যায়ে হয়ে থাকে।

আল্লাহ্‌র একটি হেদায়েত অত্যন্ত স্বাভাবিক পর্যায়ের। এই হেদায়েত কোনো সৃষ্টির প্রথম জীবন থেকে লাভ হয়। মানব সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর-ই আল্লাহ্‌র কাছে স্বাভাবিক হেদায়েত লাভ করে বলেই সে ক্ষুধা অনুভব করে, কাঁদে, হাসে, মায়ের স্তন চুষতে শুরু করে। মুরগী ছানা ফুটে বের হওয়ার পরই ক্ষুৎ-কুড়া টুক্‌টুক্ করে খেতে শুরু করে, হাঁস শাবক পানির দিকে ছুটতে শুরু করে। কেবল মানুষই নয়, অন্যান্য জীব-জন্তু, পাখি, পোকা-মাকড়ও এই হেদায়েতে প্রবৃত্ত হয়। (সূরা আন-নহাল ঃ ৬৮)

সৃষ্টিলোকের সর্বত্র উদ্ভিদ জগতে সৌর লোকেও এই ওহী ও ওহীর মাধ্যমে পাওয়া হেদায়েতের ক্রিয়াকলাপ লক্ষণীয়। ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে তাই হযরত মুসা (আ) বলেছিলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى - (طه : ٥٠)

আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সৃষ্টি করে তাকে কর্মের বিধান জানিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের হেদায়েত লাভের জন্য মানুষকে দেয়া হয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্‌বা, ত্বক অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, গন্ধ গ্রহণ শক্তি, স্বাদ

ও আস্বাদনশক্তি এবং স্পর্শ অনুভব করার শক্তি। এই কথাটি বহ্যেন্দ্রিয়। অনুরূপ শক্তি রয়েছে মানুষের অভ্যন্তরে। যথা ক্ষুধা, অনুভূতি, পিপাসাবোধ, আনন্দ-দুঃখ, অনুভূতি, ক্রোধ, লোভ, ভালবাসা ইত্যাদি। এগুলোর প্রথম পর্যায়ের তুলনায় উন্নত মানের হেদায়েত উৎস— 'ওহী'। এই পর্যায়ে পাওয়া 'ওহী' সব সময় নির্ভুল হয় না, অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। যেমন মরীচিকা দর্শনে পানির ভ্রম হয়, ছায়াকে স্থির গতিহীন মনে হয়। কিন্তু আসলে তা গতিশীল। চোখ দেখতে পায়, কিন্তু অন্ধকারে চোখ কোনো কাজ করতে পারে না, পারে না প্রাচীরের অন্তরালে কি আছে তা দেখতে এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করে কোনো জিনিস প্রত্যক্ষ করতে।

তৃতীয় পর্যায়ের হেদায়েত হচ্ছে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক মানুষের একটা বিরাট শক্তি। এ শক্তিও আল্লাহ্র দান। বিবেক-বুদ্ধির কাজ ইন্দ্রিয়নিচয়ের কাজ থেকেও উন্নত, যদিও তা অনেকটা ইন্দ্রিয় নিচয় আহরিত তথ্যের উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফলাফল নির্ধারণে। আর এখানেই বিবেক-বুদ্ধিও অনেক সময় ভুল করে বসে। কেননা বিবেক-বুদ্ধিকে প্রথম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। আর তার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অবশ্য এই বিবেক-বুদ্ধি ও তার প্রয়োগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্যতায় মানুষ সমস্ত সৃষ্টিকুল ও সাধারণ জীব-জন্তুর তুলনায় অনেক উন্নত। কেননা এ যোগ্যতাও মানুষ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টির নেই।

চতুর্থ পর্যায়ের হেদায়েত লাভের উৎস হচ্ছে ওহী। 'ওহী' মানুষের বিবেক বুদ্ধির ভুল-ভ্রান্তিকে ত্রুটিমুক্ত করে দেয়, ভুলের সংশোধন করে, ভুল করা থেকে রক্ষা করে। ইন্দ্রিয়নিচয় জনিত বিভ্রান্তি রহিত করে দেয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে এমন এক স্থানে পৌঁছে দেয়, যেখান পর্যন্ত পৌঁছা তার পক্ষে নিজস্ব শক্তিবলে কখনো সম্ভবপর হতে পারে না। এছাড়া মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক যে ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে না, পারস্পরিক মতদ্বৈততার সংঘর্ষে পড়ে বিপর্যস্ত হয়, ওহী যেখানে সব বিরোধ দূর করে দিয়ে চূড়ান্ত মতৈক্যে পৌঁছে দেয়, কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে ঃ

فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (البقرة : ٢١٣)

লোকেরা যে মহাসত্যের ব্যাপারে পারস্পরিক মতবিরোধে পড়ে গিয়েছিল, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করে তাঁরই অনুমতিক্রমে তাদেরকে সেই

মহাসত্যের সাথে পরিচিত করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান, সরল-সঠিক পথে হেদায়েত দান করেন।

লোকদের পারস্পরিক মতবিরোধ তাদের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরই অনিবার্য পরিণতি। কেননা শুধু তা-ই কখনো আসল সত্যলাভে সক্ষম হতে পারে না। আসল সত্য লাভ ওহীসূত্রে পাওয়া হেদায়েতের উপর নির্ভরশীল। সেই হেদায়েত পেয়েই মানুষ মহাসত্যের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে। প্রকৃত এ মহাসত্যের সাথে পরিচয় লাভের এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা এই ওহী পাঠাবার জন্য যাদের মনোনীত করেন, তাঁরাই নবী ও রাসূল। নবী ও রাসূলগণের কাছে আল্লাহ তা'আলা যে বিধান নাযিল করেন তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি তা জন-সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভিত্তি। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

(الحديد : ٢٥)

আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি অকাট্য দলিল-প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহকারে। আর তাদের প্রতি নাযিল করেছি আল-কিতাব। আর মানদণ্ড— যেন মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইনসাফপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

নবুয়ত ও রিসালাতের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য ব্যাপক। এখানে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১. এর অর্থ আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ যুক্তিবাদীতার প্রতি ঈমান। একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌র রহমত সর্বাত্মক ও সুব্যাপক। আল্লাহ্‌র যুক্তিবাদ ও রহমতেরই অনিবার্য দাবি হলো এই যে, মানুষকে উদ্দেশ্যহীন ও দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেয়া যায় না। মানুষকে আগে-ভাগে আদেশ-নিষেধ জানিয়ে কোনো কাজের জন্য দায়ি করা যায় না কোনো অপরাধের জন্য। মানুষকে কোনো বাস্তব কর্মবিধান না দিলে তাদেরকে পরস্পরে ঝাগড়া-বিবাদ করে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে— কিন্তু তা কখনো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতে পারে না। কুরআন মজীদ প্রশ্ন তুলেছে ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى – (القيامة : ٣٦)

মুনাষ কি ধারণা করেছে যে, তাদের নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ?

আল্লাহ্ তা'আলার স্থায়ী ঘোষণা হলো ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلًا- (بنى اسرائيل : ١٥)

আগে-ভাগে রাসূল না পাঠিয়ে আমরা কাউকেই আযাব দেই না।

২. এর অর্থ আল্লাহ্র দ্বীন এক ও অভিন্ন। সর্বকালে, সর্বযুগে দুনিয়ার সবদেশে ও অঞ্চলে আল্লাহ্র নাযিল করা দ্বীন অপরিবর্তিত। মৌল দ্বীনে কোনো পরিবর্তন বা কোনোরূপ পার্থক্য সংঘটিত হয় নি কোনো সময়ে। একই মৌল দ্বীন সকল দেশের সকল কালের, সকল নবী ও রাসূলগণের প্রতি নাযিল হয়েছে। অবশ্য সব নবীর প্রচারিত দ্বীনের শরীয়ত ও বাস্তব কর্মরীতি এক নয়। তাতে স্থান-কাল, পাত্র ও ক্ষেত্র হিসাবে পার্থক্য হয়েছে প্রচুর। আর এই হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীনের যুগোপযোগিতা। তাই সব নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য। সেই ঈমানের তাগিদই কুরআনে ঘোষিত হয়েছে এভাবে ঃ

قُوْلُوْآ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ - (البقرة : ١٣٦)

তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি, সেই কিতাবের প্রতি, যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি, যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও বংশের অন্যান্য নবীদের প্রতি, যা নাযিল হয়েছে মূসা ও ঈসা এবং অন্য নবীগণের প্রতি তাদের আল্লাহ্র কাছে থেকে। আমরা এদের পরস্পরে কোনোরূপ পার্থক্য করি না, আর (এদের প্রতি ঈমানের মাধ্যমে) আমরা সেই এক আল্লাহ্রই অনুগত হয়ে আছি।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজের মর্যাদা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন একটা রূপক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন ঃ

আমার ও অন্যান্য নবীগণের সম্পর্ক ও পার্থক্য এরূপ মনে করে, যেন কেউ একখানি পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছে খুব সুন্দর ও নিঃখুঁতভাবে। তবে তাতে এক কোণে একখানা ইট লাগনো বাকি থেকে গেছে। লোকেরা বাড়িটির চতুর্দিক ঘুরে-ফিরে দেখছে ও খুবই বিস্মিত হচ্ছে। তারা বলছে ঃ এই ইটখানা লাগানো হয়নি কেন ? মনে করো, আমিই সেই ইটখানা এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

৩. মানুষের জন্য এক উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শের (Ideal) প্রয়োজন। যে আদর্শ হবে মানবীয়, মানুষের অনুসরণযোগ্য। যা মানুষকে উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র গ্রহণের প্রেরণা দিতে পারে। সে আদর্শ নিছক অবাস্তব কতগুলো মতবাদ হবে না, হবে না আকাশ-কুসুম কল্পনা; কিংবা হবে না কতগুলো দার্শনিক মতবাদ, যা কেবল বইতে লেখা থাকে, বাস্তব অনুসরণীয় হয় না কখনো। তা হতে হবে এমন, যার প্রতি ঈমান আনা যাবে, মন ও মগজ দিয়ে অনুধাবন করা যাবে, গ্রহণ করা যাবে এবং কার্যত অনুসরণ করা যাবে। যা পর্যবেক্ষণও করা যাবে, অনুভবও করা যাবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মানুষের প্রতি রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন মানুষকেই। ফেরেশতাকে নবী বানানো হয় নি। কেননা ফেরেশতা ও মানুষ এক জাতীয় নয়। ফেরেশতাদের যা কাজ, তা মানুষের করণীয় নয়। মানুষ তো তারই মতো মানুষকে অনুসরণ করতে পারে, অনুপ্রেরণা পেতে পারে মানুষেরই উন্নতমানের পবিত্র নিষ্কলূষ চরিত্র ও নৈতিকতা দেখে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَّوْكَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓـئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا – (بنى اسرائيل : ٩٥)

পৃথিবীর বুকে যদি ফেরেশতা বাস করত ও নিশ্চিন্ত চলাফেরা করত, তাহলে তো আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই রাসূল করে পাঠাতাম।

কিন্তু জমিনের বুকে যেহেতু মানুষ বসবাস করে, তাই মানুষের জন্যই ফেরেশতাকে রাসূল না বানিয়ে মানুষকেই রাসূল বানানো হয়েছে। যেমন মানুষ রাসূলের কাছ থেকে দ্বীন জানতে পারে ও দ্বীন অনুসরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত পেতে পারে রাসূলের উন্নতমানের দ্বীনি জিন্দেগী দেখে।

বস্তুত কুরআনের দৃষ্টিতে নবী-রাসূলগণ মাবুদ বা উপাস্য নয়, উপাস্যদের পুত্র বা বংশধর নয়। নবী-রাসূলগণও মানুষ, মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই কুরআন মজীদ বিশ্বনবীর জবানীতে ঘোষণা করেছে ঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ –

আমি মানুষ মাত্র— মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার কাছে ওহী নাযিল হয়, সে ওহীতে এ কথাই বলা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একজন মাত্র।

সব নবীই একথা ঘোষণা করেছেন ঃ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ - (ابرٰهيم : ١١)

নবী-রাসূলগণ লোকদের সামনে স্পষ্ট করে বলেছে যে, আমরা তোমাদের মতোই মানুষ— মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নবী বানিয়ে ওহী দিয়ে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আমাদের পক্ষে আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া দলিল-প্রমাণ তোমাদের কাছে নিয়ে আসাও সম্ভব নয়।

পরকালের প্রতি ঈমান

এ পর্যন্ত আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমানের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, মানুষ ও তার জীবনের সমস্ত ব্যাপার কি এখানেই শেষ হয়ে যায় ? মানুষ এখানে জন্মগ্রহণ করে কিছুদিন জীবন যাপন করে, তারপরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, অতঃপর আর কিছুই নেই ? অনেকে তাই মনে করে। এরূপ ধারণা যেমন ছিল সুদূর অতীত কালের সেই অন্ধকারাচ্ছান্ন যুগে, তেমনি রয়েছে আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ বহু মানুষের মনে। এই ধরনের মনোভাব সহজ কথায় প্রকাশ করেছে কুরআন মজীদ এ ভাষায় ঃ

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ - (مومنون : ٣٧)

আমাদের এই দুনিয়াবী ও ইহকালীন জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। আর এ জীবনেরও মোদ্দা কথা, এখানে আমরা কিছুকাল জীবন যাপন করি, তারপরে মরে যাই। অতঃপর আমাদের পুনরুজ্জীবিত ও হাশরের ময়দানে প্রেরিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? আমাদের সব কায়-কারবার এখানেই চূড়ান্তভাবে শেষ, অতঃপর না আছে কোনো জবাবদিহি, না আছে কোনো শাস্তি বা শুভ প্রতিফল লাভে বাধ্যবাধকতা ? তাহলে তো সত্যিই বড় আনন্দের কথা। কিন্তু এরপরও কথা থেকে যায়।

সে কথা হলো, আমরা স্থির নিশ্চিন্তে যদি এ কথা মানতে চাই যে, অতঃপর আমাদের কোনো জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদয়-মন-অনুভূতি তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। কেননা সব মানুষের

প্রকৃতিতেই এই অনুভূতি রয়েছে যে, আমরা কেবলমাত্র এই জীবনের জন্য এবং এই জীবনের সমস্ত কায়-কারবার নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যই সৃষ্টি হইনি। আমাদের এখানকার জীবন তো অতীব সংক্ষিপ্ত। এতটুকুতেই আমাদের সমস্ত ব্যাপার ঢুকে যেতে পারে না। এ দুনিয়ায় তো আমরা (মানুষরা) যেন পথিক কিংবা মেহমান। এটা তো আমাদের আসল বাড়ির নয়।

মানব মনের এই চেতনা চিরন্তন ও শাশ্বত এবং অতীব সোচ্চার। বড় কথা, আমার এই দেহটাই তো সম্যকভাবে 'আমি' নই। আমার আত্মা ও দেহ নিয়েই আমি। দেহের বিনাশ যদি এখানে হয়েও যায়— আর যায় তাতে সন্দেহ নেই, তাতেই আমার চূড়ান্ত সমাপ্তি হয়ে যেতে পারে না। দেহের খাঁচায় আশ্রয় গ্রহণকারী আত্মা সে-ই তো আসল 'আমি'। দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও আমার সেই আসল 'আমি' তো থেকেই গেলাম। তখন তার কি হবে ?

এই আত্মাকে কেন্দ্র করে অনেক ধর্মমত গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে আত্মা এই দেহ ছেড়ে দেয়ার পর এখানকারই কোনো ভিন্নতর দেহে আশ্রয় নেয়। কেউ বলেন, আত্মা এ দেহ ত্যাগ করে বস্তুজগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নিতান্ত বস্তুহীন জগতে চলে যায় এবং সেখানে সুখ বা শাস্তি ভোগ করতে পারে। আবার কারো কারো মতে এই দেহ থেকেও অধিক সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য দেহ সত্তায় স্থান গ্রহণ করেও তাতেই লীন হয়ে যায়।

তবু এসব মত অন্তত এ কথা মেনে নিয়েছে যে, আত্মার কোনো ক্ষয় নেই, শেষ নেই, বরং এ জীবনের পর তার আরো জীবন আছে এবং তাকে সে জীবন যাপন করতে হয়। তাই এতে কোনো সন্দেহ নেই— দ্বিমতও নেই যে, সকল কালের, সকল দেশের, সকল জাতির, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী ও পুরুষ, গ্রামীণ ও নাগরিক সকল মানুষের মনে আত্মার এই অবিনশ্বরতার চেতনা রয়েছে, থাকবে চিরকাল। কোনো অবস্থায়ই এই চেতনা বিলুপ্ত হয় না, হবে না। কেননা এ চেতনা মানব-প্রকৃতি নিহিত। মানুষের এই চেতনা যেমন মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি কর্মশক্তি এ দুনিয়ায় তার বেঁচে থাকার দুটি প্রধান অবলম্বন। তেমনি মানুষের এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি মানব মনে এই চেতনা তীব্রভাবে জাগিয়ে দিয়েছে যে, এখানকার এই জীবন অত্যন্ত স্বল্পায়ু। তবে এতটুকুই মানব জীবনের চূড়ান্ত সময়কাল নয়। মানুষ এখানে এই দেহকে খুলে আলাদা করে রেখে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবে, যেমন মানুষ স্বীয় পরিধানের বস্ত্র নিত্য খুলে ফেলে ভিন্নতর পোশাক পরিধান করে। অতঃপর তার সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক জীবন রয়েছে— যদিও সেই জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব এখানে বসে পুরোপুরি অনুভব করা যায় না, ভোগ করা সম্ভব হয় না।

সকলেই জানে, স্বীকারও করবে যে, মানুষের মনকে এতটা যোগ্যতাসম্পন্ন করে তৈরী করা হয়েছে যে, তা অনন্ত-অসীমের তথ্য আহরণ করবে, জ্ঞান লাভ করবে। সে জ্ঞান আহরণ কোনো একটা স্থানে এসে বাধাগ্রস্ত হবে না। কেননা অসীমের নেশা, অদৃশ্যের মোহ-আকর্ষণ মানুষের প্রকৃতি নিহিত— এ ক্ষেত্রে কোথাও সে থামতে প্রস্তুত হয় না। আর প্রকৃতপক্ষে মানবীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষত্বের এ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ এ কথা কেমন করে মেনে নিতে পারে যে, এই দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ জীবনই তার শেষ ও চূড়ান্ত, এর পর আর কিছু নেই ? অথচ এখানে কত মানুষ অন্য নির্দোষ-নিরীহ মানুষের উপর কত না অত্যাচার করেছে, জোর-জবরদস্তি করেছে, হত্যা করেছে, কত মানুষ লুটপাট করেছে, পরস্বপহরণ করেছে, চুরি করেছে, মিথ্যা কথা বলেছে, ধোকা দিয়েছে, ঠকিয়েছে, বলাৎকার করেছে, নির্যাতন করেছে অথচ তারা তাদের সে সব কাজের কোনো প্রতিফল বা শাস্তিই এখানে ভোগ করেনি। এসব কিছু করার পর মরে গেলেই যদি সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে এসব লোকই তো বড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সর্বদিক দিয়েই লাভবান। আর যা করে 'লাভবান' হওয়া যায়, তাই তো করা উচিত— সকলেরই। তাহলে কি মনে করে নিতে হবে যে, এসব কাজ অন্যায় কিছু নয় ? তাহলে আজ থেকে সকলেই আনুস, এই ধরনের কাজ করতে শুরু করে দেই। কেননা যে কাজের কোনো শাস্তি নেই, সে কাজ কখনো অন্যায় বা অপরাধ হতে পারে না। আর এসব কাজ যদি অন্যায় ও অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তার শাস্তিও ভোগ করতে হবে কাজ অনুপাতে। সে শাস্তি যদি কেউ না পেয়ে থাকে, কিংবা আনুপাতিকভাবে ভোগ করে না থাকে, তাহলে অন্য কোথাও তাকে তো ভোগ করতে হবে। সে শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না কিছুতেই।

এর অন্য দিকটা বিবেচনা করা দরকার। এ দুনিয়ায় এমন মানুষের কখনো অভাব হয়নি, যারা ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্টিকভাবে বহু মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে। কত মানুষ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করেছে; কিন্তু অতঃপর তারা সে মহান কাজের কোনো প্রতিফলই পায়নি। হয় তারা সে কল্যাণ সাধন ব্যাপদেশেই মরে গেছে কিংবা তারা এতই অজ্ঞাত-অপরিচিত হয়ে পড়েছে যে, পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ তাদেরকে সে শুভ কাজের শুভ ফল ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। অনেক লোক এমনও এসেছে, যারা বাতিল ও অন্যায় মত ও আদর্শ ত্যাগ করে বহু কষ্ট ভোগ করেছে ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে প্রকৃত সত্যের পতাকা উর্ধ্বে উত্তোলিত রেখেছে। এ সময় জালিমরা এসে তদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে তাদের উপর। তারা শেষ হয়ে গেছে, আর অন্যায়কারী ও জালিমরা

সম্পূর্ণ নিরাপদে ও সুখে-সাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করছে। তারা তাদের ন্যায় কাজের কোনো প্রতিফলই পেল না। এই যদি তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে থাকে, তাহলে আজ থেকে কারো কোনো কল্যাণকর কাজ বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সংগ্রামে জিহাদে শরীক হওয়া ছেড়ে দেয়া উচিত। কেননা, আমি যদি সে ন্যায় কাজের কোথাও কোনো শুভ ফলই ভোগ করতে না পারলাম তাহলে আমি তা করতে যাব কেন ? কেন স্বীকার করব অমানুষিক কষ্ট, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহ্য করব অত্যাচার ও নিপীড়ন ? এখানে যদি না-ও পাই, তাহলে অন্ততঃ অন্য কোথাও তো তা পাওয়া উচিত।

বস্তুত যে মানুষ এক আল্লাহ্র ন্যায়পরতা, নিরংকুশ যুক্তিবাদিতা ও নিরপেক্ষ সুবিচারবাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে মানুষ তো এ কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না যে, মানুষের সমস্ত কায়-কারবার এখানেই চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে, অতঃপর কিছুই থাকবে না। বরং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির ঐকান্তিক দাবি হলো, মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। মানুষ তার প্রত্যেকটি কাজের তা ভালো হোক, মন্দ হোক প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে। মানুষকে এই দুনিয়ায় কর্মের যে স্বাধীনতা ও পথ বাছাইয়ের যে অধিকার দেয়া হয়েছে, এই দুনিয়ার শক্তি ও উপাদান নিয়োগ ও ব্যবহার করার যে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে ও সুযোগ ভোগ করেছে, সেজন্য তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন মানুষের জীবনের অবিনশ্বরতা। এই জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আর এক জীবন, এই বস্তু জগতের ধ্বংস ও বিলয়ের পর আর একটা জগত— যা হবে সম্পূর্ণ নৈতিক বিধানভিত্তিক জগত। সেখানে মানুষের ইহ-জীবনের সব নৈতিক কাজের হিসাব-নিকাশ লওয়া হবে। যে এখানে ভালো কাজ করেছে তাকে ভালো ফল দেয়া হবে, আর যে মন্দ কাজ করে গিয়েছে, সে মন্দ ফল লাভ করবে। মানুষ প্রকৃতির ও সাধারণ অনাবিল বিবেক-বুদ্ধির এটাই ঐকান্তিক দাবি। বিশ্বলোকের আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী প্রত্যেকটি জিনিস যে সত্যকে অকাট্য অনস্বীকার্য করে তুলেছে, বিশ্ব-নিখিলের স্রষ্টা আল্লাহ্র মহান কালামও এই সত্যকেই বলিষ্ঠ ভাষায় পেশ করেছে বিশ্ব মানবের সামনে। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ - مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ - (الدخان :٣٨-٤٠)

আমরা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, নিছক খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। এ দুটোকে আমরা বিপুল সত্যতা ও মহাকল্যাণের

ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু বহু লোকই তা জানে না, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের সকলেরই চূড়ান্ত বিচারের দিনটি পূর্ব থেকেই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ - اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ - (ص : ٢٧-٢٨)

আকাশ ও পৃথিবীকে আমরা নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। তেমন করেছি বলে কাফের লোকেরাই ধারণা করতে পারে। অতএব কাফেরদের জন্য জাহান্নামের দুঃখ ও বিপদ নির্দিষ্ট। আমরা কি ঈমানদার নেক আমলকারী লোকদের পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের কিংবা মুত্তাকী লোকদের পাপিষ্ঠ লোকদের সমান পরিণতি সম্পন্ন বানিয়ে দেব ?

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ - وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ - (الجاثية : ٢١-٢٢)

অন্যায় ও পাপ নীতি অবলম্বনকারী লোকেরা কি ধারণা করেছে যে, আমরা তাদেরকে ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদের মতো বানিয়ে দেব ? ...... এ দুই শ্রেণীর লোকদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান (?) —ওরা খুব খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে মহাসত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেকটি লোককে তার কর্মফল যথার্থভাবে পাওয়ার ও তাতে কোনোরূপ অবিচার না হতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেয়া।

وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى - (النجم : ٣١)

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সব একমাত্র আল্লাহ্র জন্যে— যেমন যারা পাপ কাজ করেছে তাদের পাপ কাজের প্রতিফল এবং যারা ন্যায় ও উত্তম কাজ করেছে তাদের জান্নাত ও উত্তম ফল দিয়ে প্রতিফল দেয়া যায়।

পর পর উদ্ধৃত এগারটি আয়াত একটি মূল কথাই ঘোষণা করছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। সে মূল কথা হলো এই সৃষ্টিলোক আল্লাহ্ তা'আলা খেলার ছলে সৃষ্টি করেননি। এ সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য নেই— এ কথা মনে করা নিতান্তই বাতুলতা। আল্লাহ্কে যারা স্বীকার করে না, তারাই এ সৃষ্টিলোককে উদ্দেশ্যহীন, তাৎপর্যহীন ও নিরর্থক মনে করতে পারে। মূলত এ সৃষ্টির মূলে বিরাট অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো, এখানে প্রত্যেকটি মানুষকে নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে বাস্তবভাবে দেখা যে, কে কি রকম কাজ করে এবং পরে আর একটা জগত সৃষ্টি করে সেখানে প্রত্যেককেই তার কর্মের যথাযথ ফলাফল দান করা। এই ফলাফল দেয়ার দিনটি পূর্ব থেকেই সুনির্দিষ্ট। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা স্বতঃই প্রমাণ করে যে, তা তীব্র গতিতে সেই চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। সেই দিন কাফের ও অসদাচারীকে কর্মফল স্বরূপ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এই জগতের ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদেরকে জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হবে।

মৃত্যু ও বিলীন হয়ে যাওয়ার পর মানুষের পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থান কি কোনো অসম্ভব ব্যাপার ? না, কিছুই অসম্ভব বা কঠিন নয়, বিশেষত তাঁর পক্ষে যিনি প্রথমবার এই সৃষ্টিলোককে অস্তিত্ব দান করেছেন। কুরআনের দাবি হলো ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَا الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (الروم : ٢٧)

সেই আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই এই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন। আর পুনঃ সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। তাঁর এই ক্ষমতার বাস্তব নিদর্শন ও দৃষ্টান্ত বর্তমান আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আসল কথা হলো, আল্লাহ্ নিজ গুণে মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।

যে সব মৌল উপাদান দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা একবার এই বিশ্বলোক ও মানুষকে সৃষ্টি করতে পারলেন, তাঁর পক্ষে সেই মৌল উপাদান দিয়ে পুনরায় এ বিশ্বলোক সৃষ্টি করা যে অতীব সহজসাধ্য কাজ, এতে কারো এক বিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। সর্বোপরি আল্লাহ্ নিজেই যখন সর্বশক্তিমান ও মহাশক্তির অধিকারী। তিনি নিজেই যখন সর্বজীয় ও সুবিজ্ঞানী, তখন এ বিশ্বলোক ধ্বংস করে পুনরায় আর একটি জগত সৃষ্টি করবেন— করবেন এজন্য যে, এটা যুক্তির ঐকান্তিক দাবি, তিনি তো আর মানুষের জীবনকে ব্যর্থ ও অর্থহীন করতে পারেন না। বর্তমান সৃষ্টির নিয়মতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করলেই আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব অনুধাবন করা

যায় এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝলেই তিনি যে আবারও তা সৃষ্টি করবেন, তাও স্বীকার করতে হয়।

মানব সৃষ্টির মৌল উপাদান মাটি থেকে নেয়া। মানবদেহে তা শুক্রকীট হয়ে মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করে। কিছু দিন পর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। জমাট বাঁধ রক্ত মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। গড়ে ওঠে এক পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি। মাতৃগর্ভে নির্দিষ্টকাল অবস্থানের পর তা ভূমিষ্ট হয়। পরে এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়ে যৌবনকাল ও পূর্ণবয়স্কতা লাভ করে। এর মধ্যে অনেকে মরেও যায়, আবার অনেকে বেঁচে থাকে বার্ধক্য বয়সে পৌঁছায়। এর পর মৃত্যু। মানব সৃষ্টির এই সহজবোধ্য ধারার কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তর পরবর্তী স্তরের প্রস্তুতি। যে মানুষ এতগুলো স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে এল, সে এই মৃত্যু পর্যন্ত এসে থেমে যেতে পারে না, নিঃশেষ হতে পারে না। তার পরবর্তী স্তরে পৌঁছা অবধারিত। সেই পরবর্তী স্তরই হচ্ছে পরকাল।

পরকাল যে অনিবার্য তা বর্তমান উদ্ভিদ জগতের নিয়মও প্রমাণ করে। কুরআন মজীদে দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ভিদ জগতের নিয়মতন্ত্র পেশ করা হয়েছে ঃ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

بَهِيجٍ - ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

وَّأَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا لا وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ - (الحج : ٥-٧)

তুমি দেখতে পাও, মাটি শুষ্ক-নিরস, মৃত পড়ে রয়েছে। তার উপর যখন আমরা পানি বর্ষণ করি, তখন সঞ্জীবিত ও স্ফীত হয়ে ওঠে, আর নানা ধরনের সুদৃশ্য গাছ-গাছালী উৎপাদন করে। এটা হয় এ জন্য যে, আল্লাহ্ পরম সত্য, আর তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন। তিনিই তো সবকিছু করতে সক্ষম। কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কবরস্থ সমস্ত মানুষকে তিনি পুনরুজ্জীবিত-উত্থিত করবেন।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আর একটি জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম, সক্ষম মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে। তা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর ন্যায় বিরাট বিরাট সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলেই স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। কেননা এ সৃষ্টিগুলো তো মানুষের অপেক্ষাও অনেক বড় অনেক দুরূহ। কুরআন এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে ঃ

---

১. মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'আলা মওদূদী (র) প্রণীত তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতটির অতি উত্তম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ - (يٰس)

যে শক্তিমান সত্তা একবার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এরই মতো আর একটা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারবেন না মনে করেছ ? না, তিনি অবশ্যই তা পারবেন। কেননা তিনি তো মহাসৃষ্টিকারী, মহাজ্ঞানী।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ط بَلٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (الاحقاف : ٣٣)

লোকেরা এটা বুঝতে পারে না কেন যে, যে আল্লাহ্ এই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করে কিছুমাত্র ক্লান্ত হয়ে ও ফুরিয়ে যান নি, তিনি তো মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। কেন নয় ? তিনি যে সর্বশক্তিমান।

যথাসময়ে 'কবর' থেকে মানুষকে পুনরুত্থিত করার পর হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র সামনে সম্মিলিতভাবে হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। স্থির মানদণ্ডে প্রত্যেকের আমল ওজন করা হবে ও প্রত্যেককে যথাযথ কর্মফল দেয়া হবে। সে দিনটি সম্পর্কে কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ - (المؤمن : ١٧)

আজকের দিনটিতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মফল দেয়া হবে। আজকের দিন কোনোরূপ জুলুম হতে পারবে না। আর আল্লাহ নিঃসন্দেহে খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

এই হিসাব নিকাশের পর সমস্ত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ভাগ হবে কাফের-জাহান্নামীদের, আর এক ভাগে থাকবে ঈমানদার-জান্নাতী লোকেরা। কুরআনই বলছে, কাফেররা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর যারা সেদিন সৌভাগ্যবান প্রমাণিত হবে তারা যাবে জান্নাতে— চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবে। (সূরা হুদ ঃ ১০৬-১০৮)

জান্নাতকে তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাতে এমন সব নেয়ামত রাখা হয়েছে, যা মানুষের দেহ

ও আত্মা উভয়ের জন্য সমানভাবে সুখদায়ক। সে নেয়ামত যে কি, কি তার রূপ ও গুণ, সে বিষয়ে এই দুনিয়ায় থেকে কল্পনাও করা যেতে পারে না। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্র এই কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنٌ رَاَتْ وَلَااُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ –

আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্যে জান্নাতে এমন সব জিনিস সুবিন্যস্ত করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, যা কোনো কান শুনতে পায়নি এবং যা মানুষের কল্পনায়ও কখনো আসেনি।

বস্তুত মানুষের পরকালীণ জীবন নিশ্চিত, অবধারিত, সন্দেহাতিত। এ জীবন সত্য। এ জীবনে ঈমানদার নেককার লোকেরা তৃপ্তিদানকারী অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করবে। সে নেয়ামত কেবলমাত্র দৈহিক দিক দিয়েই তৃপ্তিদায়ক হবে না, হবে না কেবলমাত্র আত্মিক সুখদায়ক; বরং এই উভয় দিকের সমন্বিত হবে তা। তার কারণ এই যে, যেমন পূর্বেই বলেছি— মানুষ তো নিছক দেহ সর্বস্ব নয়, নয় কেবল আত্মা সর্বস্ব। দেহ ও আত্মার সমন্বয়েই তৈরী হয়েছে মানুষের জীবন। তার পরকালীন জীবনও অনুরূপ হবে। তাই কেবল দৈহিক আনন্দদানকারী নেয়ামত দিয়েই মানুষকে তার কর্মফল দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে না, সেই সঙ্গে মানুষ মনেরও তৃপ্তি লাভ করবে সে নেয়ামত দিয়ে। আসলে মানুষের পরকালীন জীবন তার এই দুনিয়াবী জীবনেরই জের মাত্র। যদিও অবস্থা ও পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

পকান্তরে জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন কাফের-ফাসেক পাপিষ্ঠ লোকদের জন্যে। তাতেও তারা এই দু ধরনেরই আযাব ভোগ করবে। কুরআন মজীদে এই দু ধরনেরই আযাবের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ – (نساء : ٥٦)

যখন তাদের চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আমরা তা বদল করে আর একটা চামড়া পরিয়ে দেব, যেন আযাবটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে।

মনের উপর আযাব হওয়ার কথাও কুরআনের বলা হয়েছে ঃ

اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ – (المؤمن : ١٠٨)

ধৃষ্টিত হয়ে জাহান্নামে পড়ে থাকো, কথা বলো না।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ - (الهمزة)

আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন, যা অন্তর ও হৃদয়কেও স্পর্শ করবে।

فَاَمَّاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ - (الروم : ١٥)

আর যারা ঈমান আনবে ও ঈমান অনুযায়ী আমল করবে, তারা এক বাগানে স্থান পাবে এবং তথায় তারা এমন জিনিস পাবে, যা হৃদয়-মনকে আনন্দ দেবে, অন্তরকে খুশিতে ভরে দেবে, অন্তর সন্তুষ্ট হবে।

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য

এ পর্যন্ত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, এ আকীদা-বিশ্বাসের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব রয়েছে, যা দুনিয়ার অন্যান্য কোনো ধর্মমতে দেখতে পাওয়া যাবে না। এখানে এই বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব কয়েকটি দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হচ্ছে।

১. সুস্পষ্ট বিশ্বাস

ইসলাম ঈমানের জন্য সর্বপ্রথম যে আকীদা পেশ করে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা বা কুজ্ঝটিকার গোলক ধাঁধাঁ নেই। এ আকীদা সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত ধরা-বাঁধা, স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়। এর সার কথা হলো, এ নবোদ্ভাবিত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সুদৃঢ় বিশ্বলোকের অন্তরালে এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রয়েছেন। এ আল্লাহ্ই বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, সংরক্ষক ও পরিচালক। তাঁর শরীক কেউ নেই, তাঁর সদৃশ কেউ নেই, তাঁর সঙ্গি-সাথী কেউ নেই, তাঁর কোনো সন্তান নেই।

بَلْ لَّهُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ -

বরঞ্চ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবকিছু একমাত্র তাঁরই, সব কিছু তাঁরই সমীপে বিনয়াবনত, অনুগত।

এ এক সুস্পষ্ট আকীদা। এ আকীদা সব মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য। মানুষের বিবেক বুদ্ধি সৃষ্টিলোকের এ বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের মাঝে গভীর সম্বন্ধ ও একাত্মতার সন্ধান করে, সমস্ত জিনিসের পশ্চাতে যে শক্ত ও মূলীভূত কার্যকারণ তা-ই জানতে চায়। ইসলামী আকীদা মানব প্রকৃতি নিহিত এ প্রবণতার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জবাব। এ হলো তওহীদের আকীদা। আল্লাহ্র সঠিক একত্বই এ আকীদার মর্মকথা। ত্রিত্ববাদী বা দ্বৈতবাদী আকীদার অসংলগ্নতা ও গোলক ধাঁধাঁর কোনো স্থান নেই এতে। এসব ধর্ম মতের ঘোষণা হলো, বিশ্বাস করো অন্ধভাবে। কিন্তু ইসলামের এ আকীদায় কোনো অন্ধত্ব নেই। এখানকার আহবান হলো, বিশ্বাস করো দেখে শুনে।

২. স্বভাবসিদ্ধ আকীদা

ইসলামের এ আকীদা স্বভাবসিদ্ধ। মানব প্রকৃতি তথা বিশ্বপ্রকৃতির সাথে এর নেই কোনো অমিল-অপরিচিতি, বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ-সংঘাত। বরং এ আকীদা প্রকৃতির সাথে সর্বোতভাবে সমাঞ্জস্যশীল। মানব প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বের নিঃশব্দ ঘোষণা যা, এ আকীদায় তারই সশব্দ ঘোষণা। এ আকীদার সাথে বিশ্বপ্রকৃতির তেমন সম্পর্ক যেমন সম্পর্ক তালার সাথে তার চাবির। অর্থাৎ তালা যেমন খোলা যায় তার নির্দিষ্ট চাবি দিয়ে, তেমনি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি নিহিত রহস্যের দ্বার সঠিকভাবে উন্মুক্ত করা যেতে পারে ইসলামের এ আকীদার দ্বারা। কুরআন মজীদে এই কথাই বলা হয়েছে উদাত্ত কণ্ঠে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الروم : ٣٠)

তোমার পূর্ণ সত্তাকে নিবদ্ধ রাখো দ্বীনের জন্য সর্বদিক দিয়ে মুখ ফিরিয়ে। এটাই আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম নেই। এ-ই হচ্ছে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। যদিও বহু লোকই তা জানে না।

বস্তুত দ্বীন-ইসলামের আকীদায় মানুষের মনগড়া বিভিন্ন ধরনের ধারণা বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। কেননা এ ধারণা-বিশ্বাসের সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তা জ্ঞান-বিজ্ঞান সমর্থিতও নয়। ইসলামের এ বিশ্বাস যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম ও ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যসম্পন্ন, এজন্য এ দ্বীনের সাথে পুরোপুরি মিল রয়েছে বিশ্ব-প্রকৃতির, মানব স্বভাবের। কেননা এ দুটোই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আর এ দুটোই সামঞ্জস্যশীল হচ্ছে বিশ্বসত্তা নিহিত ভাবধারার সাথে। যে আল্লাহ মানুষের দেহ ও আত্মা বা অন্তর সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তো সবচাইতে বেশি ভালো জানেন যে, এ মানব সত্তার জন্য কি ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মবিধান শোভনীয় এবং প্রয়োজনীয়। তাই তাঁর দেয়া আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মানুষের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের কোনো তুলনাই হতে পারে না।

রাসূলে করীম (স) নিজেই এ কথাটি বলেছেন এ ভাষায় ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنَّمَا اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْيُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ -

(بخاری، ومسلم)

প্রত্যেকটি মানব সন্তান প্রাকৃতিক দ্বীনের ভিত্তিতে জন্মগ্রহণ করে, তাদের পিতা মাতাই পরে তাদের হয় ইহুদী বানায়, নয় খ্রিস্টান বানায় কিংবা বানায় অগ্নিপূজক।

এসব কথায় প্রমাণিত হলো যে, ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্বাভাবিক ব্যবস্থা। কাজেই এজন্য পিতা-মাতার প্রভাব বিস্তারের কোনো প্রয়োজন করে না। এ ছাড়া অন্যান্য ধর্ম ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি পিতা-মাতা ও পরিবেশের চাপের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের বড় দোহাই হচ্ছে ঃ পূর্বপুরুষ থেকে এটাই চলে আসছে, তাই আমরাও তাই করছি।

৩. সুপ্রতিষ্ঠিত আকীদা

ইসলামের এই আকীদা সুনির্দিষ্ট ও শক্ত ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এতে না কিছু বেশি করার অবকাশ আছে, না এ থেকে কিছু কম করার কোনো উপায় বা প্রয়োজন আছে। সর্বপ্রকার রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধনের উর্ধ্বে এ ঈমান-আকীদা। কোনো শাসক, রাজা-বাদশাহ্‌, সর্বাধিনায়ক, ডিকটেটর কিংবা কোনো সমাজ সংস্থার বিদগ্ধদের কোনো সম্মেলনে অথবা সমাজপতিদের কোনো কনফারেন্স এতে না কিছু বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত সংযোজন করতে পারে, না এ থেকে কোনো একটা কমিয়ে দিতে পারে, অথবা আকীদার বিপরীত কোনো ব্যাখ্যা দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব। এ ধরনের যে চেষ্টা বা প্রচেষ্টা হবে তা সবই হবে প্রত্যাখ্যাত— ব্যর্থ। নবী করীম (স) চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে গিয়েছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ – (بخارى ومسلم)

যে কেউই আমাদের এ দ্বীনে কোনো কিছু নতুন সংযোজন করবে, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে।

এ ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে কুরআন মজীদ প্রশ্ন তুলেছে ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْ الَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ – (الشورى : ٢١)

তাদের জন্য এমন শরীক-মাবুদ আছে নাকি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান রচনা করে— যার কোনো অনুমতিই আল্লাহ তা'আলা দেননি।

অর্থাৎ আল্লাহ অনুমতি দেননি এমন কোনো জিনিসকে ধর্ম-বিধান হিসাবে পেশ করার কারো কোনো অধিকার নেই। কারো এরূপ করার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করলে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা হবে। আর এরূপ শরীক করার কোনো অবকাশ দ্বীন ইসলামে নেই। কাজেই এ কথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট

যে, সর্বপ্রকার বিদয়াত, কুসংস্কার ও মনগড়া নিয়ম বা রসম-রেওয়াজ-আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ বাতিল, ইসলামে তার কোনো স্থান নেই।

৪. যুক্তিপূর্ণ আকীদা

ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস নিতান্তই যুক্তিপূর্ণ। এর প্রত্যেকটি কথার পিছনে অকাট্য যুক্তি বিদ্যমান। এখানে অন্ধ বিশ্বাসের আদৌ কোনো স্থান নেই। বংশীয় নিয়মের ধারাবাহিকতা বা দেশ চলতি প্রথার দোহাই দিয়ে এখানে কোনো কিছু মেনে নেয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। 'অন্ধভাবে মানো' কিংবা 'আগে মেনে নাও তার পরে জানো' অথবা 'চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করতে থাকো' ইত্যাদি ধরনের কথা ইসলামের নয়। ইসলামের গ্রন্থ স্পষ্ট ভাষায় চ্যালেঞ্জ করেছে এই বলে ঃ

هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ – (البقرة : ١١١ – النمل : ٦٤)

তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে যুক্তি পেশ করো।

'বুরহান' অর্থ এমন দলিল বা প্রমাণ, যা মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ প্রত্যয়ের মূলে অকাট্য দলিল ও প্রমাণ অপরিহার্য। দলিল-প্রমাণ ছাড়া প্রত্যয় হতে পারে না। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, যদি কোনো মত বা আকীদা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে দলিল পেশ করো। আর যদি দলিলই পেশ করতে না পারো, তাহলে কোনো মতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না— বাহ্যতঃ তা যতই মনমুগ্ধকর হোক-না কেন। খ্রিস্টান পাদ্রী দার্শনিক অগাষ্টিন বলেছিলেন ঃ 'এটা বিশ্বাস করে নাও কেননা এটা বাস্তবে সম্ভব নয়।' কিন্তু ইসলামী মানীষীদের কথা হলো, 'অন্ধ বিশ্বাসীর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।' অনুরূপভাবে কেবল মাত্র মন বা হৃদয় ও অনুভূতির স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, মৌলিকভাবে এ দুয়ের উপর নির্ভর করেও ইসলামের কোনো আকীদা গড়ে ওঠে না। বরং ইসলামী ঈমানের প্রতিটি কথা ও বিষয়ের মূলে সুস্পষ্ট কারণ ও দলিলের ভিত্তি অবশ্যই থাকতে হয়। যা মানব-বুদ্ধি ও বিবেককে তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করবে এবং অতঃপর মনও তাতে সায় দেবে— সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। এ কারণেই ইসলামী মনীষীদের ফর্মূলা হলো ঃ

اِنَّ الْعَقْلَ اَسَاسُ النَّقْلِ وَالنَّقْلُ الصَّحِيْحُ لَايُخَالِفُ الْعَقْلَ الصَّرِيْحَ –

বিবেক-বুদ্ধি ঐতিহ্যের ভিত্তি। আর নির্ভুল ঐহিত্য কখনো সুস্পষ্ট বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত হয় না।

ইসলামী আদর্শের নিয়ম ও প্রকৃতি এ-ই। কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌কে প্রমাণ করার জন্য সমগ্র সৃষ্টিলোক, মানুষের মন-মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাস থেকে অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছে। এসব দলিল থেকেই অনস্বীকার্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, একত্ব ও পূর্ণত্ব।

অনুরূপভাবে পরকালের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য মানুষ ও বিশ্বোলোকের প্রথমবারের সৃষ্টিকেই যুক্তি হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অস্তিত্ব তার চিরচলমানতা, চিরসবুজতা ও মৃত জমিনের পুনরুজ্জীবিত হওয়া, এ বিশ্বলোকের উপর আল্লাহ্‌র চিরন্তন কর্তৃত্ব ও পরকাল সৃষ্টির অমোঘ শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিশেষ। আল্লাহ যে সুবিচারক— নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ তা-ই প্রমাণ করছে, আল্লাহ্ নেককার লোকদের আমলের শুভ ফল দেবেন ও পাপী-নাফরমানকে দেবেন আযাব।

> যারা খারাপ কাজ করেছে তাদের কর্মের প্রতিফল দান এবং যারা নেক আমল করেছে তাদের কর্মের শুভ ফল দানই আল্লাহ্‌র এই বিশ্ব ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য। (আন-নাজ্‌ম ঃ ৩১)

৫. ভারসাম্যপূর্ণ আকীদা

ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ভারসাম্যহীন নয়। এতে যেমন নেই অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি, তেমনি নেই কোনো কিছুর অনুপস্থিতি। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরালে বিশ্ব স্রষ্টার অবস্থিতিকে অস্বীকার করা যেমন এক প্রান্তিক আকীদা, তেমনি বিশ্বলোকের জন্য একাধিক— বহু স্রষ্টা ও প্রভুর অস্তিত্ব মেনে নেয়া, এমন কি দেশের শাসক বা রাজা-বাদশাহদের মধ্যে, কোনো কোনো জীব-জন্তু, গাছ-পালা বা চন্দ্র-সূর্যে আল্লাহ অবস্থিতিকে বিশ্বাস করাও আকীদার অপর এক প্রান্ত। এই দুটি প্রান্তিকের মাঝে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস পুরাপুরি ভারসাশ্যপূর্ণ— মধ্যবর্তী। যে সব নাস্তিক আল্লাহ্ অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে, তারা যেমন সীমালংঘন করেছে, তেমনি যারা একাধিক আল্লাহ মেনে নেয়ার মূর্খতা গ্রহণ করেছে, তারাও স্বাভাবিকতার সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামের ঘোষণা সুদৃঢ়, সুস্পষ্টঃ এই বিশ্বলোক সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করেনি, সে সৃষ্টিকর্তা বহু নয়— এক ও অনন্য। তাই ইসলামী আকীদার ঘোষণা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ -

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا

تَتَّقُوْنَ - قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ - (المؤمنون : ٢٣)

বলো, এই পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা কার ? বলো যদি জানো। তারা নিশ্চয়ই বলবে, এক আল্লাহ্‌র। তাহলে তোমরা কি একথা স্মরণ রাখবে না ? বলো, সপ্ত আকাশের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু ও মহান আরশের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু কে? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তাহলে তোমরা কি ভয় করবে না? বলো যদি তোমরা জানো, প্রত্যেকটি জিনিসের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কার হাতে ? কে তিনি, যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না ? তারা সবাই বলবে, এ ব্যাপার তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই। বলো তাহলে তোমরা কোন দিক থেকে প্রতারিত হচ্ছ ?

এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিজ গুণাবলীর ব্যাপারেও এ আকীদায় পূর্ণ ভারসাম্যতা রক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌কে যারা নির্ব্যূঢ় (Abstract) মনে করে, তা নিতান্তই নৈতিবাচক, তাদের এ কথা মনে করার কোনো অর্থ হয় না। গ্রীক দার্শনিকরা আল্লাহ্‌র পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ 'তিনি এ নন, ও নন, সে নন'। কিন্তু ইতিবাচক আল্লাহ্‌র পরিচয় ও গুণাবলী যে কি এবং এই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে তাঁর সম্পর্কই বা কি, তা তাদের বক্তব্যে নেই।

ইসলামী আকীদায় আল্লাহ্‌কে তাঁর সৃষ্টিলোকের কোনো কিছুর সাথে তাঁর সাদৃশ্য আকা থেকে পবিত্র বলা হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ - (الشورى : ١١)

আল্লাহ্‌র মতো কেউ নেই, কিছু নেই। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - (اخلاص)

তার সমান কিছু নেই, কেউ নেই।

নৈতিবাচক পরিচয় দিয়েই শেষ করা হয়নি। সেই সঙ্গে ইতিবাচক পরিচয়ও দেয়া হয়েছে। প্রথমোদ্ধৃত আয়াতে নৈতিবাচক পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে ইতিবাচক পরিচয়। আর শেষোক্ত আয়াতাংশের পূর্বে রয়েছে ইতিবাচক পরিচয় ঃ

اَللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ -

আল্লাহ্ এক— একক, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন— সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

এ ছাড়া সমস্ত কুরআনে আল্লাহ্‌র ইতিবাচক পরিচয় এত বেশি দেয়া হয়েছে, যা গুণে বা উদ্ধৃত করে শেষ করা যায় না।

দুনিয়ায় বহু ধর্মমতের ভিত্তি হচ্ছে পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণ। তারা নিঃসংকোচে বলে ঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ – (الزخرف : ٢٣)

আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে একটা পথের পথিকরূপে পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।

এদের ছাড়া আরও অনেক লোক এমন রয়েছে যারা সব জিনিসের নিগূঢ় তত্ত্ব (Reality) জানবার ও সে বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবি করে—এমনকি আল্লাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্বও। অথচ তারা নিজেরা নিজেদের নিগূঢ় তত্ত্বই জানে না, জানে না তাদের জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত মাহাত্ম্য-রহস্য। বিশ্বপ্রকৃতির যেসব উপাদান মানুষকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে নিরন্তর তার সঠিক পরিচয়ও তাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও মানব বুদ্ধি কি করে যে আল্লাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে-বুঝতে পারে বলে মনে করে ধৃষ্টতা দেখায়, তা সত্যই দুর্বোধ্য।

ইসলামী আকীদা এ দুটো প্রান্তিক বিশ্বাস ও প্রবণতার মাঝে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম আল্লাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্ব জানার জন্য চেষ্টা করা থেকে বিরত করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিলোক সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবার নির্দেশ দিয়েছে, আহবান জানিয়েছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

تَفَكَّرُوْا فِىْ خَلْقِ اللّٰهِ وَلَاتَفَكَّرُوْا فِىْ اللّٰهِ فَتَهْلِكُمْ ۞

তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিলোক সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিজ সত্তা সম্পর্কে গবেষণা করতে যেও না। কেননা তা হলে তোমরা ধ্বংস হবে।[১]

কুরআন মজীদ বলেছে ঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ – (يونس : ١٠١)

বলো, দৃষ্টি দাও আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ – (الروم : ٨)

তারা কি নিজেদের সত্তা সম্পর্কে কোনোই চিন্তা-গবেষণা করে না?

---

১. হাদীসটি কয়েক ভাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে। সব কয়টি সূত্রই দুর্বল। কিন্তু বর্ণনা অনেক কয়টি হওয়ার কারণে তার যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না। এর একটা সঠিক তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে।

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْافِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ - (الاعراف: ١٨٥)

আকাশগুল ও পৃথিবীর এবং আল্লাহ্ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সে সবের উপর চূড়ান্ত মালিকানা ও কর্তৃত্ব কার চলছে, এ বিষয়ে কি তারা কিছুই ভেবে দেখে না ?

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ - وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ - (ذٰرِيٰت : ٢٠-٢١)

পৃথিবীতে বিশ্ববাসীদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন— তা আছে তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি তা দেখতে পাও না ?

দুনিয়ার অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও এর ভারসাম্যপূর্ণতা লক্ষণীয়। এ আকীদা মনে স্থান দেয়ার পর এর বিপরীত ধরনের কোনো আকীদা গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং আকীদাকে শক্ত করে ধারণ করার ও এর উপর অবিচল হয়ে থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝ (النحل : ٧٩)

তুমি পুরামাত্রায় এক আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হও, কেননা নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ج اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (الزّخرف : ٤٣)

আল্লাহ্ যে ওহী তোমার প্রতি নাযিল করেছেন, তা খুব শক্ত ও দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো। কেননা তুমি তো নিশ্চিতই সঠিক সুদৃঢ় ঋজুপথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছ।

কিন্তু তাই বলে অন্যান্য আসমানী দ্বীনের বিশ্বাসের প্রতি ইসলামের কোনো প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষ নেই।

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ - (الشورى : ١٥)

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদেরও। আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য।

বিপরীত ধরনের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ইসলামের একদিক দিয়ে ঔদার্য রয়েছে। বলা যায় ঃ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ -

তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

যদিও এই পর্যায়ের সব কথাবার্তা বিপরীত আকীদা ও ধর্মমতের প্রতি চূড়ান্ত অসন্তোষ ও অসম্মতি প্রকাশমূলক।

ইসলামের মৌল আকীদার ধারকদেরকে তার দিকে অন্যান্যদের আহবান জানাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ – (حٰمٓ السجدة : ٣٣)

আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানানোর চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে ?

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলামের এ আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের জন্য কারো উপর জোরজবরদস্তি প্রয়োগের কোনো অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ج قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ – (البقرة ٢٥٦)

দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি করা চলবে না। প্রকৃত সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে সুস্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠেছে। (অতপর জোরজবরদস্তির প্রয়োজন বা অবকাশ কোথায় ?)

দ্বীন-ইসলাম ও তার আকীদা-বিশ্বাসের সাথে যারা শত্রুতা করবে তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, তারা নিকটাত্মীয় হলেও তাদের সাথে কোনোরূপ বন্ধুতার সম্পর্ক রাখা ঈমানদার লোকদের জন্য বৈধ নয়। কুরআন বলে দিয়েছে ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْآ

اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ – (المجادلة : ٢٢)

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শত্রুতাকারীদের প্রতি কোনোরূপ বন্ধুতা পোষণ করে এমন পাবে না কখনো। তারা তাদের বাপ-দাদা, পুত্র-সন্তান, ভাই-বেরাদর ও আপন বংশ-গোত্রের লোক-ই হোক-না কেন।

অবশ্য সে কারণে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে হবে, নিত্যকার কাজ-কর্মেও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করা যাবে না এমন কথা হতে পারে না। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও নিষিদ্ধ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিরুদ্ধতা নিছক নীতিগতভাবে হতে থাকবে বা যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধানো না হবে ও ইসলামী ঈমানের কারণে তাদের দেশ থেকে মুসলিমদের বহিষ্কৃত করে দিতে না চাইবে। এরূপ অবস্থা থাকা পর্যন্ত তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করা চলবে। কেননা আল্লাহ্ সদ্ব্যবহার ও সুবিচারকারী লোকদের ভালোবাসেন।
(আল-মুম্‌তাহিনা ঃ ৮)

বহু লোক এমন রয়েছে যারা আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে বিশেষ ঔদাসীন্য পোষণ করে। তাদের মনে নানারূপ সন্দেহ সংশয় দানা বেঁধে ওঠে, নানা কুসংস্কার হয় পুঞ্জীভূত। কিন্তু তা দূর করার জন্য তাদের উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। অনেকের মনে নানারূপ খটকা জাগে। সেগুলোকেও তারা মনের গহিনে গোপন করে রাখে। তা দূর করার চেষ্টা করে না। ফলে উত্তরকালে তাদের হৃদয়-মন ইসলামের আকীদা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তাতে প্রবেশ করে নানা বিভ্রান্তি ও বিভ্রম। এদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ط اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا - (يونس : ٣٦)

এদের অধিকাংশ লোক কেবলমাত্র ধারণা অনুমানের অনুসরণ করে চলে। অথচ ধারণা অনুমান কখনো প্রকৃত সত্য জানবার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট হতে পারে না।

এ ধরনের নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে যেসব বিশ্বাস মনে দানা বেঁধে ওঠে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র কোনো সমর্থন থাকে না। আর যার প্রতি আল্লাহ্‌র সমর্থন থাকে না তা 'মনের কল্পনা' ছাড়া কিছু নয়। আর মনের কল্পনা কখনো সত্য হয় না।'মনের কল্পনা' দ্বারা আর যা-ই হোক দ্বীনি জীবন যাপন করা কখনো সম্ভবপর হতে পারে না। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস কারো মনের কল্পনা নয়। তা সম্পূর্ণরূপে শাশ্বত ও সত্য।

অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের মনে নানা সময় নানা প্রকারের সন্দেহ-সংশয়, নানা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা ও নানা খটকা জেগে ওঠে। তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এরূপ হওয়াটা খারাপ লক্ষণ নয়। কোনো কোনো সাহাবীর মনে পর্যন্ত এ ধরনের ভাবধারার উদয় হতো। রাসূলে করীম (স)-একে বলেছেনঃ

ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ - (بخارى)

এ তো সুস্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একদিন হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআন মজীদের কোন আয়াতটি আপনার দৃষ্টিতে আশাপ্রদ ? জবাবে হযরত উমর (রা) বললেন, তা হচ্ছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ - (البقرة : ٢٦٠)

ইব্‌রাহীম বললেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি মৃতকে কিভাবে জীবন্ত করো, তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না ? বলল ঃ হ্যা,

বিশ্বাস তো করিই। তবে তা দেখাতে বলছি শুধু এজন্য, যেন আমার অন্তর আশ্বস্ত, নিশ্চিত ও দ্বিধা-সংশয়মুক্ত হয়।

বস্তুত মনে দ্বিধা-সংশয় ও প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া যেমন অস্বাভাবিক নয়, তেমনি তার নিরসনের উদ্দেশ্যে পরম সত্য অবলোকন করতে চাওয়াও স্বাভাবিকতার বিপরীত কিছু নয়। তবে মূল ঈমানকে কোনোরূপ ব্যাহত হতে দেয়া চলবে না। তা বজায় রেখে এসব জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধান করাই ঈমানদার লোকদের কাজ।

অনুরূপভাবে নবুয়তের ব্যাপারেও ইসলামের আকীদা অতীব ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলামী আকীদায় নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ্‌র মর্যাদায় তুলে ধরা হয়নি। এ আকীদা অনুযায়ী মানুষ নবী-রাসূলগণের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে, কিন্তু তাদের এবাদত করবে ও সাহায্য চাওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে তার কোনো অবকাশই নেই। সেই সঙ্গে নবী-রাসূলগণকে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় নিম্নতম মর্যাদায়ও নামানো হয়নি। তাঁদের দ্বারা পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও বিশ্বাস করা হয়নি।

ইসলামী আকীদায় নবী-রাসূলগণ মানুষ— মানুষের বংশ সম্ভূত। সেই সঙ্গে তাঁরা অতীব উচ্চ মহান গুণাবলীতে ভূষিত। তাঁদের প্রকৃতিগত মহানত্ব, পবিত্রতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অসাধারণ যোগ্যতার কথা জানতে পেরেছিলেন বলেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কাছে ওহী নাযিল করেছেন ও তাঁদের নবী বা রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিজের ঘোষণা হলো ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ – (الانعام : ١٢٤)

আল্লাহ তা'আলাই অধিক ভালো জানেন কাকে তিনি রিসালাত দান করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে ঈমানদার লোকদের জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় বানিয়েছেন। আর সর্বপ্রকার গুনাহ, পাপ, হীনতা ও নীচতার পংকিলতা থেকে মুক্ত পবিত্র বানিয়েছেন। তা যদি না হতো, তাহলে তাঁদেরকেও এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো, যা এ আয়াতে করা হয়েছে ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ –

তোমরা জনগণকে নেক আমল করার জন্য আদেশ করছ, আর তোমরা নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করো? তোমাদের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই? (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

নবী-রাসূলগণ তো সর্বসাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়ের আদেশ ও নির্দেশ দাতা। এমতাবস্থায় তাঁরা নিজেরাই যদি নানা পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন, তাহলে

একাজ— এ মহান দায়িত্ব পালন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে না। আর তা ছাড়া পাপ কাজে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা তো জালিম, আর জালিম লোকেরা যে আল্লাহ্র নবুয়ত ও রিসালাতের মতো মহান দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদা পেতে পারে না, তাতো সুস্পষ্ট। আল্লাহ্র একটি স্থায়ী নিয়ম হিসাবে কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ – (البقرة : ١٢٤)

আমার এই মর্যাদাপূর্ণ পদ— নবুয়ত ও রিসালাত জালিম লোকেরা পেতে পারে না।

মানুষ কি তার প্রকৃতি ও নিয়তির বন্ধনে বন্দী হতে একান্তভাবে বাধ্য ? কিংবা মানুষ নিজ ইচ্ছার অধীন— স্বেচ্ছাধিকারী, যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে ? যা না করার ইচ্ছা, তা নাও করতে পারে ? এ একটা কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্ন নিয়ে মানব-বুদ্ধি আবহমান কাল থেকেই চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে এসেছে। এ ব্যাপারে কোনো একটা চূড়ান্ত মতে পৌঁছবার জন্য মানব-জাতির চেষ্টার অন্ত নেই। দার্শনিক, ন্যায়শাস্ত্রবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদরা এ নিয়ে বহুকাল পর্যন্ত গভীর সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়ে এসেছে। এ চিন্তা ও গবেষণার যেন কোনো শেষ নেই, নেই যেন কোনো সর্বশেষ সিদ্ধান্ত— চূড়ান্ত মীমাংসা। মানুষের দার্শনিক চিন্তা-গবেষণার যতবেশি উৎকর্ষ উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হোক-না কেন, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলা বোধহয় কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

এ পর্যায়ে ইসলামের আকীদা সর্বদিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। তা যেমন মানুষের সুস্থ স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ, তেমনি বাস্তব ও পর্যবেক্ষণের অনুরূপ। এ সম্পর্কে ইসলামের আকীদা চূড়ান্তভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষের ইচ্ছামূলক কর্মক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। তার নিজের জন্য ও নিজের যাবতীয় কাজ-কর্মের জন্য সে দায়ী। সে ইচ্ছা করলে কোনো কাজ করতে পারে, ইচ্ছা করলে কোনো কাজ নাও করতে পারে, আবার করতে শুরু করার পর তা করা ছেড়েও দিতে পারে। প্রথমে কোনো কাজ না করার সিদ্ধান্ত করে পরে সে সিদ্ধান্ত পালটে দিতে ও সে কাজ করার নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতেও পারে। লোকদের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা দেখলেই মানুষের এরূপ ইচ্ছা-ক্ষমতার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কুরআন মজীদেও মানুষকে এই দৃষ্টিতেই গ্রহণ করেছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ – (الكهف : ٢٩)

যার ইচ্ছা হয়, সে যেন ঈমান আনে, আর যার ইচ্ছা, সে যেন কুফরী গ্রহণ করে।

অন্য একটি আয়াতে ইসলামের দাওয়াত পেশ করে যার ইচ্ছা হয় তাকে তা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে ঃ

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ج فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيلًا – (المزمّل : ١٩)

এ হলো উপদেশের বাণী মাত্র। যার ইচ্ছা হয় সে যেন আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার পথ অবলম্বন করে।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرَ – (المدّثر : ٣٧)

তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা সে যেন অগ্রহসর হয়ে আসে, কিংবা সে যেন পিছনে সরে যায়। (বা পশ্চাতে পড়ে থাকে)

ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ করা উভয়ই মানুষের ইচ্ছাধীন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا – (الجاثية : ١٥)

যে লোক নেক কাজ করবে তার নিজের জন্য, আর যে লোক মন্দ কাজ করবে, তার প্রতিফল তারই উপর বর্তাবে।

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٣٣)

কোনো মানুষকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করার দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

এ পর্যায়ের আয়াত কুরআন মজীদে কয়েক শত রয়েছে। এ সব আয়াতই আলাদা আলাদাভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং তার যাবতীয় কাজের ব্যাপারে তারই পুরোপুরি দায়িত্বের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

এ কারণে ইতিবাচকভাবে মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতার কথা বলেই কুরআন মজীদ কথা শেষ করেনি। যে সব লোক শির্‌ক করে এবং সে শির্‌ক ও পাপের সব দায়িত্ব নিয়তির উপর এবং প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র উপর চাপিয়ে দেয়, তাদের সম্পর্কে কুরআন বলেছে ঃ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوا بَأْسَنَا ط قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ط إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ – (الانعام : ١٤٨)

যেসব লোক শির্‌কে লিপ্ত, তারা বলবে ঃ আল্লাহ চাইলে আমরা কখনো শির্‌ক করতাম না। আমরা কোনো জিনিস নিজেদের থেকে হারামও করতাম

না। এদের আগের কালের লোকেরাও এমনিভাবেই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল এবং পরিণামে আমাদের আযাবের স্বাদ আস্বাদন করেছে। বলো, এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোনো জ্ঞান তথ্য আছে কি ? যদি থাকে তবে তা বের করে আমাদের দেখাও। আসলে তোমরা নিছক ধারণা অনুসরণ করে থাকো আর তোমরা কেবল আন্দাজ ও ভিত্তিহীন কল্পনার ভিত্তিতে কথা বলো।

এই পর্যায়ের একটি আয়াত ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاعَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ط كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - (النحل : ٣٥)

মুশরিক লোকেরা বলে, আল্লাহ চাইলে আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারুরই ইবাদত করতাম না— আমাদের বাপ দাদারাও না, তাঁর বিধানের বিপরীত আমরা কোনো জিনিসকে হারামও ধরে নিতাম না— এদের আগের লোকেরাও এমনিভাবে আল্লাহ্‌র উপর দায়িত্ব চাপিয়ে শিরক করেছে— মনগড়াভাবে কোনো একটাকে হারাম করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুরোমাত্রায় দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ছাড়া নবী-রাসূলগণের আরও কোনো দায়িত্ব আছে নাকি ?

এ আয়াতে উদ্ধৃত মুশরিকদের বলা কথায় তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার ও মনগড়াভাবে নানা জিনিস নিজেদের জন্য হারাম করে নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে এটা যেমন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, তেমনি ধৃষ্টতাপূর্ণ শির্‌ক করে তারা। একটা জিনিসকে হারাম করে মনগড়াভাবে তারা, অথচ দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর; এটা যে কতবড় অপরাধ, তা কল্পনা করলেও শরীর শিউরে ওঠে। এটা কেবল সেকালের লোকদেরই ব্যাপার নয়। চিরকালই এক শ্রেণীর মানুষ এ রকম করে এসেছে। এখনো করছে। প্রশ্ন হচ্ছে তারা শিরক করছে কেন ? কে তাদের সে জন্য বাধ্য করছে ? তারা যদি শিরক করতে রাজি না হতো, তাহলে ধরে বেঁধে কে তাদের এ কাজে বাধ্য করত ? নবী-রাসূলগণ তো আল্লাহ্‌র তাওহীদী দ্বীনের দাওয়াত সর্বকালের মানুষের কাছে পুরোপুরি পেশ করেছেন। তবু যে তারা একাজে লিপ্ত হয়ে আছে, তার একমাত্র কারণ হলো, তারা নবী-রাসূলগণের নিষেধ মানেনি, তাওহীদী দাওয়াত কবুল করেনি। তারা নিজেরা ইচ্ছা করেই এদিকে অগ্রসর হয়েছে। অতএব তাদের এসব কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাদেরই

উপর। অন্য কাউকে সেজন্য দায়ী করার তাদের কোনো অধিকার নেই। এতো 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানোর নীতি এবং এ নীতি চিরকালই নিন্দিত। কিন্তু আশ্চর্য লাগে আজকের দিনেও এই মনোভাবের লোক রয়েছে দেখে।

যেমন সমাজে চিরকালই এমন লোক থাকে যারা দরিদ্র এবং তারা ধনশালী লোকদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সেকালে ধনী লোকদের যদি বলা হতো, তোমাদের ধন-মালে গরীবদের অংশ রয়েছে, অতএব আদায় করো, তখন তারা বলত ঃ

اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْيَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ ق اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (يٰس : ٤٧)

আমরা খাওয়াব এমন লোকদের, যাদের আল্লাহ্ চাইলে খাওয়াতেন ? তোমরা তো সুস্পষ্ট গওমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছ।

অর্থাৎ আল্লাহ্ই যখন ওদের দরিদ্র করে রেখেছেন, আল্লাহ্ই যখন ওদের খাওয়া না, তখন আমরা ওদের খাওয়াব কেন ? এর-ও অর্থ এই যে, আল্লাহ্ই ওদের দরিদ্র করে রেখেছেন, আমরা চাইলেও সে দারিদ্র দূর করতে পারব না, বা আমাদের তা দূর করতে চাওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু এই কথা যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি এই মনোভাব অত্যন্ত মারাত্মক।

এই হলো একদিকের কথা এবং এ কথা সত্য যে মানুষের যে ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। রয়েছে সে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অধিকার ও ক্ষমতা, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কথা নয়। এছাড়াও কথা আছে এবং সে কথা হলো, মানুষের এই ইচ্ছাশক্তি নিরংকুশ নয়। মানুষ যা ইচ্ছা তাই করে ফেলতে পারে না। তারও কতকটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলেই বিশ্ব মণ্ডলের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে যেতে পারেনা। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি নিরংকুশ ও অপ্রতিরোধ্য হতো, তাহলে মানুষই বিশ্ববিধাতা হয়ে যেত। মানুষ নিজ ইচ্ছশক্তিকে প্রয়োগ করে এ দুনিয়ায় অনেক কিছুই করেছে একথা সত্য; কিন্তু সে বিধাতা হতে পারেনি, কোনো দিন তা পারবেও না— সেজন্য যত ইচ্ছা বা চেষ্টাই তারা করুক-না কেন।

তাই মানুষের ইচ্ছা-শক্তি আছে, তা স্বাধীন, একথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, মানুষের সে ইচ্ছা-শক্তি নিরংকুশ নয়, সীমাহীন নয়। অনেকে অবশ্য এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নিয়মের বা পরিবেশের এই দুটিরই বাধ্যবাধকতাকে মানব-ইচ্ছার নিরংকুশ না হওয়ার পথে বাধা স্বরূপ মনে করেছেন। আবার অনেক চিন্তাবিদ বলেছেন, মানুষ একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের

মধ্যে স্বাধীন, নিরংকুশ। আর বস্তুবাদী ডায়লিকটিকবাদীদের মতে মানব-ইচ্ছা উৎপাদন উপায়ের সাথে বন্দী। সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার বাধ্যবাধকতার কথাও তারা বলেছেন। ফলে তারা মানুষকে নিতান্তই অক্ষম যন্ত্রবৎ মনে করে বসেছে। তাদের মতে মানুষ বস্তুর বাহ্য প্রকাশের কাছে বিনীত, দাসানুদাস। বস্তুর উপর মানুষের প্রভুত্ব প্রাধান্য অচল কিন্তু যুক্তির বিচারে এসব কথা অগ্রহণযোগ্য। ইসলাম মানুষ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, তা যেমন প্রকৃতির বিচারে সত্য, তেমনি মানবীয় সম্মান ও মর্যাদারও অনুকূল। আল্লাহ্ তা'আলা মানব-সত্তার জন্য যে স্থায়ী বিধান রচনা করেছেন, সেই পরিমণ্ডলে মানুষ স্বাধীন। মানুষ তার জ্ঞান, প্রযুক্তি বুদ্ধি ও ইচ্ছা-ক্ষমতার দ্বারা বিশ্ব প্রকৃতির উপর অনেকটা কর্তৃত্ব করতে সক্ষম। মানুষ স্বাধীন। কেননা আল্লাহ্ই মানুষের জন্য এই স্বাধীনতার বিধান করেছেন। মানুষ স্বাধীন। কেননা আল্লাহ্ই তাকে কিছু চাওয়ার বা ইচ্ছা করার শক্তি দিয়েছেন। তবে তা আল্লাহ্র চাওয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কুরআন এই কথাই বলেছে ঃ

وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ - وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞ (الانسان : ٣٠-٣١)

তোমরা চাইবেনা যদি না আল্লাহ চান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সুবিজ্ঞানী। তিনি যাকে চাইবেন তাঁর রহমতে দাখিল করবেন। আর জালিম লোকদের জন্য তিনি উৎপীড়ক আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

অর্থাৎ মানুষের চাওয়া প্রথম একথা ঠিক, কিন্তু তা-ই চূড়ান্ত নয়। মানুষের চাওয়া কার্যকর হবে যদি আল্লাহ্ও তাই চান। আল্লাহ না চাইলে মানুষের চাওয়া কার্যকর হবে না কখনো। আর আল্লাহ্র চাওয়াটা অন্ধ ও নির্বিচারভাবে হয় না। তিনি সব জানেন ও সুবিজ্ঞানী বিধায় তিনি মানুষের সেই চাওয়াকেই কার্যকর হতে দেন, যা তাঁর স্থায়ী বিধান সম্মত। সেখানেও আল্লাহ্র সুবিবেচনা ও নিরপেক্ষ সুবিচার নীতিই প্রধান। এ কারণেই তিনি জুলুমকারীদের নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শত চাওয়াকেও সফল হতে দেবেন না। কেননা তা আল্লাহ্র স্থায়ী বিধানের পরিপন্থী। আর তাঁর স্থায়ী বিধান হলো; যারা জালিম, যারা পাপী ও নাফরমান, তারা কঠিন আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবেই, তা থেকে তাদের নিস্তার নেই।

মোট কথা কুরআন একদিকে মানবীয় ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়নি। সেই সঙ্গে অপর দিকটি সর্বোপরি আল্লাহ্র ইচ্ছা কার্যকর হওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে। এ পর্যায়ের

কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا - (يونس : ٩٩)

তোমার আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীর বুকে যত মানুষ রয়েছে, সকলেই ঈমান গ্রহণ করত।

অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ঈমান গ্রহণ করবে এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয় যদিও তা আল্লাহ্‌র সন্তোষের বিপরীত নয়। এই কারণেই দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ঈমান গ্রহণ সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র এই ইচ্ছাই সর্বজয়ী। তাই সকল কাজের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে প্রধান বলে স্বীকার করা কর্তব্য। এই নির্দেশই তিনি দিয়েছেন সকলকে। বলেছেন ঃ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - (الكهف : ٢٣-٢٤)

তোমরা কোনো জিনিস অর্থাৎ কাজ আগামীকাল করবই এরূপ বলো না। কেননা তোমাদের কোনো কাজ করারই ইচ্ছা সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি না তা আল্লাহ চান। তাই বলবে, 'যদি আল্লাহ চান।'

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ - (بنى اسرائيل : ٣٠)

তোমার আল্লাহ্‌ রিযিক প্রশস্ত করে দেন যার তিনি চান এবং পরিমিত করে দেন।

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - (فاطر : ٨)

আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন।

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ -

বলো সব কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে থেকে হয়।

আল্লাহ্‌র প্রতি যারা ঈমানদার, তারা ভালো কাজের জন্যই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা বিশ্বাস করে যে, তারা যদি পাপ কাজ করে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের দায়ী হতে হবে।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - (الزلزال : ٧-٨)

যে লোক একবিন্দু ভালো কাজ করবে, সে তার ফল দেখতে পাবে। আর যে লোক একবিন্দু মন্দ কাজ করবে, সে তার ফল দেখবে।

কুরআনের এসব আয়াতে এ সম্পর্কিত প্রকৃত রহস্য পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উভয় দিক সম্পর্কেই কুরআনের ঘোষণা সত্য যথার্থ। তার ঘোষণায় যেমন আল্লাহ্‌র হক্ বিঘ্নিত হয়নি, তেমনি মানুষের মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়নি একবিন্দু। কেননা কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। আর আল্লাহ্‌র কাছে তো সমস্ত রহস্য চির উদ্‌ঘাটিত। তিনি মানুষের ইচ্ছা-শক্তির সক্রিয়তার সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আশার উজ্জ্বলতার বিশাল পরিবেশে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষকে আশান্বিত ও উৎসাহী করে বলেছেন ঃ

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

বলো, হে আমার সে সব বান্দা! যারা নিজের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেওনা। কেননা আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো বহু ক্ষমাদানকারী— অতিশয় দয়াবান।

অর্থাৎ একজন একবার নিজ ইচ্ছায় গুনাহে লিপ্ত হয়েছে বলেই সে চিরকাল গুনাহে নিমজ্জিত থাকতে বাধ্য হবে, কোনোদিনই তা থেকে মুক্তি সম্ভব হবে না— একথা ঠিক নয়। একবার যেমন সে নিজ ইচ্ছায় আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে, সে যদি নিজের ইচ্ছার পরিবর্তন করে, নাফরমানীর পথ পরিহার করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ বাছাই করে গ্রহণ করে, তাহলে পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র রহমত তার জন্যও রয়েছে। সে রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহের মাফী চাও এবং আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে শুরু করো, আল্লাহ্‌র রহমত আসতেই থাকবে।

বস্তুত একথা স্পষ্ট যে, কুরআনের দৃষ্টি এক সঙ্গে সমগ্র মানবতার প্রতি নিবদ্ধ। মানুষের যত দিক ও মানব জীবনের যত বিভাগ রয়েছে তার সমগ্রের প্রতি এক সঙ্গে বিবেচনা প্রসারিত। কুরআন না অস্পষ্ট কথা বলে, না কোনো বিশেষ একটি দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ও অপর দিকটি দৃষ্টির সমক্ষে অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছান্ন। মানুষের ক্রমবিকাশমান সত্তাকে পূর্ণত্বের দিকে চালিয়ে নেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। আর বিশ্বমানবের জন্য এই কুরআনই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র বিধান।

ব্যক্তি জীবনে ঈমানের প্রভাব

একজন ব্যক্তি তার জীবনে নিজের জন্য কিভাবে এবং কোন কল্যাণের আশা করে ? ব্যক্তি মানুষের মনস্তত্ত্ব কি ? কি তার মনের প্রবণতা ? একজন মানুষ কোন চরমতম মহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম চালনার কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে।

মানব-সমাজের একজন ব্যক্তির জন্য এসব প্রশ্ন যেমন মৌলিক, তেমনি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব নির্ধারণ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব ?

এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া সম্ভব তখন, যখন আমরা আমাদের নিজেদের দিকে তাকাই ও যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি আমাদের চুতঃপার্শ্বস্থ পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে উপর এবং যখন মানুষের কাছে ও অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাদের অবস্থা সন্ধান করি।

আমরা এসব প্রশ্নের জবাব পেতে পারি তখন যখন আমরা মনে করি যে, ব্যক্তি মানুষকে মানবতার পর্যায়ে রেখে বিবেচনা করাই আমাদের লক্ষ্য, বিচ্ছিন্ন একজন মানুষ হিসাবে নয়। আমাদের লক্ষ্য এক সুস্থ সুসংহত মানুষ— হতাশাগ্রস্থ ও সংশয়াপন্ন এক ব্যক্তি নয়।

আমরা স্পষ্ট কণ্ঠে বলতে পারি, এক ব্যক্তি চায় তার মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার চেতনা লাভ করতে। সে চায় তার অন্তর্নিহিত মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বসমূহের পূনর্জাগরণ সৃষ্টি করতে। সে চায় তার নিজস্ব মানবীয় মর্যাদা ও স্বাতন্ত্রের বোধ লাভ করতে। সে এ কথা বুঝতে চায় যে, মানব সমাজে তার একটা গুরুত্ব, একটা অসাধারণ মূল্য মর্যাদা আছে। তার সত্তা ও অস্তিত্বের একটা চূড়ান্ত লক্ষ্য আছে, তার জীবনের একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সে এই বিপুল বিশ্বের অসংখ্য জিনিসের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সত্তা। সে বানর-উল্লুক, শিম্পাঞ্জী-বন মানুষ ও পোকা-মাকড় প্রভৃতি ইতর প্রাণীকূল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও এক উন্নত বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই পৃথিবীতে সে উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থকভাবে সৃষ্ট হয়নি, আর তাকে যে বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান আহরণ শক্তি এবং বাক-শক্তি ও বিবরণ দানের যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, তা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যহীন বা অর্থহীন নয়— এর নির্ভুল চেতনা লাভ করা মানব প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্বের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

ব্যক্তি মানুষ সম্মান চায়, মর্যাদা চায়, সেই সঙ্গে চায় শক্তি। সে শক্তি প্রকৃতিমুখী, দুনিয়ার ঘটনাবলীর উৎস। এ শক্তি কাজ করে অপরের বিদ্রোহের সামনে দুষ্প্রবৃত্তি ও লালসা-বহ্নি নির্বাপন করে। এ শক্তি কাজ করে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া জন্য জীবনের সর্ববিধ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। এ শক্তিই ব্যক্তিকে তার দৈহিক দুর্বলতা থেকে মুক্তি দেয়। দৃষ্টিগত অক্ষমতা ও সত্তাগত ত্রুটি-অসম্পূর্ণতার পরিপূরক হচ্ছে এই শক্তি। এ ছাড়া আরো বহুবিধ কাজে ও ব্যাপারে এ শক্তির প্রয়োজন কার্যকারিতা। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এক বাক্যে স্বীকার করে যে, এ শক্তি সৌভাগ্যের বাহক। সে সৌভাগ্য কেবল ইহজীবনের নয়। নয় কেবল পরকালীন জীবনের। ইহকাল পরকাল— উভয় জীবনের চরম সাফল্য ও সৌভাগ্য এ শক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই এ শক্তি মানুষ মাত্রেরই কাম্য। কোনো মানুষই বোধহয় চায় না যে, তার এ জীবন কষ্ট ও দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ ও জর্জরিত হোক। বরং প্রত্যেক মানুষই কামনা করে, তার এ জীবনটা পরম প্রশান্তি, স্বস্তি, সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দে ভরপুর হোক। সর্বোপরি হৃদয়-মনের পরম প্রশান্তি প্রত্যেকটি মানুষেরই কাম্য। মানুষ চায়, মনের অশান্তি যেন তার জীবন-সমুদ্রকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও উথাল-পাথাল করে না তোলে।

মানব মনের এই প্রবণতা যেমন সাভাবিক, তেমনি তা নিজ সত্তার বাইরে স্ত্রী পুত্র-পরিজন ও প্রিয়জন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। অবশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন মানুষও দুনিয়ায় নিতান্ত বিরল নয় যারা হিংস্র জন্তুর মতো দুনিয়ায় বাস করতে চায়। তাদের নিজের সুখ-সুবিধাই একমাত্র কাম্য। ঠিক জন্তু জানোয়ারের মতো খেয়ে পরে নিজের জীবনটাকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ করতে চায়। কিন্তু এ ধরনের জীবন যাত্রার শেষ পরিণতি পশুকুলের মতোই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

যারা হিংস্র জন্তুর মতো জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তারা প্রত্যেক ব্যাপারেই শালীনতা ও স্বাভাবিকতার সীমালংঘন করে চলে যায়। তারা তাদের মুখের জোরে বিষাক্ত নখর ও দন্তের জোরে অন্যের উপর বিজয়ী হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির রক্তস্বাধ গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত।

কিন্তু এরা এবং এদের মতো আরও যারা আছে, তারাই মানুষের একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। এদের মধ্যেও অনেকের এবং সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও অনেকের মনে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা ও জিজ্ঞাসা জাগে। সে কে, কোত্থেকে সে এসেছে, তার সত্যিকার পরিচয়টা কি ? .... এসব প্রশ্নের সম্মুখীন অনেক মানুষকেই হতে হয়। এরাই মানুষের সত্যিকার মর্যাদা ও শক্তি সম্পর্কে শেষ

পর্যন্ত অবহিতি লাভ করতে পারে। মানুষের সৌভাগ্য ও সত্যিকার শান্তি কি করে পাওয়া যেতে পারে, তা জানবার জন্য এরাই উঠে-পড়ে লেগে যায়। জানতে চায় মানুষের ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত তাৎপর্য। যে তাৎপর্য না জানলে নিজেকে জানা যায় না, জীবনের কোনো স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভবপর হয় না। আর তার নিজের ও এই জীবনের কোনো অর্থ— কোনো মূল্য খুঁজে পাওয়া তার কাছে চিরদিনই অসম্ভব হয়ে থাকে।

কিন্তু ঈমান কি এসব বড় বড় প্রশ্নের জবাব নির্ধারণে ও মানব জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণে কোনো অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ? ব্যক্তি জীবনের পরিসরে এসব প্রশ্নের কি কোনো গুরুত্ব আছে।

পরবর্তী আলোচনা আমরা এসব বিষয় নিয়েই করতে চাই।

ঈমান ও মানবীয় মর্যদা

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا -

আর নিশ্চিতই আমরা আদম সন্তানকে অধিকতর মর্যাদাবান বানিয়েছি এবং জলেস্থলে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি, তাদের রিযিক দিয়েছি পুত-পবিত্র পরিপুষ্ট দ্রব্যাদি। আর বহু সৃষ্টি কুলের উপরই তাদের মর্যাদাও দান করেছি।

বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষ

মানুষ কি ?

বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষ এই পৃথিবীর একমুষ্ঠি মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ এই পৃথিবী থেকে উঠেছে, এই পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে, পৃথিবী থেকেই সে খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণ করে এবং পৃথিবীর মাটিতেই শেষ পরিণতি লাভ করে। এই হলো মানুষের মোটামুটি পরিচয়।

কিছু মাংস, রক্ত, অস্থি-মজ্জা, শিরা-উপশিরা, স্নায়ুতন্ত্রী-পেশী, রজ্জু, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জোড়া-গিরা ও কোষ-তন্ত্রী সমন্বিত মানব দেহ। মানব সত্তায় যে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি রয়েছে, তাও নিছক 'বস্তু' ও মগজের ক্রিয়া মাত্র। যকৃত থেকে যেমন পীতরস নিঃসৃত হয় কিংবা মূত্র থলি থেকে যেমন প্রস্রাব পরিত্যক্ত হয়, এও ঠিক তেমনি।

মানুষ একটা দেহসত্তা। ওর বিশেষত্ব যেমন কিছু নেই, তেমনি অন্যান্যের উপর তার বৈশিষ্ট্য-শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা অন্যান্য থেকে স্বাতন্ত্রও নেই কিছু। এই পৃথিবীর ধূলির উপর অসংখ্য ও বিভিন্ন জীব-জন্তু প্রাণীর ন্যায় মানুষও একটা জীব মাত্র। বরং পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, মানবেতর প্রাণীকুল, তথা বানর-উল্লুক জাতীয় একটা জীবনই মাত্র সে। মানুষ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ কথা এটাই। মানুষ কালের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমবিকাশের একটা স্তরে এসে সে হয়েছে মানুষ।

মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে তা সৌরলোকের অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে একটি গ্রহ মাত্র। আর মহাকাশে রয়েছে আরও কত সহস্র সৌরলোক, তার

হিসাবে বা সংখ্যা বলা এই দুনিয়ার কারোরই সাধ্যায়ত্ত নয়— আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এ কথাই বলেছে। কোপার্নিকাসের কাছ থেকে মানুষ শিখেছে ঃ মানুষ সৃষ্টিলোকের এক অতীব নগণ্য ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তা মাত্র। এ হলো স্থানের বিবেচনায়।

কালের বিচারে মানুষের অবস্থা নগণ্যতম বললেও সঠিক কথা বলা হয় না। কেননা ডারউইন ও অন্যান্য প্রাণী-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ কালের বিচারের একেবারে অনুল্লেখযোগ্য সত্তা। কেননা পৃথিবীর বয়স যেখানে শত কোটি বিলিয়ন বছর, সেখানে মানুষ বড় জোর একশ' বছরকাল বেঁচে থাকলে তা তো একবিন্দুর লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়।

বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে কাল ও স্থানের বিচারে এই হচ্ছে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা। অন্যরা যে মানুষকে 'খোদায়ী আত্মা' কিংবা 'বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করে, এরা সে দিক দিয়েও মানুষকে কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়। তাদের চূড়ান্ত কথা হলো, মানুষ বস্তুসত্তা মাত্র। তার দেহটা নিতান্ত জৈবিক। আর এ দেহের ও বস্তুসত্তার কি-ইবা মূল্য ও মর্যাদা হতে পারে।

বৈজ্ঞানিকরা এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে প্রস্তুত নয়। তারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানব দেহের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, মানব দেহে কতিপয় রাসায়নিক উপাদান ছাড়া কিছুই নেই।

একজন বিজ্ঞানী মানব দেহের মৌল উপাদানের রাসায়নিক পরিমাণ হিসাবে করে লিখেছেন ঃ

- কিছু পরিমাণ তৈল— যা দিয়ে সাত টুকরা সাবান তৈয়ার করা যায়।
- কিছু পরিমাণ ফস্‌ফরাস— যা দিয়েশলাইর ১২০ টি কাঠির শীর্ষে লাগিয়ে আগুন ধরানো যায়।
- কিছু পরিমাণ লবণ ম্যাগনেসিয়াম যা কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করার উদ্দেশ্যে এক চুমুকে পান করা যায়।
- কিছু পরিমাণ লোহা— যা দিয়ে মধ্যম আকারের কয়েকটি দণ্ড বানানো সম্ভব।
- কিছু পরিমাণ চূণা— যা মুর্গীর খোপের চুনকামের জন্যে যথেষ্ট।
- কিছু পরিমাণ কর্পূর— যা একটা কুকুরের চর্ম পরিষ্কারের জন্য যথেষ্ট।
- কিছু পরিমাণ পানি।

আর এসব মৌল উপাদান যে কোনো বাজার থেকে কিনে নেয়া যেতে পারে, যার দামও হবে সামান্য। বস্তু-মানুষ কিংবা বলা যায়— মানব-বস্তুর এই তো সারবত্তা, এ-ই তার মূল্য।

কিন্তু এ হিসাবে মানুষের প্রাণ বা আত্মাকে ধরা হয়নি। মানুষের সাথে অলৌকিক জগতের কোনো সম্পর্ক আছে এবং সে দিক দিয়েও যে মানুষ সম্পর্কে একটা বিবেচনা চলে, তা এ বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় না।

একালের জনৈক নাস্তিকের প্রশ্ন, মানুষেরা কি পোকা-মাকড় ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর তুলনায় উচ্চতর কিছু ? আমরা তো আমাদের মতোই, তার বেশি কিছু নই। পোকা-মাকড়ও তাই। আমরা যেমন আমাদের নিয়েই ব্যস্ত, দুনিয়ার পোকা-মাকড়ও তা থেকে ভিন্নতর কিছু নয়।

আমাদের ও পোকা-মাকড়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু উঁচ-নিচুর। আমাদের ও অন্যান্য উন্নত জীব-জন্তুর মধ্যেও এই উঁচু-নিচুরই পার্থক্য, এর অধিক কিছু নয়। আর ইতর প্রাণী ও জীব-জন্তুর মধ্যকার পার্থক্য যে খুব বিরাট কিছু নয়, তা তো স্বতঃসিদ্ধ।

আমরা যদি হারিয়ে যাই— নিঃশেষ হয়ে যাই, ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যাই, তাহলে এ বিশ্বলোক— এ চন্দ্র ও সূর্য তেমন আর কি মহামূল্য বস্তু হারাবে ?

ডারউইন ও ফ্রয়েড এবং তাঁদের মতো অন্যান্য বস্তু-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেও মানুষের এর চাইতে উন্নত কোনো মর্যাদা স্বীকৃতব্য নয়। এদের সকলের মতে মানুষ তো পোকা-মাকড়ের স্বজাতীয় বানর ও লেজবিহীন উল্লুকের বংশজাত। তারা মানুষের চামড়া ও বাহ্যাবরণ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। আর মানুষের দেহ সত্তার মূলে মাটি তথা প্রোটোপ্লাজম ছাড়া কিছু আছে বলে তাদের ধারণায়ও আসে না। তাদের মতে মানুষ প্রকৃতিজাত। তার উত্তরণ নিম্নের দিকে, ঊর্ধ্বপানে উত্থান বা উন্নতি তার ধর্ম নয়। এক কথায় মানুষ ক্রমবিকাশের এক স্তরের জীব মাত্র। বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এ পর্যন্ত এসে পৌছেছে— নেমে এসেছে।

মানুষ সম্পর্কে এই দৃষ্টিকোণ— এই ধরনের মনোভাবের তুলনায় অধিক মারাত্মক ও বিষ-ক্রিয়া সম্পন্ন বোধ হয় আর কোনো মনোভাব হতে পারে না। মানুষ যদি নিজেকে অধঃগামী জীব বা জন্তু মাত্র মনে করে, তাহলে যে-কোনো মাত্রার হিংস্রতা-পাশবিকতা ও নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা কি তার পক্ষে অসম্ভব মনে করা যায় ? কোনো মাত্রার অশ্লীলতা, হীনতা-নীচতা-নগ্নতা জঘন্যতা কি তার অশোভন হতে পারে ? যে মানুষ সম্পর্কে এরূপ ধারণা, সে মানুষ যে কখনো নৈতিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, লালসা-সংযম, বন্ধুতা-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি,

দানশীলতা, নম্রতা-বদান্যতা ও বিনয় গ্রহণ করবে, এমনটা কি কখনো চিন্তা করা যায় ? বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অবস্থা, তা যে এই ধরনেই মনোভাব তথা মানব দর্শনেরই পরিণতি তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে ?

ঈমানের দৃষ্টিতে মানুষ

ঈমান ও ঈমানদারের দৃষ্টিতে মানুষ এক মহামর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। মানুষের এ মর্যাদা ও সম্মান যেমন আল্লাহ্‌র কাছে, তেমনি বিশ্বলোকের সবকিছুর উপর। আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ উন্নতমানে তাকে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে রূপ, আকার-আকৃতি ও আংশিক গঠন প্রকৃতিও দিয়েছেন সবকিছুর থেকে ভিন্নতর, সবকিছুর তুলনায় উন্নত ও উত্তম। আল্লাহ নিজেই তাঁর 'রূহ' মানুষের দেহ সত্তায় ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার একনিষ্ঠ কর্মচারী ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদাও করিয়েছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে যেমন দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি, তেমনি দিয়েছেন জ্ঞান, বিদ্যা-বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণ-শক্তি। তারপর এই মানুষকে তিনি বানিয়েছেন তাঁর খলীফা— প্রতিনিধি, নায়েব— এই পৃথিবীতে। আসলে এই মানুষই হলো সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস, সৃষ্টিকুলের গৌরবের অমূল্য অতুলনীয় একমাত্র ধন। এ দুনিয়ার সবকিছু— যা আছে উর্ধ্বলোকে, যা আছে ভূতলে, ধরিত্রীতে, সেই সবকিছুই— মানুষের অধীন, মানুষের একান্ত অনুগত, মানুষের কল্যাণের নিয়োজিত। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুকূল ক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছেন সব কিছুকে। আর দৃশ্য অদৃশ্য যত নেয়ামত, মানুষের জন্য কল্যাণকর যা কিছু, সবই বিপুলভাবে তাকে দান করেছেন। সবকিছু তার জন্য অনুগত ও অনুকূল। আর সে নিজে কার জন্য ? তার সমগ্র সত্তা ও জীবন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্‌র নিজের এই কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اِبْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُكَ لِنَفْسِىْ وَخَلَقْتُ كُلَّ شَىْءٍ لَكَ - فَبِحَقِّىْ عَلَيْكَ لَاتَشْتَغِلْ بِمَا خَلَقْتُهٗ لَكَ عَمَّا خَلَقْتُكَ لَهٗ - اِبْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُكَ لِنَفْسِىْ فَلَا تَلْعَبْ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ - اِبْنَ اٰدَمَ اُطْلُبْنِىْ تَجِدُ نِىْ فَاِنْ وَجَدْتَنِىْ وَجَدْتَ كُلَّ شَىْءٍ - وَاِنْ فُتُّنِيْ فَاتَكَ كُلُّ شَىْءٍ - وَاَنَا اَحَبُّ اِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ -

হে আদম সন্তান! আমি তো তোমাকে কেবলমাত্র আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। আর অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। তোমার উপর আমার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত, তা তুমি যেন কখনো ভুলে না যাও। সে সব জিনিস আমি

তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি, তাতে যেন কখনো এতটা মনোনিবেশ করে না বস, যাতে তোমাকে যার জন্য সৃষ্টি করেছি, তার কথা ভুলে যাও।

হে মানুষ! আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি। এটাকে তুমি খেলা মনে করো না। আমি তো তোমার রিযিক— যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস— পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব তুমি হতাশা ভারাক্রান্ত হবে না।

হে মানুষ! তুমি যদি আমাকে পেতে চাইবে, তবে তুমি আমাকে পাবে। আর যদি তুমি আমাকে পেয়েই যাও, তবে তো সবকিছুই পেয়ে গেলে, কিছুরই অভাব বা অপূর্ণতা থাকবে না। কিন্তু তুমি যদি আমাকেই হারিয়ে ফেল, তাহলে তুমি হলে সর্বহারা— আমি যেন হই তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়।

বিশ্বলোকের বিশালতার তুলনায় মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। বিশ্বলোকের বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স খুবই সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ— এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় ও সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ বয়সের মানুষই তার প্রাণ ও আত্মার এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক দিয়ে এক বিরাট-বিশাল অসীম ও মহান সত্তা। আর সত্যি কথা, মানুষ বলতে মানুষের আত্মা ও তার অন্তর্নিহিত সত্তাই বুঝায়। কেবলমাত্র দেহটাই কখনো মানুষ নয়।

এ কথাও অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর বুকে সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ বয়সকাল বা আয়ুষ্কালের বিচারে লক্ষ বিলিয়ন জীব-তাত্ত্বিককালের মহাসমুদ্রে একটি বিন্দুবৎ (যদি তাদের এ কথা সত্য হয়) কিন্তু ঈমানদার লোকদের দৃঢ় প্রত্যয় হলো, মৃত্যুই মানুষের শেষ কথা নয়। মৃত্যু হলো মানুষের মহাযাত্রার একটা স্টেশন মাত্র। তার যে যাত্রা অতীতের অনাদিকাল থেকে শুরু হয়েছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে শুরু হবে তার সেই মহাযাত্রা অনন্তকালের অসীমতার পানে। সে এক চিরন্তন শাশ্বত জগত। সেখানে তাকে স্বাগত সম্বর্ধনা জানান হবে এই বলে ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ - فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ - (الزمر : ٧٣)

শান্তি ও স্বস্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর, সুখী হও, উৎফুল্ল হও, আনন্দিত হও তোমরা। শান্তি ও স্বস্তির এ মহান কাননে তোমরা প্রবেশ করো চিরকালের জন্য।

সাধারণভাবে দ্বীনের দৃষ্টিতে এই হচ্ছে মানুষের মর্যাদা। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের এ মর্যাদা ও সম্মানের যে কোনো তুলনা দুনিয়ার জন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন মজীদের বহু কয়টি আয়াতে মানুষের এ মহান উচ্চ মর্যাদার কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষিত

হয়েছে। হযরত জিবরাঈল সর্বপ্রথম যে ওহী নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে উপস্থিত হন, তা মোট পাঁচটি মাত্র আয়াত সম্বলিত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ওহী-বাণীতেও মানুষের কথা কিছুমাত্র ভুলে যাওয়া হয়নি। বরং শুধু মানুষের মর্যাদার কথাই নয়, মানুষের সাথে বিশ্বলোক স্রষ্টার সম্পর্কের কথাও স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে তাতে। আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের প্রথম সম্পর্ক সৃষ্টির— আল্লাহ সব মানুষের স্রষ্টা, সে সম্পর্ক হলো সম্মান ও মর্যাদার। আল্লাহ মানুষকে অতি উচ্চ মর্যাদা ও সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর অতি বড় সম্মান দিয়েছেন। সে সম্পর্ক হেদায়েত ও জ্ঞান শিক্ষাদানের। আল্লাহই মানুষকে নির্ভুল পথের সন্ধান দিয়েছেন, সে পথে পরিচালিত করেছেন এবং মানুষ ছিল অজ্ঞ, মূর্খ— আল্লাহই তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এ আয়াত কয়টিতে আল্লাহ্‌কে বুঝাবার জন্য الرب। শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি ব্যবহার করে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের শুধু স্রষ্ঠাই নন, তিনি মানুষের লালন-পালনকারী— মালিক, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ক্রমান্বয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা দিকে পরিচালনকারী ও বিধান দাতাও। কুরআনের সে প্রথম আয়াত পাঁচটি হচ্ছে ঃ

اِقْـرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْـرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْـرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - (العاق : ١-٥)

পড় তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো অতীব সম্মানার্হ। যিনি লেখনীর সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন সেই জ্ঞান যা মানুষ জানত না।

আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা

বহু আয়াতে আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের নৈকট্য ও মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। এসব আয়াত বিভিন্ন ধর্মদর্শনের দৃষ্টিতে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যবর্তী বহু শত মাধ্যমের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক আসনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। কেননা এরা তো মানুষ ও আল্লাহ্‌র মাঝে বহু শত আড়ালের দুর্ভেদ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করে দিয়েছে। এদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্‌কে পাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত পাওয়া নাকি সম্ভবপর নয়। এরা সবই মিথ্যাবাদী ও প্রতারক, শোষক, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ - (البقرة :١٨٦)

তোমার কাছে আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় আমি কোথায়; বলে দাও, আমি অতি নিকটেই রয়েছি। আমি তো প্রত্যেক দো'আকারীর দো'আর জবাব দেই যখনি আমাকে কেউ ডাকে।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - (البقرة : ١١٥)

পূর্ব ও পশ্চিম— সমগ্র বিশ্বলোক— আল্লাহ্‌রই, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাবে, সেখানেই আল্লাহ্ রয়েছেন।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ج وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ - (ق : ١٦)

নিঃসন্দেহে মানুষকে আমরাই সৃষ্টি করেছি। মানুষের মন কখন কি বলে, তা আমরাই জানি। আর আমরা তো তাঁর মেরু-রজ্জুর অপেক্ষাও নিকটবর্তী।

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - (المجادلة : ٧)

তিনজন লোকের গোপন পরামর্শ হলে তিনি তাদের চতুর্থ, পাঁচজন হলেও তিনি তাদের ষষ্ঠ, এর চাইতে কম বা বেশি যাই হোক, তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন, তারা যেখানেই থাক-না কেন।

রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্‌র কথা হিসেবে যা বর্ণনা করেছেন, তাতেও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের কথা উচ্চস্বরে ধ্বনিত। একটি হাদীসে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ - وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٌ مِّنْهُ - وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا - وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً .

(بخارى)

আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার প্রতি

সেই রকম হই। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গেই থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনেই স্মরণ করি। সে যদি আমাকে প্রকাশ্য মজলিসে স্মরণ করে, আমি তাকে স্মরণ করি তার চাইতেও উত্তম মজলিসে। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার প্রতি অগ্রসর হয়ে যাই এক গজ। সে যদি আমার প্রতি একগজ পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার প্রতি অগ্রসর হই দুই বাহু পরিমাণ। আর সে যদি আমার দিকে ধীর পায়ে চলে আসে, আমি তার প্রতি অগ্রসর হই দ্রুত গতিতে।

বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছে এই হচ্ছে মানুষের স্থান ও মর্যাদা। অন্য কথায় মানুষ নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে যেভাবে এবং যতটা পেশ করবে, সে সেটাই ফিরিয়ে পাবে। কিংবা নিজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা-ই পেতে চাইবে, তা-ই সে পেতে পারবে। এটা কি মানুষের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব নয়?

উচ্চতর জগতে মানুষের স্থান

উচ্চতর জগতে— মহান আত্মার জগতে মানুষের যে স্থান, তা এতই উচ্চ ও মহান যে, আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মস্তকও তাদের সম্মুখে অবনমিত। তারা অবশ্য নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তুলেছিলেন, কিন্তু তা তাঁদের দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে মর্যাদা ও স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র খলিফা। আল্লাহ নিজেই খিলাফতের এই মহান উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই এ ইতিহাস বলেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ
فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ - وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ
بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ
اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ - قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ - (البقرة : ٣٠-٣٣)

তোমার আল্লাহ্ যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাব, তখন তারা বলল ঃ তুমি পৃথিবীতে এমন লোকদের বানাবে যারা সেখানে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে ? আমরাই তো তোমার প্রশংসা করে তোমার তসবীহ্ পাঠ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি অহর্নিশি। তিনি বললেন, আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না। তিনি আদমকে সব নাম শিখিয়ে দিলেন, পরে সেইগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করলেন। বললেন, আমাকে এ সবের নাম জানিয়ে দাও— যদি তোমরা সত্যবদী হয়ে থাক। তারা বললঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, মহান। আমাদের তো কিছুই জানা নেই, তবে তুমি যা আমাদের জানিয়েছ শুধু তাই। নিশ্চয়ই তুমিই সর্বজ্ঞানী, সুবিজ্ঞানী। বললেন, হে আদম! এদের জানিয়ে দাও এ সবের নাম। সে যখন তাদের এ সবের নাম জানিয়ে দিল, আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমিই জানি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সব অদৃশ্য বিষয় ? আর আমি তাও জানি যা তোমরা গোপন করছিলে।

আল্লাহ তা'আলাই মানবজাতিকে এই উচ্চতর মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, তাই তিনি দিয়েছেন। এ কাহিনী থেকে জানা যায়, উচ্চতর জগতে মানুষের মর্যাদার কোনো তুলনা নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান সৃষ্টি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন মানুষকে সম্মান দেখানোর জন্য।

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ - فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ - فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ -

স্মরণ করো, তোমার আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি মৃত্তিকা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুসংবদ্ধ করে তৈরী করে দিলাম ও তার মধ্যে আমার থেকে 'রূহ' ফুঁকে দিলাম, তখন তারা সকলে একত্রে তার উদ্দেশ্যে সিজ্দায় পড়ে গেল। অবশ্য ইবলীস তা করল না।

মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র এ নির্দেশ ইবলীস মেনে নিতে অস্বীকার করল। হিংসা ও অহংকারই আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানাবার দুঃসাহস যুগিয়েছে। ফলে সে কাফের হয়ে গেল প্রকাশ্যভাবে। অতঃপর মানুষের প্রতি তার চ্যালেঞ্জ এল। এ অভিশপ্তের কি পরিণাম হলো ? আল্লাহ বললেন ঃ

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۞ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ - (صٓ : ٧٧ -٧٨)

তুই বের হয়ে যা এখান থেকে! কেননা তুই বিতাড়িত আল্লাহ্‌র রহমত থেকে আর তোর উপর আমার শেষ বিচার দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত চেপে বসল।

আত্মার জগতে— উচ্চতর জগতে মানুষের মর্যাদার কথাই জানা গেল এ কাহিনী থেকে।

বস্তু জগতে মানুষের মর্যাদা

এ বস্তু জগতে মানুষের মর্যাদা হচ্ছে মানুষ-এর নির্যাস। মানুষকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্বলোকের সৃষ্টি। মানুষ এখানকার প্রধান। মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে এই বিশাল বিশ্বলোককে। এখানে যা কিছু আছে সব-ই মানুষের জন্য, মানুষ তার উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে। এসব স্বতঃই মানুষের কল্যাণে নিরত।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ - وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ وَ سَخَّرَلَكُمُ الْاَنْهٰرَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ - وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ - وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا -

আল্লাহ তিনিই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী। আর আকাশের দিক থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছেন। তার ফলে বের করেছেন ফল-ফসলসমূহ তোমাদের রিযিকরূপে। তিনি নৌকা-জাহাজ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন যেন তা নদী-সমুদ্রে চলতে পারে তাঁর বিধান মতো। তিনি খাল-ঝর্ণধারাসমূহকেও তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করেছেন আবর্তনশীল চন্দ্র ও সূর্যকে। তিনি তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং এভাবে তোমরা যা চাও, প্রয়োজন বোধ করো তা সবই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্‌র দেয়া এসব কল্যাণকর দ্রব্য উপকরণ গণনা করতে চেষ্টা করো, তাহলে তা কখনোই পারবে না।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا - (بنى اسرآءيل : ٧٠)

আমরা অবশ্য অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদম বংশকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থলপথে ও জলপথে। আর তাদের রিযিক দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুরই উপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَلَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - (الجاثية : ١٢-١٣)

আল্লাহ তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্র নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যেন তাতে তাঁরই বিধান মতো নৌকা-জাহাজ চলাচল করতে পারে আর যেন তোমরা এ উপায়ে (সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আর এ সব করে যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করো। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যা আছে ঊর্ধ্বলোকে এবং যা আছে পৃথিবীতে— তা সবই তাঁরই থেকে। এ সব ব্যাপারে চিন্তাশীল লোকদের জন্য গভীর চিন্তা-বিবেচনা যোগ্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً - (لقمن : ٢٠)

তোমরা কি লক্ষ্য করো না, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সবকিছুই নিয়মানুগত করে দিয়েছেন। আর তাঁর দৃশ্য-অদৃশ্য নেয়ামতসমূহ ব্যাপকভাবে তোমাদের ঢেলে দিয়েছেন।

এ বিশ্বলোকে এই হচ্ছে মানুষের স্থান ও মর্যাদা এবং তার সঙ্গে এসবের এই হলো সম্পর্কের আসল রূপ।

এ সৃষ্টলোকে মানুষের চাইতেও বহু বড় বড় ও সূক্ষ্মতম সৃষ্টি রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা কেন? তার একমাত্র কারণ হলো, মানব-সত্তায় নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র জ্যোতির একটা অংশ এবং মানুষের দেহে রয়েছে সেই রূহ, যা আল্লাহ নিজে তাঁর রূহ থেকে মানুষের দেহে ফুঁকে দিয়েছেন।

বস্তুত এ কারণেই মানুষ এই বিশ্বলোকে আল্লাহ্‌র মহান খিলাফতের সুকঠিন দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও সক্ষম বিবেচিত হয়েছে। খিলাফতের এ দায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত। আর তাহলো আল্লাহ্‌র শরীয়ত বহন, পালন ও আল্লাহ্‌র

কাছে জবাবদিহির যোগ্যতা। এটা অতি বড় কঠিন আমানত এবং এ বিশ্বলোকে মানুষ ছাড়া আর যে কারোরই যোগ্যতা নেই এ বিরাট আমানত বহন করার, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এই কথাটি বলেছেন এ ভাষায় ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ - (الاحزاب : ٧٢)

আমরা আমানত পেশ করেছি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও পর্বতমালার উপর, ওরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং ভয় পেয়েছে। পরে মানুষ এই আমানত বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

মানুষের এই যোগ্যতাই তাকে তার ভাগ্য রচনার ক্ষমতা দিয়েছে। তার পূর্বে আল্লাহই তার জন্য হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ- (القيمة : ١٤)

বরঞ্চ মানুষ তার নিজের উপর দৃষ্টিমান— নিজের ব্যাপারে সচেতন সতর্ক।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا - (الشمس : ٩-١٠)

যে-লোক নিজেকে পরিচ্ছন্ন করেছে সে-ই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে আর যে-লোক নিজেকেই পর্যুদস্ত করেছে, সে-ই ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا - (بنى السرآءيل : ٧)

তোমরা যদি ভালো করো, তবে তা তোমাদের জন্যই। (তার কল্যাণ তোমরাই পাবে) আর যদি খারাপ করো, তবে তার কুফল তোমাদেরই ভোগ করতে হবে।

ইসলামই মানুষকে তার সঠিক ও উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। সবকিছুই তার জন্য স্বীকার করে নিয়েছে। মানুষের যেমন একটা দেহ রয়েছে, তেমনি আছে তার প্রাণ-আত্মা। আছে বিবেক-বুদ্ধি, হৃদয়-মন, ইচ্ছা-শক্তি, অনুভূতি-শক্তি। ঊর্ধ্বগমনের যোগ্যতা আছে মানুষের, তেমনি আছে উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছা ও প্রবণতা। মানুষের গলদেশে কোনো রজ্জু বেঁধে দেয়া হয়নি, তার পায়ে পরিয়ে দেয়া হয়নি কোনো বেড়ি। ভালো, উত্তম-উৎকৃষ্ট ও পবিত্র জিনিস তার জন্য হারাম করে দেয়া হয়নি। তার সমুখে কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়নি। ধর্মের ব্যবসাকারীদের জন্য এমন কোনো সুযোগই রাখা হয়নি যে, তারা

তোমাদের নিয়ে খেলা করবে, তোমাদের ধোঁকা দিয়ে শোষণ করবে! আল্লাহ্ নিজেই সরাসরিভাবে মানুষকে সম্বোধন করে একথা বলেছেন ঃ

يَـاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ - الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ - فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاۤءَ رَكَّبَكَ - (الانفطار : ٦-٨)

হে মানুষ! তোমার সেই মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে কোনো জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে— অহংকারী বানিয়েছে, যিনি তোমাকে সুস্থ-সঠিক সুঠাম-সুডৌল বানিয়েছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছেন এবং যে প্রতিকৃতিতে ও আকার-আকৃতিতে চেয়েছেন, তোমাকে সংযোজিত করেছেন?

يَاَيُّهَاالْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ - (الانشقاق : ٦)

হে মানুষ! তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের আল্লাহ্র দিকেই অগ্রসর হচ্ছ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথেই সাক্ষাৎ করবে।

মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের স্বীকারোক্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের যে সম্মান ও মর্যাদা তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সম্মান ও মর্যাদা মানুষকে আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। দুনিয়ার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণও বিভিন্ন সময়ে তাঁদের উক্তিতে এ মর্যাদার কথা স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ফকীহ আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেছেন ঃ

لَيْسَ لِلّٰهِ تَعَالٰى خَلْقٌ اَحْسَنَ مِنَ الْاِنْسَانِ - فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَهٗ حَيًّا عَالِمًا قَادِرًا مُتَكَلِّمًا سَمِيْعًا بَصِيْرًا مُدَبِّرًا حَكِيْمًا وَهٰذِهٖ هِيَ صِفَاتُ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلٰى -

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলে মানুষের চাইতে সুন্দর কেউ নেই— কিছু নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জীবন্ত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিদ্যান, শক্তিমান, বাকশক্তি-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন, সুব্যবস্থাপক ও বিচক্ষণ। আর এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী।

আল্লাহ্র জন্য মানুষের মনে যে ভালোবাসা, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মানবসত্তা ও আল্লাহ্র সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্য দেখিয়ে ইমাম গায্যালী বলেছেন ঃ

এই সম্পর্ক অন্তর্নিহিত। বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও সুরত-শেকেলে এই সম্পর্ক ও সাদৃশ্য দেখা যাবে না। তা রয়েছে অন্তর্নিহিত তাপর্যের দিক দিয়ে।

তার কতকটা গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, আর কতকটা লেখাও সমীচীন নয়। যা উদ্ধৃত করা যায়, তা হলো, বান্দার সে সব গুণ-বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য যা অনুসরণ ও অবলম্বনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কি, বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও— তাহ্‌লো রবুবিয়তের চরিত্র। আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর মধ্যে এও একটি। আরও অর্জনযোগ্য গুণ হলো ইল্‌ম, নেক কাজ করা, পুণ্যশীলতা, দয়া, অনুগ্রহ, স্নেহ বাৎসল্য, কোমলতা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া, কল্যাণ সাধন, তাদের ভালো কাজের উপদেশ দান, মহান সত্যের দিকে তাদের পথ-প্রদর্শন, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা প্রভৃতি শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম কার্যাবলী। এ সব কাজই এমন যা মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের সঙ্গে যে বিশেষ সম্পর্ক রেখেছেন, তার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। সেই সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত করেছেন এই বলে ঃ

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ - (بنی اسرآء یل: ٨٥)

লোকেরা তোমাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, 'রূহ' আমার আল্লাহ্‌র একটা বিশেষ ব্যাপার।

কেননা এতে তিনি বলেছেন যে, মানুষের 'রূহ' এক আল্লাহ্‌রই ব্যাপার বিশেষ। তা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা-শক্তির সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই শুধু এতটুকু বলেছেন ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ - (ص : ٧٢)

যখন আদমকে সুসংবদ্ধ করে তৈরী করে দিলাম এবং তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুঁকে দিলাম।

এ জন্যই তিনি ফেরেশতাদের দ্বারা মানুষকে সিজ্‌দা করিয়েছেন। তার মূলে যে কারণ নিহিত, তা আল্লাহ্‌র কথায় জানা যায় ঃ

اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِی الْاَرْضِ - (ص : ٢٦)

আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি।

নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও এদিকে ইঙ্গিত করে ঃ কেননা মানুষ আল্লাহ্‌র খিলাফতের অধিকারী হয়েছে কেবলমাত্র এ কারণেই যে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ - (مسلم)

আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর নিজের সুরতে পয়দা করেছেন।

এ হাদীসের সঠিক তাৎপর্য যারা বুঝতে অক্ষম, তারা বলেছে, সুরত ও আকার আকৃতি তো কেবল তাই আছে, যা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে তারা কি ভ্রান্ত হয়ে মানুষের আকার-আকৃতিকেই আল্লাহ্র আকার-আকৃতি মনে করে বসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, মহান পবিত্র। এরা মূর্খ, এদের কথা কিছুমাত্র ঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এদিকে ইশারা করেই হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিলেন ঃ

مَرِضْتُ فَلَمْ تَعِدْنِىْ -

আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, তুমি আমার শুশ্রুষা করো নাই।

তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্ তা কেমন করে হতে পারে ? তখন বললেন ঃ

مَرِضَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَعِدْهُ وَلَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ -

আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু তুমি তার শুশ্রুষা করো নাই। যদি তা করতে, তাহলে আমাকে তুমি তার কাছে পেতে পারতে।

আল্লাহ্র সাথে মানুষের এ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে কেবল তখন, যদি ফরয কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করার পর নফল এবাদত করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে এই কথাই বলেছেন ঃ

لَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرُهُ الَّذِىْ يَبْصُرُبِهٖ وَلِسَانُهُ الَّذِىْ يَنْطِقُ بِهٖ - (بخارى)

আমার বান্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে আমার নিকটবর্তী হতে পারে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার সেই কান হই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার মুখ হই যা দিয়ে সে কথা বলে। (বুখারী) (احياء العلوم - ربعالمنجيات ص :٢٦٣)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন ঃ

জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিলোকের মধ্য থেকে মানব জাতির সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এভাবে যে, তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তার প্রতি বিপুল অনুগ্রহ দান করেছেন, তাকে মর্যাদাবান করেছেন এবং বানিয়েছেন নিজের জন্য। আর অন্যান্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর বিশেষভাবে তাকে তাঁর পরিচিতি, ভালোবাসা, নৈকট্য ও মর্যাদা

দিয়েছেন, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সবই তিনি মানুষেরই জন্য নিয়ন্ত্রিত ও কর্মে নিয়োজিত করে রেখেছেন— এমনকি তাঁর ফেরেশতাগণকে পর্যন্ত, যারা তাঁর অতীব নিকটবর্তী। তাদের নিদ্রা-জাগরণ বিদেশ যাত্রা ও বাড়িতে উপস্থিতি সর্বাবস্থায় ফেরেশতাগণকে তাদের হেফাজতের কাজে লাগিয়েছেন। মানুষের প্রতি ও মানুষের উপর তিনি তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। মানুষকে রাসূল বানিয়েছেন, মানুষের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছেন। মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, মানুষের সাথে কথা বলেছেন, মানুষের প্রতি কথা পাঠিয়েছেন। অতএব মানুষের এমন একটা উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যা সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে কারোরই নেই। (مدارج السالكين : ج-١ - ص-٢١)

মনুষ্যত্ব ও মানবতার মর্যাদার উপর ঈমানের স্থান

ঈমান মানুষের এই ইজ্জত ও সম্মান মুমিনের অন্তরে দৃঢ়মূল করে দেয় এই হিসাবে যে— সে মানুষ। কিন্তু 'মুমিন' হওয়ার দিকে দিয়ে এর তাৎপর্য আরো গভীর ও সূক্ষ্ম। ঈমানই মানুষকে আরো উর্ধ্বে তুলে দেয়, যে উর্ধ্ব পর্যন্ত আর কেউ পৌঁছতে পারে না।

ঈমান গ্রহণের পর ঈমানসম্পন্ন লোকদের সমাজের একজন হওয়ার কারণে তার সম্মান ও মর্যাদা আরো উর্ধ্বে উত্থিত হয়। সে সম্মান ও মর্যাদা অন্য সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার জামা'আতের লোকদের সেই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মর্যাদার কথা বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - (اٰل عمرٰن : ١١٠)

তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। তোমর ন্যায় ও ভালো ভালো কাজের আদেশ ও নির্দেশ করো এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিষেধ করো, বিরত রাখো। আর তোমরা সব সময় ঈমান রাখো এক আল্লাহ্র প্রতি।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ - (البقرة : ١٤٣)

এমনিভাবে তোমাদেরকে এক মধ্যম মর্যাদাসম্পন্ন উম্মত বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা লোকদের জন্য পথ-প্রদর্শক হতে পার।

هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - (الحج : ٧٨)

তিনিই তোমাদেরকে পছন্দ করে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীন পালনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের রাসূলের ইজ্জত-সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে মুমিনদের ইজ্জত ও মর্যাদার কথাও বলেছেন— এক সাথে, একত্র করে ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ – (المنفقون : ٨)

আল্লাহ্র জন্য ইজ্জত ও সম্মান— তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য।

ঈমান ঈমানদার লোকদের মনে এই চেতনাও জাগিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সম্মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতার কথা তাঁর কিতাবে লিখে দিয়েছেন। এ এমন মর্যাদা ও স্বাধীনতা যে, তার সাহায্যে সে-ই উচ্চে আসীন হবে, তার উপর কেউ উঠতে পারবে না। সে-ই সরদার ও শ্রেষ্ঠ হবে, তার উপর কারো সরদারী ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا – (النسآء : ١٤١)

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর বিজয়ী হওয়ার কোনো পথই কখনো কাফেরদের জন্য করে দেবেন না।

ঈমান এই চেতনাও জাগিয়ে দেয় যে, ঈমানদার ব্যক্তির অভিভাবকত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই ওয়াদা করেছেন ঈমানদার লোকদের সাহায্য করার, রক্ষণাবেক্ষণ করার, হেদায়েত দেয়ার।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَامَوْلٰى لَهُمْ – (القتال : ١١)

তা এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা অভিভাবক সেই লোকদের, যারা ঈমান এনেছে। আর কাফেরদের কেউই অভিভাবক নেই।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ – (البقرة : ٢٥٧)

আল্লাহ্ অভিভাবক সেই লোকদের, যারা ঈমান এনেছে। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসেন। আর যারা কাফের, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগূতগুলো, তারা তাদের আলোক থেকে পুঞ্জীভূত অন্ধকারে নিয়ে যায়।

ঈমানদার লোকদের মনে এ চেতনা সব সময় জাগ্রত থাকে যে, সে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ সান্নিধ্যে-সন্নিকটে অবস্থিত— তাঁর সেই দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে, যা কখনো নিদ্রাচ্ছন্ন হয় না। সে যেখানেই থাকুক, তিনি তার সংরক্ষণ করছেন এবং তাকে এমন সাহায্যদানে শক্তিশালী করে দিচ্ছেন যাকে কেউ পরাভূত ও পর্যুদস্ত করতে পারে না।

وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الروم : ٤٧)

মুমিন লোকদের সাহায্য করা আমাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে।

ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ج حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ - (يونس : ١٠٣)

অতঃপর আমরা মুক্তি দেই আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। এমনিভাবে আমার কর্তব্য হলো, আমি মুমিনদের মুক্তি দিয়ে থাকি।

ঈমানদার ব্যক্তির একথা জানা থাকে যে, মহান শক্তিমান আল্লাহ্র সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা সে সব সময় পাবে। তার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করা হোক, তাকে লক্ষ্য করে যত তীরই শাণিত ও নিক্ষিপ্ত হোক, তিনি তাকে রক্ষা করবেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِـعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ - (الحج : ٣٨)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবেন ঈমানদার লোকদের জন্য। কেননা তিনি বিশ্বাস ভঙ্গকারী অকৃতজ্ঞ লোকদের কখনো পছন্দ করেন না।

কুরআন ভালো কাজ বা মন্দ কাজের পর্যবেক্ষক বানিয়েছে মুমিন লোকদেরকে। এ পর্যায়ে তাদের ফয়সালা ও নির্দেশ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। সেসব কাজ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেখার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে মুমিনের দেখাকে।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ - (التوبة : ١٠٥)

আর বলো, তোমরা কাজ করো। আল্লাহ তোমাদের কাজ অবশ্যই দেখবেন— তাঁর রাসূল এবং মুমিন লোকেরাও।

কুরআনের আয়াত একথাও জানিয়েছে যে, মুমিন লোকদের সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে উৎসারিত এবং মুমিনদের রোষ-অসন্তোষও আল্লাহ্‌রই রোষ ও অসন্তোষেরই ফসল।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا – (المؤمن : ٣٥)

আল্লাহ্‌র কাছে এটা অতি বড় গুনাহ— মুমিন লোকদের কাছেও।

এ সব বিরাট উচ্চ ভাবধারা যখন একজন ব্যক্তির হৃদয়-মনে স্থান লাভ করে, তখন সে বাস্তবিকই অত্যন্ত শক্তিশালী, মানসিক চেতনাসম্পন্ন ও মহাসম্মানিত ব্যক্তি হয়ে যায়। তার আত্মাও তখন হয় অতিশয় বিরাট। তার হৃদয়-মনে জাগে বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা-বাসনা। তখন সে এমন উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে যায় যে, অপর কোনো সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করতে সে কিছুতেই প্রস্তুত হয় না। যতবড় দাপট ও প্রতাপশালীই কেউ হোক-না কেন, সে তাকে একবিন্দু পরওয়া করতে প্রস্তুত হয় না। কোনো ধন-মাল বা সম্মান-মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাই সে অন্যায় পথে ও অবৈধ উপায়ে অর্জন করতে রাজি হতে পারে না। কেননা সব সময় তার মনে এ কথাটি জাগরূক হয়ে থাকে ঃ

সে বিশ্বের সেরা, সে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই বান্দাহ।

এরই বাস্তবরূপ আমরা দেখতে পাই হযরত বিলাল ইবনে রিবাহর জীবনে। তিনি যখন এরূপ ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি ক্রীতদাস হয়েও বড় বড় অহংকারী কুরাইশ সরদারদের সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। কেননা তিনি তো এ ঈমানের দৌলতেই আল্লাহ্‌র কাছে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উমাইয়া ইবনে খালফ, আবু জেহেল ইবনে হিশাম প্রমুখ কুরাইশ সরদার ও মক্কা নগরীর কর্তা শ্রেণীর লোকদের প্রতি তাকাতেন এমনভাবে, যেমন দৃষ্টিমান ব্যক্তি তাকাচ্ছে অন্ধ লোকদের প্রতি, যেমন আলোক-মণ্ডিত ব্যক্তি তাকায় অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের প্রতি। কুরআন মজীদ এই কথাই বলেছে ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا – (الانعام :)

যে লোক ছিল মৃত, পরে তাদের আমরা জীবন দান করলাম। আর তার জন্য এমন আলোর সৃষ্টি করে দিলাম যা সঙ্গে নিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, সে কি কখনো তার মতো হতে পারে, যে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যেই নিমজ্জিত রয়েছে, তা থেকে বের হতে পারছে না ?

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

যে লোক উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, সে কি অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত। তার তুলনায় যে লোক সমান্তরালভাবে সরল-সঠিক সুদৃঢ় পথে নিজ থেকেই চলে যাচ্ছে ? (সূরা মুলক ঃ ২২)

এ রূপ দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই হযরত রব্য়ী ইবনে আমের (রা)-কে কেন্দ্র করে। তিনি যখন ঈমান আনলেন এবং কুরআনের আয়াত তাঁর চিন্তা-বিশ্বাসকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত ও সুপরিচ্ছন্ন করে দিল, তখন তিনি পারস্যের সেনাবাহিনী প্রধান রুস্তমের মুখোমুখি সদর্পে দাঁড়িয়ে গেলেন। রুস্তম তখন অত্যন্ত জাঁক-জমক দাপট-প্রতাপ সহকারে স্বীয় আসনে আসীন ছিল। কিন্তু তিনি তাতে একটুও কম্পিত হলেন না। তাঁর চারপশে তখন বিপুল সংখ্যক চাকর-নফর পাত্রমিত্র-সহকারী স্বর্ণ ও রৌপ্যের চোখ ঝলসানো চাকচিক্য লয়ে নত মস্তকে দণ্ডায়মান। কিন্তু সত্যিকার ঈমানের অধিকারী হযরত রব্যী তার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দাঁড়ালেন। রুস্তম জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমরা কারা ? তখন আরব বেদুঈন রব্য়ী জবাব দিলেন,তাঁর কণ্ঠে ঈমানী আত্ম-সম্মানবোধ ঝংকৃত হয়ে উঠল ঃ

نَحْنُ قَوْمٌ اِبْتَعَثَنَا اللّٰهُ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهٗ وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا اِلٰى سِعَتِهَا وَمِنْ جُوْرِ الْاَدْيَانِ اِلٰى عَدْلِ الْاِسْلَامِ -

আমরা এমন একটা জাতি, আল্লাহ তা'আলা যাদের সৃষ্টি করেছেন দুনিয়ার মানুষকে মানুষের দাসত্ব ও অনুগত্য থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্যের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা-জটিলতা থেকে মুক্ত করে তাঁর বিশালতা-উদারতার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করে ইসলামের নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা ও সুবিচারের দিকে নিয়ে আসার মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে।

মানুষ সম্পর্কে ইসলাম ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

আল্লাহ্‌র কাছে প্রাপ্য ইজ্জত-সম্মান, উচ্চতর জগতের মান-সম্মান এবং সমগ্র বিশ্বলোকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানুষকে তার আত্মচেতনায় অধিকতর শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। সে নিজেকে কোনো একটি দিক দিয়েও অপর কারোর তুলনায় একবিন্দু ছোট বা খাটো মনে করতে পারে না। কেননা তার সম্পর্ক সংস্থাপিত রয়েছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গে। এ জন্য সে

সব-সময় আত্মসচেতন হয়ে থাকে। তার সে চেতনা সব-সময় থাকে তীব্র হয়ে। তার মস্তক থাকে চির উন্নত হয়ে। অপমান, লাঞ্ছনা ও অবক্ষয়তা সে কখনো বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয় না। সে এমন কোনো কাজ করতেও প্রস্তুত হয় না, যার দরুন তাকে তেমন কোনো অবস্থায় পড়ে যেতে হতে পারে। মুমিন বান্দার এই আত্মচেতনা-আত্মসচেতনতা সামান্য জিনিস নয়। এ এক বিরাট উপার্জন, মহামূল্যবান সম্পদ। এর তীব্র প্রভাব প্রতিফলিত হয় মুমিনের চেতনালোকে, মন-মগজে, ধারণা-বিশ্বাসের জগতে, বাস্তব কর্ম ও আচার-আচরণের বিশাল ক্ষেত্রে। অতঃপর ব্যক্তিসত্তার যে ভাব মূর্তি গড়ে ওঠে, তাতে সে মানব-বিশ্বের সেরা ব্যক্তি না হয়ে পারে না।

এক ব্যক্তি জীবন যাপন করে এই মনোভাব নিয়ে যে, সে নিরেট জীব বা জন্তু বিশেষ। তার এ জীবনের গভীর তলদেশে কোনো শিকড় নেই, এ জীবনের পূর্বে তার কোনো নাম-চিহ্ন যেমন ছিল না, তেমনি এ জীবনেরও শেষ প্রান্তে তার থাকবে না কোনো অবস্থিতি। তার এ জীবনেও কোনো বৃহত্তর মহত্তর সত্তার সাথে নেই কোনো সম্পর্ক। বরং সে হচ্ছে বড় জোর বানর— লেজুর বিহীন উল্লুকের বংশধর মাত্র।

কিন্তু আর এক ব্যক্তি এ দুনিয়ায় জীবন-যাপন করে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে, সে এই সৃষ্টিলোকের সেরা সৃষ্টি, সে এই ধরিত্রীর বুকে মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি— খলীফা। এখানে মহান সত্য দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা, নির্বিশেষে সমস্ত মানবতার সার্বিক কল্যাণ ও মংগলের জন্য নিরন্তন কাজ করে যাওয়া এবং যা কিছু সুন্দর, ভালো ও কল্যাণকর তার প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেই সঙ্গে তার এ চেতনাও রয়েছে যে, এ বিশ্বলোকের সবকিছুই তার কল্যাণে ও খেদমতের কাজে নিয়োজিত, ফেরেশতাগণ সব সময় তার সংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত, আর মহান বিশ্ব-স্রষ্টা নিজেই সর্বদা তার সঙ্গে অবস্থিত। সে সেই মানব-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত— যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। নবী-রাসূল-সিদ্দীক-শহীদ নেক্‌কার বান্দাদের সেও একজন। তার এ সত্তা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না, কবরই তার শেষ ঘর নয়। সে তো চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনের জন্যে সৃষ্ট।

এই দুইজন লোকের মধ্যে বাস্তবতার দৃষ্টিতে যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য, তা সূর্যালোকের মতোই চিরসমুজ্জ্বল— তা অস্বীকার করতে পারে এমন অজ্ঞমূর্খও যে দুনিয়ায় আছে, তা বাস্তবিকই অভাবনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হচ্ছে বেঈমান সমাজের প্রতীক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ঈমানদার সমাজের প্রতিনিধি। মুমিনদের স্বর্ণযুগে যেমন ইসলামী ঈমান-আকীদার বাস্তব প্রতিমূর্তি দেখা গেছে

ঘরে ঘরে, তেমনি বেঈমান সমাজের প্রতীক দেখা যায় পাশ্চাত্য সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাবিত সমাজের প্রতিটি বংশে ও পরিবারে। তিনটি ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট ও সুস্পষ্ট ঃ

১. বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষের স্থান ও মর্যাদা,

২. মানুষের প্রকৃতি, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে,

৩. মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জীবনে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানুষের স্থান ও মর্যাদা

মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ঘোষণা— 'মানুষকে আমি পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি'— থেকে এই জগতের বুকে মানুষের সঠিক স্থান ও মর্যাদা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, এ কথা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। বস্তুত মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে এক বিশেষ প্রজাতীয় সৃষ্টি। মানুষ প্রস্তর নয়, উদ্ভিদ বা গাছপালা নয়, জন্তু-জানোয়ার নয়, ফেরেশতা নয়, শয়তানও নয়। মানুষ এক সম্মানিত ও সম্মানার্হ সৃষ্টি। এককভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি দায়িত্বশীল— প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ একাকী— একার শক্তিতেই বসবাস করতে পারে না এই জগতে, —যেমন নাস্তিকরা মনে করেছে; বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও অনুগ্রহেই সে এখানে বেঁচে থাকে, বসবাস করে। মানুষকে তিনিই অতীব উত্তম আকার-আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাকে মুখের ভাষা দিয়েছেন, প্রকাশ ক্ষমতা দিয়েছেন। আছে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর— চিন্তা-ভাবনা-বিবেচনা করার শক্তি। মানুষ এই জগতের কোনো কিছুরই দাস নয়, কারো অধীন নয়— একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

এ হলো ইসলামের আকীদা। কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মানুষের এই মর্যাদা স্বীকৃতব্য নয়। মানুষকে কোনো স্রষ্টা সৃষ্টি করেন নি। সে আগাছা-পরগাছার মতোই স্বয়ং সৃষ্ট-স্বয়ম্ভু, অনস্তিত্ব থেকে সে এমনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে। সে এখানে কিছুদিন বসবাস করে একাকী, একাকীই মরে যাবে, শেষ হয়ে যাবে তার সবকিছু। অতঃপর তার কিছুই থাকবে না।

মানুষ এক কথায় জন্তু। তবে কেউ বলেছে ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত মানুষ-জন্তু; কিংবা উন্নতিপ্রাপ্ত জন্তু, অথবা সামাজিক জীব। কিন্তু জন্তু সে সর্বাবস্থায় জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও তার সম্পর্কে এতটুকু অবশ্য স্বীকৃত যে, মানুষ তার পরীক্ষণ-লব্ধ অভিজ্ঞতাবলে বিশ্বপ্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করে নিতে পেরেছে। 'বস্তু'কে সে নিজের মন মতো ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। আর এ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের জোরেই 'ক্রমবিকাশলব্ধ জীব' হতে পেরেছে সে। সে নিজের

মধ্যে অনেক শক্তির উপলব্ধি পেয়ে পৃথিবীকে যথেচ্ছভাবে চালাতে চায়। সে মনে করে, সে যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে।

এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী চেতনা জেগেছে।

একটি চেতনায় সে কিছু নয়— একান্তই হীন-নীচ-নগণ্য, অনুল্লেখযোগ্য। সে দুদিন পরে চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এখানে তার কোনো দায়িত্ব নেই, তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। সে নিছক বন্য জন্তু মাত্র।

দ্বিতীয় চেতনায় সে অহংকারী, আত্মম্ভরিতায় তার মন-মগজ স্ফীত, ভারাক্রান্ত। 'আমি কি হনু রে' চিন্তায় সে হয় মাতাল, দিশেহারা। ইউরোপীয় চিন্তাবিদের ভাষায়— এই নিত্যনতুন জগতে মানুষই হচ্ছে প্রভু, সেই এর উদ্‌গাতা, সে 'যা ইচ্ছা' করার অধিকারী। অবশ্য আধুনিক কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নবতর দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত হওয়ায় এ চেতনায়ও কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে ইদানিং।

মানুষের প্রকৃতি

মানুষের প্রকৃতি এমন একটা দিক, যেখানে চিন্তার পদস্খলন হওয়া খুবই সহজ এবং এ জন্য তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ দুনিয়ার অনেক চিন্তাবিদই এখানে এসে নিদারুণভাবে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। মানব প্রকৃতি বহু বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়। মানুষ নিছক লালসা বা প্রবৃত্তি সর্বস্ব নয়। নয় নিছক বিবেক-বুদ্ধি চিন্তা-শক্তি আধার। মানুষের শুধু একটা দেহই নেই, নেই নিছক একটা রূহ। মানুষের প্রকৃতিতে এ উভয় দিকই সুন্দরভাবে সুষমা মণ্ডিত হয়ে আছে।

প্রগতির যুগে একটি বিষয় চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত মনীষীদের বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছে। তা হলো, মানুষের প্রকৃতি। তার একটি দিক রয়েছে বস্তুগত, তাহলো তার দেহ। এই দেহে বেঁচে থাকে, ক্রমশ বৃদ্ধি পায়— ছোট থেকে বড় হয়। শেষকালে তা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু তার আরও একটা 'জিনিস' রয়েছে যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতা বহির্ভূত। এই 'জিনিসটি'ই চেতনা লাভ করে, চিন্তা-ভাবনা গবেষণা-বিবেচনা করতে পারে। মূলত এই 'জিনিসটি'ই দেহটিকে নিয়ন্ত্রিত করে, চালায়, কোনো কিছু করার নির্দেশ দেয়। এই 'জিনিসটি'ই মানব সত্তার চূড়ান্ত নির্যাস। মানুষ গড়ে ওঠে এক সঙ্গে দুটি দিক নিয়ে। একদিকে সে বস্তু আর অপর দিকটি বস্তুবিরোধী। এ দুটোকেই কি তুমি সত্য ও বাস্তব বলে মনে করো? কিংবা তার কোনো একটা দিক কাল্পনিক মাত্র?

মানুষের চিন্তা-ভাবনা বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি এবং মানব-সত্তা সংক্রান্ত ধারণায় বিচ্যুতি ঘটে তখনি, যখন এ দুটো দিকের কোনো একটিরও প্রতি সামান্য উপেক্ষাও প্রদর্শিত হয়। সে অবস্থা ঘটতে পারে যদি এ দুটি দিকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়, অথবা তার প্রত্যেকটির উপর অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো স্বতন্ত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (এ এক মার্কিন চিন্তাবিদের উক্তি)

এই প্রেক্ষিতে একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসেই মানব প্রকৃতিকে যথার্থ মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানব প্রকৃতিকে নির্ভুলভাবে চিনতে ও জানতে পারাও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের একক কৃতিত্ব। কেননা ইসলাম তো আল্লাহ্‌র বাণী, আর মানুষ সেই আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টাই যে তার সৃষ্ট জিনিসের স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব সম্পর্কে সর্বাদিক অবহিত, তার অপেক্ষা অধিক সত্য ও নির্ভুলভাবে অন্য কেউ সে বিষয়ে জানতে পারে না, তা সর্বজনস্বীকৃত। তাই কুরআন মজীদ চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন তুলেছে ঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ - (الملك : ١٤)

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি সঠিকভাবে সব কথা জানেন না ? অথচ তিনি তো অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে পুরোপুরি অবহিত ?

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন একটা ভারপূর্ণ দেহ, আর একটা সূক্ষ্ম শরীরবিহীন রূহ— আত্মা। দেহ মানুষকে নিম্নের দিকে টানে আর রূহ বা আত্মা মানুষকে ঊর্ধ্বপানে নিয়ে যেতে চায়। মানব দেহের অভ্যন্তরেই রয়েছে প্রতিরোধ শক্তি, আছে লালস-বাসনা-প্রভৃত্তি। মানবাত্মার সমুখে বিশাল উদার দিগন্ত। দেহের এমন কতগুলো দাবি রয়েছে যা জন্তু-জানোয়ারের দাবির অনুরূপ। আর মানবাত্মার চাহিদা ও প্রবণতা হচ্ছে তাই, যা ফেরেশতাদের রয়েছে।

এই হচ্ছে মানব-প্রকৃতির যথার্থ রূপ। এ প্রকৃতি মানুষের উপর উর্ধ্ব থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। এ প্রকৃতি তার কাছে কিছুমাত্র গৌণও নয়। বরং এই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এবং এইভাবেই তাকে পৃথিবীর উপর আল্লাহ্‌র খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্য বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রথম যেদিন সমস্ত মানুষের আদি পিতা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই তার প্রকৃতিতে একমুষ্ঠি মৃত্তিকা ও রূহের একটা ফুঁক একত্রিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তারই ঐরসজাত সন্তান হিসাবে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এই মানব বংশ— কোট শত-কোটি মানুষ।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - اَلَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ - ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ -

তিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের বিশেষজ্ঞ, সর্বজয়ী, দয়াবান। তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দরতম করেছেন। মানুষের সৃষ্টিকার্য শুরু করেছে মাটি থেকে। পরে তার বংশধারা চালু করেছেন সূক্ষ্ম শুক্রকীট দিয়ে। এ থেকেই মানবদেহে সুসংবদ্ধ করে দিয়েছেন ও সে দেহে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর থেকে। তিনিই তোমাদের জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়, চক্ষু ও হৃদয় বানিয়ে দিয়েছেন— তা সত্ত্বেও তোমরা খুবই কমই শোকার আদায় করো। (সূরা সাজদা ঃ ৬-৯)

ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসে দেহকে বাদ দিয়ে কেবল রূহকেই লক্ষ্যে রাখা হয়নি, রূহকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দেহের প্রতি আরোপ করা হয়নি সব গুরুত্ব। এবং এ দুটো জিনিসকে একই সূত্রে গেঁথে দেয়া হয়েছে সুশৃঙ্খলতা ও ভারসাম্যতা সহকারে। এ পর্যায়ে রূহ্‌কে ততটাই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যতটা তার প্রাপ্য, অনুরূপভাবে দেহকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যতটা গুরুত্ব তার জন্য দারকার— বেশিও নয়, কমও নয়।

কিন্তু দুনিয়ার বিভিন্ন মতাদর্শ এমন রয়েছে যাতে মানুষের দেহসত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেহের উপর নির্মম নির্যাতন চালানোর দর্শন তৈরী হয়েছে অনেক— যেন আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়, নির্মল-পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ হয় দেহ। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ও খ্রিষ্টীয় বৈরাগ্যবাদের কৃচ্ছ-সাধনার কথা বিশ্ব-ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখ পেয়েছে।

পাশ্চাত্য বস্তুবাদ এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তাতে মানবদেহে রূহের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে, যেমন অস্বীকার করা হয়েছে বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে। কেননা বস্তুবাদী দর্শনে যা ইন্দ্রিয় গোচর নয়, পরীক্ষণে ধরা পড়ে না এমন কিছু স্বীকৃতব্য নয়। এ কারণে এ উভয় মতের দৃষ্টিতে মানুষকে অর্ধ জীবন যাপন করতে হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের কোনো সুযোগ এ দু'ধরনের সমাজের লোকদের ভাগ্যে জোটেনি। 'অর্ধ জীবন' বললে কথাটা অস্পষ্ট থেকে যায়। তাই বলতে হয়, সে অর্ধ জীবন নিতান্তই পাশবিক জীবন, মানবোপযোগী জীবন নয়।

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য কি ? ... কি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এই জীবন পরিসরে ? কেবলমাত্র ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসই এর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, মানুষ এই দুনিয়ায় উদ্দেশ্যহীন, কর্তব্যহীন, দায়িত্বহীন— অর্থহীন হয়ে সৃষ্ট হয়নি। নিরুদ্দেশের যাত্রী বানিয়ে মানুষকে ছেড়ে দেয়া হয়নি এ বিশাল জগত পরিসরে। মানুষকে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টি মূলে নিহিত রয়েছে গভীর সূক্ষ্ম যৌক্তিকতা ও কৌশল। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি তার নিজের জন্য। কেবলমাত্র নিজের কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করে জীবন কাটানোই তার একমাত্র কাজ নয়, হতে পারে না। বস্তুজগতের মৌল উপাদান সমূহের কোনো একটা বিশেষ উপাদানের দাসত্ব করাও তার কাজ নয়। জন্তু-জানোয়ার যেমন প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়েই জীবন কাটায়, মানুষ সেভাবে জীবন কাটাতে পারে না। নিরর্থক কাজে-কর্মে জীবন কাটিয়ে দিয়ে মানুষ মরে যাবে, তাকে মাটির নিচে দাফন করে তার উপর মাটি চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর দেহটিকে পোকা-মাকড়ে খেয়ে শেষ করে দেবে, মাটির সাথে একাকার করে মিলিয়ে-মিশিয়ে দেবে— এই পরিণতিও মানুষের জন্য নয়।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, সে চিনবে-জানবে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্ব লোকের স্রষ্টারূপে এবং সমগ্র জীবনব্যাপী দাসত্ব করবে কেবলমাত্র তাঁরই। সেই এখানে আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। তার সৃষ্টি উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে তার এ সংক্ষিপ্ত নির্দিষ্ট জীবন কালে বিরাট আমানত বহন করবে, সে আমানতের মর্যাদা রক্ষা করবে। সে আমনত হচ্ছে, শরীয়ত পালনের দায়িত্ব, আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্য বহু প্রকারের বাধা-প্রতিরোধ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এসব তাকে নীরবে সহ্য করে নিতে হবে, একটুও ঘাবড়ে যাবে না, ভয় পাবে না। কেননা এসব দুঃখ-কষ্টই তো তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ-পরিচ্ছন্ন করে তুলবে এবং এমন পরিপক্কতা লাভ করবে, যা তাকে প্রস্তুত করবে পরকালীন জীবনের মহা সাফল্যের জন্যে। পরকালের এই জীবন চিরন্তন ও শাশ্বত। এ জীবনের কোনো শেষ নেই।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ – (المؤمنون : ١١٥)

তোমরা কি এই ধারণা করে বসে আছ যে, আমরা তোমাকে নিতান্তই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন করে সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।

এ কথার অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য অবশ্যই অনুধাবনীয়। উদ্ধৃত আয়াতটির মূল কথা দুটি ঃ

১. মানুষকে এ দুনিয়ায় নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন, নিতান্তই খেলারছলে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মানব সৃষ্টির মূলে বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিহিত।

২. মানুষ এখানে জীবন যাপন শেষ করে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাবে, অতঃপর তার আর কোনো ব্যাপার থাকবে না, তাকে কোনো জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না, এই জীবনের কাজ-কর্মের কোনো হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না, ভালো কাজের ভালো ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল ভোগ করতে হবে না এবং এ জন্য তাকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতেও হবে না— এরূপ মনে করা একেবারেই ভিত্তিহীন, অসত্য। বরং এসব কথার বিপরীতটাই একমাত্র সত্য। এ সব কিছুই হবে এবং হবে তাঁরই সামনে, যিনি মহান আল্লাহ, বিশ্ব-সম্রাট, মহান সত্য-শাশ্বত। অতএব মানুষের পরবর্তী জীবনও শাশ্বত ও চিরন্তন।

সমঝ্‌দার লোকের উক্তি ঃ নির্বোধেরা বাঁচে খাওয়ার জন্যে

আর বুদ্ধিমানেরা খায় বাঁচার জন্যে।

কিন্তু এই কথাই চূড়ান্ত নয়। শুধু জীবন যাপন—নিছক বেঁচে থাকাটাই কোনো লক্ষ্য হতে পারে না। তাই এর পরও প্রশ্ন থাকে, মানুষ বেঁচে থাকবে কেন ?

বস্তুবাদীরা বলে, মানুষ বেঁচে থাকবে বাঁচার জন্য, বেঁচে থাকবে নিজের জন্যে। তার আবার উদ্দেশ্যে কি ?

কিন্তু ঈমানদার লোকদের বক্তব্য, মানুষ বাঁচবে তার মহান আল্লাহ্‌র জন্যে। বেঁচে থাকবে তার পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ— সে জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। কেননা পরকালের যাত্রা মহাযাত্রা। সে যাত্রার সম্বল এখনই জোগাড় না করলে তা জোগাড় করার সুযোগ কস্মিন কালেও পাওয়া যাবে না।

যে লোক নিজের জন্যে বেঁচে থাকে, আর যে লোক বেঁচে থাকে আল্লাহ্‌র জন্যে— এ দুজনের মাঝে বিরাট পার্থক্য অবধারিত। যে লোক বেঁচে থাকে এখানকার সীমাবদ্ধ জীবনটুকু যাপন করার জন্যে, আর যে লোক এখানে বেঁচে থাকে তার পরকালীন অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তির বিধানের উদ্দেশ্যে অনন্ত পথের মহাযাত্রী হয়ে। এ দুজনের মাঝে যে কতবড় পার্থক্য তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়।

নাস্তিকতাবাদী-বস্তুবাদী দৃষ্টি মানুষের জীবনের কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখতে পায়নি। কেননা যদি কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারককে। কিন্তু যেহেতু মানুষকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে একথা তারা স্বীকার করে না, এই কারণে তারা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকেও মানতে রাযি নয়। অতএব তাদের মতে এখানে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা কিংবা আয়েশ-আরামের ভাণ্ডার লুট করে আকণ্ঠ ভোগ করা ছাড়া এই মানুষের কোনো কাজ নেই। মানুষের এই সংক্ষিপ্ত নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেলে তার যথাসর্বস্বই নিঃশেষ হয়ে গেল, মনে করতে হবে। কিন্তু এ দুনিয়ার আয়েশ-আরামের দ্রব্য-সামগ্রী যে খুবই স্বল্প। কুরআন কত সত্য কথা বলেছে ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ - (النساء : ৭৭)

বলে দাও! সকলকে জানিয়ে দাও, এ দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী যে খুবই স্বল্প।

শুধু স্বল্পই নয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, নগণ্য। কেননা এখানকার যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী তা যত বিপুল সুখ-সম্ভোগেরই হোক-না কেন— তা একান্তই জৈবিক। এজন্য তার আর এক নাম জীবিকা। এ জীবিকা যেমন মানুষ নামের জীবের জন্য, তেমনি জন্তু-জানোয়ারের জীবনের জন্যও। জনৈক রসিক লেখক তাই লিখেছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ غَايَتُهُ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ قِيْمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

যার উদ্দেশ্য শুধু তার পেট ও যৌনাঙ্গ, তার মূল্য শুধু তাই যা এ দুটি পথ দিয়ে বের হয়ে আসে।

এ পর্যায়ে কুরআনের কথাই যথার্থ ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ - (محمد :১২)

যারা কুফরি নীতি গ্রহণ করেছে, তারা সুখ-ভোগ করে— খায়-দায়, যেমন খায়-দায় জন্তু-জানোয়ার। পরিণতিতে জাহান্নাম ছাড়া তাদের আর কিছু নেই।

বস্তুবাদী দৃষ্টি মানুষকে শুধু তার প্রভৃত্তির চরিতার্থতার কাজে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে অহর্নিশ। তার নফ্‌সের কামনা-বাসনা পরিপূণর ও তার লালসা-বহ্নির ইন্ধন জোগানোই তার একমাত্র কাজ। দেহের ক্ষুধা-পিপাসা নিবৃত্ত করা ছাড়া কোনো বৃহত্তর-মহত্তর বিষয়ে এক বিন্দু চিন্তা-ভাবনা করারও এক মুহূর্ত অবকাশ

থাকে না তার। আর এ হচ্ছে তার জীবনের শুধু জৈবিক-পাশবিক দিক মাত্র। এদিকটির উপরই তার লক্ষ্য ও কর্ম-ক্ষমতা নিবদ্ধ হয় বলে এ পর্যায়ে তার শ্রী-বৃদ্ধির মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ফলে তাতে যেমন মেদ জমে, তেমনি তার চাকচিক্য লোকদের চক্ষু ঝলসে দেয়। কিন্তু তা হয় বিরাট মানব সমাজের মধ্যে অতীব নগণ্য সংখ্যক লোকদের। পরিণামে সেখানে আছে'র দল ও নাই'র দলে বাঁধে বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ— অনিবার্যভাবে। যারা বৈষয়িকতায় প্রাচুর্য জমিয়েছে তারা বঞ্চিত করেছে কোটি কোটি মানুষকে তার সামান্য বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও। ফলে মানব সমাজের তলদেশে তিল তিল করে যে বিষ জমে ওঠে, তা-ই শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়— চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয়ের করাল গ্রাসে ঠেলে দেয় বিশ্ব মানবতাকে। বর্তমান বিশ্বের প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত তৃতীয় মহাযুদ্ধের যে দুন্দুভি নিনাদ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তা কি এই হীন পাশবিকতারই পরিণাম নয় ?

এ পর্যায়ের আলোচনা শেষে কুরআন মজীদের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়ার লোভ সংবরণ করা যায় না। উদ্ধৃতিটি এই ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ - وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ - سَآءَ مَثَلًا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ - (الاعراف : ١٧٥-١٧٧)

পাঠ করে শুনাও লোকদেরকে তার খবর যাকে আমরা আমাদের অনেক নিদর্শন দিয়েছি, পরে সে সব কিছুই পরিত্যাগ করে ফেলেছে। পরিণামে শয়তান তাকে নিজের অনুসারী বানিয়ে নিয়েছে। পরে সে চরম বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আমরা যদি চাইতাম তাকে তার সাহায্যে অনেক উচ্চ উন্নত করে দিতে পারতাম। কিন্তু সে মাটিতে চিরস্থায়ী আসন বানিয়ে নিল এবং নিজের মনের কামনা-বাসনার অনুসরণ করল। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুর জাতির মতো। তুমি তাকে তাড়াও তবু সে হা-হা, ঘেউ-ঘেউ করবে, আর যদি এমনি ছেড়ে দাও তবুও হা-হা ঘেউ-ঘেউ করবে। এ হচ্ছে সেই জনসমষ্টির দৃষ্টান্ত যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অগ্রাহ্য করেছে। অতএব তুমি ওদের কিস্‌সা শুনাও হয়ত তারা চিন্তা ও বিবেচনা

করবে। যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ ও নিজেদেরকে মিথ্যা মনে করে অগ্রাহ্য করে, তাদের দৃষ্টান্ত খুবই খারাপ। এরাই তো জুলুম কাজে মগ্ন ছিল।

বস্তুত হেদায়েত লাভের সুস্পষ্ট নির্দশনাদি ও ঈমানের প্রেরণা জাগানোর বহু কারণ মানুষের সত্তা ও প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে। মানুষের গোটা পরিবেশও মানুষকে সে জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এই সব কিছুই অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে মানুষ যখন বের হয়ে আসে, সে প্রকৃত পক্ষেই মনুষ্যত্বের উচ্চ-মহান মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিতান্ত জন্তু-জানোয়ারদের পর্যায়ে অধঃপতিত হয়। আর এখানেই তার সাদৃশ্য ঘটে কুকুরের সাথে। কেননা কুকুর সর্বাবস্থায় মাটিমুখী হয়ে থাকে। অথচ এই মানুষের কাছে এমন সম্পদ ছিল যার দৌলতে সে অনেক উচ্চে উন্নীত হতে পারত। এই কারণে কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষ তার প্রথম সৃষ্টি অবস্থায় অতীব উত্তম মান ও মর্যাদায় সৃষ্ট হয়। কিন্তু পরে তার মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। এই পর্যায়ের মানুষকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কুকুরের দৈহিক সব কিছুই আছে; কিন্তু কেবল 'হৃদয়' বলতে কিছু নেই। এই পর্যায়ে মানুষও 'হৃদয়' হীন হয়ে পড়ে। চরিত্রের রূপ বর্ণনা করে উপরোদ্ধৃত আয়াতে বলা হয়েছে, কুকুর গর্জাবেই, ঘেউ ঘেউ করবেই। তুমি তাকে কিছু বলো কিংবা না-ই বলো, কুকুর গর্জানো বন্ধ করবে না। এই পর্যায়ের মানুষের স্বভাবও তাই হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র অসীম অশেষ উজ্জ্বল নিদর্শনাদি অমান্যকারী মানুষের এই নির্মম পরিণতি বড় দুঃখজনক।

ঈমান ও সৌভাগ্য

সৌভাগ্য স্বপ্নস্বর্গ। প্রত্যেক মানুষই সৌভাগ্য লাভের জন্যে হন্যে হয়ে চেষ্টা চালায়। এটাই স্বাভাবিক। দার্শনিক, চিন্তাবিদ থেকে শুরু করে অতি সাধারণ নগণ্য ব্যক্তি পর্যন্ত, সম্রাট রাজাধিরাজ থেকে শুরু করে তার ঘরের নিম্নশ্রেণীর চাকর-চাকরাণী পর্যন্ত এবং কোটিপতি-লক্ষপতি থেকে শুরু করে পথের ভিখারী পর্যন্ত কোনো এক ব্যক্তিও দুর্ভাগ্য-হতভাগ্য হতে চায়, দুঃখ-কষ্ট পেতে চায় সুখ-সম্ভোগ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে, এমন কথা দুনিয়ায় কেউ বলবে না— বিশ্বাসও করবে না। এ কথা কেবল আজকের দিনেই সত্য নয়। চিরকালের মানুষের ব্যাপারেই এটা সত্য। বিশেষ কোনো দেশের জন্য নয় সর্বকালের সর্বদেশের ও সর্বজাতির জন্য সত্য।

সৌভাগ্য কোথায় ?

কিন্তু যে প্রশ্নটি সমস্ত মানুষকে বিব্রত ও দিশেহারা করে তুলেছে, তাহলে সে সৌভাগ্য কোথায় থাকে ? কোথায় তাকে পাওয়া যায়, কি করে তা পাওয়া যেতে পারে ? বহু মানুষ এই সৌভাগ্যের সন্ধানে দুনিয়ার দিকে দিকে ছুটে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে ঠিক তারই মতো, যেমন মরুভূমিতে মুক্তার সন্ধান করে ফিরে আসতে হয় রিক্ত হস্তে, ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে, ভারাক্রান্ত মন, নিরাশা আর হতাশায় পর্যদুস্ত হয়ে।

কিন্তু তার পরও মানুষ সৌভাগ্য-সন্ধান থেকে বিরত থাকেনি, ক্ষান্ত হয়নি এই সন্ধান অভিযান থেকে। যুগে যুগে বহু প্রকারের বস্তু সামগ্রী নিয়ে মানুষ সৌভাগ্য অর্জনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বহু কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় পরিশ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তা তারা পায়নি। তারপরও মানব মনে প্রশ্ন জেগেছে, সৌভাগ্য লাভের উপায় কি ?

বস্তু-সম্পদে কি সৌভাগ্য নিহিত ?

সৌভাগ্য কোথায়, তা নিয়ে মানুষ অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছে। অনেক মনে করেছে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যেই সৌভাগ্য লুকিয়ে আছে। সৌভাগ্যবান সে যার জীবন যাত্রা স্বচ্ছন্দে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে অতিবাহিত হয়। বৈষয়িক সম্পদের স্তুপ সংগ্রহ করা যার পক্ষে সম্ভব ও সহজ হয়েছে, তাকেই তারা ভাগ্যবান মনে

করেছে। কিন্তু হায়, তাও শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যদি তাতেই সৌভাগ্যের স্বর্ণ হরিণ লুকিয়ে থেকে থাকত, তাহলে যেসব দেশে জৈব-সম্পদের অফুরন্ত প্রাচুর্য, যেখানে অসংখ্যা আকাশচুম্বি প্রাসাদ সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে খাদ্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ, অত্যাধুনিক যানবাহন ও সুখ-সম্ভোগের দ্রব্য-সামগ্রীর সর্বগ্রাসী প্লাবন প্রবাহিত, সেখানকার মানুষ কখনো জীবনের অশান্তির কথা বলত না। অথচ আজ এমন সব দেশ থেকে চরম দুখ-কষ্ট ও অশান্তির হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়ে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে তা চিন্তা করে বিশ্বাস করা যায় না। সেসব দেশেও নাকি মানুষের কষ্টের ও অশান্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তারাও নাকি ভিন্নতর পথে সৌভাগ্য লাভের কথা চিন্তা করছে।

'রাওযুল ইউসুফ' নামের একটি পত্রিকায় কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ধারাবাহিক আলোচনা প্রকাশ হয়েছিল। তার শিরোনাম ছিল ঃ

'স্বর্গবাসীরা সৌভাগ্যবান নয়'

'স্বর্গবাসী' বলতে বোঝানো হয়েছে সুইডেন-এর অধিবাসীদের। তারা এক সুষম অর্থ ব্যবস্থার অধীন জীবন যাপন করে। দারিদ্র্য, বার্ধক্য, বেকারত্ব কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কোনো অবস্থায়ই তাদের একবিন্দু ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে না। কেননা সেখানে রাষ্ট্রই প্রত্যেক নাগরিকের জন্যে এসব ক্ষেত্রে বিপুল সাহায্য-সহযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ও নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা দান করেছে। ফলে দেশবাসীর কারো কোনো অভিযোগ বা অভাব বোধের মূলতই কোনো কারণ থাকতে পারে না।

সুইডেনের জাতীয় বাজেটে প্রত্যেক ব্যক্তি বার্ষিক ৫২১ টাকা (সুইজ) এবং মাসিক ৪৩ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য দূর করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায়, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় সে দেশ অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে।

সুইডেনের প্রত্যেক নাগরিক কাজ পাওয়ার অধিকারী। রোগে সাহায্য পায়, অক্ষমতা বা বেকারত্বে ভাতা পায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাবসিডি পায়। এ ছাড়া বাসস্থানের দুষ্প্রাপ্যতা ও অন্ধত্বের ভাতাও রয়েছে। এসব নগদ টাকায় দেয়া হয়। আর হাসপাতালে পারে সকলে সব রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে। প্রত্যেক নারী মাতৃত্বের সাহায্য পায়। সন্তান প্রসবজনিত যাবতীয় কাজকর্ম ও সাহায্য হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক বাড়তি সন্তানের জন্য বাড়তি সাহায্য রয়েছে। রয়েছে বাধ্যতামূলক শ্রমের বিনিময়ে সর্বাত্মক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

বেকারত্বের সময় রাষ্ট্রীয় শর্তাধীন সাহায্যও রয়েছে। এতদ্ব্যতীত শিশুদের ব্যাপারে নগদ অর্থ সাহায্য দেয়া হয় ১৬ বছরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে। এ ছাড়া বিনামূল্যে সাধারণ শিক্ষা চালু রয়েছে সমগ্র দেশে। তার সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রয়োজনীয় পোশাক দেয়া হয়। অসমর্থ সন্তানের জীবিকার দায়িত্ব নেয়া হয়। এ ছাড়া রয়েছে বিবাহ ভাতা এবং তা পাঁচ বছর পর্যন্ত চালু থাকে। এভাবে রাষ্ট্রীয় বাজেটের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হয় এসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনা বাবদ। এ থেকে শতকরা ৮০ ভাগ নগদ সাহায্যও এ খাতে ব্যয় করা হয়। সেখানকার এই বাজেটটাই সর্বাপেক্ষা বড় ব্যয়-বাজেট। তার পরেই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ ব্যয়।

বৈষয়িক সুখ-সম্ভোগ ও সমৃদ্ধি বিধানের ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা রয়েছে যে দেশে, সে দেশেও মানুষ প্রাণান্তকর কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে দিনাতিপাত করছে বলে সাংবাদিক উল্লেখ করেছেন। সেখানকার মানুষেরও নাকি অভিযোগের অন্ত নেই। ফলে এ কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তি লাভের জন্য হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে। এভাবে তারা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে মানসিক পীড়া ও অন্তরের জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করতে চাচ্ছে। উক্ত সাংবাদিক আলোচনা শেষে লিখেছেন, এ দেশের মানুষের দুর্ভাগ্যের মূলে মাত্র একটি কারণই নিহিত রয়েছে, আর তা হলো ঈমানের অভাব। তাদের সবকিছুই আছে। নেই কেবল ঈমান। ঈমান না থাকার দরুনই তাদের যাবতীয় বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাদের কাছে শুধু অর্থহীনই নয়, চরম মানসিক পীড়াদায়কও।

আমেরিকা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ। কিন্তু সে ধন-সম্পদ ঐশ্বর্যের বিপুলতা ও প্রাচুর্য কি সেখানকার মানুষকে কিছুমাত্র সৌভাগ্য দিতে পেরেছে? ... পারেনি। যদিও সেখানে ঐশ্বর্যের অভাব নেই। স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরত সেখানে উপর থেকে বর্ষিত হয়, আর পায়ের তল থেকে উপচিয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও সেখানকার মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ঃ

নিউইয়র্কের জীবন দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাগ্যে ভারাক্রান্ত।

যে-লোকই আমেরিকা স্বচক্ষে দেখেছেন, তিনিই একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ফরাসী সাহিত্যিক 'ফ্রাঙ্গোয়াজ সাজান' দু-দু'বার নিজ চক্ষে নিউইয়র্ক দেখে এক গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'নিউইয়র্কের জীবন মানুষের জন্য দুর্বহ— দুঃখময়। মিঃ কলোন ও লসন নিউইয়র্কে সবকিছুর প্রশংসা করে শেষে লিখেছেনঃ দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের উপর একটা সুন্দর আচ্ছাদন হচ্ছে নিউইয়র্ক।

বস্তুত ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য শান্তি-সুখ ও সৌভাগ্যের নিয়ামক নয়। তা লাভ করার জন্য প্রথম বা প্রধান উপায় নয় তা। বরং অনেক সময় এই ধন-ঐশ্বর্যের

প্রাচুর্য মানুষের জন্য চরম দুঃখ ও অশান্তির প্রধান কারণ হয়ে দেখা দেয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - (التوبة : ٥٥)

লোকদের ধন-মাল ও সন্তান-জনশক্তি যেন তোমাকে বিস্মিত-বিমোহিত না করে। কেননা এগুলো দিয়ে আল্লাহ্ তাদের বৈষয়িক জীবনে কঠিন শাস্তি দিতে চান।

দুনিয়ার ধন-সম্পদশালী মানুষ যে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগে তিল তিল করে ভুগছে, তা কি তাদের বৈষয়িক শাস্তি নয় ? এ শাস্তি যে নিতান্তই মানসিক এবং এ শাস্তি স্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন। এ থেকে তাদের নিস্তার নেই। আসলে সুখ ও সৌভাগ্য এবং দুঃখ-কষ্ট নিতান্তই মানসিক ব্যাপার। রাসূলে (স) এই সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্টের মূল উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَاوَهِىَ رَاغِمَةٌ - وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَاْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا قُدِّرَلَهُ ● (ترمذى، ابن ماجه)

যে-লোক পরকালের জন্য চিন্তাশীল হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরের মধ্যেই সচ্ছলতার সম্পদ বানিয়ে দেন, তার যাবতীয় প্রয়োজন সংগ্রহ করে দেন এবং তার বৈষয়িক সুখ-সুবিধাও তাকে পুরোপুরি দিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কেবল এ দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই, আল্লাহ তার দারিদ্র তার দুচোখের সামনেই রেখে দেন, তার প্রয়োজনাবলী ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। আর দুনিয়ায় সে ততটুকুই লাভ করে, যতটুকু তার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তার বেশি একটুও নয়।

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ -

(ترمذى، ملسم، احمد، ابن ماجه)

দুনিয়ার বিপুল পরিমাণ বিলাস-ব্যসন ও ভোগ-সম্ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী সংগৃহীত হলেই সত্যিকার সচ্ছলতা হয় না। বরং সত্যিকার সচ্ছলতা হচ্ছে মনের সচ্ছলতা ও সম্পদশীলতা।

কেননা মানুষের মন যদি সম্পদশালী হয়, তা হলেই লোভ ও লালসা থেকে সে বাঁচতে পারে। তখন হৃদয়-মনই হয় মহান ও বিরাট। পক্ষান্তরে যার অন্তর দরিদ্র, সে লোভ-লালসার কারণে পরম অশান্তিতে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়। এ লোভ-লালসা তাকে নীচতা ও হীনতা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত করে। ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যও তাকে একবিন্দু শান্তি দিতে পারে না। বস্তুত হৃদয়-মনে ঐশ্বর্য যার থাকে সে হয় অল্পে তুষ্ট। সে কখনো অকারণ অভাববোধের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ঠ হয় না। বরং সে সদা সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে পাওয়া পরিমাণ নিয়ে। তার বেশি পাওয়ার লোভে সে হীনতা ও নীচতার কাজে প্রবৃত্ত হয় না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত হওয়া, অন্তরের উদ্বেগ-আকুল হওয়া ও দারিদ্র্য চোখের সম্মুখে চিরস্থায়ীভাবে প্রকট হয়ে থাকা এমন এক মর্মান্তিক অবস্থা যে, দুনিয়া-প্রেমিকরা যদি নিতান্তই পাগল হয়ে না যেত, তাহলে তারা এ আযাবের কারণে আর্তচীৎকার করে ফেটে পড়ত। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, অনেক মানুষ ক্লিষ্ট করে— তা যেমন হয় অন্তরের, তেমনি দৈহিক। মনীষীদের এ কথাটি তাদের জন্য যথার্থঃ 'যে লোক দুনিয়া পাগল, সে তার হৃদয়-অন্তরে নানারূপ দুঃখ-পীড়া ভোগ করতে বাধ্য।' দুনিয়া-প্রেমিকরা তিনটি বিপদ থেকে কখনো মুক্তি পায় না— চিরসঙ্গী দুশ্চিন্তা, চিরস্থায়ী শ্রম ও ক্লেশ এবং অশেষ অনুতাপ ও হতাশা। তার কারণ, দুনিয়া প্রেমিক যত সম্পদই লাভ করুক না কেন, সে চায় তার বহু গুণ বেশি। অল্প পেয়ে কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। যেমন হাদীসের বলা হয়েছে ঃ

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى لَهُمَا ثَالِثًا -

মানব-সন্তান যদি স্বর্ণ ভরা দুটি বিশাল ক্ষেতও লাভ করে, তাহলে তার সঙ্গে তৃতীয় ক্ষেতটিও সে পেতে চাইবে।

হযরত ঈসা (আ) বলেছেন ঃ 'দুনিয়া পাগল লোক মদ্যপায়ীর মতো। মদ্যপায়ী যতই পান করে, আরও অধিক পান করার জন্য সে পাগল হয়ে ওঠে।

বাস্তব পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানে কি সৌভাগ্য নিহিত ?

বর্তমান যুগে বাস্তব পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের যুগ। এ যুগে মানুষ বাস্তব পরীক্ষা ব্যতীত কোনো কিছুই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এ জ্ঞানই দূরকে নিকট করে দিয়েছে, বহু কঠিনকে সহজ করে দিয়েছে— এ সবই সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের সৌভাগ্য কি এর মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব হয়েছে ?

—৮

জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা এত বৃদ্ধি করে দিয়েছে, যা পূর্বে কখনো কল্পনাও করা যায় নি। জ্ঞানের পিপাসা মানুষের স্বভাবগত। কিন্তু সে যখনি কোনো অজানাকে জানতে পারে, জানতে পারে তার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব, তখন সে আরো বহু নতুন বিষয় জানবার জন্য চেষ্টিত হয়। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এভাবে মানুষ যতই নিত্য-নতুন জ্ঞান-তথ্য ও গভীর তত্ত্বের সাথে পরিচিত হয়— ততই তার মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়— তীব্র থেকেও তীব্রতর হয়ে ওঠে। আসল কথা, তত্ত্বজ্ঞান কখনো সৌভাগ্যের কারণ হয় না। বরং তা অনেক ক্ষেত্রে সমধিক মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বহু জ্ঞানী-মনীষী জ্ঞান সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন; কিন্তু শেষ বয়সে পৌঁছে হতাশা ছাড়া তার হৃদয়ে আর কিছুই জমেনি। কেননা জ্ঞান হচ্ছে কুল-কিনারাহীন মহাসমুদ্র। অর্জিত জ্ঞান যখন একটা পর্যায় অতিক্রম করে, তখন তার সমানে উন্মুক্ত করে আরও বহু দিগন্ত, যার কোনো সীমা শেষ নেই। তখন তাদের মনে এই ভাব জেগে ওঠে, হায়! সারা জীবন শুধু মরীচিকার পশ্চাতে ধাওয়া করেই কাটিয়ে দিলাম, কি ফল লভিনু হায়। একালের সেরা বিজ্ঞানী বার্ট্রান্ড রাসেল পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ মানুষ প্রকৃতির সাথে বোঝাপড়া করতে গিয়ে জ্ঞানের মাধ্যমে অনেক শক্তি লাভ করেছে, কিন্তু মানুষ তার নিজের সাথে যখন বোঝাপড়া করতে শুরু করেছে তখন এ জ্ঞান তাকে কোনো শক্তি বা সাহায্য দিতে পারে নি। এক্ষেত্রে মানুষের চির সহচর হয় একমাত্র ধর্ম। অদৃশ্য-শক্তি বিশ্বাস করতে যারা প্রস্তুত নয়; জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার দোহাইতে যারা অব্যস্থ তাদের প্রসঙ্গে ডঃ হেনরী লিংক (আমেরিকান মানসিক রোগ চিকিৎসক) বলেছেন ঃ 'জ্ঞান-গবেষণা একাই মানুষকে প্রকৃত সৌভাগ্য দানে সক্ষম নয়।'

সত্য কথা হচ্ছে আজকের মানুষ অনেক কিছুই জানতে পরেছে; কিন্তু সেই জানার পাশাপাশি চলছে অজ্ঞানতার ও চরম মূর্খতার পুঞ্জীভূত তমিস্রা। কাজেই একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, দুষ্কর জীবন রহস্য উদঘাটনে শুধু অর্জিত জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, জ্ঞানের অগ্রগতি ও উৎকর্ষেই সৌভাগ্যের দ্বার আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে না। উপরন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কতগুলো বিষয়ে গভীর তত্ত্ব একত্রিত করলেই সত্যিকার জ্ঞান অর্জিত হলো বলা চলে না। সে জন্য প্রয়োজন বিছিন্ন-বিক্ষিপ্ত জ্ঞান তথ্য ও তত্ত্বকে একত্রিভূত করে তার নির্যাস— তা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সে সিদ্ধান্ত হতে হবে নিত্যকার জীবন-সত্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। তা করা হলে এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার না করে কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু তওহীদের জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করা যায় জ্ঞানের পরে ঈমানের মাধ্যমে মাত্র।

সৌভাগ্য মানুষের অন্তরে

বস্তুত ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে সৌভাগ্য নেই। অতিবড় সম্মান-মর্যাদা, শক্তি-ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভেও নেই কোনো সৌভাগ্য। এমন কি জ্ঞানের স্তূপ সংগ্রহ করার দ্বারাও সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব হয় না।

সৌভাগ্য একটা মানসিক ব্যাপার। তা চোখে দেখা যায় না। তার কোনো পরিমাণও চিন্তা করা যায় না। সৌভাগ্য টাকা-পয়সা দ্বারা খরিদ করা যায় না। সৌভাগ্য মানুষ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। এজন্য হৃদয়মনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার প্রয়োজন। হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্থৈর্য জরুরী। হৃদয়ের সব সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাওয়া দরকার। মনের শান্তি চাই। সৌভাগ্য মানুষের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হয়। বাইরের কোথাও থেকে তা অর্জন করা যায় না।

স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে বলল ঃ আমি তোকে হতভাগী বানিয়ে ছাড়ব। প্রত্যুত্তরে স্ত্রী বলল ঃ তুমি আমাকে হতভাগী করতে পার না। যেমন পার না আমাকে সৌভাগ্যবতী বানাতে। স্বামী আক্রোশে বলল ঃ কেমন করে তা পারব না? স্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ঃ সৌভাগ্য যদি কোনো বস্তু হতো কিংবা হতো অলংকার, তাহলে তুমি তা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারতে এবং তার ফলে আমি হতে পারতাম হতভাগী। কিন্তু তা এমন এক জিনিস, যা না তোমার করায়ত্ত, না অন্য কারোর।

স্বামী ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ঃ কি তা?

স্ত্রী অটল বিশ্বাসের সঙ্গে বলল ঃ আমি আমার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমার ঈমানে। আমার ঈমান আমার হৃদয়-মনে। আর আমার হৃদয়-মনের উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব কেবল আমার আল্লাহ্র।

এ কোনো নভেল-নাটকের 'ডায়লগ্' নয়। সত্য লাভের একটা উপায় মাত্র। এবং কথোপকথনের মাধ্যমে যে প্রকৃত সত্য দিবালোকের মতোই উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয় উঠেছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বস্তুত এই হচ্ছে প্রকৃত সৌভাগ্য। এ সৌভাগ্যের মালিক ও কর্তা কোনো মানুষ নয়, কেউ কাউকে তা দিতে পারে না। কেউ কারো সৌভাগ্য কেড়েও নিতে পারে না। সৌভাগ্যের অধিকারী এক ঈমানদার ব্যক্তি বলেছিলেন ঃ আমরা মহাসৌভাগ্য-সম্পদের মধ্যে জীবন যাপন করছি। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যদি তা জানতে পারত, তাহলে তা কেড়ে নেয়ার জন্য আমাদের সাথে তারা তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করতে আসত।

অন্তর্নিহিত সৌভাগ্য ধনে ধনী জনৈক ব্যক্তি বলেছে ঃ বেহেশতবাসীরা যদি এমনই সৌভাগ্যের অধিকারী হয় যেমন এখন আমি রয়েছি, তাহলে তো তারা

অশেষ সুখের জীবন লাভ করবে। কেননা যারাই এ সম্পদ লাভ করে, তারা দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তন, উত্থান-পতন ও দুঃখ-দুর্দশাকে থোড়াই কেয়ার করে, তা যত বড় ভয়াবহই হোক-না কেন। তারা তো মহা বিপদেও হাসতে পারে। কোনো দুঃখেই তারা কাতর হয়ে পড়েন না। কেননা যে সব বিপদে মানুষ আর্ত চিৎকার করে ওঠে, এরা সে ধরনের বিপদে পড়েও আল্লাহ্র শোকর আদায় করতে পারে। আসলে এদের মনের গভীর প্রশান্তিই তাদের সৌভাগ্যের উৎস। এ জন্য তাদের সৌভাগ্য চিরন্তন। তা কখনো শেষ হয় না, ফুরিয়ে যায় না।

সৌভাগ্যলাভের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু-পরিমাণ

পূর্ববর্তী আলোচনায় কারোর মতে এই ধারণা আসা উচিত নয় যে, সৌভাগ্য লাভের জন্য বৈষয়িক বস্তু প্রয়োজনের কথা বুঝি একেবারেই অস্বীকার করা হচ্ছে। না, এই লেখকের সেরূপ প্রকৃতি নেই। কেননা তাহলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হবে। এই বাস্তবও আল্লাহ সৃষ্টি, যে আল্লাহ এই বস্তু জগতের বাস্তবতার মাঝে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মজীদের বহু কয়টি আয়াতেও মানুষের সৌভাগ্য পর্যায়ে বহু বস্তু জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। হাদীসেও তার ব্যতিক্রম করা হয়নি। রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ - وَالْمَسْكَنُ الطَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ-

(مسنداحمد)

সচ্চরিত্রবান স্ত্রী, সুন্দর মনোরম বাসস্থান (ঘর-বাড়ি) এবং উপযুক্ত যানবাহন মানুষের সৌভাগ্যের জিনিসের মধ্যে গণ্য।

তবে পার্থক্য এতটুকু যে, এসব বৈষয়িক জিনিসপত্রের গুরুত্ব ইসলামী আকীদার দৃষ্টিতে সর্বাধিক নয়। এসব জিনিসই সর্বপ্রথম পেতে হবে এবং পেলে মনে করা যাবে যে, সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে— এমন নয়। দ্বিতীয়, এক্ষেত্রে পরিমাণের চাইতে গুণগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব অগ্রাধিকার সম্পন্ন। যেসব বৈষয়িক বস্তু মানুষের হৃদয়কে সংকীর্ণ করে দেয়— উদার উন্মুক্ত করে না, যেসব খারাপ জিনিস মানুষের জীবনকে তিক্ত-বিষাক্ত, দুঃখময় ও বিড়ম্বনাপূর্ণ করে দেয়, তা থেকে মানুষের সতর্ক থাকা আবশ্যক, আবশ্যক তার সংস্পর্শ বর্জন করে চলা। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে উল্লেখিত জিনিসসমূহের বিপরীত যা— যেমন খারাপ চরিত্রের ও নিকৃষ্ট আচার-আচরণের স্ত্রী, অমনোরম ঘর-বাড়ি ও বিপজ্জনক যানবাহন— তা সব সময়ই বর্জনীয় তাহলে ব্যক্তি অনেকখানি সুখ-শান্তি ও জীবনের নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। সেই মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় যথাসম্ভব সহজে ও

কঠিন দুঃখ-ভোগ ব্যতিরেকেই অর্জিত হওয়া জরুরী। রাসূলে করীমের বাণীতেও এই কথাটি উচ্চারিত ও ধ্বনিত হয়েছে ঃ

مَنْ اَصْبَحَ اٰمِنًا فِىْ سَرْبِهٖ مُعَافًى فِىْ بَدَنِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيْرِهَا - (بخارى، ترمذى)

যে লোক নিজে তার পরিবারবর্গসহ তার নিজের ঘরে পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে থাকতে পারছে, স্বাস্থ্য ভালো ও নিরোগ রয়েছে, সেই দিনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য-পানীয় তার কাছে মজুদ রয়েছে, মনে করতে হবে, তার জন্য সারাটি দুনিয়া সবকিছুসহ একত্রিত করা হয়েছে।

আর প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্য হচ্ছে এমন একটি বৃক্ষ, যা মানব-মনের জমিনের উপর উদ্ভূত হয়। মানুষের মনের রস গ্রহণেই তা চিরসবুজ চিরশ্যামল ও চিরসতেজ হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ্‌র প্রতি, পরকালের প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমানই হচ্ছে তার রস, তার খাদ্য, তার আলো ও বাতাস। মানব মনে নিহিত এই ঈমানই হচ্ছে সৌভাগ্য বৃক্ষের উৎসমূল। এ ছাড়া অন্য কোথায়ও অন্য কোনো উপায়েও এই বৃক্ষ সৃষ্টি করা যেতে পারে না। আর এই হচ্ছে প্রকৃত শান্তির প্রস্রবণ। মানব জীবনের স্বস্তি ও নিরাপত্তা, অন্তরের নির্মল সন্তোষ, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসারও মূল কথা এই। অতঃপর আমরা তারই বিশ্লেষণ করছি।

মনের প্রশান্তি

শান্তি ছাড়া সৌভাগ্য হয় না

আমেরিকার জনৈক যুবক চিকিৎসাবিদ সুখময় জীবনের অপরিহার্য উপাদানের একটা তালিকা রচনা করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

জীবনে সুখ পেতে হলে একান্ত জরুরী জিনিস হচ্ছে ঃ স্বাস্থ্য, প্রেম-প্রীতি, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, শক্তি-সামর্থ্য, সম্পদ-ঐশ্বর্য, সুনাম-সুখ্যাতি।

অতঃপর তিনি এই তালিকা পেশ করলেন একজন উচুদরের সমাজবিজ্ঞানীর সমুখে। তিনি তালিকাটি দেখে বললেন ঃ খুব সুন্দর তালিকা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর প্রত্যেকটি যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি এ পর্যায়ে একটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে ভুলে গেছ। যার ফলে তোমার তালিকাটি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে গেছে।

এই বলে তিনি সম্পূর্ণ তালিকাটি কলম দিয়ে কেটে ফেললেন এবং তার উপর মাত্র দুটি শব্দের একটি বাক্য লিখে দিলেন ঃ 'মনের প্রশান্তি'। সেই সঙ্গে তিনি বললেন ঃ জীবনের সুখের জন্য তোমার তালিকার সব কয়টি জিনিসই জরুরী বটে, তবে তার মূলে ও সর্বোপরি প্রয়োজন হচ্ছে মনের প্রশান্তি। ওগুলি আয়ত্ত হলেই যে মন শান্তিময় হবে, সুস্থির, অচঞ্চল ও নিরুদ্বিগ্ন হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু মনের প্রশান্তি হলে এসব আপনিই হবে, আর এসব জিনিস না হলেও জীবনের সুখময় হতে কোনো অসুবিধা থাকবে না। মনের এই প্রশান্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দান। আল্লাহ্ই তা তাঁর প্রিয়পাত্রদের মনের গভীর গহনে সঞ্চারিত করে দেন এবং এদের অনেককে তিনি দেন মেধা-প্রতিভা ও স্বাস্থ্য, বিপুল ধন-মাল। আর সুনাম-সুখ্যাতি এমন জিনিস নয়, যা সুখময় জীবনের জন্য অপরিহার্য মনে করা যেতে পারে। কিন্তু হৃদয়-মনের প্রশান্তি সব অভাবেরই ক্ষতিপূরণকারী।

তিনি তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে আরও বলেছেন ঃ এ কেবল আমার একার মতই নয়। বিশ্বের সকল প্রখ্যাত সুধী-বিজ্ঞানীদেরও এই মত। তাঁরা সবাই কাতর কণ্ঠে এই আবেদন জানিয়েছেন ঃ

হে আল্লাহ! দুনিয়ার সব সুখ-সামগ্রী নির্বোধদের পায়ের তলে করে দাও। আর আমার জন্য দাও শুধু উদ্বেগ-অস্থিরতা মুক্ত অন্তর। কথাটি খুব সহজে

গ্রহণযোগ্য হয়ত নয়। কিন্তু ধীর-স্থিরভাবে সুস্থ মন-মগজ নিয়ে উদার-অনাবিল দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে এতে কোনোই সন্দেহ থাকবে না যে, হৃদয়-মনের প্রশান্তিই হচ্ছে সুখময় জীবনের চরম লক্ষ্য। দুনিয়ার অন্যান্য যাবতীয় জিনিস মানুষকে শান্তি ও সুখ দিতে পারবে, এমন কথা নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত নয়। বরং ধন-সম্পদ ছাড়াও যে মানব মনে গভীর প্রশান্তির নির্ঝর ফুটতে পারে, তার প্রমাণ যত্র-তত্র পাওয়া যায়। অনেক স্বাস্থ্যহীন মানুষকেও মানসিক প্রশান্তিতে সুখী হতে দেখা গেছে। মনের প্রশান্তির দৌলতে পর্ণকুটিরবাসী সুরম্য প্রাসাদবাসীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারে। আর তার অভাবে অনেক প্রাসাদবাসীও নিজেকে মনে করতে পারে নিতান্তই কারা-পিঞ্জরের বন্দী। এই কথাটি এমন একটি ব্যক্তির, যে আমেরিকার মতো বিশ্বের অন্যতম ধন-ঐশ্বর্য-বৈভবশালী দেশের নাগরিক। যে দেশে পথে পথে সোনা ঝরে। ব্যক্তি স্বাধীনতা সেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তির মুঠোর মধ্যে। তার একথা একটা মৌখিক উক্তিমাত্র নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, বহু চিন্তা-বিবেচনা-গবেষণা-পর্যালোচনার নির্যাস। এই লোক হৃদয়-মনের গভীর প্রশান্তির চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য ও কাম্য জিনিস অন্য কিছুই দেখতে পায় নি। একথা আমাদের জন্যও বিশেষ মূল্যবান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা যারই হোক, যেখানে থেকেই পাওয়া যাক— তা অবশ্যই গ্রহণীয়।

ঈমান ছাড়া মনের প্রশান্তি অসম্ভব

হৃদয়-মনের গভীর প্রশান্তিই সৌভাগ্যের উৎসমূল। এ কথায় কোনোই সংশয় নেই। কিন্তু মনের প্রশান্তি কিভাবে অর্জিত হতে পারে? মানুষের প্রতিভা-মেধা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যায়ের বিদ্যার সমারোহ, নিরোগ স্বাস্থ্য, সবল দেহ, শক্তি-সামর্থ্য, ধন-ঐশ্বর্য, খ্যাতি ও মান-সম্ভ্রম কিংবা অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ দ্রব্যাদির দ্বারাই কি মনের প্রশান্তি লাভ সম্ভব?

আমরা নিশ্চিন্ত ভাবনা মুক্ত ও দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে বলতে পারি, মনের প্রশান্তির একটি মাত্র উৎস। আর সে উৎস থেকেই এ ধন লাভ করা যেতে পারে, তাছাড়া অন্য কোথা থেকেও তা পাওয়া যেতে পারে না। সে উৎস হলো ঈমান। ঈমান এক আল্লাহ প্রতি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি, পরকালের প্রতি। ঈমান— গভীর নির্ভুল সত্য ঈমান। নির্ভেজাল, মুনাফিকী ও সংশয়শূণ্য ঈমান। ঈমানই হচ্ছে সেই মহামূল্য ধন, যার দ্বারা মানুষ মনের গভীর প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম। মানুষ পারে পরম সৌভাগ্য অর্জন করতে কেবল এই ঈমান দিয়েই।

বাস্তবতার দৃষ্টিতে বিচার করলেও একথার সত্যতা অনস্বীকার্য। ইতিহাস থেকেও তাই প্রমাণিত। প্রত্যেক মানুষই নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেও এ কথার যথার্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

আমাদের জীবনই আমাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছে যে, দুনিয়ায় যে-সব লোক মনের অশান্তি-অস্থিরতা ও উদ্বেগে ভুগছে, যাদের মনে দুঃখের অনন্ত সাগর সদাপ্রবাহিত এবং যারাই হতাশা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদের অধিকাংশই হচ্ছে তারা, যারা ঈমানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত, যাদের প্রত্যয় বলতে কিছু নেই। সংশয় ও সন্দেহ যাদের মন-মগজে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে।

এরা জীবনে বেঁচে থেকে কোনো আনন্দ পায় না। পায় না জীবনের কোনো স্বাদ। তাই বলে স্বাদ-আস্বাদন ও আনন্দ-স্ফূর্তির বৈষয়িক উপাদানের কোনো অভাব ঘটেছে তাদের জীবনে, তা কিন্তু নয়। আসলে তারা জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না, তাদের জন্য নেই এ জীবনের কোনো তাৎপর্য। তাদের জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, নেই কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্য। কি যে তাদের এই জীবনে দায়িত্ব, তাও তাদের অজানা। এরূপ অবস্থায় তাদের হৃদয় মনের বন্ধ দুয়ার খুলবে কি করে ? কি করে তারা লাভ করবে মানসিক প্রশান্তি ? মনের প্রশান্তি ও সুখ তো ঈমান স্তম্ভের আলোকচ্ছটা, পবিত্র তওহীদ বিশ্বাসের পরিণতি। তওহীদ বৃক্ষই তো প্রতি মুহূর্ত মানব-মনের আঙ্গিনায় মহাশক্তি ও সুখের ফল ঝরায়।

মনের প্রশান্তি স্থৈর্য এমন এক বায়ু প্রবাহ, যা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় ঈমানদার লোকদের মন-লোকে প্রবাহিত করেন। প্রবাহিত করেন, যেন মানুষ যখন অস্থির-উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে তখন যেন তা স্থিরতা লাভ করতে পারে। যখন ক্রুদ্ধ হবে, তখন যেন বহে সুখ ও শান্তির অমিয় স্রোত। সন্দেহ-সংশয় যখন মানব মনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেবে, তখন যেন সেখানে ইল্‌ম ও ইয়াকীনের আলোকমালা জ্বালাতে পারে, বিপদ ঝঞ্ঝায় যখন মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠবে, তখন যেন সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। ধৈর্য ও ধৈর্যের বাঁধন যখন ভেঙ্গে যাবে, তখন যেন তাকে সামাল দিতে পারে।

এ তো মনের সেই প্রশান্তি, যা রাসূলে করীমের হৃদয়কে সুদৃঢ় করে দিয়েছিল হিজরতের রাত্রে। প্রাণের কঠিন শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও কোনো আশঙ্কা— কোনো বিপদ-ভয় তাঁকে একবিন্দু কাতর করতে পারে নি। তিনি নিজেদের সম্পর্কেও একবিন্দু সন্দিহান হন নি এই ঈমানলব্ধ মানসিক প্রশান্তির দৌলতে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ

فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاثَانِىَ اثْنَيْنِ - اِذْهُمَا فِى الْغَارِ - اِذْ يَقُوْلُ

لِصَاحِبِهٖ - لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - (توبة : ٤٠)

আল্লাহ্ই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তখন, যখন কাফেররা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল— দুইজনের দ্বিতীয় জন— দুজনই যখন গুহার মধ্যে ছিল

তখন সে তার সঙ্গিকে বলছিল ঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

তাঁর সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কিন্তু খুব বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত ও উদ্বগ্ন হয়ে পড়েছিলেন নিজের জন্য নয়, নিজের জীবনের জন্যও নয়, বরং কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর জন্য। রিসালাতের চূড়ান্ত পরিণতির জন্য। শত্রু বাহিনী যখন গুহার মুখে দাঁড়িয়ে, তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ

ইয়া রাসূল! ওদের একজনও যদি পায়ের দিকে তাকায় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পাবে।

তখন রাসূলে করীম (স) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ঃ

يَا اَبَابَكْرٍ مَاظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

হে আবু বকর! যে দুজনের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ, তাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

এই যে মানসিক প্রশান্তি, এটা সম্পূর্ণত আল্লাহ্‌র দান। এ এমন একটা আলো, অন্ধকারে হাতড়ে মরা দিশেহারা ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ এ আলোতেই শান্তি এবং স্বস্তি লাভ করতে পারে। উদ্বেগ-আকুলতা দূর হয়ে পরম প্রশান্তিতে হৃদয়লোক ভরে যেতে পারে। দুঃখী তার দুঃখের কথা ভুলে যেতে পারে। শ্রান্ত-ক্লান্ত-ভারাক্রান্ত ব্যক্তি এর দ্বারা পেতে পারে অভূতপূর্ব মনোবল। দুর্বল পেতে পারে শক্তি। দিশেহারা পেতে পারে নির্ভুল পথের সন্ধান।

এই প্রশান্তিই জান্নাতের কুঞ্চিকা। আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতের দ্বার খুলে দেবেন এরই সাহায্যে।

মুমিনের দৃষ্টিতে শান্তির উপদান

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, সমস্ত মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র মুমিনরা মানসিক শান্তির ধনে সম্পদশালী হতে পারল? মানুষ কেন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, সাংস্কৃতিক তৎপরতায়, দর্শনে মাথা ঘামানোয় শান্তি পেতে পারে না? বর্তমান সভ্যতার এত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, সুখ ও শান্তির দ্রব্য-সম্ভারের স্তুপ রচিত হয়েছে, তবু মানুষ কেন তাতে শান্তি পেতে পারছে না?

প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এর জবাবে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। কোন সব কার্যকারণ অন্যদের তুলনায় মুমিনদের মানসিক শান্তি লাভের বেশি অধিকার বানাল, তা দেখানোর জন্য এ আলোচনা অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্ব প্রকৃতির আহ্বানে মুমিনদের সাড়া

আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই বিশ্ব-প্রকৃতি। মুমিনরা সেই বিশ্বপ্রকৃতির আহবানে সাড়া দিয়েছে। ফলে প্রকৃতির বুকে মানুষের বসবাস ও জীবন-যাপন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হতে পারছে। বিশ্বপ্রকৃতির সাথে তাদের নেই কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষ— নেই কোনোরূপ প্রতিকূলতা। বরং আছে পুরোপুরি সামঞ্জস্য, সখ্যতা, আনুকূল্য ও সহযোগিতা। এ জন্য শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

মানব প্রকৃতিতে যে শূন্যতা রয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা তা পূরণ করতে পারে না। তা পূরণ করতে পারে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান। মানব প্রকৃতির অভাব বোধ, ক্ষুৎপিপাসা অনন্ত। তার পরিতৃপ্তি একান্তভাবে নির্ভরশীল আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের উপর। এখানেই মানুষ মানসিক ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও আশংকা বোধ থেকে পেতে পারে নিষ্কৃতি। দিশেহারা মানুষ পেতে পারে নির্ভুল হেদায়েত, মনের স্থিতি ও স্থৈর্য। অস্থিরতার পরে নিশ্চিন্ততা। লক্ষ্যহীন মানুষের সামনে তা উদ্ভাসিত করে দেয় একটা জীবন-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গতিহীন নিষ্ক্রিয় মানুষ লাভ করতে পারে কর্মের গতি, কর্মের প্রেরণা, কর্মের দায়িত্ব। কিন্তু যে লোক আল্লাহ্‌র সন্ধান পায় না, আল্লাহ্‌র সাথে যার নিজস্ব নিবিড় কোনো সম্পর্ক নেই, সে যেন লক্ষ্যহীন মুসাফির। তার মতো হতভাগ্য আর কে হতে পারে! তার জীবনে দুঃখের কোনো অবধি থাকে না। তার জীবনের সব শ্রম— সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

এ ধরনের ব্যক্তি কখনো সৌভাগ্য লাভে ধন্য হতে পারে না। ফলে সে পায় না মনের সুগভীর প্রশান্তি একবিন্দুও। সে নিজের সত্তা সম্পর্কে থেকে যায় সম্পূর্ণ অনবহিত। সে নিজেকেই হারিয়ে ফেলে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। কুরআনের ভাষায় এ লোক হয় তাদের মতো ঃ

كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ - (الحشر : ١٩)

যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্‌ও তাদের নিজেদের সত্তাকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য পরিণতি আত্মবিস্মৃতি— নিজকে ভুলে যাওয়া। মানুষ কারো বান্দা হয়ে দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে, এ কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন এ দুনিয়ায় মানুষের সত্যিকার মর্যাদা কি, দায়িত্ব-কর্তব্য কি, জীবন লক্ষ্য কি, অনিবার্যভাবে তাও সে বেমালুম ভুলে বসে। মানুষ যাতে এই

মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন না হয়, তারই জন্য উক্ত আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌র নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ وَلَا تَكُونُوا —'এদের মতো হবে না' বলে।

যে লোক নিজ সম্পর্কে কিছুই জানে না, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, নিজেকেই ভুলে বসেছে, সে লোকের কল্পনা কতটা বিড়ম্বনাময়। হোক গিয়ে সে অতিবড় বিদ্বান, হোক বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী। কিংবা প্রভুত ঐশ্বর্য-বৈভবের একচ্ছত্র মালিক। এর কি ফলটা সে তার নিজের জীবনে লাভ করতে পারবে ? যে লোক নিজেকে চিনে না, জানে না, সে নিজেকে কি করে পেতে পারে! অহংকার ও অহমিকতা যার বিবেক-চক্ষুর উপর ছানি ফেলেছে, সে নিজেকে চিনবেই বা কি করে! অন্ধ, নির্বিচার, লালসা-পংকিলতার সুগভীর পংকে নিমজ্জিত ব্যক্তি কোনো দিনই নিজেকে ফিরে পেতে পারে না।

মানুষ বস্তুতই এক আশ্চর্য ধরনের সৃষ্টি। একমুষ্টি মৃত্তিকা ও আল্লাহ্‌র রূহের এক বিন্দু ফুৎকারের সমন্বয়ে এই মানব সত্তা। যে লোক মাটির দিকেই সমস্ত লক্ষ্য নিবন্ধ করেছে ও রূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে কিংবা তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে— তার ভিতরে যে 'রূহ' রয়েছে একথা বেমালুম ভুলে বসেছে, সে লোক মানুষকেই চিনতে পারে নি, শুধু তাই নয়, মানুষ সম্পর্কে একটা মৌলিক ভুল ধারণা তার মনে-মগজে বাসা বেঁধেছে। মানুষকে সে জীবমাত্র মনে করতে পেরেছে, আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি— সৃষ্টিকুলের সেরা সৃষ্টি মনে করতে পারেনি। আর এটাই হচ্ছে মস্ত বড় ভুল।

যে লোক মানুষকে নিছক মৃত্তিকা-সৃষ্ট মনে করেছে, সে তার দেহকে বাঁচিয়েছে তার উপযোগী খোর-পোশ দিয়ে, যা মাটি থেকে উৎপন্ন। সে নিজের 'রূহ'কে কোনো খোরাক দেয়নি— দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি বলে। অথচ ঈমান ও আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ ছাড়া এই রূহের আর কিছু খোরাক হতে পারে না। ফলে সে লোক তার মানবীয় প্রকৃতিকেই অভুক্ত রেখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। রূহের যা খোরাক তা তাকে সে দেয়নি, সে রূহের কদর বুঝেনি।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ

মানুষের হৃদয়ে একটা ক্ষুধা রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ভাবে নিবৃত্ত করা যেতে পারে না।

মানব প্রকৃতিতে এক ধরনের বর্বরতা রুঢ়তা রয়েছে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছাড়া তা দূর করা যায় না।

মানব মনে একটা দুঃখ ও দুশ্চিন্তা লুকিয়ে আছে, যা আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভজনিত আনন্দ-স্ফূর্তি ছাড়া এবং আল্লাহ্‌র যথার্থ আনুগত্যজনিত তৃপ্তি অর্জন ছাড়া দূরীভূত করা সম্ভবপর নয়।

মানব মনে একটা কুণ্ঠা, একটা উদ্বেগ-অস্থিরতা রয়েছে, আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড়ভাবে একাত্ম হওয়া ও সবকিছুর বন্ধন ছেড়ে আল্লাহ্‌র দিকে পালিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তা প্রশমিত হয় না।

মানব প্রকৃতিতে একটা দুঃখ ও অনুতাপ রয়েছে। আল্লাহ্‌র নিষেধ-নির্দেশ পালনে সন্তোষ লাভ, আল্লাহ্‌র ফয়সালা মেনে নেয়া, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসা বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণই হলো এ দুঃখ ও অনুতাপের আগুন নেভানোর একমাত্র উপায়।

মানব প্রকৃতির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্‌র প্রেম-ভালোবাসা। আল্লাহ্‌র দিকে আত্মৎসর্গের ভাব, আল্লাহ্‌র চিরন্তনী স্মরণ, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছাড়া এই প্রেম-ভালোবাসা পাওয়ার আর কোনো পথ নেই। সমগ্র দুনিয়ার ধন-ঐশ্বর্য লাভ করলেও সে ক্ষুধা মিটবে না।

এ সব কথা শুধু একজন বিজ্ঞ লোকের, তা-ই নয়। এ কথাগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের নির্যাস। কেননা মানব প্রকৃতি ও স্বভাব বস্তুতই তাই। আল্লাহ্‌র হেদায়েত গ্রহণ ছাড়া, আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক ঈমান ব্যতীত মানব প্রকৃতি সত্যিই কোনো শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। এ এমন প্রকৃতি, যাকে আরবের মুশরিকরাও জাহিলিয়তের গভীর পংকে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার করতে পারেনি। সেই সময়ই কুরআন মজীদে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ –

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করো যে, এই আকাশমন্ডল ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে ? সূর্য ও চন্দ্রকে কে নিয়ন্ত্রিত করেছে ? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ।

এ-ই হচ্ছে মানুষের আসল প্রকৃতি, মানব প্রকৃতির আসল পরিচয় এই-ই এবং এই স্বীকৃতিই মানব প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা। কিন্তু এই প্রকৃতিও অনেক সময় সন্দেহ সংশয়ের আবর্তে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অমূলক ধারণা অনুমানের অন্ধ অনুসরণ করে করে মানুষের এই প্রকৃতি তার আসল প্রবণতা হারিয়ে ফেলে। বিপদগামী পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করে করে, বিভ্রান্ত নেতাদের

আনুগত্য করে করে অন্ধ-অনুসরণ প্রবণ হয়ে পড়ে। অহংকার ও অহমিকতা বোধও মানুষের মন-মগজকে এমনভাবে আচ্ছান্ন করে ফেলে যে, সে নিজেকে বিরাট কিছু মনে করতে শুরু করে দেয়। তখন সে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সাংঘাতিকভাবে উন্নাসিক হয়ে পড়ে।

মানুষের এই স্বভাবজাত প্রকৃতি অনেক সময় মরে যায়, নিস্পন্দ হয়ে পড়ে। বোধ-অনুভূতি-চেতনা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু জীবনের বাস্তব কোনো সংঘাত ক্রমে যখন তার উপর কঠিন আঘাত হানে, যার প্রতিরোধের কোনো সাধ্যই থাকে না তার বা তারই মতো অন্য মানুষের, তখন বিভ্রান্তির পুঞ্জীভূত আবরণ সহসা উন্মোচিত হয়। ঘুমন্ত ও অচেতন প্রকৃতি তার তীব্র অনুভূতি লয়ে আবার জেগে ওঠে। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কণ্ঠে আকুল আকুতি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কুরআন মজীদে এই কথাটি বলা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ - (بني سراءيل: ٦٧)

কুল-কিনারাহীন সমুদ্রে কঠিন বিপদ যখন তোমাদের উপর ঘনীভূত হয়ে এসে আঘাত হানে, তখন একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মাবুদ-উপাস্য-আরাধ্যরা নিঃশেষে হারিয়ে যায়। তখন কারোই নামচিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিশ্বজাতি ও সভ্যতার ইতিহাস রচয়িতাগণ একথা অকপটে স্বীকার করেছেনঃ ইতিহাসে এমন শহর-নগরের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে হয়ত সুরম্য প্রাসাদ, বিরাট-বিশাল কারখানা বা দুর্বোদ্য দুর্গের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মানব ইতিহাসে ও সভ্যতায় এমন কোনো জনপদ পাওয়া যায় না, যেখানে একটিও উপাসনালয় নেই।

মানব জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও আল্লাহ্‌র উপাসনা-আনুগত্য স্বীকারের অপরিহার্যতা অস্বীকার করার মতো কোনো বিপর্যয় দেখা যায় নি। বিপর্যয় দেখা দিয়েছে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে শরীক করার ও আল্লাহ্‌র আরাধনার বিভিন্ন রূপ গ্রহণের কারণে। এই কারণে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী রাসূলগণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তাওহীদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। এক আল্লাহ্‌র সাথে আরও অনেক আল্লাহ্‌র উপাসনা-আরাধনা-আনুগত্য থেকে মানুষকে ফিরিয়ে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র উপাসনা ও আনুগত্যের দিকে টেনে আনা। তাই প্রত্যেক নবী ও রাসূল মানুষের সামনে সর্বপ্রথম যে বক্তব্য রেখেছেন তা হচ্ছে ঃ

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ - (النحل : ٣٦)

দাসত্ব-বন্দেগী কবুল করো এক আল্লাহ্‌র। আর যে-সব আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তি রয়েছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করো।

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ - (اعراف : ٦٥)

বন্দেগী-দাসত্ব ও আনুগত্য করো এক আল্লাহ্‌র। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।

এ কারণেই কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকারের দাওয়াতকেই প্রথম গুরুত্ব দিয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের বক্তব্য হলো, এবাদত ও আনুগত্য করবে এক আল্লাহ্‌র। সর্বাবস্থায় সাহায্য পেতে চাইবে কেবল তাঁরই কাছে থেকে। সব ব্যাপারে নির্ভরতা রাখবে কেবল এক আল্লাহ্‌র উপর। সমস্ত অন্তর-মন দিয়ে উৎসর্গীত হবে এক আল্লাহ্ কাছে। কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়। কেননা তা অস্বীকার করা তো কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় কারণ তাহলে নিজের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করতে হয়। কাজেই আল্লাহ্ আছেন এতটুকু স্বীকৃতিতেই কেউ নিজেকে ঈমানদার বলে দাবি করতে পারে না। এ ধরনের স্বীকৃতি বহু নাস্তিকের কণ্ঠেও অনেক সময় ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

দ্বীন ও ধর্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, সন্দেহের প্রচার করে এ বিষয়ে খ্যাতিবান বহু নাস্তিকের এমন রচনা পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছে, যাতে তারা তাদের পাঠকদের বলেছে যে, ঈমান বিরোধী ও নাস্তিকতায় পোষক-সমর্থক কোনো কথা যেন তারা বিশ্বাস না করে। লিখেছে, আমি চাইলেও আমার মন ও বিবেক চায় যে, আমি সন্দেহ পোষণ করি, তাহলে আমিও তা পারব না। আমি যদি কথা দ্বারা আমার ঈমানকে অস্বীকার করি, তাহলে আমার সে কথা সত্য হবে না। কেননা আমার অন্তর্নিহিত চেতনা আমার কথার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। কেউ যদিও বলেও যে, সে তার নিজেকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে না নিজের জীবনকে, তাহলে তুমি কি তা বিশ্বাস করবে? কিংবা তার একথা কি সত্য হতে পারে? শুধুমাত্র কথা দ্বারাই তো তুমি আমার মনকে— অনুভূতিকে অস্বীকার করতে পার না। শব্দ আর ভাষা কখনো বিরাট মহান সত্যকে মিথ্যা বানাতে পারে না। অনুরূপভাবে নবী-রাসূল ও দ্বীন-ধর্ম বিরাট মহান সত্য বিশেষ। আমরা তাকে দুর্বল করতে পারব না, বাক্যের ধূম্রজাল দ্বারা তাতে সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে না।

আমার ঈমানের ব্যাপারে একথা চূড়ান্তঃ আমি আছি, অতএব আমি ঈমানদার। আমি ভাবি— চিন্তা করি, অতএব আমি মুমিন। আমি মানুষ অতএব আমি ঈমানদার ছাড়া আর কিছু হতে পারি না।

এ পর্যন্ত লেখার পর সেই লেখক বন্ধু পৃষ্ঠাব্যাপী যা কিছু লিখেছেন, তা কুফরি, সংশয়পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট গুমরাহীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার উপরোদ্ধৃত কথাগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে ঈমান হচ্ছে প্রকৃতি নিহিত ব্যাপার, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির গভীর মর্মমূলেই এই ঈমান নিহিত। এ পর্যায়ে আমাদের বক্তব্যও তাই।

এখানে আমাদের আরও বক্তব্য হলো, ঈমান ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। কোনো ইলাহ্‌কে মহান-পবিত্র মনে না করে, তাকে ভয় না করে, তার দয়া-অনুকম্পার আশা হৃদয়ে পোষণ না করে, তার উপাসনা-আরাধনা না করে, তার উপর নির্ভরতা গ্রহণ না করে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু এটা হতে পারে যে, তার ইলাহ্ কে— কাকে সে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, তার নাম সে হয়ত বলতে পারে না এবং তার প্রতি তার যে আনুগত্য ও আন্তরিকতা, তাকে হয়ত সে এবাদতও বলবে না। কিন্তু তাতে মূলের দিক দিয়ে তারতম্য হচ্ছেনা কিছুই।

সে-সব অসহায় মিসকীনদের জন্য আমার বড্ড দুঃখ হয়, যাদের প্রকৃতি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং তার উপর শক্ত আবরণ বসে গেছে। ফলে তাদের অন্তরে ঈমানের আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত হতে পারছে না। এসব হতভাগ্যরা কিছুই না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলতে আসে, কিছুই না বুঝে রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

আমি তাদের জন্য দুঃখ করছি দুটি কারণে। একটি কারণ এই যে, তারা জীবনে প্রবেশ করেছে, পরে তারা তা থেকে বের হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে যে উত্তম ও মহৎ মূল্যবান সম্পদ ছিল, তা তারা লাভ করতে পারেনি। সে সম্পদ হলো ঈমান। এসব লোক সত্যিকারভাবে হতভাগ্য, বঞ্চিত। কারো কোনো বৈষয়িক আনন্দ সমাগ্রী হারিয়ে গেলে সে বলে ঃ আমার জীবনের অর্ধেক চলে গেছে। তাহলে যে লোক জীবনের প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, বঞ্চিত হয়েছে, প্রাণের জীবন বিলীন করে ফেলেছে, যার অন্তরটাই ঈমানের সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, তার সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে ? তাকে বলতে হয়, সে তার সমস্ত জীবনটাই হারিয়ে ফেলেছে। তার গোটা জীবনই মিথ্যা হয়ে গেছে।

এসব হতভাগ্য লোক ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেছে। তারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে নিজেদের সত্তাকে, নিজেদের জীবনকে, জীবনের পরবর্তীকালকে। এ এক চিরন্তন ক্ষতি। প্রত্যেকটি ব্যাপারের সার্বিক বিপর্যয়। কেননা তারা ঈমানকে হারিয়েছে। আল্লাহ্‌র তা'আলার এই কথাটি হাদীসের বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

عَبْدِیْ اُطْلُبْنِیْ - فَاِنْ وَجَدْ تَنِیْ وَجَدْتَ كُلَّ شَیْءٍ وَاِنْ فَتَكَ فَاتَكَ كُلَّ شَیْءٍ -

আমার বান্দা! আমাকে পেতে চাও! তুমি যদি আমাকে পেতে পারো, তাহলে সবই পেয়ে গেলে। আর আমাকেই যদি না পেলে, তাহলে সবকিছুই হারালে।

এসব নাস্তিকদের জন্য দ্বিতীয়বার দুঃখ হয় তখন, যখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, তারা এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করতে তো রাজি হয়নি; সেই সঙ্গে সহস্র 'খোদার' দাসত্বের কঠিন নিগড়ে বন্দী হয়ে পড়েছে। তারা মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে এই ভেবে যে, তারা মুক্ত— সর্বপ্রকার দাসত্ব শৃঙ্খল থেকেই তারা মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু আসল অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা এক আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই অসংখ্য 'খোদার' দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পড়েছে। নিজেদের মুক্ত মনে করা তাদের পক্ষে যতই উল্লাসব্যঞ্জক হোক-না-কেন, আসলে তারা শত-সহস্র মাবুদের দাস হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এসব মাবুদ কখনো একক মাবুদ আল্লাহ্‌র তুলনায় উত্তম হতে পারে না— এক মাবুদের দাসত্বের তুলনায় যেমন শত সহস্র মাবুদের দাসত্ব উত্তম নয়। কার্যত তারা উত্তমকে বাদ দিয়ে নিকৃষ্টতমকে গ্রহণ করেছে, ভালো ও মানবোপযোগী অবস্থা গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় তারা বাধ্য হয়েছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও পরম দুঃখময় অবস্থায় পড়ে যেতে।

এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বহু শত খোদাকে তারা গ্রহণ করেছে। তারা পরস্পরকে খোদা ও মাবুদ রূপে গ্রহণ করেছে এক মহান আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে। ফলে সারা জীবন ধরে তাদের হতে হচ্ছে লাঞ্ছিত অপমানিত— প্রত্যেকটি কাজে, প্রতিপদে।

কিন্তু মুমিন— এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ব্যক্তি— তার মন ও জীবন থেকে উৎখাত করে সমস্ত রকমের কৃত্রিম খোদাকে। সব রকমের মূর্তিকে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। সে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করতেই রাজি, তাতেই সে সন্তুষ্ট, তৃপ্ত। সে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রাখে। তাঁরই দিকে তার হৃদয়-মন সমর্পিত। সে তাঁকে শক্তভাবে ধারণ করে আছে। সে এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে চায় না, অন্য কারো দিকে তার একবিন্দু লক্ষ্য নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। সে অন্য কাউকে স্বীয় অভিভাবক মনে করেন না। অন্য কারো কাছ থেকে সে কোনোরূপ আইন বিধান গ্রহণ করতে একবিন্দু প্রস্তুত নয়। সে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র অধিন, অনুগত। সারা বিশ্বলোকের সবকিছুর উর্ধ্বে তার স্থান ও মর্যাদা। পক্ষান্তরে এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস যাদের নেই তারা সবকিছুর অধীন— সবকিছুর গোলামী করে যাওয়াই তাদের অদৃষ্টলিপি। কাজেই এ দুজন লোকের বৈষয়িক বাস্তব জীবনের সম্ভ্রম ও মর্যাদায় যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য তা যে-কোনো লোকই বুঝতে পারে। যে লোক সব কিছুর দাসত্ব অস্বীকার করে এক

আল্লাহ্‌র দাস হলো, তার জীবন উত্তম ও সুখময়, না ছোট-বড় হাজার রকমের মাবুদের গোলামী করে নিষ্পিষ্ট হতে বাধ্য হয় যে ব্যক্তি তার জীবন সম্মানপূর্ণ ? এ প্রশ্নই কুরআন তুলেছে দুনিয়ার এ পর্যায়ের লোকদের সামনে ঃ

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - (يوسف : ٣٩)

ভিন্ন ভিন্ন সত্তাসম্পন্ন অসংখ্য বিচ্ছিন্ন খোদা উত্তম, না একমাত্র আল্লাহ্ যিনি সর্বাধিক পরাক্রমশালী উত্তম ?

এ দু ধরনের জীবনের তুলনা করে কুরআন প্রশ্ন করছে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ط هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الزمر : ٢٩)

আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত রেখেছেন এমন এক ব্যক্তির যার মালিকানায় বহু সংখ্যক শরীক এবং তারা পরস্পর বিবদমান। আর এক ব্যক্তি কেবলমাত্র এক ব্যক্তিরই অধীন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিচার করে বিবেচনা করে দেখো, এ দুজন লোক কি কখনো সমান হতে পারে ? (না, এরা দুজন কখনোই সমান নয়। তাহলে এক আল্লাহ যে মানছে, আর যে-লোক এক আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে হাজারো খোদার দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে— এরা দুজন কখনো সমান হতে পারে না) অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। তবে বহু লোকই তা জানে না।

যে লোকের মনিব-মালিক অসংখ্য এবং এ মনিব ও মালিকানার অধিকারে তারা সব সমান, এদের প্রত্যেকেই সেই লোকটির কাছে যা চায়, অন্য শরীকরা চায় তার বিপরীত। একজন তাকে একদিকে টানে, অন্যজন টানে তার উল্টা দিকে— এরূপ অবস্থায় সে কি করবে, কোন দিকে যাবে, তা সে ঠিক করতে পারে না। ফলে তাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পর্যুদস্ত হতে হয় মর্মান্তিকভাবে। সে কাকে খুশী করবে ? কার কথা মানবে ? তার দুঃখের কোনো অবধি থাকে না। এ হলো এক আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী লোকদের অবস্থা। কিন্তু যে লোক কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌কে মানে, সে সেই এক-এরই একনিষ্ঠ বান্দা, তার ব্যাপারে কোনো শরীকদারী নাই, সে নিজেই এসব শরীকদারীর দাবিদারগণকে অগ্রাহ্য করেছে। সে তার আসল মনিব-মালিককে চিনতে পেরেছে। সে জানতে পেরেছে, কিসে তার সে মনিব-মালিক খুশী হয়, আর কিসে হয় অসন্তুষ্ঠ। তাই সে সেই এক মনিব মালিকেরই বন্দেগী করে— অন্য কারুর করে না। সে হলো তওহীদে বিশ্বাসী মুমিন।

কুরআনের উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয় প্রমাণ করেছে যে, প্রত্যেক নাস্তিকই আসলে মুশরিক। আর মুশরিকরা কার্যত নাস্তিক। এই কারণে ব্যবহারিক জীবনে নাস্তিক ও মুশরিকরা পরস্পরের সহচর, পরস্পরের পৃষ্টপোষক। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে যেমন, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মুশরিকরা এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে শত সহস্র খোদার পূজা উপাসনা আরাধনা করে। আর নাস্তিকরা এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আনুগত্য করে বহু শত-খোদার।

মুমিন তার অস্তিত্বের রহস্য জানে

প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়-মনের গভীর গহনে কতগুলো তীব্র জিজ্ঞাসা নিহিত রয়েছে। সেগুলো প্রচণ্ড ধ্বনিতে মানুষকে আহ্বান করে সেগুলোর যথাযথ জবাব দেয়ার জন্য। কেননা এ প্রশ্নগুলোর জবাব না দেয়া পর্যন্ত মানব মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কুণ্ঠা-শংকা কিছুতেই দূর হতে পারে না, পারে না মানব মন কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করতে। সে প্রশ্নগুলো হচ্ছে ঃ

... কি এ বিশ্বলোক ? মানুষ কি জিনিস ? মানুষ এসেছে কোথা থেকে ? কে এই বিশ্বলোক ও মানুষের স্রষ্টা, নির্মাতা ? কে এ দুটির নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক-ব্যবস্থাপক ? এ দুটির চরম লক্ষ্য কি ? পরিণতি কিসে ? এ দুটির সূচনা কি করে হলো ? কেমন করে এ দুটির অবসান হবে ? জীবন কি ? মৃত্যুর অর্থ কি ? এ জীবনের পরে কোনো ভবিষ্যত আছে কি ? এ জীবনের অবসান শেষে পাওয়ার মতো কিছু আছে কি ? এ বিশ্বলোক ও পরবর্তী জীবনের সাথে মানুষের সম্পর্ক কি ? কি তার স্বরূপ ? ...

এ প্রশ্নগুলো শাশ্বত। যে দিন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সে দিন থেকেই মানব মনে এ প্রশ্নগুলো শক্তভাবে বসে গেছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ প্রশ্নগুলো প্রবলভাবে মানুষের কাছে জবাব চাইবে। কিন্তু এ সব প্রশ্নের একটিরও জবাব দেয়া সম্ভব নয় যদি কোনো ধর্মকে স্বীকার করা না হয়। কেবলমাত্র ধর্মই এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। অন্য কোনো দর্শন নয়, নয় কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য। বিশ্বলোক ও মানুষের এই বিরাট অস্তিত্বের রহস্য উদঘাটন করেছে ধর্ম। ধর্মই পারে মানুষকে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার কঠিনতর দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে। ধর্মের দেয়া জবাবই মানব প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা-ই মানব মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ-সংশয় দূর করতে সক্ষম।

বিশেষ করে দ্বীন-ইসলাম এই পর্যায়ে সর্বাধিক স্বচ্ছ ও অকাট্য জবাব দিয়েছে। দ্বীন-ইসলামের দেয়া জবাবই মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, মানবীয়

বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। ইসলামের দেয়া এ জবাব বাইরে থেকে চাপানো নয়; বরং তা হৃদয়ের গভীরতম কন্দর থেকে উৎসারিত। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী এ দ্বীনই হচ্ছে মানুষের মৌল প্রকৃতি।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا - فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَا النَّاسَ عَلَيْهَا -

তোমার সমগ্র সত্তাকে নিবদ্ধ করো দ্বীন-ইসলামের জন্য— অন্যান্য সর্বদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমুখী হয়ে। এ দ্বীনই হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রকৃতি, এ প্রকৃতির উপরই তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।

কাজেই মানব-প্রকৃতিকে যদি তার আসল অবস্থায় থাকতে দেয়া হয়, যদি তার উপর বাইরের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত না হয়, তাহলে প্রত্যেকটি মানুষই ইসলামের অনুসারী হবে নিঃসন্দেহে। রাসূল করীম (স)-এর হাদীসে এই কথাই ঘোষিত হয়েছে ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ - وَاِنَّمَا اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ -

প্রত্যেকটি মানব-সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতার কারণে কেউ ইহুদী হয়, কেউ খ্রিষ্টান হয় বা কেউ হয় অগ্নিপূজক।

প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি বলে, মানুষ স্রষ্টা ছাড়া স্বয়ং সৃষ্ট হয়নি। তারা নিজেরাও নিজেদের সৃষ্টি করেনি, সৃষ্টি করেনি অন্য কেউ তার পরিবেশ থেকে। কুরআন প্রশ্ন তুলেছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ - اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

(الطور : ٣٥-٣٦)

তারা কি এমনি কোনো স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে ? কিংবা তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা ? অথবা তারাই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে ?

এর প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব 'না'। 'না' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বিশ্বলোক ও মানুষের স্রষ্টা অবশ্যম্ভাবী। সে স্রষ্টাকে অবশ্যই সর্বজ্ঞানে পূর্ণমাত্রার অধিকারী হতে হবে। হতে হবে তাঁকে মহাবিজ্ঞানী, নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, কার্যনির্বাহী, মহাশক্তির অধিকারী। কেননা এরূপ গুণ না থাকলে মানুষ ও বিশ্বলোকের সৃষ্টির অস্তিত্ব দান কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ পরিচয় যাঁর, তিনিই এ সব কিছুর স্রষ্টা। যার এ পরিচিতি নেই, সে স্রষ্টারূপে বরিত হওয়ার যোগ্য নয়, অধিকারী নয়। কুরআন এ পরিচিতি সম্পন্ন স্রষ্টার সাথে বিশ্বমানবকে পরিচিত করেছে এই বলে ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ - كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ - اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - (المؤمن : ٦٢-٦٤)

এই আল্লাহ্ই হচ্ছে তোমাদের রব্ব। তিনি সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কেউ 'ইলাহ' নয়। তাহলে তোমাদের কোন দিক দিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? এমনিভাবেই বিভ্রান্ত হয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অমান্য-অগ্রাহ্য করে। আল্লাহ তো তিনিই, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য স্থিতিলাভের স্থানরূপে বানিয়েছেন ও আকাশমণ্ডলকে বানিয়েছেন ছাদরূপে। আর তোমাদের আকার-প্রতিকৃতি দিয়েছেন এবং অতীব উত্তম বানিয়েছেন তোমাদের আকার-আকৃতি-প্রতিকৃতি। এবং অতীব উত্তম পবিত্র দ্রব্যাদি রিযিকরূপে তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের এই আল্লাহ্ই তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। বিরাট মহান হচ্ছেন আল্লাহ্— যিনি সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু।

বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবি হচ্ছে, এ মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ মহাবিশ্বলোক ব্যবস্থাপনার অন্তরালে সদা সক্রিয় পরিচালক-ব্যবস্থাপক হয়ে বর্তমান থাকবেন, যেন তিনি তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনায় মানুষকে তার সঠিক লক্ষ্যের পানে নির্ভুলভাবে চালিয়ে নিতে পারেন। অন্যথায় এ সমস্ত সৃষ্টি ও বিরাট ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন তাৎপর্য-শূন্য ও চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হওয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ - مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الدّخان : ٣٨-٣٩)

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে তার কোনো কিছুই আমরা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। এ দুয়ের সৃষ্টি করেছি পরম সত্যতা সহকারে। কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

আসমান ও জমিনকে সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ভিতরে কোনো বাতুলতা নেই। এ এমন একটি কথা, যার যৌক্তিকতা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি স্বতঃই স্বীকার করে। বিশ্ব প্রকৃতির সাথে এ কথার পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে। এই

দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন নয়। মানুষের এই জীবনটা দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ। নানা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয় মানুষের জীবন। এ জীবনের পরে রয়েছে আর একটি জীবন— মানুষের জীবনের পরবর্তী ভাগ। জীবনের এই ভাগটাই চরম পরিণতি, শেষ লক্ষ্য। সেই জীবনেই পাবে এই জীবনের সমস্ত কাজের পুরোপুরি প্রতিফল। যে এখানে ভালো করেছে, সে সেখানে ভালো ফল পাবে। যে মন্দ করেছে, সে পাবে মন্দ ফল— এটাই স্বাভাবিক। কেননা ভালো আর মন্দ কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে না। নেককার-পরহেযগার ও পাপী লোকের পরিণতি ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। আল্লাহ্র অনুগত বান্দার ও নাফরমান বান্দার একই রকমের পরিণতি লাভ বিবেক-বুদ্ধি সম্মত নয়। নির্ভেজাল যুক্তির এটাই দাবি। আর কুরআন মজীদও তাই বলেছে ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ - اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ - (ص : ٢٧-٢٨)

আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে, আমরা তা নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। কেবল কাফের লোকেরাই এই রকম মনে করে। অতএব কাফেরদের শাস্তি জাহান্নাম। ঈমানদার নেক আমলাকারী লোকদেরকে কি আমরা পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মতো বানাব ? আল্লাহ্ ভীরু আল্লাহ-অনুগত লোকদেরকে কি আমরা পাপী না-ফরমান লোকদের সমান করে দেব ?

না, তা কখনো সমান হতে পারে না। কাজেই উভয় শ্রেণীর লোকদের পরিণতিও কখনো অভিন্ন হবে না। আর সকলকেই তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হতে হবে। উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে চূড়ান্ত বিচার গ্রহণ করতে হবে।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ - (المؤمنون : ١١٥)

তোমরা কি ধারণা করে বসেছ যে, আমরা তোমাদে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরে আসতে হবে না ?

বিশ্ব প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধির তীব্র চেতনা এই যে, যে মহান আল্লাহ্ স্বীয় একক সিদ্ধান্তে ও কুদরতে বিশ্বলোক ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং এই মানুষকে দিয়েছেন অসংখ্য অপরিমেয় নেয়ামত— তাকে অবশ্যই জানতে হবে, চিনতে

হবে, তাঁকে অস্বীকার ও অমান্য করা হবে না। তাঁর শোকর করা হবে— না-শোকরি ও কুফরি করা হবে না, তাঁর আনুগত্য করা হবে— নাফরমানী করা হবে না। কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করা হবে— তাঁর সাথে শির্ক করা হবে না। কুরআনও সমগ্র মানুষকে সম্বোধন করে একথাই বলেছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

হে মানুষ। দাসত্ব স্বীকার করো তোমরা সকলে তোমাদের সেই সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও— তাহলে আশা করা যায়, তোমরা বাঁচতে পারবে। সেই সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক তিনিই, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যাবৎ সমতল বানিয়েছে, আকাশকে বানিয়েছেন ছাদরূপে। আর উর্ধ্বদেশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। পরে তারই সাহায্যে তোমাদের রিযিক রূপে বহু ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন। অতএব তোমরা প্রকৃত ব্যাপার জেনে শুনে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী মেনে নিও না।

সাধারণভাবে আসমান-জমিনের এবং বিশেষভাবে মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি তা কুরআন মজীদ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لا وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا - (الطلاق : ١٢)

আল্লাহ তিনিই, যিনি সপ্ত আকাশ এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সে সবের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান অবতীর্ণ হতে থাকে, একথা তোমাদের বলা হচ্ছে এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ব ব্যাপারেই শক্তি রাখেন। আরও এই যে, আল্লাহ্র জ্ঞান সব কিছুকেউ পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

(সপ্ত আকাশ ও অনুরূপ সংখ্যক বলে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বোঝানো হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য একাধিক বা বহু বোঝানো। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, ২৮ পারা সূরা 'তালাক'-এর ২৩ টীকা দ্রষ্টব্য।)

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ - مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ - (الذّٰريٰت : ٥٦-٥٧)

জিন ও মানুষকে আমি সৃষ্টি করিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে— সৃষ্টি করার মূলে একটি মাত্র উদ্দেশ্যই নিহিত আর তা হলো (মানুষ) কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রিযিক চাই না; আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

কুরআন মজীদের উদাত্ত কণ্ঠে ও স্পষ্ট ভাষায় দেয়া এসব জবাব থেকেই মুমিন তার অস্তিত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পেরেছে— জানতে পেরেছে বিশ্বলোকের সৃষ্টি উদ্দেশ্য। ফলে তারা আল্লাহ্কে চিনতে ও জানতে পেরেছে। আর এই জানা ও চেনার ফলে তাদের পক্ষে সবকিছুই জানা ও চেনা সম্ভব হয়েছে, সহজ হয়েছে। এতে করে তাদের সম্মুখে জটিল হয়ে থাকা সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সমস্ত কল্যাণের দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। তারা জানতে পেরেছে এ বিশ্বলোক মহান আল্লাহ্র সাম্রাজ্য বিশেষ। এখানে যা কিছু রয়েছে তা সবই সেই এক আল্লাহ্র অস্তিত্বের নিদর্শন যেমন, তেমনি নিদর্শন তাঁর অবাধ-অসীম দয়া-অনুগ্রহের। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ খলীফা। আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদতের উদ্দেশ্যে, তার আমানত বহন করার জন্য, যথাযোগ্য কাজে তা প্রয়োগ ও ব্যবহার করার জন্য। এই জীবনটা আল্লাহ্র দান। মৃত্যু তাঁর নির্ধারিত ব্যবস্থা। এ দুনিয়া আল্লাহ্র বন্দেগী করার ক্ষেত্র, পরকাল তাঁরই ফসল কাটার নির্দিষ্ট সময়। এ ফসল হচ্ছে আল্লাহ্র দেয়া কর্মফল। যে লোক এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র হেদায়েত পেয়ে তদনুযায়ী চলবে, সে-ই সৌভাগ্যবান আর যে-লোক আল্লাহ্র হেদায়েত পেয়েও তা গ্রহণ করল না, তার প্রতি উপেক্ষা-অবজ্ঞা প্রদর্শ করল, আল্লাহ্কে ভুলে গেল— সে চরম হতভাগ্য।

এ জগত ধ্বংসশীল, নিত্য অবক্ষয়মান। এখানে মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর। এভাবে তাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে পরকালীন শাশ্বত জীবনের জন্য উপযুক্ত করে তৈরী করাই এ সবরের মূল উদ্দেশ্য। মৃত্যু হচ্ছে এ দুই জীবনের ব্যবধান অতিক্রম করার সিঁড়ি।

বড় বড় দার্শনিক চিন্তাবিদরা এসব প্রশ্ন নিয়ে হয়ত চিন্তা-গবেষণা চালিয়েছেন। এই করে হয়ত তাঁরা তাদের জীবনকেও নিঃশেষ করেছেন; কিন্তু এসব প্রশ্নের নির্ভুল সান্ত্বনাদায়ক জাবাব লাভ করা তাদের ভাগ্য জোটেনি।

তাদের চিন্তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করার মতো ফল তারা লাভ করেননি। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি অতি সহজেই এসব জটিল প্রশ্নের জবাব লাভ করেছে। মানুষ কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কোথায় যেতে হবে, কেন এই জীবন, কেন মৃত্যু, মৃত্যুর পর তার জন্য কি জিনিস অপেক্ষা করছে— এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব তার নখদর্পণে। তার পক্ষে এ সবের জবাব পাওয়া সম্ভব হলো কি উপায়ে? জবাব পেয়েছে তাঁরই কাছ থেকে, যিনি সবকিছু জানেন, যাঁর জানায় কোনো ভুল নেই। তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছে এমন সূত্রে, যা একান্তই নির্ভরযোগ্য। বস্তুত যে লোক মহান স্রষ্টার কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে এসব জবাব জানতে পেরেছেন, সে তো একান্তই নির্ভুল কথা জানতে পেরেছেন। আল্লাহ্ই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝ وَّ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ - (الانفطار : ١٣-١٤)

নিঃসন্দেহে সত্যপন্থী লোকেরা সুখ-শান্তিতে থাকবে এবং নিশ্চয়ই পাপপন্থী লোকেরা জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহ্র দ্বীন এসেছে বিশ্বপ্রকৃতির পরিপূরক হিসাবে এই বিশ্বপ্রকৃতির নির্ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এই কাজেরই সহায়ক। এ দ্বীন এমন কিছু নিয়ে আসেনি যা প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক, যা প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। বিশ্বপ্রকৃতির গভীর মূলে নিহিত মহাসত্য ও তত্ত্বকে উদ্ঘাটিত করেছে এই দ্বীন। তা সুন্দরভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, দিয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা। মানুষের অনাবিল স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি যা বুঝতে পেরেছে মোটামুটি অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণভাবে, দ্বী-ইসলাম সেই সব কিছুই অতীব বিস্তারিত সুস্পষ্ট অকাট্য ও যথার্থভাবে বলে দিয়েছে। ফলে সব শোবাহ সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেছে— আলোর আঘাতে যেমন দূর হয়ে যায় অন্ধকার। অতঃপর মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণায় বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকল না।

প্রকৃতি মানুষকে শুধু ভাবায় না, শুধু চেতনাই জাগায় না, মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও চেতনাকে অনেক সময় বিভ্রান্তও করে। এই কারণে দ্বীন প্রকৃতিকেও সম্বোধন করেছে। দিকনির্দেশ করেছে চিন্তা-ভক্তি-চেতনা, অন্তর-হৃদয় ও প্রকৃতিকেও। যারা কেবলমাত্র নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে নির্ভুল সত্য বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। কেননা তারা বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে যা বহন করার মতো সাধ্য বা সক্ষমতা আদপেই তার নেই। তার কারণ এই যে, মানুষের এই বিবেক-বুদ্ধিই উচ্চমানের জ্ঞানসূত্র ওহীকে উপেক্ষা করেছে। আর ওহী বাদ দিয়ে এ পর্যায়ে নির্ভুল সত্য লাভ করা সম্ভব হতে পারে না।

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির অনেক শক্তি রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের মেধা ও চিন্তা-গবেষণা শক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তা খুব সীমাবদ্ধ। এ মানবীয় সীমাবদ্ধতার দ্বারা তা সমাচ্ছন্ন, পরিবেষ্টিত। স্থান, কাল, উত্তরাধিকার ও পরিবেশ দ্বারা এই সীমাবদ্ধতা আরো গভীর ও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি পরিচালনের জন্য একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সূত্র একান্তই জরুরী। এই সূত্রই মানুষকে সর্ব প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে। পথ হারিয়ে ফেললে নির্ভুল পথে নিয়ে আসবে এবং সঠিক চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে দেবে। এই সূত্রই হচ্ছে ওহী। আর এই ওহীই হচ্ছে দ্বীনের মূল ভিত্তি। মানুষের শক্তি-সামর্থের আওতা বহির্ভূত তত্ত্ব ও তথ্য জানবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা চালানো থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে এই ওহী। এই ওহীকে বাদ দিয়ে মানুষ তার নিজের সত্তা সম্পর্কে, এ বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে, এ বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা ও পরিচালক সম্পর্কে কেবলমাত্র নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার জোরে কি কিছু জানতে পারে ? কিছুই জানতে পারে না। চিন্তা-গবেষণার কোনো পথই সে পেতে পারে না। হয়ত দূর থেকে পানি মনে করে মরীচিকার পিছনে ছুটতে পারে তৃষ্ণার্ত মরু যাত্রীর মতো। কিন্তু দৌঁড়ে গিয়ে দেখবে, পানি সেখানে নেই, সেখান থেকে আরো আরো অনেক দূরে। হয়ত সে চেষ্টায় পুঞ্জীভূত অন্ধকারাচ্ছন্ন কুল-কিনারাহীন সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারে; কিন্তু তীরে পৌঁছা কোনো কালেই কোনো ক্রমেই সম্ভব হবে না। এ কথাটি আল্লাহ্ই বলে দিয়েছেন এ ভাষায় ঃ

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ - (النور : ٤٠)

এ ব্যাপারটি এ রকম, যেন একটি গভীর সমুদ্রে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, উপরে একটা তরঙ্গ দাঁড়ানো, তার উপর আর একটি উর্মি, তার উপরে সমাচ্ছন্ন ঘনঘটা। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। হাত বের করলেও তা কেউ দেখতে পায় না। আর আল্লাহ্র নিজেই যার জন্য জ্যোতি সৃষ্টি করেন নি তার পক্ষে তো আলো পাওয়া সম্ভব নয়।

নিছক নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির বলে যারা চিন্তা-সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যায়, তারা আসলে চরম ও পুঞ্জীভূত অন্ধকারে হাবুডুবু মরে। কোনো দিক থেকেই একবিন্দু আলোক সম্পাত নেই। নিজের হাতও নিজে দেখতে পায় না এমনই

অন্ধকার। এরূপ অবস্থায় কারুর তীরে পৌছতে পারা কি কোনো ক্রমেই সম্ভব বলে মনে করা যায়? মানুষ ও বিশ্বলোক সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনি দশা হচ্ছে প্রাচীন ও আধুনিক কালের সব আল্লাহীন চিন্তাবিদ দার্শনিকদের। তারা যত বড় বিদ্বানই হোন, আনবিক বোমা আবিষ্কার করে দুনিয়াকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার এবং চাঁদে ও অন্যান্য গ্রহলোকে পৌছার যোগ্য রকেট তৈরী করার ক্ষেত্রে তাঁরা যত সাফল্যই অর্জন করুক— আসলে এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা এমনি-ই যা উপরের আয়াতে বলা হয়েছে। এঁদের দার্শনিকত্বই মানুষের হৃদয়-মনকে অস্থির করে দিয়েছে, নিশ্চিন্ততা দূর করেছে। অথচ এই নিশ্চিন্ততাই সৌভাগ্যের প্রথম উপকরণ। বস্তুত যে লোকের রত্রি কাটে সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে, যার দিন সন্দেহ-সংশয়ের ধুম্রজালে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তার যে কি চরম দুর্গতি ও অসহায় অবস্থা, তা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে।

সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, নিশ্চিন্ততা ও পরম নির্ভরতা লাভের একটি মাত্র উপায়ই থাকতে পারে। আর তা হলো আল্লাহ্‌র কাছে থেকে পাওয়া ওহী। এই ওহীই মানুষকে সর্বপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় ও মানসিক অস্থিরতা-অনিশ্চয়তা থেকে চিরতরে মুক্তিদান করতে সক্ষম। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ হলো ঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىٓ أُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (الزخرف : ٤٣)

অতএব তুমি শক্ত করে ধারণ করো সেই কথা যা তোমার প্রতি ওহীরূপে নাযিল হয়েছে। নিশ্চিতই তুমি সঠিক সরল দৃঢ় পথে রয়েছ।

আল্লাহ্‌র কাছে থেকে ওহী সূত্রে অবতীর্ণ সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদ। কুরআনের উপস্থাপিত দ্বীন হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম। পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করা জন্য একমাত্র পথ হলো সর্বাত্মক ও সুদৃঢ় হস্তে এই কুরআন ও দ্বীন ইসলামকে ধারণ করা। তা হলেই মনে করা যাবে, সত্য সরল দৃঢ় পথে চলা হচ্ছে এবং এ পথ নিশ্চিতই চিরস্থায়ী সর্বাত্মক কল্যাণ ও অফুরন্ত নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই কারণে কুরআনের নির্দেশ হলো ঃ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝ (النمل : ٧٩)

তুমি সম্যকভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা গ্রহণ করো। তা যদি করতে পার, তাহলে তুমি নিশ্চিত হতে পার এজন্য যে, তুমি সুস্পষ্ট মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছ।

সুস্পষ্ট মহাসত্য তাই, যার নিদর্শন ও লক্ষ্যণাদি স্পষ্ট হয়ে গেছে, পথ উজ্জ্বল উদ্ভাসিত। যাতে কোনোরূপ জটিলতা নেই, নেই কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়, নেই কোনোরূপ বিরোধ ও অস্পষ্টতা।

যে লোকের এই চেতনা যে, সে প্রকৃত সুস্পষ্ট মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সুদৃঢ়-নির্ভুল পথে চলছে, সে এমন একটা চেতনার অধিকারী, যা কেবলমাত্র মুমিনরাই লাভ করতে পারে। আল্লাহ্র প্রতি, আল্লাহ্র ওহীর প্রতি যাদের অবিচল প্রত্যয় নেই, তারা কখনো এই চেতনা লাভ করতে পারে না। যারা আল্লাহ্র হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ্র রাসূলকে একমাত্র নেতা ও পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেনি তাদের অবস্থা ঃ

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى - (الانعام : ٧١)

সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তানরা পৃথিবীতে বিভ্রান্ত করে জংগলে ঢুকিয়ে দিশেহারা করে ছেড়েছে। তার বন্ধুরা ডেকে বলছে, সঠিক পথ তো এদিকে, এদিকে এস। তুমি বলে দাও, আল্লাহ্র দেয়া হেদায়েতই হচ্ছে সত্য নির্ভুল পথ-নির্দেশ।

বিশ্বালোক ও স্বীয় সত্তা সম্পর্কে দৃঢ়-নিশ্চিত প্রত্যয় লাভ করার একমাত্র পথ হলো ওহী। ওহী ব্যতিরেকে কখনো এই প্রত্যয় লাভ সম্ভবপর নয়। আর প্রত্যয়-অবিচল, দৃঢ়, ঐকান্তিক বিশ্বাস ছাড়া মানব মনের প্রশান্তি আসতে পারে না। আর হৃদয়-মনের এই প্রশান্তি ব্যতিরেকে সৌভাগ্য লাভ সুদূর পরাহত ব্যাপার।

ওহীর সাহায্যেই মানুষ ইস্পাত-দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করতে পারে। এ প্রত্যয়-ধন্য আত্মা আরো উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করে উন্নীত হতে পারে আরো উচ্চ ও উর্ধ্ব পর্যায়ে। শেষ পর্যন্ত সে লাভ করতে সক্ষম হয় প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত বিশ্বাস (عين اليقين)। আর তার পর চরম-পরমভাবে গ্রহণ করা মহা প্রত্যয় (حق اليقين) মূল সত্য ও মানুষের মাঝে যে আবরণ, তা যদি দূরীভূত হয়ে যায়, তাহলে দৃঢ় প্রত্যয়ও বৃদ্ধি পায়। কেননা তার ঈমান হচ্ছে এমন ওহীর প্রতি, যার দ্বারা তার হৃদয়ের মর্মমূলে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তখন অবস্থা হয় এমন যে, সে যেন তার নিজের চক্ষুদ্বয় দ্বারাই মহাসত্য দেখতে পাচ্ছে— দেখতে পাচ্ছে নিজের সম্মুখে উপস্থিত। নির্মেঘ আকাশে বসন্তের উজ্জ্বল সূর্য যখন ভাস্বর হয়ে ওঠে, এ ঠিক সেই রকম অবস্থা। এই পর্যায়ে পৌঁছেই একজন ঈমানদার বলতে পারে ঃ 'আমি এই পৃথিবীতে থেকেই জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্যরূপে দেখতে পেরেছি।' যদি প্রশ্ন করা হয়, তুমি এখানে থেকেই জান্নাত-জাহান্নাম দেখলে কিরূপে— অথচ তাতো মৃত্যুর পর দেখার বস্তু। জবাবে সে বলবে ঃ রাসূলে করীম (স) তা নিজ চক্ষে দেখেছেন, তিনি তা বলেছেন। আমি রাসূলের প্রতি

বিশ্বাসী। অতএব আমিও তা দেখতে পেয়েছি। বরং আমার নিজের দেখার চাইতেও রাসূলের দেখাটা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কেননা আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু রাসূলের দৃষ্টি কোনোক্রমেই ভুল করতে পারে না।

ঈমানদার ব্যক্তির সংশয়-মুক্তি

এইরূপ সুদৃঢ়-সুস্পষ্ট অকাট্য ঈমানের বলেই একজন ঈমানদার লোক সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা-উদ্বেগ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে। কেননা এই ঈমান ওহীর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিই এ ঈমানের সমর্থক। প্রকৃতি এই ঈমানের সাথে পূর্ণ সংহতি ও একাত্মতা ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি অণু, বৃক্ষ-লতার প্রতিটি পত্র-পল্লব এ ঈমানের সত্যতা জানিয়েছে। এ ঈমানের কারণে সব মানসিক দ্বন্দ্ব ও উদ্বেগ বিলীন হয়ে গেছে। সে নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছে যে, তাঁর এক আল্লাহ রয়েছেন, তিনিই সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তিনিই তাকে ও সমগ্র বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন। তাকে নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সুঠাম-সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত একটা পূর্ণাঙ্গ দেহাবয়ব দিয়েছেন। তাকে মর্যাদাবান ও সম্মানিত করেছেন। এই দুনিয়ার বুকে তিনিই তাকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন, তার যাবতীয় প্রয়োজন পরিপূরণের দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেছেন। আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে, তা সবই তিনি মানুষের কল্যাণে ও কর্মে নিযুক্ত করে রেখেছেন। এমন সব অফুরন্ত নেয়ামত দানে তাকে ধন্য করেছেন, যার কিছু প্রকাশমান আর কিছু লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন। ফলে তার হৃদয়-মন পূর্ণ সান্ত্বনা পেয়েছে। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সে ধন্য হয়েছে। সে তাঁর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করেছে। এর ফলে সে এমন এক শক্ত সুদৃঢ় স্তম্ভের সাথে নিজেকে বেঁধেছে, যেখানে অস্থিরতা ও উদ্বেগ একবিন্দু স্থান পেতে পারে না। সে এমন একটা রজ্জু দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে, যা কোনো দিনই ছিন্ন হবার নয়।

এ ঈমানের দৌলতেই সে এই চেতনা পেয়েছে যে, তার এই সংক্ষিপ্ত জীবন সুখ-অসুখ ও শান্তি-অশান্তিতে ভরপুর। এখানে যেমন আছে সুবিচার, ন্যায়পরতা, তেমনি রয়েছে অবিচার ও উৎপীড়ন। এখানে পদে পদে যেমন দেখা যায় হক, তেমনি সাক্ষাত ঘটে বাতিলের সঙ্গে। একটি জিনিসে যদি পাওয়া যায় শিষ্টতার স্বাদ, তো তিক্ত-বিস্বাদ জিনিসেরও এখানে কোনো অভাব নেই। কিন্তু এই সবই চূড়ান্ত ব্যাপার নয়— এ-ই নয় মানুষের শেষ পরিণতি। এ দুনিয়া তো পরকালীন ফসল সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত। সেই পরকালটাই স্থায়ী। এ জীবনটা সংক্ষিপ্ত। পরকালীন জীবনে প্রত্যেকটি মানুষকে এই জীবনের যাবতীয় কাজের ফল দেয়া হবে। মানুষ যা এখানে উপার্জন করবে, তা-ই সে ভোগ করবে

পরকালীন জীবনে। এর ফলে মুমিন বান্দা জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্বেগ-আকুলতা-অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

ঈমানদার ব্যক্তিই এ বিষয়ে অবিচল স্থিরতা পায় যে, এ দুনিয়ায় তাকে নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়নি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি নবী-রাসূল পাঠিয়ে তার জীবন-উদ্দেশ্য বলে দেয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে সে নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছে মহাসত্যের পথ— কোন পথে চললে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন, কোন পথে আল্লাহ্র গযব বর্ষিত হয়। এই নবী-রাসূলগণই দুনিয়ার বুকে মহাসত্যের প্রদীপ্ত সূর্য উন্নত করে ধরেছেন। ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের পারস্পরিক মতবিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন চিরকালের তরে।

মুমিনের অনুভূতি হচ্ছে, সে এখানে অসহায় নিঃসঙ্গ নয়। সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি তার আপন পরিবেশ থেকে। বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ স্বয়ং তার চিরসঙ্গী। ফলে বিশ্বের সবকিছুই তার নিকটতম আত্মীয়; সহচর। এ বিশ্বলোকের প্রকৃতিতেও ঈমান নিহিত। সবকিছুই সেই এক আল্লাহ্র অনুগত, তাঁরই সমীপে সিজদাবনত। সবকিছু তাঁরই তাসবীহ্ পাঠে সোচ্চার।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ –

সপ্ত আকাশ ও অনুরূপ পৃথিবী সেই এক আল্লাহ্রই তাসবীহ্ পাঠে নিরত।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا –

বিশ্বলোকের সবকিছুই এক আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করছে। কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ পাঠকে অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।

এটা গভীর তীব্র অনুভূক্তির ব্যাপার। যাদের সে অনুভূতি রয়েছে, তারাই সমস্ত হৃদয় দিয়ে এ অনুভূতির স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে। কিন্তু যারা সংশয়াপন্ন, যারা আল্লাহ্কে ও পরকালকে বিশ্বাস করতে পারে নি, তারা এ অনুভূতি থেকেই বঞ্চিত। তারা এমন জীবন যাপন করে, যে জীবনে সত্যিকার আনন্দ বলতে তাদের কিছু নেই। সে জীবন সংশয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত জর্জরিত। তাদের দৃষ্টিতে এই সব কেবলমাত্র প্রশ্ন চিহ্ন, যার কোনো জবাবই তাদের জানা নেই।

কোনো জিনিসেই তাদের বিশ্বাস নেই। তাদের নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাদের মনে নানা সন্দেহ। তারা জানে না, কোথেকে তারা এসেছে, কে তাদের

নিয়ে এসেছে এখানে ? এই দুনিয়ায় তাদের কি কাজ ? এখানকার জীবনাবসানের পর চলে যেতে হয় কোথায় ? সেখানে তাদের কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে ? এই বিশ্বলোকের উদ্দেশ্য কি, এর সাথে তাদের সম্পর্কই বা কি ? ... এসব বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। এসব প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের নির্ভুল জবাব জানিয়ে দিলেও তারা তা হৃদয়-মন দিয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। ফলে তারা যে অন্তর্দ্বন্দ্বে দিন কাটাতে বাধ্য হয়, তা হয় অবর্ণনীয়ভাবে মর্মান্তিক। এর ফলে তারা মানসিক প্রশান্তি থেকেও বঞ্চিত। তাদের এই জীবন সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا - (طه : ١٢٤)

যে লোকই আমার দ্বীন ও বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে অত্যন্ত সংকীর্ণ— চরম অশান্তিময়।

ضنك শব্দের অর্থ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়, মানসিক অশান্তি-বিভ্রান্তি, বিপর্যয়-অস্থিরতা-উদ্বেগ,লোভ-লালসা, ভীতি-শংকা, দুঃখ ও হতাশা। যার জীবনে এসব উপসর্গ গভীর ও ব্যাপক হয়ে বাসা বাঁধে, তার জীবনের মর্মান্তিক অবস্থা চিন্তা করলেও হৃদয় কেঁপে ওঠে। এরূপ জীবনই আল্লাহ্র অবিশ্বাসী লোকদের ভাগ্যলিপি, চিরস্থায়ী নিয়তি। এ থেকে তাদের রক্ষা নেই।

মুমিনের কর্মপথ ও জীবন লক্ষ্য সুস্পষ্ট

আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাসী লোকদের মন নানাবিধ দুশ্চিন্তার আবর্তে পড়ে চরমভাবে বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। তাদের সামনে শত শত জিনিস লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন তারা কোন দিকে চলবে, কি করবে না করবে, তার কিছুই ভাবতে পারে না। তারা কখনো ডান দিকে আকর্ষিত হয়, কখনো হয় বাম দিকে। ডান ও বামের দ্বন্দ্ব তাদের মনে চিরস্থায়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি করে রাখে। তারা কখনো নিজেদের মনের তাগিদ অনুসরণ করতে শুরু করে কখনো তারা সমাজের ইচ্ছাকে পূরণ করতে প্রবৃত্ত হয়। কখনো নেতা ও রাষ্ট্রকর্তা তাদের বিশেষ একটি দিকে চালিত করে। এ এক চরম টানা-হেচড়া।

কিন্তু মুমিনের জীবনে এ ধরনের কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও টানা-হেচড়ার প্রশ্ন আসে না। তাদের জীবন-লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পারে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে। আর মুমিনের সে লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর তা অর্জনের পথ, আল্লাহ্র নাযিল করা দ্বীন-ইসলাম হৃদয়-মন দিয়ে বিশ্বাস করা ও পুরোপুরি পালন করে চলা। এই লক্ষ্য ছাড়া অন্য

কোনো লক্ষ্যই তার থাকে না। এই পথ ছাড়া তার জীবনে আর কোনো পথ নেই। অন্য হাজারো লক্ষ্যও যদি তার সামনে লোভনীয় আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দেয়, তবু তাতে সে একবিন্দু বিচলিত হয় না। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ ছাড়া আরও হাজারো পথ তার সামনে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; কিন্তু তার পা ক্ষণিকের তরেও সেদিকে যায় না। কেননা তার মন নিশ্চিত যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া তার জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই পথ ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই। এই কথাই সে দিন-রাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে আল্লাহ্র কাছে বলে ঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

হে আল্লাহ! কেবলমাত্র তোমারই বন্দেগী করি আমরা, কেবল তোমার কাছে সাহায্য চাই আমরা।

বলে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

আমাদের পরিচালিত করো সুস্পষ্ট সুদৃঢ় নির্ভুল একমাত্র পথে .....।

আল্লাহ্র সুন্তুষ্টি লাভের জন্য এ-ই একমাত্র পথ। এছাড়া আর কোনো পথ নেই— থাকতে পারে না। এ কথা আল্লাহ তা'আলাই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ -

এ-ই হচ্ছে আমার পথ— আমাকে পাওয়ার জন্য আমারই দেখানো পথ। এ পথ সুদৃঢ়-সরল-ঋজু, সুনির্দিষ্ট। অতএব তোমরা কেবলমাত্র এই পথ অনুসরণ করেই চলতে থাকো। এ ছাড়া অন্যান্য বহু শত পথও রয়েছে, কিন্তু তা তোমরা অনুসরণ করো না। যদি করো, তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্র একমাত্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পথের দিকে নিয়ে যাবে। (সূরা আনআম ঃ ১৫৩)

দুজন লোক— একজন তার লক্ষ্য জানে, জানে সে লক্ষ্যে পৌঁছার পথও। সে তো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততায় ও পূর্ণ উদ্যম-উৎসাহে সে লক্ষ্য পানে নির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে থাকে। তার মনে লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কে কখনো কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগ্রত হয় না। আর অপর জন জানে না তার লক্ষ্য কি— কোথায়। জানে না কোন পথে তাকে চলতে হবে। কোন পথে সে চললে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। এই দুজন লোকের মধ্যে যে পার্থক্য, কার্যত সে পার্থক্যই তীব্র হয়ে দেখা দেয় মুমিন ও কাফেরের মধ্যে। এ দুজনের মধ্যবর্তী এ প্রকট পার্থক্য দেখিয়েই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ –

যে লোক মুখ থুবড়ে অন্ধভাবে চলতে থাকে সে অধিক নির্ভুল পথে চলছে, না যে লোক নির্ভয়ে সোজা-সুজি পথ ধরে অগ্রসর হয়, সে অধিক সৎ পথগামী ?
(সূরা আল-মুলক ঃ ২২)

তবে আল্লাহ্‌র দেখানো সুনির্দিষ্ট পথে চলা খুব সহজ নয়, বরং সর্বাধিক কষ্টসাধ্য, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এ পথের কোনো পথিকই পথের বন্ধুরতা দেখে চলা বন্ধ করে না, এ পথের বিপরীত দিকে সহজ পথ দেখে এ-পথ ছেড়ে সে-পথে চলে যায় না। কেননা তার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে যে, যে জিনিসকে সে জীবন লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছে, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে এ পথেই তাকে চলতে হবে— তা যত বন্ধুর, যত বিপদ সংকুলই হোক না কেন। তাই এ পথে চলে কত মানুষ যে কত কষ্ট সহ্য করেছে, শত শত জীবন অকাতরে উৎসর্গ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। হয়রত খুবাইব ইবনে যায়দ (রা)-কে এ পথে চলার কারণেই তদানীন্তন আরবের মুশরিকরা ধরে শূলে দিয়েছিল। তিনিও হাসিমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি যে কবিতা পাঠ করেছিলেন, তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে ঃ

وَلَسْتُ اُبَالِيْ حِيْنَ اَقْتَلُ مُسْلِمًا ۞ عَلٰى اَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذَالِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَاءَ ۞ يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِيْ

আমি যখন মুসলিম হওয়ার কারণেই নিহত হচ্ছি, তখন আমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্‌র কারণে যেদিকেই আমাকে শোয়ানো হোক, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। এ তো মহান আল্লাহ্‌র সত্তায় উৎসর্গকৃত, তিনি চাইলে আমার এই ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও বরকত দিতে পারেন।

একজন সাহাবী তীব্র গতিতে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। চারিদিকে মৃত্যু নগ্ন নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল। তিনি বলছিলেন ঃ

وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى – (الاحزاب : ٢٢)

হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হয়ে এসেছি শুধু এ জন্য, যেন তুমি খুশি হও হে আল্লাহ।

একজনের বক্ষদেশ ভেদ করে তীর বিদ্ধ হলো। সে তীর পৃষ্টের দিকে বের হয়ে পড়েছে। মৃত্যু সমুপস্থিত। তিনি বললেন ঃ

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -

কাবার মালিকের শপথ! আমি তো সফল হয়েছি।

আহযাব যুদ্ধে মুমিনগণ কঠিনভাবে বিপদে পরিবেষ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের পদতল কেঁপে উঠেছিল। তাদের অবস্থানের উপরের দিক থেকে শত্রু বাহিনী অগ্রসর হয়ে এল, এল তাদের নিম্ন দিক থেকেও। সবাইর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। হৃদয় কণ্ঠনালি পর্যন্ত উঠে এল। আল্লাহ্ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা করতে লাগল লোকেরা। মুনাফিকরাও এই সময় নিকাব উল্টিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। তখনই মুসলমানরা বলে উঠলেন ঃ 'আল্লহ্ ও রাসূল আমাদের প্রতারিত করবেন না নিশ্চয়ই।'

এ রূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও মুসলমান ধীরস্থির হয়ে থাকতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্র ওয়াদার কথা স্মরণ করে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

وَلَمَّا رَاَالْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ لا قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا - (الاحزاب : ٢٢)

মুমিনরা যখন শত্রু বাহিনী দেখতে পেল, তারা বলল ঃ এতো তা-ই যার ওয়াদা আল্লাহ এবং তার রাসূল আমাদের কাছে করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের কাছে সত্যই বলেছিলেন। এরূপ অবস্থায়ও তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়েছিল।

যুদ্ধের ময়দানে ও শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও মুমিনদের হৃদয়ে এ প্রশান্ত সমাহিত ভাবধারা কে এনে দিয়েছিল? মৃত্যুর করাল গ্রাস যখন বীভৎস রূপ নিয়ে মুখ ব্যাদান করে আছে, তখনও তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন কেমন করে? একমাত্র ঈমানের কারণে। এ কথাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - (الفتح : ٤)

সেই মহান আল্লাহ্ই মুমিনদের হৃদয়ে পরম প্রশান্তি নাযিল করেছেন, যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে আরও ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আসমান ও জমিনে আল্লাহ্র কত যে বাহিনী রয়েছে তার কিছু লেখাজোখা নেই। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে পরম প্রশান্তি ও স্থৈর্য লাভ করেছে, জেনে রাখো, আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয় পরম প্রশান্তি লাভ করে থাকে। (সূরা রাদ ঃ ২৮)

মুমিনগণ তাদের জীবনের স্থির নিশ্চিত লক্ষ্য বস্তুর সাথে গভীরভাবে পরিচিতি লাভ করতে পেরেছেন, ফলে তাঁরা গভীর আরাম ও আস্বস্তি পেয়েছেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছার নির্দিষ্ট পথ তাঁরা জানতে পেরেছেন, সেই পথ ধরেই তাঁরা চলেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে জানেন, এই পথই হচ্ছে সে সব লোকের পথ যাদের প্রতি আল্লাহ্র অফুরন্ত নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেককার মুসলমান। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) যে পথ প্রদর্শ করেছেন, সে পথই হচ্ছে সত্যিকার হেদায়েতের পথ। সেই পথই আল্লাহ্র পথ।

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ - (الشورى : ٥٢-٥٣)

হে নবী! তুমি তো নিশ্চিতরূপেই হেদায়েত করো সত্য-সঠিক-সুদৃঢ় পথের দিকে। এই পথ সেই আল্লাহ্র, এই আসমান ও জমিনের সব কিছু যাঁর।

এই সঠিক দৃঢ় ঋজু পথে চলে এবং এই পথের নিয়ম-বিধান নিজেদের চরিত্র ও আচার-আচরণে পুরোপুরি কার্যকর করে মুমিনরা নিশ্চিন্ত প্রশান্ত হৃদয়ে। এ পথ কিছুমাত্র আকাবাকা নয়, এ পথ সরল-সোজা ঋজু। কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয়-সন্দেহ বা ইতস্ততভাব তাদের পথ চলাকে ব্যাহত করে না, প্রতিরোধ করে দাঁড়ায় না। কি করব, এটা করব না ওটা করব, এমন জটিলতা কখনো তাদের পায়ের বেড়ি হয় না। তাদের পথের নিদর্শন উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট। প্রত্যেকটি ব্যাপারে তারা সেই নিদর্শন দেখে পথ চলতে পারে। এ পথের চড়াই-উৎড়াই তাদের জানা। বিপদ-আপদ কি আসতে পারে, সে ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ সচেতন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন ঃ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ - يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

মনে রেখো আল্লাহ্র কাছ থেকে তোমাদের কাছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পথ দেখান তাকে, যে তাঁর সন্তুষ্টিব পথ অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তাদের পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনেন তাঁরই অনুমতিক্রমে এবং সত্য-সঠিক সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন। (সূরা মায়েদা ঃ ১৫-১৬)

এতদসত্ত্বেও তার মন-হৃদয় সদা জাগ্রত, হৃদয়দেশ চির আলোকোদ্ভাসিত। সন্দেহ সংকুল অবস্থা দেখা দিলে এই জাগ্রত হৃদয় তাকে পথ দেখায়। এ জন্য বলা হয়েছে, লোকেরা কে কি বলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করো না, তোমার নিজের অন্তরকেই জিজ্ঞেস করো।

মুমিনদের কাছে নৈতিকতার মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাঁর আইন-বিধানের অনুসরণ, তাঁর নিষিদ্ধ পথ পরিহার। তাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস, এ পথেই প্রকৃত সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব। মানবতার সত্যিকার কল্যাণ এ পথেই নিহিত। এই পথে তাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়। অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তাতে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে না, মন এ পথ ছেড়ে ভিন্নতর পথে চলতে রাজি হয় না। যত ক্ষতিই আসুক না কেন, সে পথেই তারা অগ্রসর হয় বীরদর্পে, নির্ভীক চিত্তে। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তার স্নেহাশিস পুত্র ইসমাইল (আ)-এর কিস্‌সা দুনিয়ায় কার অজানা ? বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তানের কামনা করলেন আল্লাহ্‌র কাছে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাই দান করলেন। এই কামনার ধনকে আল্লাহ্‌র জন্য কুরবান করার ইশারা দিলেন আল্লাহ তা'আলা মহান পিতাকে। আল্লাহয় নিবেদিত প্রাণ পুত্র বললেন ঃ

يَٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ - (الصّٰفّٰت : ١٠٢)

হে পিতা! আপনাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে তা আপনি কার্যকর করুন, আল্লাহ চাইলে আমাকে আপনি ধৈর্যশীলই পাবেন।

ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্‌র মর্জি পূরণার্থে প্রাণাধিক পুত্রকে কাত করে শোয়ায়ে দিলেন, তখনই প্রমাণিত হলো, পিতৃ হৃদয় আল্লাহ্‌র মর্জি পূরণে পুরোমাত্রায় প্রণত। তখন আল্লাহ্‌র পরীক্ষার কাজ পূর্ণ সমাপ্ত। তাই তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

يَٰٓاِبْرٰهِيْمُ - قَدْصَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ -(الصّٰفّٰت : ١٠٤-١٠٥)

হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নের ইশারাকে সত্যে বাস্তবায়িত করেছ। আমরা আল্লাহ্‌র নিবেদিত প্রাণ লোকদের এমনি প্রতিফলই দিয়ে থাকি।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র শেষ বাক্য হলো ঃ

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ - (الصّٰفّٰت : ٨١)

সে (ইবরাহীম) নিঃসন্দেহে আমাদের মুমিন বান্দাদেরই অন্যতম।

এই বন্দেগী একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য। এ ঈমান কেবলমাত্র তাঁরই প্রতি। 'একান্তভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী' অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলেই সবকিছুরই

অধীনতা ও আনুগত্য পরিহার করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করা। অতঃপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে বিনয় জানানো হবে না। সবকিছুর অধীনতা ও আনুগত্য থেকে হবে সম্পূর্ণ মুক্তি ও নিষ্কৃতি। বান্দা কেবল আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধই মানবে। মানবে হৃদয়-মনের পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে। সে ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ তাকে বিভ্রান্ত করবে না।

প্রকৃত নিষ্ঠাবান বান্দাই এবাদতকে এরূপ জানে ও তার হক রক্ষা করতে পারে। ফলে সে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌মুখী হয়ে থাকে। আশে পাশের সব প্রতিমূর্তি সে নিঃসংকোচে চূর্ণ করে দেয়। জীবনের বাঁকা-চোরা পথসমূহ নিঃশেষ বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র এক বান্দাহ ঘোষণা করে ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - (الانعام : ١٢٢-١٢٣)

নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার যাবতীয় এবাদত-বন্দেগী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য-ই নিবেদিত। সে আল্লাহ্‌র শরীক কেউ নেই। এভাবেই তাঁকে মেনে নেয়ার জন্যে আমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং তাই আমি-ই হলাম প্রথম আত্মসমর্পণকারী।

মুমিনের সাথে বিশ্বসত্তার সম্পর্ক

মুমিন জীবন-যাপন করে বিশ্বসত্তার সাথে গভীর সম্পর্ক রেখে। এ পর্যায়ে তার হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবধারায়। কেননা এ বিশ্বলোক তার শত্রু নয়, তার অপরিচিত নয়। এ বিশ্বলোকই হচ্ছে জীবন-যাপনের লীলাক্ষেত্র। এর সাথে তার মনের সম্পর্ক, চিন্তার সম্পর্ক, তার নাড়ির সম্পর্ক। এই বিশাল সম্পর্কই তার চিন্তার উপাদান। তাকে চিন্তা-গবেষণায় করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। তার প্রতি আল্লাহ্‌র যে বিপুল নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে, এই প্রকৃতিই তার নিদর্শন। এই বিশাল বিশ্বলোক সর্বাত্মকভাবে বিনীত, অবনমিত, অনুগত আল্লাহ্‌র নিয়ম-বিধানের। মুমিন বান্দাহর পরিচয়ও তাই। বিশ্বলোক এবং তার প্রতিটি অনু-পরমাণু এক আল্লাহ্‌র তসবিহ্ পাঠ করে, পবিত্রতা ঘোষণা করে প্রতিনিয়ত। মুমিনের দিনরাত্রিও অতিবাহিত হয় এই কাজের মধ্য দিয়ে। তাই মুমিন ও বিশ্বলোক একাত্ম, অভিন্ন, একাকার। মুমিন বান্দাহ বিশ্বচরাচরের প্রতি তাকায়, বিশ্বচরাচর তাকে তার

আল্লাহ্‌র দিকে পথ দেখায়। বিশ্বচরাচর মানুষের একান্ত বন্ধু, সহচর। এরূপ উদার বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি মানুষের অন্তঃকরণকে প্রশস্ত করে দেয়, তার জীবন হয় সুখময়। মানুষ যে পরিবেশে বাস করে, সেই পরিবেশ হয় উদার, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত। তখন তার হৃদয় হয় এতটা প্রশস্ত যতটা এই বিশাল বিশ্বলোক। তার জীবন বিস্তৃত ও প্রশস্ত হয় ইহকাল ও পরকাল— উভয় জগতব্যাপী। বিনাশশীল জীবন ও শাশ্বত জীবন উভয়ই সেখানে পাশাপাশি হয়ে দাঁড়ায়। সর্বশেষে এই উভয় জীবন পরিণতি লাভ করে মহান আল্লাহ্‌র সাথে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি যাদের ঈমান নেই, যারা সন্দিগ্ধমনা, তাদের অন্তর হয় সংকীর্ণতর। তাদের জীবনও হয় সংকীর্ণতায় সংকুচিত— কারাগারের চাইতেও বেশি সংকীর্ণ। কেননা তাদের জীবনের আগাও নেই মাথাও নেই। তারা অতীতও জানে না, ভবিষ্যতও ভাবে না। তারা জানে শুধু 'আজ'। শুধু আজ নয়, আজকের আমিই তাদের যাবতীয় চিন্তার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। আর আমি বলতে তারা বোঝে নিজের দেহটি শুধু। অন্য কিছু নয়।

এ এক চিরন্তনই সত্য কথা। চিরকাল থেকে তাই হয়ে এসেছে, চিরকাল তাই হতে থাকবে। এজন্য ধরিত্রীর বুকে প্রথম মানুষের আবাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ঘোষিত হয়েছে ঃ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى - وَمَنْ أَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِىْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا - (طٰهٰ : ١٢٣-١٢٤)

আমার কাছ থেকে যখন-যখনি হেদায়েত আসবে, তখন যে লোকই আমার হেদায়েত মেনে চলবে, সে কখনো গুমরাহ হবে না, ভাগ্যাহত হবে না। পক্ষান্তরে যে লোক আমার হেদায়েতকে অগ্রাহ্য করবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণতার চাপে আক্রান্ত।

তাই আল্লাহ্ বিমুখ লোকদের যদি দেখতে পাও বস্তুগত সুখ-সম্ভোগ ও আরামে-আয়েশে নিমজ্জিত, তাহলে মনে করো না তারা আসালেও খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। কেননা সংকীর্ণতা তাদের বাইরে দেখা যাবে না, সংকীর্ণতা রয়েছে তাদের অন্তলোকে। তার ফলে তাদের গোটা জীবনই সংকীর্ণতায় ভঙ্গুর। এরূপ অবস্থায় তাদের জীবন পশুজাতির সাথে একাকার-একাত্ম হয়ে যায়। আর পশুকুলের জীবন তো এক পেট ঘাস ও পানির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ওদের জীবন একটা চারণভূমির সসীমতার বেড়িতে পরিবেষ্টিত। তার বাইরে ওদের না থাকে লক্ষ্য, না ভ্রূক্ষেপ। ওদের অবস্থা

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো, যার অস্তিত্ব নির্ভর করে তার মা ও মার দুই স্তনের উপর। পরে যখন আরও বড় হয়, তখন তাদের ভাই, পিতা ও খেলার সাথীদের নিয়ে ওদের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এরপর যখন আরো বড় হয় তখন তাদের অনুভূতির ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হয়। এরপর আরো বড় হয়। পূর্ণ বয়স্কতায় পৌঁছালে পর তার অনুভূতি মণ্ডল ছাড়িয়ে অননুভূত পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। তখন তারা উচ্চতর জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

কিন্তু ঈমানদার লোক আল্লাহ ও গায়েবের প্রতি ঈমানের দৌলতে প্রথম পদক্ষেপেই পাশবিকতার পর্যায় অতিক্রম করে মানুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। বালকত্ব ছাড়িয়ে পূর্ণ বয়স্কতার পর্যায়ে চলে যায়। কেননা এই ঈমানই মানুষকে ইন্দ্রিয়গোচর জগত থেকে নিয়ে পৌঁছে দেয় জ্ঞান ও বিবেকের অনধিগম্য জগতে। ফলে মুমিন তার মন ও হৃদয়ের প্রশস্ততার মধ্যে জীবন যাপন করতে পারে। তার জৈব-জীবিকা অনুরূপ প্রশস্ত না হলেও কোনো অসুবিধা হয় না। ঈমানের প্রকৃতি বা ধর্মই হলো মন, হৃদয় ও জীবনের প্রশস্ততা বিধায়ক। তা ঈমানদারকে মহা সত্তার সাথে মিলিত করে দেয়। তখন প্রকাশ-অপ্রকাশ, উচ্চতর ও নিম্নতর— যা দেখা যায়, যা দেখা যায় না, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার কাছে একাকার হয়ে যায়। আকাশ জগত, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই হয় তার অতীব নিকটবর্তী। ফেরেশতারাও তাদের কাছে চলে আসে। আল্লাহ্‌র যেসব সৈন্য-সামন্ত শক্তি ও আরশবহনকারী— যাদের এক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করে। আল্লাহ্‌র ওহী বহনকারী এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্তকার সমস্ত রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাদের সঙ্গে তারা এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। পরকাল, পুনরুত্থান হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম— কোনো কিছুই আর তার আগোচরীভূত থাকে না। সর্বপরি সমস্ত আবরণ ভেদ করে যারা আল্লাহ্‌র অতি সান্নিধ্যে পৌছে যায় তারা হয় আল্লাহ্‌র নিকটতম, প্রিয়তর। মুমিনের হৃদয় সুপ্রশস্ত আনন্দ-উৎফুল্ল থাকে। কেন হবে না ? আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, আরশ-কুরসী, ইহকাল-পরকাল, নশ্বর-অবিনশ্বর— এ সবের বিশাল-বিশালতায় হয় তার বিচরণ। তারা একটা আলোকমালার মধ্যে অবস্থান করে। যেখানে তাঁরা প্রতি মুহূর্তেই পথের দিশা লাভ করে। গোটা পরিবেশই থাকে তাদের সামনে সদা উন্মুক্ত। মানুষ যে পরিমণ্ডলে বাস করে তাকে অধিকতর প্রশস্ত করে দেয়াই আলোর ধর্ম। অন্ধকারকে বিলীন করে দেয় সমস্ত পরিমণ্ডল থেকে। কিন্তু যারা অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তারা কিছুই দেখতে পায় না তাদের চতুষ্পার্শ্বের। এমতাবস্থায় সহসা আলোক মশাল জ্বলে উঠলে তাদের চোখ ঝলসে যায়, দেখতে পায় তারা নিজেকে, পরিমণ্ডলের সবকিছুকে। এ আলোক মশাল যদি

অধিকতর তেজস্বী হয়, তাহলে অধিক বিশাল এলাকা তার সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তোলে। তখন আলো যতটা তেজস্বী, দৃষ্টি শক্তি যতটা স্বচ্ছ, ততখানি বিশাল এলাকা জুড়ে তার দৃষ্টির তৎপরতা চলতে পারে।

রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ - (الزمر : ٢٢)

আল্লাহ্ যার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন, সে আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া একটা 'নুর'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর তাৎপর্য কি ?

জবাবে নবী করীম (স) এরশাদ করেছিলেন ঃ

اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ فِى الْقَلْبِ اِتَّسَعَ وَانْفَسَحَ -

'নূর' যখন হৃদয়-দেশে অনুপ্রবেশ করে তখন হৃদয়-দেশ প্রশস্ত হয়, সম্প্রসারিত হয়।

এ 'নূর'-এর মূল উৎসই হচ্ছে ঈমান। ঈমানের 'নূর' ও প্রত্যয়ে হৃদয়-দেশ উন্মীলিত, উন্মোচিত ও সম্প্রসারিত হয়। যেমন নাস্তিকতা, সংশয় ও নিফাকের অন্ধকারে তা হয় সংকুচিত। এ কথা কুরআনের ঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا - (الانعام : ١٢٥)

আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দিতে ইচ্ছা করেন, তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। পক্ষান্তরে যাকে গুমরাহ করতে চান, তার হৃদয়টাকে সংকীর্ণ ভারাক্রান্ত করে দেন।

'আল্লাহ ইচ্ছা করেন' অর্থাৎ যে লোক নিজে ইচ্ছা করে হেদায়েত গ্রহণ করে না, তার হৃদয়কে ইসলাম কবুল করার জন্য আল্লাহ কখনো খুলে দেন না, বরং তখন আল্লাহ তার হৃদয়টাকে সংকীর্ণ করে দেন। সেখানে নানা চিন্তায় সমাকীর্ণ জংগলের সৃষ্টি হয় এমন যে, তাতে ঈমানের 'নূর' প্রবেশ করতে পারে না। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ - (بخارى، مسلم)

আল্লাহ্ যার কল্যাণ চাহেন তিনি তাকে দ্বীনের সমঝ-বুঝ দান করেন।

দ্বীনের সমঝ-বুঝ লাভ করার জন্য ঈমান ও ঈমান কবুল করার জন্য হৃদয় দেশ উন্মুক্ত হওয়া জরুরী। আর যার হৃদয়-দেশ উন্মুক্ত হয়, সে যেমন ঈমান লাভ করতে পারে, তেমনি দ্বীনের সমঝ-বুঝও লাভ করতে পারে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে।

মুমিন আল্লাহ সাহচর্যে জীবন যাপন করে

আল্লাহ্র প্রতি যাদের ঈমান নেই, তাদের মনোলোকে নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক রোগের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কেবলমাত্র মুমিনরাই সর্বপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক রোগ থেকে মুক্ত। মনস্তাত্ত্বিক রোগের উৎস হচ্ছে পীড়াদায়ক নিঃসঙ্গতাবোধ। নিঃসঙ্গতাবোধের রোগ যাদের মানসলোকে বাসা বেঁধেছে, তারা এ বিশাল জগতটাকে মনে করে তালাবদ্ধ, নিঃচ্ছিদ্র। সে এই বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্বে যাপন করে একক নিঃসঙ্গ (Segregated) জীবন। সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজের রক্ষা পাওয়া একক যাত্রী যেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা তাকে ভাসাতে ভাসাতে ও দোলাতে দোলাতে একটা ক্ষুদ্র জনশূন্য দ্বীপের রিক্ত শূন্য রৌদ্রে খাঁ খাঁ করা বেলাভূমে পৌঁছে দিয়েছে যেন। যেন সে তখন একদিকে দেখতে পায় তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্র, অপরদিকে ঊর্ধ্বে দিগন্ত বিস্তীর্ণ আকাশ। প্রবল বায়ু ও তরঙ্গের হৃদয়-বিদারক ঝঞ্ঝাধ্বনি ছাড়া তার কর্ণকুহরে আর কিছুই পৌঁছে না।

একজন লোকের পক্ষে এই পরিবেশটি যে কত ভয়াবহ বিপদসংকুল, তা বলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এখানকার একক জীবনে যে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা যা হতে পারে তা বিশ্লেষণ করার সাধ্য কারো নেই। বিশাল কয়েদীবহুল কারাগারে যাকে নিঃসঙ্গ (Segregated) করে সেলবন্দী করা হয়, অন্যদের সাথে মেলা-মেশার সুযোগ যার নেই, তার মানসিক অবস্থাটা চিন্তা করলেই আমাদের বোধগম্য হবে বেঈমান লোকের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সঠিক রূপ।

বিশেষজ্ঞদের মত মনস্তাত্ত্বিক রোগ অন্যান্য সর্ব প্রকার রোগের তুলনায় অধিক মারাত্মক ও পীড়াদায়ক। কেননা এ রোগের রোগীদের ধারণা, তাদের পরিবেশের সবকিছুই তাদের বিপরীত পথগামী। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা প্রতিবন্ধক। এরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করে, সবকিছুকেই তাদের শত্রু মনে হয়। কেউ তাদের আপনজন তা তারা আদৌ ভাবতে পারে না। ঘুরে ফিরে তাদের দৃষ্টি কেবল নিজের উপরই পড়ে। একটি ক্ষুদ্র পরিসর রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতরে চতুর্দিকের দেয়ালের দর্পণ খাড়া করে তার মধ্যে একটি লোককে দাঁড় করিয়ে দিলে সে যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই কেবল নিজেকেই প্রতিফলিত দেখতে

পারে, বেঈমান লোকদের অবস্থাটা ঠিক এ লোকটিরই মতো। এ লোকটি শেষ পর্যন্ত নিজের পরিবেশ থেকে পালাতে চাইবে; কিন্তু রুদ্ধদ্বার বলে পালানোও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন সে ভয়-বিহ্বলতায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হওয়া ছাড়া কোনো পথ পাবে না।

এইরূপ অবস্থায় পড়া ব্যক্তির পক্ষে দুনিয়ায় কোনো কাজ করা কি সম্ভব ? কাজ করার জন্য মন-মানসিকতা ও মগজের নিবিড় প্রশান্তি ও সুস্থতা অপরিহার্য। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি এ সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। মানসিক ব্যধিগ্রস্ত এই ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। তখন তার একমাত্র লক্ষণ দেখা যাবে, সে শুধু পালাতে চায়— শুধু পালাতে চায়।

ডঃ মরীস যুবথেল নিউইয়র্কের বিবেক-বুদ্ধির স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তির নিঃসংগতার অনুভূতিজনিত রোগের পরিণতিতে বিবেক-বুদ্ধির চরম বিপর্যয় সংঘটিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চিকিৎসার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো কোনো দ্বীন বা ধর্মকে পুরোপুরি গ্রহণ করা, ঈমানের সুদৃঢ় রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করা এবং তার মনে এই বিশ্বাস ও অনুভূতি তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয়া যে, সে একা নয়, নিঃসঙ্গ নয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাই তার সঙ্গে রয়েছেন। এই বলিষ্ঠ ঈমান-ই মনস্তাত্ত্বিক রোগের একমাত্র ঔষধি। তাই আল্লাহ্র প্রতি যাদের সঠিক ঈমান রয়েছে, কেবল তারাই এ রোগ থেকে চিরমুক্ত। এ ধরনের রোগ তাদের কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

ডঃ ফ্রাংক লোবাখ আলমানীয় মনস্তত্ত্ববিদ। তিনি বলেছেন ঃ তুমি যখনি নিজেকে একক ও সঙ্গীবিহীন অনুভব করবে, তখনি তোমাকে জোর করে হলেও মনে করতে হবে ঃ "না, আমি একা নই, নিসঙ্গ নই।" তুমি যখন একটি রাজপথের পাশ দিয়ে যাচ্ছ, তখন তোমার মনের এই প্রত্যয় থাকতে হবে যে, আল্লাহ তোমার চিরসহচর হয়ে পথের অপর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু মুমিন-মুসলমানের অনুভূতি ও প্রত্যয় হয় এর চাইতেও গভীর, তীব্র, ব্যাপক। সে যেখানেই, যে অবস্থায়ই থাকুক, আল্লাহ তার সঙ্গে রয়েছেন, এটা কেবল তার ধারণা বা খোশ খেয়ালই নয়, এটা তার ঈমান— তার অনন্য ইয়াকীন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْآ اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ - (محمّد : ٣٥)

অতএব তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়ো না, সন্ধি করার আবেদন পেশ করো না। আসলে তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। আর তিনি তোমাদের আমলসমূহকে কখনোই বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দেবেন না।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্র এই বাণী উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ –

আমি আমার বান্দার আমার সম্পর্কিত ধারণা অনুরূপ। সে যখন-ই আমাকে স্মরণ করবে, আমি তার সঙ্গেই রয়েছি।

পাশ্চাত্য দেশের জনৈক লেখক সাহিত্যিকের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ একটি সাধারণ দ্বার পথে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আমি বললাম, আমাকে এমন একটা আলো দাও, যার দ্বারা আমি পথের অন্ধকার আলোকোদ্ভাসিত করে তুলতে পারব।

লোকটি বলল, তোমার হাত আল্লাহ্র হাতে সঁপে দাও। তাহলে তিনি তোমাকে সঠিক-সত্য-সরল পথ দেখাবেন।

মুমিনের হৃদয়-মনে চিরজাগ্রত চেতনা হচ্ছে, তার নিজের হাত আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। তাঁর দয়া-অনুগ্রহ প্রতি মুহূর্তে তার প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। সে তাঁর দৃষ্টিসম্মুখে চিরবিরাজমান, সে চক্ষু কখনো তন্দ্রা ভারাক্রান্ত বা নিদ্রাচ্ছন্ন হয় না। এবং তিনি সব সময়ই তার সঙ্গে রয়েছেন— সে যখন যেখানেই থাকুক না কেন। তিনিই তার নিঃসঙ্গতার ভীতি-বিহ্বলতা দূর করে দিচ্ছেন চিরসঙ্গী হয়ে থেকে।

মুমিন লোক কি করে নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে পারে? তারা তো কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী এবং সে কুরআনই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ –

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য— সমগ্র বিশ্বলোক তো আল্লাহ্রই। তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহ রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বিশাল সম্প্রসারণময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ – (الحديد : ٤)

তোমরা যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্ম দেখছেন।

এই অনুভূতি সবই ঈমানদার লোকেরই। হযরত মূসা নবীও এই অনুভূতির দরুন বনি ইসরাঈলদের বলেছিলেন ঃ

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنَ -

নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার আল্লাহ। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।

এই বিশ্বাস ছিল বলেই নবী করীম (স)-ও গুহার অভ্যন্তরে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ

لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - (التوبة : ٤٠)

ভীত-সন্ত্রস্ত-দুঃখিত হওনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

আল্লাহ্র সাহচর্য ও নিকটবর্তিতার চেতনা মুমিনকে আল্লাহ তা'আলার সার্বক্ষণিক সংস্পর্শে আটকে রাখে। তার হৃদয়-দেশ আল্লাহ্র নৈকট্য নূরে থাকে সদা সমুদ্ভাসিত। সে যদি পুঞ্জীভূত সূচীভেদ্য অন্ধকারেও নিমজ্জিত থাকে কখনো, তবু তাতে তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। এই ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি তার সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে।

নবী-রাসূল ও সিদ্দীকদের সান্নিধ্যে মুমিনের জীবন

মুমিন সব সময় সাধারণ মুমিনদের গভীর সান্নিধ্যে জীবন-যাপন করে। সে একাকী হলেও মানসিক দিক দিয়ে কখনো একাকিত্ব বোধ করে না, নিঃসঙ্গ হয়ে যায় না। সে সব সময়ই নিজেকে অন্যান্য শত-সহস্র মুমিনদের সঙ্গী এবং অন্যান্যদের নিজের অতীব নিকটে মনে করে। সে একাকী নামায পড়লেও প্রতি রাক'আতে পড়ে ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

আমরা কেবল তোমারই বন্দেগী করি হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমারই সাহায্য চাই হে আল্লাহ!

একা হয়েও 'আমরা' বলার মূলে এই তাৎপর্যই নিহিত। সে যখন কিছু চায়, তখন সে কেবল একা নিজের জন্যই চায় না, চায় তারই মতো অন্যানা সবারই জন্য। তাই তার দোয়া ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

আমাদের সরল সঠিক সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো হে আল্লাহ!

নামাযের দো'আয়ও এই ভাবধারাই বিধৃত ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ -

শান্তি ও রহমত হোক আমাদের উপর, আর আল্লাহ্‌র সব নেক বান্দাদের উপর।

কেবল বর্তমান কালে জীবিতরাই তার সান্নিধ্যে থাকে না। দূর অতীত কালের মুমিনরাও তাদের ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়। তাই একজন মুমিনও যখন দো'আ করে তখন বলে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ - (الحشر : ١٠)

হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাদের সে সব ভাইদেরও, যারা ঈমান আনার ব্যাপারে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের পূর্বগামী ঈমানদার লোকদেরও।

মুমিনের চেতনা এই যে, সে তার ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে আল্লাহ্‌র নবী ও প্রিয় রাসূলগণের সংস্পর্শে জীবন যাপন করছে। প্রত্যেক যুগের ও কালের এবং প্রত্যেক জাতির সব নেক বান্দা, শহীদ ও সিদ্দীকগণ তার চির সহচর। কেননা আল্লাহ্‌র কুরআনেই এই কথা ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا - (النساء : ٦٩)

যে লোকেরাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ করে, তারাই সেই লোকদের চিরসঙ্গী, যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন। তারা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক আমলকারী লোকেরা এবং এরাই উত্তম সহচর বন্ধু।

সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে এরাই যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং এদের সহচর বন্ধু হতে পারা যে সবচাইতে বড় ভাগ্যের কথা, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? এ বন্ধুত্ব ও সাহচর্য দৈহিক বা আঙ্গিক ও আকার-আকৃতিগত নয়। এ হচ্ছে আত্মিক বন্ধুতা ও সাহচর্য। চিন্তা-বিশ্বাস ও মন-মানসিকতা-আন্তরিকতার একত্ব। এটা কোনো হিসাবেই সামান্য বা নগণ্য ব্যাপার নয়। এ বন্ধুতা ও সাহচর্য লাভও নয় একবিন্দু সহজ কাজ।

নামায ও দো'আ মুমিনদের মানসিক প্রশান্তির বাহন

বস্তুবাদী ও নাস্তিক লোকেরা যে মানসিক প্রশান্তি ও স্থৈর্য থেকে বঞ্চিত, মুমিনরা তা লাভ করে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কদমে কদমে। মুমিন লোক দিন-রাত

২৪ ঘন্টায় অন্তত পাঁচবার করে নামাযে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়ায়, তার কাছে সুগভীর আন্তরিকতা সহকারে কাতর প্রার্থনা জানায় এবং এর মাধ্যমেই সে লাভ করে মনের সুগভীর প্রশান্তি ও স্থৈর্য।

দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুমিন যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার আত্মার উৎকর্ষ ঘটে। তখন বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে থাকে না কোনো প্রাচীর, কোনো প্রতিবন্ধক, কোনো মাধ্যম, কোনো আবরণ। সবকিছু দূরীভূত হয়ে যায় তখন। সে নিজ সত্তা ও হৃদয়-মন নিয়ে সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র সম্মুখবর্তী হয়ে যায়। তখন তার হৃদয়-মন এক আকুল ভাবধারায় পরিপূর্ণ ও উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে।

আল্লাহ্‌র সাথে এইরূপ ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্য লাভের ফলে মুমিনের হৃদয় মনে একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়। জেগে ওঠে একটা প্রবল মনোবল এবং আত্মার একটা গভীর প্রশান্তি। আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জন্য নামাযকে একটা বড় হাতিয়ার বানিয়ে দিয়েছেন। এর সাহায্যে সে তার জীবন সংগ্রামে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সরাসরি শক্তি ও সাহায্য লাভ করে থাকে। কঠিনতম বিপদেও সে সক্ষম হয় ধৈর্য ধারণ করতে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা সাহায্য লাভ করো ধৈর্য-স্থৈর্য ও নামায থেকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)

তাই দেখতে পাই, নবী করীম (স) যখনই কোনো ভয়াবহ ব্যাপারে সম্মুখীন হতেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর তাঁর নামায যে নিতান্তই দাঁড়ানো ও ওঠক-বৈঠক মাত্র হতো না, একটা অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠান মাত্র হতো না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ নামাযে তিনি গভীর একাকিত্বে আল্লাহ্‌র কাছে মর্মবেদনা জানাতেন। এজন্য তিনি বলেছেন ঃ

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ -

নামাযে আমার দুই চোখের শান্তি ও শীলতা রেখে দেয়া হয়েছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেল কার্নেগী আল্লাহ্‌র ঐকান্তিক উপাসনায় মানব মনে যে আশ্চর্য ধরনের ভাবধারার প্রতিফলন ঘটে, তা অকপটে স্বীকার করেছেন। ধর্ম নির্বিশেষে যে-কোনো উপাসানার, আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটির ও কাতর প্রার্থনার একটা মহত্তর ভাবধারার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তার কথার সার নির্যাস এই ঃ

তুমি ধার্মিক হও বা না হও, একথা জেনে রাখো আল্লাহ্র উপাসনা তোমাকে বিরাট শক্তি দিতে পারে। কেননা আল্লাহ্র উপাসনা একটা বলিষ্ঠ সক্রিয় কার্যক্রম। আমি মনে করি, আল্লাহ্র উপাসনা তোমাকে এমন তিনটি জিনিস দিতে পারে, যা না হলে মানুষের চলে না, সে ঈমানদার হোক, কি বে-ঈমান।

১. যেসব ব্যাপার তোমার হৃদয়-মনকে ব্যতিব্যস্ত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে, আল্লাহ্র উপাসনা তোমাকে তা থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি দিতে পারে। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, একটা না একটা বিপদ বা সমস্যা তাকে দিশেহারা করে দেবেই। এরূপ অবস্থায় সে যদি আল্লাহ্র সম্মুখে উপাসনায় দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সে যেমন সমস্যার সমাধান পাবে, তেমনি তার বিপদও অনেকখানি কেটে যেতে পারে। মনের দুঃখভার লাঘব হবে।

২. এই উপাসনা তোমার মনে এই চেতনা জাগাবে যে, এই বিশাল বিশ্বলোকে তুমি তোমার সমস্যা সমাধানে ও দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ বিদুরণে একাকী নও, নিঃসঙ্গ নও। অনেক সময় মন এতটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, তখন মনের দুঃখ ও আবেগ আমরা নিকটতর বন্ধুর কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য হই। সে ক্ষেত্রেও মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে হৃদয়ের আবেগ ও বেদনা প্রকাশ করা অন্যান্য সব উপায়ের তুলনায় অধিক কর্তব্য বলে বিবেচিত। এ কথাটা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত।

৩. এরূপ অবস্থায়ও উপাসনাই আমাদের কর্মে অনুপ্রাণিত করে, পদক্ষেপ গ্রহণে করে সাহসী ও আগ্রহী। বরং এই উপাসনাই হয় কর্মের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। কোনো মানুষ সত্যিকারভাবে উপাসনা করলে সে কোনো ফায়দাই পায় না— একথা আমি বিশ্বাস করি না। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আলেকসিজ কারেল বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্র উপাসনাই একটা বিরাট শক্তি, মানব-মনের গভীর প্রশান্তির উদগাতা, আজ পর্যন্ত তাই সত্য বলে জানা গেছে। তাহলে তুমি তা করে উপকৃত হও না কেন ?

এই বিশ্লেষণে উপাসনার স্থানে সোজাসুজি 'নামায' শব্দটি বসিয়ে দিলেও মূল কথায় কোনো তারতম্য ঘটে না। কিন্তু ইসলাম যে নামাযের শিক্ষা দিয়েছে, তা এ সাধারণ উপাসনার তুলনায় অনেক গভীর— পবিত্রতার প্রধান নেয়ামত। তাতে প্রথমে অর্জিত হয় দৈহিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা। আর তা মনের ভার লাঘবের একটা প্রধান বাহন। নামাযে কুরআন পাঠ করা হয়। তা যেমন আত্মার উৎকর্ষ বিধানকারী, তেমনি মন-মগজ তৈরীরও মাধ্যম। তাতে যে সব সামগ্রিক-সামষ্টিক শিক্ষা রয়েছে, তা মানুষের নিঃসঙ্গতার অনুভূতিটাকে নিঃশেষে

বিলুপ্ত করে। কঠিন দুঃখ ও বিপদের সময় মুমিন নামাযে দাঁড়িয়ে কত না মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে; আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া প্রার্থনাও এরূপ অবস্থায় মানব-মনের বোঝা অনেকখানি হালকা করে দেয়। রাসূলে করীম (স) তায়েফ থেকে ক্ষত-বিক্ষত দেহ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়-মন নিয়ে ফিরে এসে দুই হাত ঊর্ধ্বপানে তুলে ধরে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَ اِنِّىْ عَلَى النَّاسِ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ - وَاَنْتَ رَبِّىْ ....

হে মহান আল্লাহ! আমি আমার দুর্বল শক্তি ও লোকদের উপর আমার প্রভাবহীনতা ও নিরুপায়তার কথা তোমার কাছেই পেশ করছি। হে দয়াময়! তুমি সব দুর্বলদের মালিক— আমারও আল্লাহ তুমিই ...

এরূপ দো'আ করে একদিকে তিনি যেমন মনের শান্তি পেয়েছিলেন, মনের দুঃখভার অনেক লাঘব হয়েছিল, তেমনি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন দৈহিক আঘাতের কষ্টও।

মুমিন যদি বা 'হায়'-এর ধার ধারে না

মানুষ মাত্রেরই মনে দুঃখ-কষ্ট, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অতীতের জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা, বর্তমানের জন্য ক্রোধ-অসন্তোষ এবং ভবিষ্যতের ভয়-আশঙ্কা বোধ জাগে এবং তা মানুষকে এতখানি জর্জরিত করে যে, মানব-মনে সুখ-শান্তি, স্বস্তি-প্রশান্তি বলতে কিছুই থাকে না। মানুষের উপর বিপদ আসে। সে বিপদ সহসা দূরীভূত হয় না, দীর্ঘদিন পর্যন্তই হয়ত মানুষকে পীড়া দিতে থাকে। ফলে মানুষ হয় বিপর্যস্ত। তখন মানুষ যেমন অনুতাপ-অনুশোচনা, মানসিক পীড়া ভোগ করে, তেমনি নিজের প্রতি ধিক্কারও জাগে। তখন সে আফসোস করতে শুরু করে এই বলে ঃ হায়! আমি এমনটা কেন করতে গেলাম, হায়, আমি যদি এই কাজ না করতাম। আমি যদি এটা করতাম, তাহলে এটাই হতো— যদিও এই ধরনের অনুতাপসূচক কথার বাস্তব মূল্য কিছুই নেই, তবু মানুষ সাধারণত এরূপই করে থাকে। কিন্তু এটা মানুষের মানসিক শান্তির প্রতিবন্ধক, অশান্তির প্রবর্ধক। এ কারণে মানসিক রোগ-চিকিৎসক, সমাজ সংস্কারক ও প্রশিক্ষণদাতা— তথা কাজের লোকেরা উপদেশ দিয়ে থাকেন ঃ অতীতের দুঃখ ভুলে যাও। আজকের বাস্তবকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হও। কেননা যা অতীত, তা আর কোনো দিনই ফিরে আসবার নয়।

এই কথাটি বোঝাবার জন্য আমেরিকার কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে কে আছে যারা কাষ্ঠ কাটার কাজ করেছে ? তখন বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র তাদের হাত তুলে ইতিবাচক জবাব দিল। অধ্যাপক আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের কয়জন লোক কাষ্ঠগুড়ি বা ভূষি কাটার কাজ করেছে ? এ প্রশ্ন শুনে একজন ছাত্রও হাত তুলল না। তখন অধ্যাপক ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ এ প্রশ্নের জবাবে তোমাদের নিরুত্তর থাকাই স্বাভাবিক। কেননা কাষ্ঠ চিরিলেই তবে কাঠের গুড়া বা ভুষি হয়। তা আর কেউ কাটে না, তা কাটা যায়ও না। যা অতীত হয়ে গেছে, তার ব্যাপারটিও ঠিক এমনি। কাজেই অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগে, তাহলে তোমরা মনে করবে, তোমরা কাষ্ঠগুড়ি আবার কাটতে চাইছ। অন্য কথায়, যা হয়ে গেছে, যা আবার করা যায় না— তাই নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছ। অর্থাৎ নিতান্তই নিষ্ফল কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, সময়ের অপচয় করছ।

অনেক মানুষই মানসিক দুর্বলতায় কঠিনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে, অতীতের জন্য অনেক কান্নাকাটি করে। যা হারিয়ে গেছে, তার জন্য আফসোস করতে গিয়ে দুঃখে কলিজা ফেটে যায়! এরূপ হয় না এমন মানুষ খুব কমই দেখা যায়। কেবল মুমিন লোকদের সম্পর্কেই একথা সত্য যে, তাদের এরূপ অবস্থা হতে পারে না— হওয়া উচিত নয়, কাম্য নয়। কেননা মুমিনের অন্তরেই একটা সুদৃঢ় প্রত্যয় চির জাগরূক হয়ে থাকে। সে তার তক্‌দির ও নিয়তির প্রতি বিশ্বাসী। কাজেই অতীতের যে সব দুঃখ-কষ্ট তাকে ভোগ করতে হয়েছে, সে সম্পর্কে তার মনে এই প্রবল বিশ্বাস জেগে ওঠে যে, তা তার তক্‌দিরের লিখন। আল্লাহ্ তা'আলাই তার ভাগ্যে যদি এটা না লিখতেন, তাহলে তা কখনো হতে পারত না। সে তখন এমন হিসাবে শুরু করে না যে, আমি যদি এইরূপ করতাম তাহলে এইরূপ হতে; ওরূপ হতে পারত না; বরং সে তখন বলে সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। আর হয় শুধু তা-ই, যা আল্লাহ্ চান। আর এই যখন প্রকৃত ব্যাপার তখন অসন্তোষের উদ্রেকে কি লাভ। মনকে দুঃখে-অনুতাপে ভারাক্রান্ত করে কি ফল পাওয়া যাবে ? আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন ঃ

مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - (الحديد : ٢٢-٢٣)

পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের উপর যে-কোনো বিপদই আসে তা আমরা তাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিখে রেখেছি। এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ। এসব এজন্য করা হয়েছে, যেন তোমাদের যা কিছু ক্ষতি হয় সেজন্য তোমরা দুঃখিত হও আর যা কিছু আল্লাহ্ তোমাকে দেন সেজন্য অহংকারী হয়ে না পড়। আল্লাহ্ এমন লোক পছন্দ করেন না, যারা নিজেদেরই বড় কিছু মনে করে এবং অহংকার করে বেড়ায়।

ঐতিহাসিক ওহুদ যুদ্ধে সত্তরজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন; এ সময় মানসিক রোগে আক্রান্ত মুনাফিকরা নানারূপ বিদ্বেষাত্মক কথাবার্তা বলতে শুরু করে দেয়। তাদের কথা তুলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জবাব দিয়েছেন ঃ

يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ - (اٰل عمرٰن : ١٥٤)

তারা বলে, ব্যাপারটা যদি কিছুমাত্র আমাদের হাতে থাকত, তাহলে আমরা এমনিভাবে এখানে মারা যেতাম না। হে নবী! তুমি বলে দাও, যাদের ভাগ্যে নিহত হওয়া লিখে দেয়া হয়েছে তারা যদি নিজেদের ঘরে শুয়ে থাকত তবুও তারা তাদের নিহত হওয়ার স্থানে বের হয়ে আসত অবশ্যই।

এই মুনাফিকরাই বলেছিল, ওরা যদি আমাদের কথামতো কাজ করত, তাহলে এমনিভাবে নিহত হতো না। তাদের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - (اٰل عمرٰن : ١٦٨)

বলো, তোমরা যদি এ কথায় সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের নিজেদের থেকেই মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দাও না।

মুমিনরা মুনাফিকদের মন-মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা কাফের বেঈমানদের মতোও নয়, যারা বিদেশগামী বা যুদ্ধে যোগদানকারীদের সম্পর্কে বলত ঃ

لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۞

ওরা যদি আমাদের নিকটে থাকত, তাহলে ওরা না মরত, না নিহত হতো।

এদের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন ঃ

لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - (اٰل عمرٰن : ١٥٦)

ওদের এসব কথা-বার্তার কারণ হলো, আল্লাহ ওদের অন্তরের দুঃখ-অনুতাপ জাগিয়ে দিতে চান। আসলে জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা তো আল্লাহই। আর তোমরা যা কিছু করো, তা সবই আল্লাহ দেখতে পান।

বস্তুত ঈমানদার ব্যক্তির মন ও মানসিকতা চিরকালই এমনি থাকে। তাদের কথা স্পষ্ট-সহজ-সোজা ঃ যা আল্লাহ চাহেন তাই তিনি করেন। আর সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র শোকর। এ কারণে যা তারা হারায় সে জন্য তারা অনুতাপ করে না। স্মৃতি ও স্মরণের যন্ত্রণা তাদের মনকে পীড়া দেয় না। তারা কুরআনেরএ ঘোষণা পেয়েই নিজেদের মনে পরম প্রশান্তি পেয়ে যায় ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - (التّغابن : ١١)

যে বিপদই কারো উপর আসে, তা কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে। যে লোক আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়েত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত, জ্ঞানী।

আর এই চিন্তা-বিবেচনাই মুমিনের দিলে জাগিয়ে দেয় স্বস্তি এবং সন্তোষ।

সুখ ও সন্তোষ

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْفَرْحَ وَالرَّوْحَ فِىْ الرِّضَا وَالْيَقِيْنِ - وَجَعَلَ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ فِىْ السَّخَطِ وَالشَّكِّ -

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সুখ ও আনন্দ রেখেছেন সন্তোষ ও দৃঢ় প্রত্যয়ে এবং অসন্তোষ ও সংশয়ে রেখেছেন দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও উদ্বেগ।

হাদীসের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সত্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ্র স্বাভাবিক ব্যবস্থানুযায়ী যেমন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয় বস্তুজগতের নিয়মে, মনস্তাত্ত্বিক জগতেও আল্লাহ্র ব্যবস্থানুযায়ী আনন্দ, স্ফূর্তি, সুখ-বোধ ও মানসিক শান্তি ও স্বস্তি রেখেছেন সন্তোষ ও দৃঢ় প্রত্যয়ে। মানুষ যদি নিজের ও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার 'আজ' ও 'এখন' বর্তমান নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে এবং আল্লাহ্র পরকাল ও বিচার-প্রতিফলের ব্যাপারে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে সে নিশ্চিত হতে পারে আগামীকাল তথা ভবিষ্যত সম্পর্কে। পক্ষান্তরে বেঈমান লোক কি করে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে তার 'আজ'কে নিয়ে এবং তার 'কল্য' সম্পর্কে ? যেহেতু তাদের মনে সংশয়, অস্বস্তিবোধ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, সেজন্য দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় তাদের মনোলোক ভারাক্রান্ত হয়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক— এ-ই আল্লাহ্র নিয়ম।

স্বতঃই যারা ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট ও সন্দেহপ্রবণ, তারা জীবনে কোনো আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। তাদের গোটা জীবনই কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন, পুঞ্জীভূত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তাদের জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিশার অবসানে দিনের নতুন সূর্যের উদয় ঘটে না কখনো রঙীন ঊষার মাংগলিক ধ্বনিত হয় না তাদের কর্ণ কুহরে। উপরোক্ত হাদীসটিতে অসন্তোষ ও সংশয়কে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটো পরস্পর যুক্ত, ওতপ্রোত। সংশয় ছাড়া অসন্তোষ হয় না, অসন্তোষ ও ক্ষোভ জমে না সংশয় ব্যতিরেকে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ স্বতঃ অসন্তুষ্ট ব্যক্তি সংশয় থেকে খুব কমই মুক্ত থাকতে পারে। সংশয়-ক্ষুব্ধ ব্যক্তির মন ও মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রাখবেই, সে বিষয়ে তার

চেতনা হোক আর নাই হোক। অনুরূপভাবে সন্তোষ ও প্রত্যয় পরস্পর ভ্রাতৃপ্রতীম, চিরসঙ্গী।

অসন্তোষ ও রোষসম্পন্ন ব্যক্তি চিরদুঃখী। মানসিক যন্ত্রণা তার সীমা-শেষহীন, হৃদয় তার সংকীর্ণ-সংকুচিত। ফলে তার জীবনটাও সংকীর্ণতার তীব্র চাপে থাকে ভারাক্রান্ত হয়ে। সে সংকীর্ণতা দেখা যায় তার নিজের প্রতি, দেখা যায় অন্যদের প্রতিও। সব জিনিসের ব্যাপারেই তার সংকীর্ণতা তীব্র ও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এই পৃথিবী তার বিপুল বিশালতা সত্ত্বেও তার দৃষ্টিতে সূচের ছিদ্রতুল্য।

মুমিন ব্যক্তিদেরও মানসিক কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ফেনায়িত দুঃখ তাদেরও বক্ষদেশে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। এই কারণেই অবস্থা বিশেষে রাসূলে করীম (স)-কেও আল্লাহ তা'আলা বলার প্রয়োজন মনে করেছেন ঃ لاتحزن عليهم —তুমি ওদের ব্যাপারে দুখিত হবে না ولايحزنك قولهم —ওদের কথাবার্তা যেন তোমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে না দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুমিনের দুঃখ-দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ হয় যতটা নিজের জন্য তার চাইতে অনেক বেশি হয় অন্য লোকদের জন্য। তারা যদি নিজেদের জন্য দুঃখিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্বিগ্ন হয়ও তবুও তা দুনিয়ার তুলনায় পরকালীন ব্যাপার নিয়েই হয় অধিক মাত্রায়। তাদের হৃদয়-মন যদি কখনো কোনো বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ও তবে তা স্থায়ী হয় না, হয় নিতান্তই অস্থায়ী। তা শীতকালীন মেঘের মতো দ্রুত অপসৃয়মান। ঈমানের মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহেই তা নিঃশেষ বিলীন হয়ে যায় কোনো অদৃশ্য নীলিমায়। কত সংকুচিত মন ও অস্বস্তিতে ভরা স্বভাব প্রকৃতির লোক ঈমানের সামান্য আলোক সম্পাতেও আনন্দ ও সুখানুভূতি সম্পন্ন হয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যে। তারা হয় সদা উৎফুল্ল।

কিন্তু আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সন্দিগ্ধ হৃদয় মানুষ অশেষ মানসিক দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। রোষ-অসন্তোষ চাপা ক্রোধ তাদের কলিজাটাকে যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিতে চায়। তারা তীব্র আত্মঘাতি মানসিক ক্লেশে তৈলহীন দ্বীপশিখার মতোই হয় নির্বাণোন্মুখ। তারা ধিক্কার দেয় নিজেদের, দেয় অন্য মানুষকে। যুগ ও কালকেও তারা ধিক্কার না দিয়ে অভিসম্পাত না করে ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত তারা মারাত্মক স্নায়ুবিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যদিও তার আসল কারণটা তারা কোনো দিনই জানতে পারে না, চিনতে পারে না। তারা জানে না, কেন এরূপ অবস্থা হলো, জানতে পারে না, এ রোগ থেকে মুক্তি লাভের কি উপায়। এই কারণে এ কথায় কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, মানুষের সন্তোষমূলক চেতনা মানসিক শান্তি ও স্বস্তির জন্য প্রথম শর্ত। আর এই শান্তি ও স্বস্তিই হচ্ছে সৌভাগ্যের মূল উৎস। হাদীসেও এই কথার সত্যতা বিধৃত।

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اِسْتِخَارَتُهُ رَبَّهُ وَرِضَاهُ بِمَا قَضٰى - وَمِنْ شِقَاءِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ الْاِسْتِخَارَةَ وَعَدَمِ رِضَاهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ - (بزار، احمد، ترمذى)

মানুষের সৌভাগ্যের উৎস হচ্ছে তার আল্লাহ্র কাছে থেকে ভালো চাওয়া এবং আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্ট ও রাজি থাকা। আর মানুষের দুর্ভগ্যের মূল উৎস হলো আল্লাহ্র কাছে ভালো চাওয়া পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ্র ফয়সালায় যা হয় তাতে সন্তুষ্ঠ না থাকা।

এ দৃষ্টিতে সংঘটিত প্রত্যেকটি ব্যাপার সম্পর্কে মুমিনের আচরণ হতে হবে ঘটনা ঘটার পূর্বে আল্লাহ্র কাছে ভালো চাওয়া এবং ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর যা ঘটেছে তাতে রাজি থাকা, সন্তুষ্ট থাকা। এ দুটিকে যে লোক পুরোপুরি রক্ষা করতে পারবে, সেই সৌভাগ্যবান এবং সেই মুমিন। আর যে লোক তা করতে পারে না, সে হতভাগ্য।

মুমিন কোনো কাজ শুরু করার পূর্বেই তা করবে কিনা তা আল্লাহ্র কাছে থেকে জানতে চায়। কোনো কাজ করার নিয়্যত হলেই সে তাতে সর্বোত্তম পথ ও পথের দিশা লাভ করতে চায়। সে তখন সেই দো'আ করে যা রাসূলে করীম (স) শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি প্রখ্যাত দো'আ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ - خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَا شِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ - وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَا شِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاَصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهٖ ۞ (بخارى)

হে আমাদের আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, এই কাজটি আমার জন্য আমার দ্বীন, বৈষয়িক ও পরকালীন দিক দিয়ে মংগলময় হবে, তাহলে তুমি এ কাজটি আমার জন্য সহজ করে দাও এবং তাতে আমার জন্য বরকত দাও। কিন্তু তুমি যদি জানো যে, এই কাজটি আমার জন্য আমার দ্বীন, বৈষয়িক, জৈবিক ও পরকালীন দিক দিয়ে খারাপ হবে, তাহলে কাজটিকে আমার দিক থেকে ফিরিয়ে দাও এবং আমাকে তা থেকে ফিরাও। আর আমার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণময় কাজ নির্দিষ্ট করো তা যেখানেই থাক না কেন এবং আমাকে তাতেই রাজি বানিয়ে দাও।

আল্লাহ্‌র নির্ধারণ লাভের পর মুমিন যে কাজ করে সে কাজে মন-মানসিকতায় যে সন্তোষ সঞ্চারিত হয় তা কেবলমাত্র মুমিনের মনই অনুভব করতে পারে। তখন কোনো ব্যাপারেই মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আসে না। আসে না অসন্তোষ বা আত্মাক্রোধ— নিজের প্রতি ধিক্কার। এর ফলে তার নিজের প্রতি নিজের মনে সন্তোষ জেগে ওঠে। সে সন্তুষ্ট হয় গোটা পরিবেশের প্রতি। আর এই সন্তোষ উৎসারিত হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ঈমান থেকে।

বস্তুত সন্তোষ ও সর্বাবস্থায় রাজি খুশি থাকা একটা বিপুল নেয়ামতভরা আত্মিক সুখ বিশেষ। দুঃখের বিষয়, আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসী লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত। যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনোরূপ সংশয় পোষণ করে কিংবা পরকালীন হিসাব-নিকাশ ও কর্মফল লাভ সম্পর্কে সন্দিহান তাদের অবস্থাও অনুরূপ। আল্লাহ্‌র প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রায়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে সন্তোষমূলক সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সঙ্গে, কেবল তারাই এই মানসিক সুখটা লাভ করতে সক্ষম। আল্লাহ্ আ'আলা রাসূলে করীম (স)-কে সম্বোধন করে এই সন্তোষের কথাই বলেছেন এ ভাষায় ঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَاۤءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى - (طٰهٰ : ١٣٠)

লোকেরা যা কিছুই বলে সেজন্য তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাকো। আর তসবীহ্ পাঠ করো তোমার আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রিবেলা। আরো তসবীহ্ পাঠ করো দিনের এ পাশে ও পাশে, সম্ভবতঃ তুমি সন্তুষ্ঠ হবে।

কুরআন বিশেষজ্ঞরা এ আয়াত থেকে দিন-রাতের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের নির্দেশ বুঝতে পেরেছেন। 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বলে ফজরের নামায, 'সূর্যাস্তের পর' বলে মাগরিবের নামায, 'রাত্রি বেলা' বলে এশার নামায এবং 'দিনের এ-দিক ও-দিক' বলে যোহর ও আসর বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি পড়ে তুমি সন্তুষ্ঠি লাভ করবে, এমন সওয়াব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى - (الضحى)

তোমার আল্লাহ তোমাকে শীগগিরই এমনই দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্টি লাভ করবে।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا -

(احمد، مسلم، ترمذى)

যে লোক আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহম্মদ (স)-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে ও গ্রহণ করে সন্তুষ্ঠ হলো, সে লোকই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে।

আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা মুমিনের একটা বিশেষ গুণ ও পরিচয়। আর এ গুণের প্রতিফল আল্লাহ্‌র সন্তোষ ঃ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ - (البينة : ٨)

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তারা সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি।

মুমিন আল্লাহ্‌র প্রতি ও নিজের প্রতি সন্তুষ্ট

মুমিন নিজের প্রতি সন্তুষ্ট। নিজের সত্তার অস্তিত্ব ও এই বিশ্বলোকে তার অবস্থিতির দরুন সে সন্তুষ্ট। সে এখানে কেন এসেছে এ নিয়ে তার মনে একবিন্দু ক্ষোভ, দুঃখ বা অনুশোচনা নেই— থাকতে পারে না। সে নিজেকে অবহেলার যোগ্য ও অবক্ষয়মান বিন্দু মনে করে না। সে নিজেকে বেকার নিষ্ফল ও অর্থহীন নগণ্য ভাবে না। বরং মনে করে, সে আল্লাহ্‌র এক ফোঁটা নূর। আল্লাহ্‌র রূহ থেকে ফূঁৎকারে সে সঞ্জীবিত। এই বিশ্ব ভুবনে সে আল্লাহ খলীফা।

মুমিন সন্তুষ্ট তার আল্লাহ্‌র প্রতি। কেননা তিনিই তো তাঁর নিজের ইচ্ছায় ও স্বীয় কুদরতে তাকে সৃষ্টি করেছেন ও এই ভুবনে চোখ খোলার, এখানে বসবাস করার, এখানে জীবন-যাপন করতে পারার ও আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতসমূহ ভোগ করার সুযোগ দান করেছেন। তিনি তা না করলে তার কিছুই করবার ছিল না। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে সন্দুর চেহারা, অবয়ব, দেহ-সংগঠন এবং নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে বিকৃত-বীভৎস চেহারার পঙ্গু ও অসম্পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েও বানাতে পারতেন। অতএব তাঁর সুবিচার নীতি ও অশেষ রহমতে মুমিনের হৃদয় সদা সন্তুষ্ঠ। আল্লাহ সর্বাত্মক ইল্‌ম ও হেকমতের প্রতি মুমিনের হৃদয় থাকে অবিচল আস্থা ও নির্ভরতা। তার মনে এই বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ এ বিশ্বলোকের কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। এ জগতের সবকিছুই আল্লাহ্‌র রহমতের দান। মানুষ যা ভালো ও কল্যাণ লাভ করে, তা আল্লাহ থেকেই পায়, আর খারাপ কিছু হলে তা হয় নিজের আমলের

কারণে। মূলত তাও হয় আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই। মুমিনের কণ্ঠে সর্বদা এই কথাই ধ্বনিত হয়, যা উচ্চারিত হয়েছিল হযরত ইবরাহীমের কণ্ঠে ঃ

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ - وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ - وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ - وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ - وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ - (الشعراء : ٧٨-٨٢)

সেই মহান আল্লাহ্‌ই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখান, সেই আল্লাহই আমাকে খাওয়ান, পান করান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে নিরাময় করেন। সেই আল্লাহ্‌ই আমাকে মৃত্যু দেবেন; তিনি-ই আমাকে জীবিত করবেন। সেই আল্লাহ্‌র প্রতি-ই আমার আকাংক্ষা হচ্ছে, বিচারের দিনে তিনিই আমার ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।

মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তার জন্য আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা তার নিজের ব্যবস্থাপনা অপেক্ষা অনেক উত্তম। তার প্রতি তার নিজের পিতা-মাতার যে দয়া স্নেহ, তার চাইতেও তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা অসীম অপার। সে যখন বিশ্বের দিকচক্রবালে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে সর্বত্রই আল্লাহ্‌র অসীম করুণার অশেষ অবদান স্পষ্ট দেখতে পায়। তখন আল্লাহ্‌র কাছে নিজের মনের আবেগ জানায় ঃ

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - (ال عمرٰن : ٢٦)

তোমার হস্তেই কল্যাণ নিহিত হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গল আল্লাহ্‌র হাতে। তাঁর প্রতি কোনো অন্যায় ও মন্দকে আরোপ করা যায় না। আর মানুষ যাকে মন্দ বা খারাপ মনে করে, তা মূলত ও প্রকৃতপক্ষে খারাপ নাও হতে পারে। তাছাড়া যাই ভালো, তার একটা অনিবার্য দিক মন্দ রয়েছে। আর বিশ্বসত্তা অস্তিত্বের জন্য ভালো। সাথে সাথে এ মন্দর অস্তিত্বও অনিবার্য। কেননা মূলের দিক দিয়ে এ ভালো ও মন্দের মাঝে কোনো বৈপরীত্য বা সংঘাত নেই। বরং দুটিই পরস্পর পরিপূরক। তাই বীরত্ব ও সাহসিকতার একটা দিক জীবনের ঝুকি। বদান্যতা ও দানশীলতার অপর পার্শ্বেই রয়েছে অভাব, দারিদ্র। কষ্ট হতে লাগলেই সবর ও ধৈর্যের প্রশ্ন। কোনো রকম বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পাশে রয়েছে অপেক্ষাকৃত কমশ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় যা কিছু অনুভব করে, সেখানেও পাশাপাশি থাকে দুই পরস্পর বিপরীত জিনিস। ক্ষুধার অনুভূতি না হলে পরিতৃপ্তির স্বাদ আস্বাদন করা যায় না। তৃষ্ণার

তীব্রতা কাতর করতে শুরু না করলে পানির স্বাদ পাওয়া যায় না। সুদৃশ্যের বিশিষ্টতা প্রকট হয়ে ওঠে কুদৃশ্য পাশে থাকলে। এসব কথার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত।

মুমিন জীবন ও বিশ্বলোকের প্রতি সন্তুষ্ট

এ কারণে মুমিন তার জীবন ও তার পরিবেশের ও বিশ্বলোকের প্রতি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকে। কেননা তার ঈমান এই যে, এই বিশাল বিশ্বলোক আল্লাহ্‌র মহত্তম সৃষ্টি। এখানকার প্রতিটি বিন্দু ও অণু আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত ও সৃজন-কুশলতার অত্যুজ্জ্বল সাক্ষী। এই বিশ্বলোকব্যাপী আল্লাহ্‌র একটা সুদৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খল সংস্থাপিত, এ তাঁর একটা বিশাল সাম্রাজ্য। এর প্রত্যেকটি বস্তুরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এসব দেখে ঈমানদার ব্যক্তি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠেঃ

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ -

হে মহান আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমি এখানকার একটি জিনিসও নিরর্থক সৃষ্টি করনি।

এ কারণে মুমিন সব সময় রাজি থাকে তার তকদীর নিয়ে— যা আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ যা তার জন্য ফয়সালা করেন তা নিয়ে, কেনন' তার বিপরীত কিছু হতে পারে না বলে তার মনে রয়েছে অসীম-অকৃত্রিম বিশ্বাস।

মানুষ নিজের প্রতি ও নিজের জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে— সন্তোষের সুখ আস্বাদন থেকে থাকে বঞ্চিত— শুধু এ কারণে যে, সর্বব্যাপারে স্বপ্লতার অনুভূতি তার অত্যন্ত তীব্র। তারা কেবল বলে ঃ হায়! আমার এটা নেই, ওটা নেই। কিন্তু তারা কখনো বলে না, তাদের এটা আছে, ওটা আছে। এ যাদের স্বভাব, তারা কোনো দিনই মনের শান্তি পেতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহ্‌র দেয়া অশেষ নেয়ামত সম্পর্কে মুমিন বান্দার অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র। সে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র সীমাহীন অনুগ্রহের কথা অকপটে অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করে। সে যেদিকেই তাকায়, কেবল আল্লাহ্‌র নেয়ামতই দেখতে পায়। ডানে দেখে, বামে দেখে, সামনে দেখে, পিছনে দেখে, উপরে দেখে, নিচে দেখে। কেননা সর্বত্রই আল্লাহ্‌র সীমা শেষহীন অফুরন্ত নেয়ামত বিরাজিত। সে যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখনো তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ছিল, যখন মার কোলে ছিল, তখনো তাঁর রহমতের কোনো শেষ ছিল না। মায়ের বুকে সে পেয়েছে অমৃতের স্বাদ। তার পিতা-মাতার হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন অকৃত্রিম স্নেহ দয়া ও

মায়া। তারা তারই জন্য খাওয়া-দাওয়া, আহার-নিদ্রা উপেক্ষা করেও দিন-রাত পরিশ্রম করছে। তার পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোনো কিছুই তার কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র যে নেয়ামত, তা গুণে পরিমাপ করে কেউ শেষ করতে পারে না। তবে এ পর্যায়ে কেবলমাত্র স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১. আল্লাহ্‌র প্রথম নেয়ামত হলো এই সৃষ্টি— বিশ্বলোকের অস্তিত্বদান। তিনি নিজেই যদি ইচ্ছুক না হতেন এবং অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে নিছক নিরন্ধ্র অন্ধকার ছাড়া কোথাও কিছু থাকত না। কোনো কিছু এমন থাকত না, যার উল্লেখ করা যেতে পারে, এমন কেউ হতো না যে, কিছুর উল্লেখ করতে পারে।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا - (الدّهر : ١-٢)

মানুষের উপর এমন একটা সময় কি আসেনি, যখন তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না ? পরে আমরা সংমিশ্রিত ঔরস থেকে তাদের সৃষ্টি করেছি তাদের আমরা পরীক্ষা করব এ উদ্দেশ্যে, তখন আমরা তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বানিয়েছি।

২. তিনি মানুষকে মানুষ বানিয়েছেন, মনুষ্যত্ব দিয়ে ধন্য করেছেন, এটা তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। তিনি নিজেই ইচ্ছা করে সেরা সৃষ্টিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এই বিশ্বভূবনে মানুষকে আল্লাহ খলীফা বানিয়েছেন, অন্যান্য সব সৃষ্টির উপর বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, এটাই তাঁর একটা বিশেষ অবদান ছাড়া কিছু নয়।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا - (بنى السرآءيل : ٧٠)

আমরা নিঃসন্দেহে আদম সন্তানকে মর্যাদাবান বানিয়েছি এবং তাদের নিয়ে গিয়েছি স্থলভাগ ও জলভাগের সর্বত্র। আর তাদের পবিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি রিযিকরূপে দিয়েছি ও আমার সৃষ্ট বহু জিনিসের উপর-ই তাদের অধিক সম্মানিত করেছি।

সেই সঙ্গে মানুষকে তিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে উন্নতমানের করে তৈরী করেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - (التين : ٤)

মানুষকে আমরা অতীব উত্তম-উন্নত আঙ্গিক ও আকার-প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ - (التغابن : ٣)

তিনি তোমাদের আকার-আকৃতি দান করেছেন এবং অতীব উত্তম আকার-আকৃতি দিয়েছেন।

৩. অনুভূতি ও জ্ঞান-শক্তির নেয়ামত দিয়েছেন ঃ

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ - (العلق : ٣-٥)

পাঠ করো, আর তোমার আল্লাহ্ অতীব সম্মানিত যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিখিয়েছেন সেই সব কিছু যা মানুষ জানত না।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا لا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (النحل : ٧٨)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে তোমাদের বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, যেন তোমরা শোকর করো।

শ্রবণ-দৃষ্টি-বিবেক— এ তিনটিই হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের মৌল উপায়।

৪. কথা বলা ও লেখার শক্তি মানুষের প্রতি আল্লাহ্র বড় নেয়ামত।

اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ - (الرّحمن : ١-٤)

মহান দয়াময়, তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে প্রকাশ-পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -

যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ - (القلم : ١)

কলমের শপথ, শপথ তার— যা তারা লেখে .....

৫. রিযিকের নেয়ামত। 'রিযিক' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। মানুষ বেঁচে থেকে যেসব জিনিসের মুখাপেক্ষী, যেসব জিনিস সে ব্যয়-ব্যাবহার ও ভোগ করে, যেসব জিনিস দ্বারা সে নানা কাজ করে, সেই সবই এর মধ্যে শামিল।

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط هَلْ مِنْ خَـالِقٍ غَـيْـرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ - (فاطر : ٣)

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র যে সব নেয়ামত রয়েছে, তার স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি যে তোমাদের রিযিক দেয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী থেকে ?

قُلْ مَنْ يَّرْ زُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ - (سباء : ٢٤)

জিজ্ঞাসা করো আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের রিযিক দান করে কে ? বলে দাও— আল্লাহ।

৬. মুমিন লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অবদান এই যে, তিনি তাদের ঈমান ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি হেদায়েত লাভের নেয়ামত দান করেছেন।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ - فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً - (الحجرات : ٨)

বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয়তর বানিয়েছেন এবং তোমাদের মন-মানসে ঈমানকে অত্যন্ত চমকপ্রদ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বানিয়েছেন। আর কুফর, শরীয়ত বিরোধী কাজ ও আল্লাহ্‌র নাফরমানীকে ঘৃণিত বানিয়েছেন ? এই যাদের পরিচয়, তারাই সত্য পন্থী, এটা আল্লাহ্‌র দেয়া একটা বিশেষ মর্যাদা এবং অতি বড় নেয়ামত।

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - (الحجرات : ١٧)

বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন এ জন্য যে, তিনিই তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েছেন যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭. ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক হওয়াও মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটা মস্ত বড় অনুগ্রহের অবদান।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا - (اٰل عمرٰن : ١٠٣)

আর স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা, তোমরা যখন পরস্পরের শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ পরস্পরের সাথে

সংযুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা আল্লাহ্‌র এ নেয়ামত পেয়ে পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط إِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ – (الانفال : ٦٣)

তিনিই তোমাদের অন্তরসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করেছেন। তোমরা যদি এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সবকিছুই ব্যয় করে দিতে তবুও তাদের পরস্পরের অন্তরকে সংযুক্ত করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরকে যুক্ত করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিশালী সর্বজয়ী ও সুবিজ্ঞানী।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিশেষ দান ও আল্লাহ্‌কে তীব্রভাবে অনুভব করতেন। এ জন্যই দেখা গেছে তিনি যখন খাদ্য গ্রহণ করতেন তা যত নিকৃষ্ট মানেরই হোক-না কেন, অতীব সন্তুষ্টচিত্তে পূর্ণ তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তিনি খাদ্য গ্রহণ শুরু করতেন এবং খাওয়া শেষে তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

সব প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।

পানি পান করার পর তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَهٗ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا –

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি এ পানিকে সুমিষ্ট-সুপেয় বানিয়েছেন দয়া করে এবং একে লবণাক্ত বানান নি আমাদের গুনাহের কারণে।

তিনি যখন কাপড় বা অন্য কোনো পোশক পরিধান করতেন, তখন বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَاقُوَّةٍ – اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرَ مَاهُوَلَهٗ –

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিয়েছে এবং আমাকে এই রিযিক দিয়েছেন আমার কোনোরূপ সাধ্য ও শক্তি ব্যতীতই। হে আল্লাহ, আমি এর কল্যাণ তোমার কাছে চাই এবং এর জন্য যা কল্যাণ তাও তোমার কাছে প্রার্থনা করি।

তিনি যখন কোনো যানবাহনে আরোহণ করতেন, তখন আল্লাহ্‌র শেখানো এই দোয়াটি পাঠ করতেন :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি আমাদের জন্য এটিকে কার্যরত ও অধীন করে দিয়েছেন এমতাবস্থায় যে, আমরা এটির কাছেও যেতে পারতাম না। বরং আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যাব।

তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, তখন বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَااَمَا تَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্যই, যিনি আমাদের জীবিত করেছেন আমাদেরকে মেরে ফেলার পর। আর পুনরুত্থান তো তাঁর দিকেই হবে।

তিনি যখন পায়খানা থেকে ফারেগ হয়ে বের হয়ে আসতেন, তখন বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন।

তিনি যখন কোনো লোকের দেহ বা ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপর কোনোরূপ অসুবিধা ঘনীভূত দেখতে পেতেন তখন বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانَا مِمَّا ابْتَلٰى بِهٖ كَثِيْرًا مِّنْ خَلْقِهٖ -

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের রক্ষা করেছেন সেই সমস্ত বিপদ থেকে যাতে আল্লাহ্‌র বহু সংখ্যক সৃষ্টি নিমজ্জিত।

তাঁর কোনো একটা কাজ যখন তার ইচ্ছা ও বাসনা অনুরূপ সুসম্পন্ন হতো, তখন তিনি বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تُتِمُّ الصّٰلِحٰتِ -

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যাঁর অনুগ্রহে সব ভালো কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

তাঁর কোনো আশা যখন ব্যর্থ হতো কিংবা তার মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির পক্ষে অপছন্দনীয় কোনো ঘটনা সংঘটিত হতো তখন তিনি বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা।

যখন প্রভাত সময় তার সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠত তখন তিনি এই দো'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصَبْتُ مِنْكَ فِىْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسَتْرٍ فَاَتِمَّ عَلٰى نِعْمَتِكَ وَعَافِيَتِكَ وَسَتْرُكَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - اَللّٰهُمَّ مَااَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُوْلَكَ الشُّكْرُ -

হে আমাদের আল্লাহ! আমি সকাল বেলা পর্যন্ত তোমার নেয়ামত, নিরাপত্তা ও আচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে পৌছে গেছি। অতএব তুমি তোমার নেয়ামত, নিরাপত্তা ও আচ্ছাদন আমার উপর সম্পূর্ণ করো, দুনিয়া ও আখেরাত— উভয় স্থানেই। হে আল্লাহ! আমার প্রতি বা তোমার সৃষ্টির মধ্য থেকে কারোর প্রতি কোনো নেয়ামত বর্ষিত হয়ে থাকলে তা কেবলমাত্র তোমারই অনুগ্রহে। তোমার শরীক কেউ নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা কেবলমাত্র তোমারই জন্য।

আবার যখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হয়ে আসত তখনো অনুরূপ দো'আ পাঠ করতেন।

রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্র অসংখ্য অপরিমেয় নেয়ামতের কথা এমনিভাবেই স্মরণ করতেন ও স্বীকার করতেন। তাঁর উম্মতের লোকদেরও তিনি এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কেননা মুমিনের মন-মানসিকতা সদা-সর্বদা সচেতন, জাগ্রত ও সক্রিয় থাকে। এই-ই স্বাভাবিক। এ হচ্ছে আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে বান্দার স্মরণ এবং তার অনুগ্রহ অবদানের শোকর। কেননা বান্দার যা কিছুই আছে তা সবই আল্লাহ্র নেয়ামত। আল্লাহ্ দিয়েছেন বলেই সে তা পেয়েছে। অতএব তার স্বীকৃতি ও শোকার অবশ্যম্ভাবী। তাই আল্লাহ্র কিতাবের প্রথম সূরাটিই যদি হয়ে থাকে এমন, যার প্রথম শব্দটিই হচ্ছে 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামী' তাহলে আশ্চর্যের কিছুই থাকতে পারে না। এ শব্দটিই মুমিন মাত্রের অন্তরে আল্লাহ্র অফুরন্ত নেয়ামতের চেতনা জাগিয়ে দেয়, মুমিনের অন্তরকে অবনতি করে আল্লাহ্র কাছে তাঁর সীমা পরিমাণহীন অনুগ্রহের কারণে। এই উদ্দেশ্যে এ সূরাটির তিলাওয়াত নামাযের প্রতি রাক'আতের জন্য জরুরী করে দেয়া হয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অন্তত ১৭ বার এই সূরাটি পাঠ করা হয়, যার শুরুতেই পড়তে হয় আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

মুমিন তার তকদীর নিয়ে খুশী

মুমিনের ঈমান হলো, আল্লাহ্ তার তকদীর বহু পূর্বেই ঠিক করে দিয়েছেন এবং যা কিছু তার হয়, তা তার সেই তকদীর অনুযায়ীই হয়। মুমিনের হৃদয়-মন আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহের প্রতি সদা-সচেতন, অবস্থা তার যাই হোক-না কেন। এমনকি, মুমিন যদি কঠিন দুঃখ ও বিপদেও নিপতিত হয়, বিপদের চাপে তার জীবন-তরী যদি হয় ডুবুডুবু তবু সে তার এই চেতনা হারায় না। আল্লাহ তার জন্য যা ফয়সালা করেন তাই হয় এবং মুমিন তাতেই রাজি, খুশী ও সন্তুষ্ট থাকে। কেননা তার ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ্ তার জন্য যে ব্যবস্থাই করবেন, তা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে— তার মূলে আল্লাহ্র এক বিশেষ উদ্দেশ্য অবশ্যই নিহিত রয়েছে। আর কোনো উদ্দেশ্যই উদ্দেশ্যহীন নয়, নিরর্থক নয়। তিনি বান্দাকে নিশ্চয়ই অযথা কষ্ঠ দিতে চান না। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়াবান, করুণাময়। বাহ্যত আমরা যে কাজ বা ব্যাপারকে কষ্টদায়ক মনে করি, তাতেই নিহিত রয়েছে অপরিসীম কল্যাণ। কেননা ঃ

فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلُ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

এমন প্রায়ই হবে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপছন্দ করবে, কিন্তু আল্লাহ তাতেই বিপুল কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।

আল্লাহ্র দেয়া রিযিক পেয়ে বান্দা খুশী

আল্লাহ যা কিছু রিযিক দেন, মুমিন বান্দা তাই পেয়ে খুশী, সন্তুষ্টচিত্ত। কেননা সে আল্লাহ্র সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের উপর পুরোপুরি আস্থাশীল। আর তিনিই তো তাঁর বান্দাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন, পরিমান নির্ধারণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর যে নীতি ও কর্মকৌশল, তা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলামী পরিভাষায় একেই বলা হয় 'কানায়াত (قناعة) অল্পে তুষ্টি। অবশ্য এই 'অল্পে তুষ্টি' কথাটি খুবই কদর্থ করা হয়েছে সারা দুনিয়ায়। বান্দার যে দীনহীন অবস্থা তাই নিয়েই নিষ্ক্রিয়-নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা ও অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোনোরূপ চেষ্টা না করাকেই 'কানায়াত' মনে করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, এটা এ শব্দেরই কদর্থ, সম্পূর্ণ ভুল প্রয়োগ। এটা সম্পূর্ণ গুমরাহীও বটে। আসলে কানায়াতের সেই অর্থই নয়, যা সাধারণত বোঝা হচ্ছে বা বোঝানো হচ্ছে। 'অল্পে তুষ্টি' কিংবা 'কানায়াত' কথাটির তাৎপর্য দু'দিক দিয়ে বুঝতে হবে।

এক— মানুষ স্বভাবতঃই অত্যন্ত লোভী। তার লোভ অত্যন্ত ব্যাপক, সর্বগ্রাসী। তা কোনো কিছুতেই নিবৃত্ত বা পরিতৃপ্ত হতে চায় না। হাদীসে লোভী মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্র দেখিয়ে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ ইবনে আদমের দুটি প্রান্তরও যদি স্বর্ণ ভর্তি হয়, তবু সে অনুরূপ আর একটি প্রান্তর লাভ করতে হন্যে হয়ে উঠবে। মাটি ছাড়া মানুষের চোখ আর কিছুতেই ভরে না। (বুখারী) এ কারণে ধন-সম্পদ অর্জনে মানুষের চেষ্টা-সাধনাকে ভারসাম্যপূর্ণ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ চান, মানুষের রিযিক সন্ধান হবে নীতি ভিত্তিক, শালীনতাপূর্ণ। তাহলেই তার মনে ও জীবনের ভারসাম্য আসবে। আর তাহলেই মানুষ সত্যিকার সুখ-শান্তি পেতে পারে, যা সৌভাগ্যের মূল কথা। এ হলেই মানুষ প্রয়োজনের কম করা বা তার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উভয় প্রান্তিক নীতি থেকে দূরে থাকতে পারবে। এ কারণেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ - فَاِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاَ عَنْهَا فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ - خُذُوْا مَاحَلَّ وَدَعُوْا مَاحَرُمَ - (ابن ماجه)

হে মানুষ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে রিযিক সন্ধানে চেষ্টা চালাও। কেননা কোনো মানুষই তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযিক গ্রহণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মরে যাবে না, তাতে সে যতই ধীরতা অবলম্বন করুক না কেন। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং রিযিক সন্ধানে সুষ্ঠতা আনো। যা হালাল তাই গ্রহণ করো, আর যা হারাম তাই পরিহার করো।

মানুষ যদি তার লোভ ও লালসার কাছে নতি স্বীকার করে, তাহলে তা তার নিজের আত্মার ও মন-মানসিকতার পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে পড়ে। তাই মানুষের স্বভাবগত লোভ-লালসাকে উচ্চতর কোনো মূল্যমানের দিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা একান্তই জরুরী। যে দিকটিতে কোনো শাশ্বত ভাবধারা বিধ্যমান, যেখানে চিরস্থায়ী রিযিক নিহিত এবং যা তার দ্বীন ও ধর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এমন দিককেই মানুষের সম্মুখে সমস্ত চেষ্টা ও সাধনার লক্ষ্যস্থল রূপে দাঁড় করতে দেয়া একান্তই আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দৃষ্টকোণকে এভাবেই নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন— এবং সেই সঙ্গে সমস্ত মানুষের দৃষ্টিকোণকেও —এই বলে ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى - (طٰهٰ : ١٣١)

এবং দৃষ্টি তুলেও দেখবে না বৈষয়িক জীবনের সে-সব জাঁক জমককে, যা আমরা বিভিন্ন ধরনের লোকদের দিয়ে রেখেছি। তা তো তাদের আমরা দিয়েছি তাদের পরীক্ষায় ফেলার উদ্দেশ্যে। আর তোমার আল্লাহ্‌র দেয়া হালাল রিযিকই উত্তম ও চিরস্থায়ী জিনিস।

ফাসিক-ফাজির লোকেরা অবৈধ উপায়ে যে সম্পদ-সম্পত্তি করায়ত্ত করে নিজেদের জীবনে যে বাহ্যিক চাকচিক্যের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে নেয় তা তোমরা ঈর্ষা ও হিংসার চোখে দেখো না। এ ধরনের ধন-সম্পদ ঈমানদার লোকদের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে না। তোমরা যে হালাল ও পাক রিযিক লাভ করো তা যত কম পরিমাণেরই হোক, তাই উত্তম ও উৎকৃষ্ট জেনো।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ - قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ -

স্ত্রীলোক, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিপুল স্তূপাকার, চিহ্নিত ঘোড়া, জন্তু-জানোয়ার ও ক্ষেত-খামার লোকদের জন্য খুবই চাকচিক্যময় ও ভালোবাসার আকর্ষণীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে এগুলো বৈষয়িক জীবনের দ্রব্যসামগ্রী মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে অতীব উত্তম আশ্রয়। বলো, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতেও উত্তম ও অধিক কল্যাণকর জিনিসের কথা বলব ? যারা মুত্তাকী, তাদের জন্য তাদের আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশত রয়েছে, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেখানে তারা পাবে পবিত্র জুড়ি এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ। (সূরা ইমরান ঃ১৪-১৫)

বস্তুত ঈমানের দাবি হলো লোভ ও লালসা সীমাবদ্ধ করা, মানুষের নফস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা, যেন তা কোনো সময় মানুষের উপর বিজয়ী হতে না পারে ও মানুষের জীবনকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বানাতে না পারে, যেন মানুষের অল্পে তুষ্টতা নিঃশেষ হয়ে না যায়। বেশি-বেশি পাওয়ার জন্য মানুষ যেন দিশেহারা হয়ে না পড়ে। লোভের আগুন যেন মানুষের মনে এত তীব্র হয়ে জ্বলে না ওঠে যা কোনো দিনই নিভে না, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। হালাল রিযিক পেয়ে পরিতৃপ্ত না হয়ে মানুষ যেন হারামের জন্য লালায়িত না হয়। কেননা এ ধরনের মানুষ জীবনে কখনো শান্তি পেতে

পারে না, সুখী হতে পারে না। এদের জীবন চিরকাল অগ্নিকুণ্ডে জ্বলতে থাকে। আরো চাই, আরো দাও— এই হয় তখন তাদের একমাত্র কণ্ঠধ্বনি।

তাই মানব মন ও দৃষ্টিতে এ সব ক্ষণস্থায়ী ও ভংগুর দ্রব্যাদি থেকে ফিরিয়ে মহান ও চিরন্তর মূল্যমানের দিকে নিবদ্ধ করতে হবে। দুনিয়া থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে পরকালের দিকে ফেরাতে হবে। চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। মুমিনকে বুঝতে ও বোঝাতে হবে যে, অর্থ সম্পদ ও ঐশ্বর্য-বৈভব-ই কোনো লোভনীয় জিনিস নয়। মানুষের মনে তৃপ্তি ও চরিতার্থ বোধই হলো মানুষের আসল সম্পদ। হাদীসে তাই বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ اِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ- (بخارى، مسلم)

বহু বিত্ত-সম্পত্তি সংগ্রহই সম্পদশীলতা বা ধনাঢ্যতা নয়। মন ও আত্মার লোভ সংবরণই আসল সম্পদশীলতা।

'কানায়াত' বা অল্পেতুষ্টতার সঠিক অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা হালাল পথে মানুষকে যা দেন তাই নিয়ে রাজি ও খুশী থাকা। কেননা তা এমন জিনিস যা কেউ হরণ করতে বা যাতে কোনো পরিবর্তন আনতে কেউ পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য সে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার মধ্য থেকে সে যা পায়, তাই নিয়েই তার আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হওয়া কর্তব্য। যা তার সাধ্যের বাইরে, তা পাওয়ার লোভ নিজের জীবনকে জর্জরিত করে তোলা চরম নির্বুদ্ধিতাও বটে। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যক্তি কখনো ২৪-২৫ বছরের যুবকের ন্যায় যৌবন পেতে পারে না, শক্তিপ্রদ ঔষধি সে যতই সেবন করুক না কেন। নিগ্রো নারী যত চেষ্টা করুক শ্বেত-সুন্দরী নারী হতে পারবে না। হিংসা ও ঈর্ষা করে নিজেকে জ্বালিয়ে মারা যেতে পারে, কোনো বাস্তব ফল পাওয়া সম্ভব নয়। নারী শত চেষ্টা করেও পুরুষ হতে পারে না। প্রত্যেককেই তার প্রজাতীয় স্বাভাবিক সীমা মেনে চলতে হয়, তার বাইরে যাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্বোধের অহেতুক ঈর্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূলে করীম (স)-এর সময় মেয়েরা তাই পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত-আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছিলেন ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ - (النساء : ٣٢)

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের উপর পরস্পরকে যে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তা পাওয়ার জন্য তোমরা লোভ করো না। পুরুষদের জন্য

তাই, যা তারা উপার্জন করেছে, স্ত্রীলোকদের জন্য তাই যা তারা উপার্জন করেছে। তোমরা তোমাদের প্রজাতীয় সীমার মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার অনুগ্রহ পেতে চাইবে।

অবশ্যই মানুষের জীবনে অভাব-অনটন এবং রিযিকের ব্যাপারে সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মানুষের জীবনে তা সাধারণভাবে হয়েই থাকে। ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে এক-একটা জাতির জীবনেও দেখা দেয় অনেক সংকট, অসুবিধা ও নানাবিধ জটিলতম সমস্যা। যেসব দেশ-রাষ্ট্রে স্বভাবতঃই ধন-ঐশ্বর্যের বিপুল প্রাচুর্য সৃষ্টির সম্ভবপর হয় না এবং সেখানকার জনসাধারণও নিজেদের রিযিক প্রবৃদ্ধিকরণ কিংবা সে দেশ থেকে হিজরত করে উন্নততর দেশে চলে যাওয়ার সুযোগ পায় না, অল্পে তুষ্টতা ও আল্লাহ্‌র দেয়া পরিমাণ পেয়ে সুখী ও তৃপ্ত হওয়াই তাদের রোগের একমাত্র ঔষধ— সমস্যার একমাত্র সমাধান। প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পেতে চাওয়াই লোভ বা লালসা নয়। যা অবাঞ্ছনীয়, যা সাধ্যাতীত, যা হওয়া সম্ভব নয় তা পাওয়ার চেষ্টায় শক্তি ব্যয় করা এমন একটি পণ্ডশ্রম— দুঃখ, হতাশা ও ব্যর্থতা ছাড়া যার কোনো ফল নেই। আমরা শুধু একথাই বলছি।

সেই সঙ্গে এও আমাদের বক্তব্য যে, মানুষের এটা জেনে রাখা দরকার, হৃদয়-মনে দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতীতি জন্মানো আবশ্যক যে, খুব বেশি ঐশ্বর্য-বৈভব ও বিলাস দ্রব্য করায়ও হওয়ায়-ই সৌভাগ্য নিহিত নেই। আসল সৌভাগ্য অন্তরের হৃদয়-মন ও মানসিকতার ব্যাপার। এই জন্যই বলা হয়েছে ঃ যা আল্লাহ দিয়েছেন তাতেই রাজি থাকো এবং হালাল পথে চেষ্টা চালাতে থাকো অধিক পাওয়ার জন্য। তাহলে তুমি অবশ্যই সব মানুষের তুলনায় অধিক সম্পদশালী হতে পারবে। এই জন্যই বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ هُدِىَ لِلْاِسْلَامِ وَكَانَ رِزْقُهٗ كَفَافًا وَّ قَنَعَ بِهٖ -

যে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছে, তার রিযিক যদি প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয় এবং তাই পেয়েই সে তুষ্ট থাকে, তবে বুঝবে, সে যথার্থ সাফল্যমণ্ডিত ও সৌভাগ্যবান।

তাহলে 'কানায়াত' বা অল্পে তুষ্ট হওয়ার তাৎপর্য হলো, যা তোমার আছে, তা নিয়ে মূলত সন্তুষ্ট হবে। সুখী হবে। যদি তা তোমার মৌল প্রয়োজন পূরণ না করে তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে অধিক পেতে চাইবে— চেষ্টা করবে হালাল ও বৈধ পথে। কিন্তু তুমি লোভী হবে না। লালসা কাতর হবে না। যা তোমার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়, যা পাওয়া তোমার ন্যায় লোকের সাধ্যাতীত তা পাওয়ার লোভ মনে

স্থান দেবে না। তাহলে তোমার জীবন পবিত্রতাময় হবে, আনন্দপূর্ণ হবে, তুমি সুখী হবে। এ রকমের জীবন আল্লাহ্ তা'আলা দেন সে সব ঈমানদার লোকদের যারা দুনিয়ায় নেক আমল করে।

مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً -

যে মুমিন লোক ভালো কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী, তাকে আমরা পবিত্র উত্তম জীবন যাপন করার সুযোগ করে দেব।

হযরত আলী (রা)-এর ব্যাখ্যানুযায়ী 'কানায়াত'— অল্পে তুষ্ঠ জীবনই পবিত্র জীবন। এ জীবন কখনো জাতীয় উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। তা প্রগতি উন্নতির পথে অন্তরায় নয়; বরং তা এর পরিপূরক, বলিষ্ঠতা দানকারী। প্রকৃতপক্ষে অল্পেতুষ্টি ব্যক্তির জন্য একটা শক্তি বিশেষ। এ পর্যায়ে দুটি কথা স্মরণীয়ঃ প্রথম এই যে, অল্পে তুষ্টি কোনো দুর্বলতার উৎস নয় যদিও নির্বোধ লোকেরা তাই মনে করে। জীবন ক্ষেত্রে যারা কোনো-না কোনো শক্ত ভূমিকা পালন করতে চায়, তাদের জন্য এই তুষ্টি একটা আত্মশক্তি ও দৃঢ় চরিত্রতা এনে দেয়। কি পেল ? তার হিসাব মেলাতে তাদের মন কখনো রাজি হয় না। এদের অনেককে দেখবে, তারা অন্যায় ও বাতিলের বিরুদ্ধে দিবস-রজনী অবিশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত। তারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-বিলাসিতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে চলে। তারা তাদের জীবন লক্ষ্যের দিকে ইস্পাতের মতো কঠিন, দুর্জয় ও সুসংবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ় কদমে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। কেননা তারা নিঃসন্দেহে জানে যে, মোটা ভাত মোটা কাপড় ও কষ্টের জীবনই তাদের জন্য যথেষ্ট।

দুনিয়ার বড় লোকদের বালাখান, রাজা-বাদশাহদের ধন-ভাণ্ডার ও সুখী-বিলাসী লোকদের আয়েশ-আরামের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে না— তা নয়। তারা তা জানে ও দেখতে পায়। কিন্তু সে সবের প্রতি তারা তেমনি তাকায়, যেমন উড়োজাহাজের আরোহীর নিচের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য শহরের গগনচুম্বি বালাখানাগুলো দেখে মনে হয় ক্ষুদ্রাকার খেলনা, আর মানুষ মনে হয় গর্তের ভিতরে থাকা পিপীলিকা। জনৈক চিন্তাশীল শিক্ষক তার ছাত্রকে বলেছিলেন ঃ ভাত ও পানি খেয়েই সুখী হও, দুই হাত দিয়ে বালিশ ও শয্যা ধরে থাকো, সুখী জীবন লাভ করতে পারবে। আর যে স্তর পর্যন্ত পৌঁছা তোমার অসাধ্য— যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসে অন্যায় পথে তাকে মনে করো উড়ন্ত সাদা মেঘ। তাতে পানি নেই, বর্ষে না, তাতে সজীবতাও আসে না। বস্তুত এই মন-মানসিকতা যারা অর্জন করতে পারে তাদের কাছে রাজাধিরাজের বিপুল ঐশ্বর্য-বৈভবও নিকৃষ্ট তৃণ খণ্ডের সমতুল্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকার অর্থ এই নয় যে, জীবন-চরিত্রে ও সমাজের যে সব বিকৃতি ও অন্যায়-অনাচার দেখতে পাবে, তাতেও নিশ্চুপ নির্বাক ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বরং মানুষের কৃত অন্যায়-বিকৃতি ও বিপর্যয়ের প্রতি তাকে হতে হবে কঠোর ও ক্ষমাহীন। যা কিছু হচ্ছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই হচ্ছে, তাতে আমার করণীয় কিছু নেই— এই মনোভাবই আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরিপন্থী। মোটরগাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রযানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, তার সাথে দুর্ঘটনার কারণ ঘটাতে হবে এবং পথ চলার চলতি নিয়মের বিরুদ্ধতা করে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মরতে হবে।

মুমিন আল্লাহ্‌র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন তাও তো আল্লাহ্‌র এই বিশ্ব ব্যবস্থারই অংশ। মানুষ এর দরুনই দায়িত্বশীল সৃষ্টি, এ কারণেই মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হতে হবে। আর এর দরুনই ভালো কাজের ভালো ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল ভোগ করবে— এ থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই।

মোট কথা, মুমিন আল্লাহ্‌র কায়েম করা বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু তাতে মানুষের হস্তে যে বিকৃতি ও বিপর্যয় সংঘটিত হয়, তার প্রতি সে চরম অসন্তুষ্ট। এই অসন্তোষ জানিয়ে ও অন্যায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের মুলোৎপাটন করেই মুমিন কৃতজ্ঞতা জানায় আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের অবদানের জন্য। মানুষ যেখানে আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার বা অপমান করছে, সেখানেই মানুষ তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী। মুমিন বান্দার এই যে রোষ-অসন্তোষ, এর প্রতিই রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তোষ। বরং আল্লাহ্ নিজেই এরূপ ক্ষেত্রে অসন্তোষ প্রকাশের অন্যায়, বিকৃতি ও জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এ অসন্তোষ ও প্রতিবাদ যারা জানায় না, তাদের প্রতিই আল্লাহ্‌র অভিশাপ। বনী-ইসরাঈলীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অসন্তোষের অন্যান্য বহু কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ ছিল ঃ

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ - (المائدة : ٧٩)

তারা যে সব পাপ কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না— বিরত রাখত না।

ঈমানদার লোক অতীতের জন্য হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদতে বসে না। বর্তমানের প্রতিও তাদের থাকে না রোষ-আক্রোষ, অসন্তোষ বা কোনোরূপ অনীহা। আর ভবিষ্যতের প্রতিও তারা তাকায় না ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে। তারা ভয়ে কম্পমান হয়ে জীবন যাপন করে না। কারো দাপট-প্রতাপে তারা হয় না ভীত বিহ্বল-বিবশ। বরং তারা মনের শান্তিতে বসবাস করে, জীবন যাপন করে, যেন তারা জান্নাতে বাস করছে। মূলত ঈমানই হচ্ছে তাদের মনে এই নিশ্ছিদ্র প্রশান্তির মূল উৎস। আর মনের এই প্রশান্তিরই পরিণতি হচ্ছে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা, নির্ভয়তা। এ নিশ্চিন্ততার সম্পর্ক ভবিষ্যতের সঙ্গে, যা কিছু মানুষ আশা করে। যেসব ব্যাপারে মানুষ সাধারণত ভয় পায়, আতঙ্কগ্রস্ত হয়, ঈমানদার সে সবের উর্ধ্বে— তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর সত্যি কথা হচ্ছে, মনের এই প্রশান্তি ব্যতিরেকে সৌভাগ্য লাভ হয় না। একজন বিজ্ঞ-বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ 'আনন্দ কি' ? তিনি বললেন ঃ পরম নিশ্চিন্ততা, নিরাপত্তা, নির্ভয়তা। কেননা ভীত-সন্ত্রস্ত লোকদের কোনো জীবন নেই। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বানিয়েছেন নিরাপত্তা ও শান্তির ঘর। বেহেশতবাসীরা কক্ষসমূহে পরম নিশ্চিন্ত শান্তিতে বসবাস করবে। তাদের কোনো ভয় থাকবে না, থাকবে না কোনো আশঙ্কা। প্রথম দিনই ফেরেশতাগণ তাদের সম্বর্ধনা জানাবে এই বলে ঃ

اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ -

আপনারা সকলে বেহেশতে প্রবেশ করুন পূর্ণ নিরাপত্তা-নিশ্চিন্ততার শান্তি সহকারে।

ঈমান মানব মনে কতটা প্রশান্তি ও নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করে এবং এই কারণে মুমিন ও বেঈমানের জীবনে ও মন-মানসে কতটা পার্থক্য হয়ে থাকে তা তুলনামূলকভাবে বিচার-বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে জনৈক বিদেশী লেখকের একটা বিশেষ রচনার একটা অংশ এখানে আমাদের ভাষায় তুলে দিচ্ছে ঃ

ভীতি ও মানসিক অশান্তির নমুনা

আমি এক চিরন্তন ভয়ের মধ্যে জীবন-যাপন করি। মানুষ ও অন্যান্য বহু জিনিস থেকেই আমি ভয় পাই। একটা প্রচণ্ড মানসিক ভীতিবোধ আমাকে

বিহ্বল করে দেয়। ধর্ম-ঐশ্বর্য আমাকে কিছুমাত্র শান্তি বা নিশ্চিন্ততা দিতে পারে নি। কোনো জাকজমক পূর্ণ মিলন-কেন্দ্রও দেয়নি আমাকে একবিন্দু স্বস্তি। স্বাস্থ্য-সুস্থতা-নিরাময়তা, পুরুষ, নারী, প্রেম-ভালোবাসা, রাতের গভীর দীর্ঘ সুখনিদ্রাও দেয়নি আমাকে কিছুমাত্র শান্তি ও স্বস্তি। আমি সব জিনিসই ব্যবহার করে দেখেছি এবং দেখে দেখে আমি অতিষ্ঠ ও বিরক্ত হয়ে গেছি।

আমি আমার সত্তাকে ঘৃণা করি। আমি নিজেকেই ভয় পাই। তোমরা কি আমার চতুষ্পার্শ্বের ভীতিকর পরিবেশ অনুভব করো না, দেখতে পাও না ভয়ের ভয়াবহ লেলিহান জিহ্বা ব্যাদান হয়ে আছে আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে ?

কি থেকে এসব হয় ? দুশ্চিন্তা থেকে ? না, আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে এই পৃথিবী নিয়ে। আমার ধন-সম্পদ রয়েছে, আছে মিলন-কেন্দ্র, আছে মান-সম্মান, মর্যাদা, স্বাস্থ্য, নারী, রূপ-সৌন্দর্য — সবই আছে, কি নেই আমার ? সবই আমার চোখের সামনে, সব কিছুরই নিরংকুশ মালিকানা আমার মুঠোর মধ্যে। ... কোন্ জিনিস আমাকে এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল ?

খোদাকে ভয় ? না, কক্ষনোই নয়। আমার জীবনে খোদার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহলে আমি ভয় করব কাকে ? সমাজকে ? সমাজকে আমি ঘৃণা করি, সমাজ আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, হীন। আমি থোড়াই কেয়ার করি সমাজকে। তাহলে আমার মনে এ ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে কোত্থেকে ? মৃত্যুকে ভয় করি ভাবছ ? হতেও পারে। কিন্তু না, আমি মৃত্যুকে কেয়ার করি না। আমি মনে করি না আমি মৃত্যুকে ভয় করি। ওটা তো আমার কাছে একটা নগ্ন সত্য। ওটাকে ভয় করার কি আছে ? তবু ভয় কোত্থেকে আসে, আমার মনের এই ভয় ?

আসলে আমি খুব কম জিনিসকেই ভয় পাই। কেননা আমার বিবেচনায় ভয় করার যোগ্য কিছু নেই, কেউ নেই, আমি কোনো কিছুরই ভয় পাই না। কারণ সব কিছুই আমার চোখের সামনে। কোনো কিছুরই অভাব নেই আমার। পরিতৃপ্তি তো ক্ষুধার মতোই। দুটাকেই ভয় করা যেতে পারে। কিন্তু না, আমার কাছে যদি ধন-সম্পদ না থাকত তাহলে আমি তা পেতে চাইতাম। তা পাওয়ার জন্য আমি প্রাণপ্রণে চেষ্টা চালাতাম। দিন ও রাত্রি ব্যাপী আমি অর্থোপার্জনে লেগে থাকতাম। কোনো আকর্ষণীয় মিলনকেন্দ্র যদি আমার কাছে দুরধিগম্য হতো তাহলে সেখানে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন মতো চেষ্টা করতাম। কিন্তু না, সবই আমার মুঠোর মধ্যে, কাছে, অতি কাছে।

সম্পদ, নারী বন্ধু-বান্ধব, মান-মর্যাদা মানুষের যা কিছু কাম্য— যা মানুষের হতে পারে, যার জন্য মানুষ ভাবিত হয়, তা সবই তো আমার রয়েছে। আমি পাওয়ার চেষ্টায় লেগে যেতে পারি এমন কোনো জিনিসের নাম করা যেতে পারে না। আমাকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে, এমন তো কিছু নেই। আমার জীবন উন্মুক্ত প্রশস্ত। দুর্ভাবনা ? দুশ্চিন্তা ? না, আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই, দুশ্চিন্তা নেই। তবুও আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। কেননা ভয় পাওয়ার কিছুই তো আমার সামনে নেই। আমাকে ভয় করতে হয় এমন এক অজানাকে, যার কোনো পরিচয়ই আমার কাছে নেই।

আমার জীবনটা ঐশ্বর্যময়, বিপুল বৈভবে ভরা। কেননা জীবনের শীর্ষস্থানে আমি পৌঁছে গেছি। এখন আমার এই জীবনটাই আমার শত্রু। আমার জীবনের সবকিছুরই মালিক আমি। সে সব কিছুই যে আমার অধীন, সে বিষয়ে আমি পূর্ণ সচেতন। ওসব কিছুই আমার চোখের সামনে ভিড় করে আছে। হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, আমি কাকে ভয় করি। আমি ভয় করি আমার এই জীবনটাকেই।

উদ্ধৃত কথাগুলো পড়লে সহসা মনে হবে, এ পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। হতে পারে, কিন্তু যে সত্যিকার ভাবে পাগল সে কি পারে এরূপ রচনা তৈরী করতে ? আসলে এ হচ্ছে এ দুনিয়ারই এক শ্রেণী মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ? এরা কোন শ্রেণীর লোক ? এরা কারা ? —এরা হচ্ছে ঈমানের স্বাদ থেকে চিরবঞ্চিত বেঈমান লোক। এদের মনে দৃঢ়প্রত্যয়ের শীতলতা নেই। তারা আমাদের জন্য ভীতিপূর্ণ ভয়াবহ চিত্র অংকন করে। সে চিত্র এতই আতংকের যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, মান-সম্মানের আতিশয্য ও দুনিয়ার সুখ-সামগ্রীর বিপুলতাও তা দূর করতে পারে না।

কিন্তু এর বিপরীত ঈমানদার লোকদের মানসিক শান্তি ও স্থৈর্যের মনোমুগ্ধকর চিত্রও দর্শনীয়। কুরআন মজীদে এই চিত্র বিধৃত। মাকে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ তোমার স্নেহের সন্তান ও কলিজার টুকরাকে সমুদ্রগর্ভে ছেড়ে দাও। সেইসঙ্গে ওয়াদা করলেন তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। মা ছিল ঈমানদার, সেই কারণে নিজের গর্ভজাত সন্তানকেও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে নদীগর্ভে ছেড়ে দিল। আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে সে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে পেরেছিল। সন্তানটিকে একটি বাক্‌সে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দিল। নদী তাকে ভাসাতে ভাসাতে বহু দূরের বেলাভূমে পৌছে দিল। তাঁকে ধরার জন্য শত্রুপক্ষ নদীতীরে অপেক্ষমান ছিল। এই সব কিছুই ঘটে গেল, কিন্তু ঈমানদার মার হৃদয়-মন মুহূর্তের তরেও কেঁপে উঠল না। কেননা তার হৃদয়-মন ছিল ঐকান্তিক ঈমানের বলে বলীয়ান। কুরআনের ভাষায় ঃ

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ج اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - (القصص : ٧)

এবং আমরা ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম মূসার মাকে এই বলে যে, তুমি মূসাকে দুধ খাওয়াও। পরে যখন তুমি তার ব্যাপারে ভয় অনুভব করবে, তখন তাকে নদীতে ছেড়ে দাও। তুমি ভয় পেও না, কিছুমাত্র চিন্তাও কারো না। আমি তাকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং তাকে আমি এজন রাসূল বানাব।

ভাসিয়ে দেয়া এ সন্তানকে ফিরাউনের লোকেরা ধরে তুলে নিয়ে গেল। এই সন্তান-ই তাদের শত্রু হলে গেল এবং তাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আসলে ফিরাউন হামান ও তাদের সৈন্যসামন্ত ছিল ভ্রান্ত। ঈমানদার মা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতোই কাজ করলেন। ফলে তার প্রতি আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করলেন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - (القصص : ١٣)

পরে তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম— যেন তার চোখ শীতল হয় ও সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। আর সে যেন জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য— যদিও বহু লোকই তা জানে না।

কুরআনের এ চিত্র কত না আশাব্যঞ্জক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙ্গে রঙ্গিন।

ঈমানই শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস

মানুষ অনেক কিছুতেই ভয় পায়, অনেক কিছুকেই ভয় করে। মানুষ ভয় পায় এমন জিনিসের যার কোনো হিসাব নেই, তার কোনো সংখ্যাও লেখাজোখা নেই। কিন্তু মুমিন দুনিয়ার কোনো কিছুকেই ভয় করে না, কোনো কিছুতেই সে ভয় পায় না। সে ভয়ের সব পথ বন্ধ করে দিয়ে একটি মাত্র দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। আর তাহলো সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আল্লাহ্‌র ভয় ছাড়া তার হৃদয়-মনে আর কেউ বা অন্য কোনো কিছু একবিন্দু আতংকের সৃষ্টি করতে পারে না, ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে না তাকে। মুমিন আল্লাহ্‌কে ভয় করে। তার হক পুরোপুরি আদায় করতে পারল কিনা কিংবা তার অধিকারকে কোনোরূপ লংঘন করা হলো নাকি এই জন্য। কিন্তু সে দুনিয়ার মানুষকে একবিন্দু ভয় করে

না। কেননা তার ঈমান হলো— তার ক্ষতি করতে পারে, তাকে একবিন্দু কল্যাণ দিতে পারে, তাকে মারতে পারে, জীবন দিতে পারে এমন ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। এ সব শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই নিবদ্ধ।

হযরত ইবরাহীম (আ) জনতাকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনার জন্য আহবান জানালেন। তিনি লোকদের বললেন, এক আল্লাহ ছাড়া আর সব উপাস্য দেবদেবী-প্রতিমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে। তখন লোকেরা তাদের দেবদেবীর ব্যাপারে তাঁকে ভয় দেখাল। বলল সে সবের রোষ-আক্রোশ ও অনিষ্টকারিতার কথা। হযরত ইবরাহীম বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ط فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ج اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - (الانعام : ٨١)

তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করছ, তাদের আমি কি করে ভয় করতে পারি ? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক করছ কিন্তু সেজন্য তোমরা একবিন্দু ভয় পাও না। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করছ এমন সবকে যে জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোনো সমর্থন দলিল নাযিল করেন নি। তাহলে দুপক্ষের কোন পক্ষ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিক অধিকারী বলো, যদি তোমরা জানো।

ভয়ের প্রতিকারের জন্যই নির্ভরতা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন। মুশ্‌রিকরা হযরত ইবরাহীমকে ভয় দেখিয়েছে তাদের দেবদেবীর ব্যাপারে, আর ইবরাহীম (আ) তাদের বলেছেন, আল্লাহর সাথে শিরক করার কারণে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র দিক দিয়ে নিরাপদ, কেননা তিনি তো আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করেন নি। মুশরিকরা তাদের দেবদেবীর দিক দিয়ে নিরাপদ, কেননা তারা তাদের উপাস্য রূপে মেনে নিয়েছে। এখন এ দুপক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ অধিক নিরাপত্তার অধিকারী ? হযরত ইবরাহীম, না মুশরিকরা ? দেবদেবীরা যে মুশরিকদের নিরাপত্তা দেয় তা অধিক নির্ভরযোগ্য ? আল্লাহ তা'আলা এই পক্ষদ্বয়ের মাঝে ফয়সালা করে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -
(الانعام : ٨٢)

যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানের সাথে জুলুম ও শিরক করেনি তাদের জন্যই পূর্ণ নিরাপত্তা, নির্ভরতা ও শান্তি। আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

এই আয়াতে 'জুলুম' শব্দটির অর্থ শিরক। রাসূলের করীম (স) নিজেই এ তাফসীর বলে দিয়েছেন।

কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - (القمن : ١٣)

শিরক নিশ্চয়ই অতিবড় জুলুম।

এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান ও আল্লাহ্র তওহীদ একত্ববাদ এই দুটিই হলো নিরাপত্তা ও শান্তিলাভের প্রধান উপকরণ। আর আল্লাহ্কে অস্বীকার-অমান্য করা, আল্লাহ্র ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয়-সন্দেহে নিমজ্জিত হওয়া কিংবা তার সাথে কোনো শিরক করাই হচ্ছে ভয়, ভীতি, মানসিক অস্তিরতা, অশান্তি ও আতংকগ্রস্ততার মৌল কারণ। এসব রোগ যাদের ঘিরে রেখেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا - (ال عمرٰن : ١٥١)

কাফেরদের হৃদয়-মনে আমরা ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করে দেব। তারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করেছে এই অপরাধে। কেননা শিরকের কোনো সমর্থনই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন নি।

নাস্তিক ও মুশরিকদের ভীতি ও আতংক

নাস্তিক ও মুশরিকরাই যে আল্লাহ্কে সকলের চাইতে বেশি ভয় পায়, যদিও তারা তা গোপন করতে চেষ্টা করে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কেননা কালের ঘাত-প্রতিঘাতকে তারাই বেশি ভয় করে। তারা দারিদ্র রোগ-ব্যাধি ও সাধারণ মানুষের ব্যাপারে বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত। এর মধ্যে মৃত্যুর ভয় তাদের সবচাইতে বেশি। মৃত্যুর কথা শুনলেই তাদের চোখ চড়ক গাছ হয়ে যায়। দার্শনিক ইবনে মসকুইয়া বলেছেন ঃ মৃত্যু মূলত কি, তা যারা না জানে, তারাই মৃত্যুকে সবচাইতে বেশি ভয় করে। তাদের ছাড়া মৃত্যুভয় আর কাউকে ততটা ভীত করে না। কেননা তারা জানে না, মৃত্যুর পর তাদের পরিণতি কি হবে। তারা মনে করে, মৃত্যুর পর তাদের দেহ যখন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে, তাদের বর্তমান দেহ সংস্থা চূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তাদের মূল সত্তাই বিলীন হয়ে যাবে। তারা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ নিঃশেষ অস্তিত্বহীন। অথচ এই মনোরম বিশ্বলোক তার সবকিছু সহ অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তারা থাকবে না এখানে। মৃত্যু যন্ত্রণার কথা স্মরণ করেও

তাদের অন্তরাত্মা কেপে ওঠে। সে যন্ত্রণা এত দুঃসহ, যা কোনো দিন-ই তারা ভোগ করে নি। মৃত্যুর পর যে আযাব তাদের পরিবেশিষ্টত করবে তার কথা মনে করেও তারা হয় আতংকগ্রস্থ। অথবা মৃত্যুর পর তাদের কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই। অথবা তারা সারা জীবন ধরে যে কাজ-কর্ম করেছে তার পরিণতি যে কিছুমাত্র ভালো হতে পারে না, এ বিষয়ে তাদের মনে একটা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গেছে। যদিও এসবের মূলে তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান বলতে কিছু নেই। নাস্তিক ও মুশরিকরা এই ধরনের অজ্ঞতার অন্ধকারেই ডুবে থাকে সারা জীবন ভরে। এই অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু ঘটে। আসলে তারা মৃত্যু ও জীবনের মাঝে এক কঠিন টানাহেচড়া ও প্রচণ্ড ভীতির মধ্যে জীবন যাপন করে। কিন্তু মুমিনরা এদিক দিয়ে হয় সর্বাধিক নির্ভীক, আতংকহীন।

মুমিন রিযিকের ব্যাপারে নিঃশঙ্ক

ঈমানদার লোক তাদের রিযিকের ব্যাপারে সব ভয়-ভীতি ও আশংকাবোধের উর্ধ্বে। কেননা তাদের ঈমান হলো, রিযিকের ব্যবস্থা তো আল্লাহ তা'আলা করেই রেখেছেন, তার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ্র ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কখনো ধ্বংস করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা এই পৃথিবীকে সুবিন্যস্ত ও শয্যার ন্যায় বিস্তীর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। এখানে দিয়েছেন অফুরন্ত উর্বরতা শক্তি এবং জীবনের জীবিকার ব্যবস্থা তিনি এখানেই করে রেখেছেন। এ পর্যায়ে তিনি স্পষ্ট ওয়াদা করেছেন। কুরআন মজীদে তার এই ওয়াদা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্র ওয়াদা পবিত্র ও একান্তই বিশ্বাস্য। তিনি কার্পণ্য করেন না। তিনি মহাশক্তিমান, ওয়াদা পূরণে তিনি কিছুমাত্র অসমর্থ নন। তিনি মহাবিজ্ঞানী। তিনি কোনো বাজে কথা বলেন না।

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا - (الكهف : ٩٨)

আমার আল্লাহ্র ওয়াদা একান্তই সত্য— তা বাস্তবায়িত হবেই।

وَعْدَ اللّٰهِ ط لَايُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الروم : ٦)

আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বরখেলাফ করেন না। যদিও অনেক লোকই এ কথা জানে না।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ - (الذّٰريٰت : ٥٨)

নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ হচ্ছে মহান রিযিকদাতা, সুদৃঢ় শক্তি ও সামর্থের নিরংকুশ অধিকারী।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا - (هود : ٦)

পৃথিবীর সব জীবেরই রিযিকদানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর অর্পিত।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ - (العنكبوت : ٦٠)

কোনো জীবই নিজের রিযিক সঙ্গে বহন করে নিয়ে আসে না, আল্লাহ্‌ই তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদেরও।

আল্লাহ তা'আলার এসব ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানের উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন করেই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করে ঈমানদার লোকেরা। আল্লাহ যে তাদের না খাওয়ায়ে ক্ষুধার জ্বালা দিয়ে হালকা করবেন না, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। মহাশূন্যে উড্ডয়নশীল পাখিকে কে খাওয়ায় ? নিবিড় জংগলে বসবাসকারী হিংস্র পশুকুল কার অনুগ্রহে রিযিক পেয়ে থাকে ? সমুদ্র গর্ভের মৎস্যকুলকে কে রিযিক দেয় ? পর্বতশৃঙ্গের উপর বসবাসকারী মানুষ ও জীব-জন্তু কোথা থেকে রিযিক পায় ? ... রিযিকদাতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আছে কি ?

মুমিন জিহাদের ময়দানে চলে যায় কাঁধের উপর তার মাথাটি বহন করে নিয়ে। আল্লাহ্‌র পথে জীবন কুরবান করাই হয় তাদের একমাত্র কামনা-বাসনা। পিছনে রেখে যায় দুর্বল অক্ষম সন্তান-সন্ততি— যারা উপার্জন করতে সক্ষম নয়। তবু যাওয়ার সময় মুজাহিদ এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই যায় যে, সে তার এ অসহায় পরিবারবর্গকে একমাত্র আল্লাহ্‌র হেফাজতেই রেখে যাচ্ছে। তিনিই এদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, রিযিক দেবেন।

স্বামী জিহাদে রওয়ানা হয়েছে। স্ত্রী বলছে, আমি জানি, ও শুধু খায়, রিযিক দেয় না। এখান থেকে খাওয়ার লোক যদি চলে যায়, তাহলে রিযিকদাতা তো আমাদের জন্য রয়েই গেলেন। আল্লাহ্ রিযিকদাতা হওয়ার প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকলেই এরূপ কথা বলা যেতে পারে।

মুমিন তার রিযিকের ব্যাপারে যেমন নিশ্চিন্ত, তাদের আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। কেননা তার ঈমান হলো, তার আয়ুষ্কাল আল্লাহ তা'আলাই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে কতদিন বেঁচে থাকবে, কতটা শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়বে, তা পূর্বে থেকেই সুনির্দিষ্ট। তার আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়ে যাবার মুহূর্তটিও পূর্ব নির্ধারিত। তার আয়ুষ্কাল সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি করার শক্তি বা ক্ষমতা কারোর নেই। মৃত্যু মুহূর্তকে এদিক-ওদিক করে এগিয়ে নিয়ে আসা বা পিছিয়ে দেয়ার সাধ্যও নেই কারুর। আল্লাহ্‌র কুরআন এসব কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন ঃ

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ج فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

(اعراف :)

প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তিরই আয়ুষ্কাল সুনির্দিষ্ট। যার মৃত্যু মুহূর্ত যখন উপস্থিত হবে, তা থেকে তাকে একবিন্দু পিছনেও কেউ নিয়ে যেতে পারে না, কেউ সম্মুখের দিকে এগিয়েও আনতে পারে না।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهَا - (المنفقون : ١١)

কারুর মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তা বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিক করবেন না।

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَّلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ

اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ - (فاطر : ١١)

যে যতটা বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং যার বয়স হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তা সবই গ্রন্থে লিখিত (পূর্বনির্ধারিত)

মুমিনের ইয়াকীন হলো, মানুষের বয়সকাল ও মৃত্যু মুহূর্ত নির্ধারণের কাজটি আল্লাহ তা'আলা প্রথমেই করে রেখেছেন। কোনো প্রাণীর ও এই মানুষের মৃত্যু কখন হবে, কোথায় হবে, তা সব-ই তিনি লেখা–পড়া করে রেখেছেন। এ কারণেই আয়ুষ্কাল ও মৃত্যু মুহূর্ত সম্পর্কে বান্দার যে ভাবনা-চিন্তা করার কিছু নেই, এ ব্যাপারে মুমিনরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এ ব্যাপারে তাদের মনে কোনো ভয় বা আশঙ্কাও জাগে না কখনো। আর রিযিক ও মৃত্যু সম্পর্কে এই নিশ্চিন্ততাই মুমিনকে দিয়েছে পরম শান্তি ও স্বস্তি। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা)-কে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ

لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ فِىْ يَدِكَ مَاعَبَدْتُ اِلٰهًا غَيْرَكَ -

আমি যদি জানতাম জীবন ও মৃত্যু তোমার হাতে, তাহলে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'ইলাহ'রূপে গ্রহণ করতাম না— এবাদত-বন্দেগী করতাম না।

মুমিন মৃত্যুকে ভয় করে না

মুমিন মৃত্যুকে ভয় করে না বলে নির্ভীকভাবে জীবন যাপন করে। কেননা সে জানে, মৃত্যু তার নিশ্চিত, অনিবার্য, মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনে সে একান্তভাবে বাধ্য। এ থেকে তার নিস্তার নেই, নিষ্কৃতি নেই। এতে কোনো সন্দেহও নেই। শত ভয়

করলেও কোনো লাভ নেই, মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। এ দুনিয়ায় পরম ও একান্ত সত্য যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে তা হচ্ছে এই মৃত্যু।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ - (الجمعة : ٨)

জানিয়ে দাও, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাও, তা অবশ্যই তোমাদের ধরবে।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ - (النسآء : ٧٨)

তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই যদি তোমরা দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যেও অবস্থান করতে থাক।

মুমিন লোকের কাছে মৃত্যু সহজ হয়ে যায় একথা ভেবে যে, এই হচ্ছে চিরন্তন মানুষের পরিণতি। সব নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ, নেককার মুসলমান— সকলকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে। কেউই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তাহলে সে কেমন করে তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে? দ্বিতীয়তঃ সেও যখন তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছে, তাদের পথ অবলম্বন করছে, তখন তার আর চিন্তার কি থাকতে পারে! মৃত্যু? ... সে তো সকলের জন্যই।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ - (الزمر : ٣٠)

তুমি মরবে, মরবে এই সব লোকও।

মৃত্যু এসে মুমিনকে এই জীবনের সব সুখ শান্তি, আয়েশ-আরাম, চর্ব্য-চুষ্যলেহ্য-পেয় ও যাবতীয় দ্রব্য-সম্পদ থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে নিয়ে যাবে, একথা তার ভালো করেই জানা আছে। কিন্তু তবু তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে না। কেননা সে জানে, মৃত্যু তাকে এই নশ্বর জগতের সবকিছু থেকে কেড়ে নিয়ে শাশ্বত জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারমুখে পৌঁছে দেবে। এ দুনিয়ার তুলনায় সেখানকার সুখ-শান্তি ও আয়েশ-আরাম তো অতুলনীয়, অফুরন্ত ও চিরন্তন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - (آل عمرٰن : ١٨٥)

প্রত্যেকটি প্রাণীই মরনশীল— মৃত্যু স্বাদ গ্রহণে বাধ্য। তোমাদের সমস্ত কর্মফল কেয়ামতের দিন পূর্ণ করে আদায় করে দেয়া হবে। সেদিন যে লোক জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে ও বেহেশতে দাখিল হবে, সে-ই সাফল্যমণ্ডিত। দুনিয়ার এই জীবনটা একটা প্রতারণা-সামগ্রী মাত্র।

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى قف وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -

(النساء : ٧٧)

জানিয়ে দাও, দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী খুবই স্বল্প-সামান্য ও পরকালই অধিকতর কল্যাণময়— অবশ্য কেবল তাদের জন্য, যারা এ দুনিয়ায় তাক্ওয়ামূলক জীবন যাপন করেছে। আর তাদের প্রতি এক বিন্দু জুলুম করা হবে না।

এ আলোচনার সারকথা, মৃত্যু চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ ও একেবারে 'নাই' হয়ে যাওয়া নয়। তা হচ্ছে এ জীবন থেকে অন্য জীবনে— জীবনের প্রথম ভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগে উত্তরিত হওয়া মাত্র। এজন্য মৃত্যুকে বলা হয় 'ইন্তেকাল'। তা এক অবস্থা থেকে স্থানান্তরে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। বড়জোর, তা নিছক অবস্থান্তর মাত্র। তাই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْاَبَدِ وَ اِنَّمَا تَنْقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ -

তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে চিরকালের জন্য। তবে তোমাদের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে— এক জগত থেকে ভিন্নতর জগতে নিয়ে যাওয়া হবে মাত্র।

মৃত্যু হচ্ছে দেহ-পিঞ্জর ও বৈষয়িকতার আচ্ছাদন দীর্ণ করে বরযখ জগতে গমন। অতঃপর পুনরুজ্জীবনের দিনে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন। জালালুদ্দীন রূমী মৃত্যুর রহস্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

ধ্বংসের পরই হতে পারে পুনর্গঠনের কাজ। মাটির গভীরে খননকার্য না চালানো পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ বিপুল মহামূল্য দ্রব্যসম্ভার উত্তোলিত হওয়া সম্ভব হয় না। তুমি যখন দেখবে, কোনো একটা ঘর ভাঙ্গা হচ্ছে, জানবে, সেখানে একটা নবতর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। কত ঘর ভাঙ্গা হয়েছে তার ভিটির গর্ভে গচ্ছিত মহামূল্য ধন বের করার উদ্দেশ্যে, তারপরই সেখানে গড়ে উঠেছে নবতর প্রাসাদ। ফুল না ঝরে পড়লে গাছও দিতে পারে না কোনো সুমিষ্ট ফল। রূহ বা আত্মার ব্যাপারটিও এমনি। এই মরদেহ মরে, পঁচে, গলে না যাওয়া পর্যন্ত নবতর অবয়ব গড়ে উঠতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ দাতা— একমাত্র দানশীল দয়ালু। তিনি কোনো বান্দার একটা নেয়ামত কেড়ে নিলে আর একটা নেয়ামত দেবেন তার চাইতেও বড়। এই জীবনটাকে তো আর চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন বলা যায় না। এ জীবনটা যখন কেড়ে নেয়া হবে, তখন তাকে দেয়া হবে এক উন্নততর, বিশালতর, সুন্দরতর ও উৎকৃষ্টতর জীবন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায বলেছে ঃ কেবলমাত্র সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিই মৃত্যুকে অপছন্দ করে। অথচ এই মৃত্যুই বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিত করে।

—১৩

এ কেবল দার্শনি চিন্তাবিদদের উক্তি বা মতাদর্শ নয়। মৃত্যু সম্পর্কে সর্ব সাধারণ মুমিন-মুসলমানেরই এই মত।

একজন মরুবাসীকে বলা হলোঃ তুমি শিগগীরই মরে যাবে। সে বললে ঃ মৃত্যুর পর আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে ? বলা হলো ঃ আল্লাহ্‌র কাছে। সে বলল, তাহলে যার কাছেই চূড়ান্ত কল্যাণ, সার্বিক মঙ্গল নিহিত, তাঁরই কাছে যেতে আমি ভয় পাব কোনো দুঃখে।

আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থই ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - نَحْنُ أَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ - نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ - (حٰمٓ السجدة : ٣٠-٣٢)

যারা বলল, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর তার উপর সুদৃঢ় অবিচল থাকল, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে ঃ তোমরা ভীত হবে না, চিন্তাগ্রস্ত হবে না, তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল। আমরাই তোমাদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক দুনিয়ার জীবনে, পরকালেও। সেখানে তোমরা তাই পাবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং যা পেতে চাইবে। এসব হচ্ছে মহান ক্ষমতাশীল, দয়াবান আল্লাহ্‌র মেহমানদারী।

আশাবাদ

মুমিনের হৃদয়-মনে শান্তি ও স্বস্তির যে প্রস্রবণ, তার একটি প্রধান উৎস হচ্ছে আশাবাদ। আশা-আকাঙ্ক্ষা মানব-মনের একটা বিরাট বলিষ্ঠ সম্পদ। আশা একটা আলো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তা জীবন-অঙ্গনকে উদ্ভাসিত করে তোলে। স্পষ্ট করে দেয় পথের দিশা। আশাই জীবন বৃক্ষের প্রবর্ধনের মূল প্রেরণা। সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের প্রেরণাকে সদা তেজস্বী ও বলিষ্ঠ করে রাখে এই আশা। প্রত্যেক ব্যক্তি এরই সাহায্যে সৌভাগ্যের স্বাদ-আস্বাদন করতে পারে। জীর্ণ জীবনে নবজীবনের হিল্লোল প্রবাহিত করে এই আশাবাদ। তাই আশা এবং আশাবাদ মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য।

আশাবাদ একটা প্রচণ্ড প্রেরণা শক্তি। মানব-হৃদয়কে নব নব কর্মোদ্যমে অনুপ্রাণিত করে রাখে এই আশাবাদ। মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে। দেহ ও প্রাণে তাই নতুন শক্তি প্রবাহের সৃষ্টি করে। আলস্য ও কর্মবিমুখতা দূর করে। চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রামের দিকে চালিত করে মানুষকে। দুর্লংঘ্য পথ অতিক্রম করে পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত যে সাফল্য লাভ করে, তার মূলে নিহিত থাকে এই আশাবাদ। ব্যবসায়ী তার সমস্ত জীবনের অর্জিত সম্পদ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে, দেশের পর দেশ পরিভ্রমণ করে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা যাচাই করে এবং নানাবিধ ঝুকি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, এই আশাবাদই তাকে এ জন্য প্রস্তুত করে। যে ছাত্র রাত্র জাগরণ করে ও অনিদ্রার কষ্ট স্বীকার করে পড়াশুনা করে, তার মনে আশা থাকে পরীক্ষায় সফলতা লাভ। সৈন্য-সামন্ত প্রাণটা হাতের তালুতে লয়ে যুদ্ধের ময়াদানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয়ের আশায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী মুক্তির আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। রোগী ঔষধ খায় নিরাময়তার আশায়। অনুরূপভাবে মুমিন তার মনে কামনা-বাসনাকে উপেক্ষা বা পদদলিত করে নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে চলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও পরকালীন মুক্তি বা জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষায়।

বস্তুত আশা হচ্ছে মানব জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। কষ্টের অনুভূতিকে তাই দমন করে, সহ্য শক্তির মাত্রা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। দুঃখ-ব্যথার ক্রন্দনরোল স্তব্ধ করে দেয়। জীবনে নিয়ে আসে প্রবল গতিশীলতা, আনন্দ, স্ফূর্তি ও উদ্যম। তাই বলা হয়েছে ঃ

আশার আলো না থাকলে জীবনটা হতো কতই না সংকীর্ণ, দুঃসহ এবং দুর্বহ বোঝা।

এ সব কারণে আশা হচ্ছে অতীব সুস্বাদু পানীয় ও সুখী জীবনের মৌল উপাদান। এই আশারই বিপরীত হচ্ছে নৈরাশ্য, হতাশা। আর নৈরাশ্য ও হতাশার অর্থ জীবন-প্রদীপের নির্বাণ লাভ। আশার প্রদীপ নিভে গেলে সারা জীবনটাই নিমজ্জিত হয় অন্ধকার সমুদ্রের অতল গহ্বরে। ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবে বিদ্যুৎ লাইনের তার কেটে গেলে সমগ্র শহরটি যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আশার দ্বীপ নিভে গেলে, হৃদয়-মনে নৈরাশ্য ও হতাশা চেপে বসলে অনুরূপ অবস্থারই সৃষ্টি হয়। দেহ-মনে ক্লান্তি ও কর্মের অনস্পৃহা-অনীহা ছেয়ে যায়। নৈরাশ্য ও হতাশা দেহমনকে দুর্বল করে দেয়। উচ্চাশাসম্পন্ন ব্যক্তির সমস্ত তৎপরতা নিমেষে স্তব্ধ হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ

اَلْهَلَاكُ فِىْ اِثْنَيْنِ : اَلْقُنُوْطُ وَالْعُجْبُ ·

দুটি জিনিসের অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস; একটি নৈরাশ্য আর অপরটি অহমিকা।

নৈরাশ্য বা হতাশা যে মারাত্মক, তাতো স্পষ্টই। আর অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা যে ধ্বংস ডেকে আনে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা অহমিকা আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। ইমাম গাযালী এ দুটোকে এক সূত্রে গাঁথার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন; সৌভাগ্য চেষ্টা ও পেতে চাওয়া ছাড়া কখনোই অর্জিত হতে পারে না। সৌভাগ্য লাভের জন্য প্রয়োজন প্রাণপণ সংগ্রাম ও সাধনার। কিন্তু নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো কিছু পাওয়ার জন্য চায়ও না, আর তা পাওয়ার জন্য চেষ্টাও চালাও না। কেননা যা চাওয়া হবে, তা পাওয়া তো তার দৃষ্টিতে নিতান্ত অসম্ভব। অসম্ভব বলেই তো সে চায় না। আর অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি মনে করে যে, কোনো কিছুর জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে না। অনুরূপভাবে যা অর্জন করা সম্ভব নয়, তা চাওয়ার উর্ধ্বে। অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তি তো মনে করে বসেছে যে, সৌভাগ্য তার অর্জিত, তার বাড়ির দাসী। আর নৈরাশ্যবাদী তো তাকে পাওয়া অসম্ভবই মনে করে বসেছে। এই কারণেই হযরত ইবনে মাসউদের উপরোক্ত কথায় এ দুটো জিনিসকে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে।

আর এই কথা এবং তার এ বিস্তারিত বিশ্লেষণ যে সত্য ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ছাত্র যদি পরীক্ষা পাস থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়, তাহলে তার পড়াশুনা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। শত উপদেশ দিলেও তার নৈরাশ্য দূর করা যাবে না। তার অবস্থার পরিবর্তন

করার জন্য অন্যান্য সব বাস্তব অনুকূল ব্যবস্থাপনা-ই সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে— যদি না তার মানসলোকে আশার সূর্যের উদয় হয়।

রোগী যদি নিরাময়তা লাভের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে ওষুধ-পথ্য সেবন করবে না, চিকিৎসকের আদেশ-উপদেশ কিছুই পালন করবে না, বেঁচে থাকা মুহূর্তগুলোর অতিবাহন তার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে যতক্ষণ না তার মনের আঁধার পটে বেঁচে যাওয়ার ক্ষীণতম দীপও জ্বলে উঠবে।

বস্তুত নৈরাশ্য ও হতাশা যার উপর-ই বিজয়ী হয়ে দাঁড়াবে— সে যে-ই হোক-না কেন— তার চোখে সারাটি জগত গভীর আঁধারে ডুবে গেছে। তার সব পথ রুদ্ধ, তার সম্মুখের সব সম্ভাবনা নিঃশেষ। উপায়-উপকরণ বলতে কিছুই বাকি নেই, ফলে এই বিশাল পৃথিবী তার বিপুল বিস্তৃতি সহই সংকীর্ণ হয়ে যাবে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা দেখা দেবে।

এ নৈরাশ্য জীবনের জন্য হত্যাকারী বিষ। জীবনের গতিশীলতায় সর্বকালের নৈরাশ্যবাদীদেরই এই পরিণতি। তাদের জীবনের ফল নেই, জীবনের কোনো অর্থ নেই। বেঁচে থাকার নেই কোনো তাৎপর্য।

নৈরাশ্য ও কুফর একসূত্রে গাঁথা

এই ধরনের নৈরাশ্যবাদী মানুষ যদি খুব বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় দুর্বল ঈমানদার ও আল্লাহ অবিশ্বাসী— তথা নাস্তিকদের মধ্যে, তবে তা বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা এসব লোক তো নিজেদের নিয়েই বাঁচে। আর সবকিছুর সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ককে তারা ছিন্ন করে। তাদের সম্পর্ক থাকে না এই বিশ্বলোকের সাথে, সম্পর্ক থাকে না বিশ্বলোকের মহান স্রষ্টার সাথে। এই কারণেই দুনিয়ার কাফের লোকদের আমরা পাই অধিকতর নৈরাশ্যবাদী হিসাবে। যেমন দেখি, অধিকাংশ নৈরাশ্যবাদীরাই হচ্ছে কাফের। নৈরাশ্য ও কুফরের এখানেই মিল। এ দুটির একটি অপরটির ফল। নৈরাশ্য কুফর জন্ম দেয়, আর কুফর জন্ম দেয় নৈরাশ্য। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ - (يوسف : ٨٧)

আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কেবলমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়— কাফের ছাড়া আর কেউই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ إِلَّا الضَّآلُّوْنَ - (الحجر : ٥٦)

আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ আর কেউ হয় না— হয় কেবল পথভ্রষ্ট লোকেরা।

কঠিন বিপদ কারো উপর নেমে এলে, কেউ যখন কোনো মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখী হয়, তখন এই নৈরাশ্য প্রকট হয়ে ওঠে। এই যাদের অবস্থা, তাদের হীন ও সংকীর্ণ মন-মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ج اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ - (هود : ٩)

আমরা যদি লোকদেরকে আমাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই এবং পরে তা তার থেকে কেড়ে নেই তখন তারা অত্যন্ত নিরাশ-হতাশ ও না-শোকর হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তী কথায় এ থেকে ভিন্নতর লোকদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হচ্ছে ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - (هود : ١١)

যারা ধৈর্যশীল ও নেক আমলকারী, তারা এদের থেকে ভিন্নতর।

অপর এক আয়াতে প্রথমোক্ত লোকদের চরিত্র স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰبِجَانِبِهٖ ج وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا -
(بنى اسرائيل : ٨٣)

আমরা যখন লোকদের নেয়ামত দেই তখন তারা ফিরে যায় ও পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করে। আর যখন কোনো অসুবিধা বা বিপদ তাদের ধরে, তখন তারা নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

নৈরাশ্য কেবল যে কুফরির অপরিহার্য অংশ তা-ই নয়, সন্দেহ-সংশয়ের পরিণতিও এই নৈরাশ্য ও হতাশা। যে লোকই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয় হারিয়ে ফেলে, আল্লাহ্‌র বিশেষ বিচক্ষণতা, কর্ম কুশলতা ও সুবিচার, ন্যায়পরতার প্রতি যার এক বিন্দু বিশ্বাস থাকে না, সে অত্যন্ত করুণভাবে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। বিশ্বলোক ও জীবনের প্রতি তখন তার মনে কোনো শ্রদ্ধাও থাকে না। তখন এই দুনিয়ার উপর তার কালো দৃষ্টি নিপতিত হয়। পৃথিবীটা মনে হয় যেন একটা জনহীন নিবিড় জঙ্গল এবং জীবনটা তার তখন একেবারেই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থা মানুষের পক্ষে কত যে দুঃসহ তা বলে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না।

ঈমানই আশাবাদ সৃষ্টি করে

উদার দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি ঈমান ও আশাবাদ পরস্পর সম্পৃক্ত, অবিচ্ছিন্ন। ঈমান থাকলে আশাবাদ হবেই। ঈমানদার মানুষ কখনো নিরাশ হতাশ হয় না। ঈমানদার ব্যক্তি অন্যান্য সমস্ত লোকের তুলনায় অধিক আশাবাদী। সে কোথাও কোনো খারাপ লক্ষণ দেখতে পায় না। খারাপ লক্ষণ বলে কোনো জিনিসই তার চোখে পড়ে না। কেননা ঈমানের অর্থই হলো উচ্চতর মহান শক্তির প্রতি ঐকান্তি বিশ্বাস, যিনি সমগ্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক এবং যাঁর কাছে কোনো কিছুই অজানা-অস্পষ্ট বা গোপন নেই, তিনি কোনো কিছু করতে অক্ষম নন, যাই করবার ইচ্ছা হবে, তাই তিনি করবেন। তিনি সর্ব শক্তিমান। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার কোনো সীমা-শেষ নেই। তাঁর রহমত অপার, কুল-কিনারাহীন। বিপদগ্রস্তের ফরিয়াদ তিনি সর্বাগ্রে শুনতে পান। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদ তিনিই দূর করে দেন, দূর করতে তিনিই পারেন। তিনি গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন— মাফ চাওয়ারই শুধু অপেক্ষা। তিনিই তওবা কবুল করেন, যদি সত্যিকারভাবে কেউ তওবা করে। তিনি সমস্ত মানব সন্তানের প্রতি দয়াশীল, করুণাময়, স্নেহময়, পিতা-মাতার চাইতেও বেশি। বান্দা তওবা করলে তিনি খুশী হন, হারিয়ে যাওয়া মানুষ ফিরে পেলে যেমন হয় তার চাইতেও বেশি। তিনি নেক আমলকারীর প্রত্যেকটি নেকীর দশ থেকে শত শত গুণ বেশি শুভ প্রতিফল দান করেন। আর পাপ যতটুকু, তার শাস্তি দেন ঠিক ততটুকুই, তার একটু বেশি নয়। কাজেই তাঁর ব্যাপারে নিরাশা-হতাশার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। তাঁর প্রতি ঈমানদার কোনো লোকই নিরাশাগ্রস্ত হয় না কখনো। কেননা তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَادَعَانِ -

আমার বান্দা যদি তোমাকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে বলে দাও আমি তো খুবই কাছে রয়েছি। যে বান্দাই আমাকে যখন ডাকে, আমি তারই জবাব দেই।

এই বিশ্বলোক যেমন একটা স্থায়ী নিয়মে চলছে, মানব সমাজেও তিনি অনুরূপ একটা স্থায়ী নিয়ম চালু করে রেখেছেন। তিনি লোকদের সাধারণ অবস্থার মধ্যে তারতম্য করেন। কখনো ভীতি দেখা দিলে পরক্ষনেই তা বদলে দেন ও পূর্ণ নির্ভয়তার পরিবেশ দাঁড় করান। দুর্বলতার পর ক্ষমতা ও শক্তি ফিরে আসে, সংকীর্ণতা দূর হয়ে সৃষ্টি হয় বিশালতার। ঈমানদার ব্যক্তি এহেন মহান আল্লাহ্‌র রজ্জুকেই শক্ত করে ধারণ করে। ফলে পরম অশেষ আশাবাদের মধ্যে

দিয়ে জীবন যাপন করা কেবল এই ঈমানদার লোকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। সে এই জীবনটাকে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে, আনন্দ-হাসি সহকারে সে বরণ করে নেয় আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি দানকে। বাহ্যত সে দান যতই রূঢ় হোক, বিষাক্ত হোক— কোনো অবস্থায়ই সে নিরাশ হয় না। সে যখন যুদ্ধ করে, আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা তাকে অতিশয় দুঃসাহসী বানিয়ে দেয়। কেননা সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে, আল্লাহ্ তার সঙ্গী। সে নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে দিয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে। আর এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই তো আল্লাহ্‌র বাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ - وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ -

এই লোকেরা, হ্যাঁ, এরাই তো সাহায্যপ্রাপ্ত এবং আমার সৈন্যবাহিনী— হ্যাঁ, কেবল তারাই তো জয়ী হবে।

ঈমানদার লোক যখন রোগাক্রান্ত হয় তখনো সে নিরাময়তার ব্যাপারে নিরাশ হয় না। কেননা আল্লাহ্‌ই তো ঈমানদার লোকদের এরূপ বিশ্বাসে বলীয়ান হতে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ - وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ - وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ - (الشعرآء : ٧٨-٨٠)

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। তিনিই তো আমাকে খাওয়াবেন, পান করাবেন। আর আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই তো আমাকে নিরাময়তা দেবেন।

ঈমানদার লোকেরা গুনাহে গুনাহে যদি জীবনপাত্র পূর্ণও করে থাকে তবু সে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয় না। কেননা বান্দার গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র ক্ষমা দান যে তার চাইতেও অনেক বড়। তাছাড়া এরূপ গুনাহগারকেও আল্লাহ্ তাঁর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (الزمر : ٥٣)

বলে দাও, হে আমার সে সব বান্দাহ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করে করে, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হবে না। কেননা আল্লাহ তো সমস্ত গুনাহই মাফ করে দেবেন। আর তিনিই তো ক্ষমাশীল, দয়াবান।

মানুষ যখন বিপদে জর্জরিত হতে থাকে তখনো সে নিরাশ হয় না। আল্লাহ্‌র ওয়াদা তাদের বিপদ অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করে আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে ঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - (النشراح : ٥-٦)

জেনে রাখো, দুঃখ-কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে সুযোগ-সুবিধা, অসচ্ছলতার সঙ্গেই রয়েছে উদার সচ্ছলতা।

ঈমানদার লোককে বিপদ যখন চেপে ধরে, তখনো তার মনে এই আশা বর্তমান থাকে যে, এই বিপদ সহ্য করার অতীব কল্যাণময় ফল আল্লাহ্ তা'আলা দেবেন এবং এরপরই সুখ ও শান্তি তিনি দান করবেন।

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ - (البقرة : ١٥٦-١٥٧)

ঈমানদার লোকেরা এমন যে, কোনো বিপদ যখন তাদের বেষ্টন করে তখন তারা বলে, আমরা একান্তভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য এবং আমরা সকলে তাঁরই দিকে ফিরে যাব। এই লোকেরা এমন যে, এদের উপর তাদের আল্লাহ্‌র কাছে থেকে পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হবে এবং এরাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

ঈমানদার লোকেরা যখন লক্ষ্য করে, বাতিল নীতি সমস্ত দেশ ও সমাজকে অক্টোপাশের মতো আকড়ে ধরেছে, সমস্ত মানুষ বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, অন্যায় ও অসত্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে, তখনো তারা নিরাশ হয় না। কেননা তাদের বিশ্বাস হলো, বাতিল কখনো স্থায়ী হতে পারে না, তা বিলীন হবেই। বাতিল হচ্ছে পানির উপর সৃষ্ট ফেনা। তা নিতান্তই ক্ষণভংগুর, ক্ষণস্থায়ী।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ - (الانبياء :١٨)

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ الْاَمْثَالَ - (الرعد : ١٧)

বরং সত্যকে দিয়ে বাতিলের উপর আঘাত হানি, পরে তা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যা ফেনা তা তো এমনিই উবে যায়। আর যা মানুষের জন্য কল্যাণময় তাই শুধু শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকে।

ঈমানদার লোক যখন খুনখুনে ও থুত্থুরে বুড়ো হয়ে যায়, সমস্ত চুল দাড়ি পেকে যায়, এই জীবনের আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আর বড় দেরী নেই বলে স্পষ্ট মনে হয়, তখনো সে নিরাশ হয় না, কেননা মৃত্যু হলেই সে পুনরুজ্জীবন লাভ করবে, বার্ধক্যের পরিবর্তে সে পাবে নতুন যৌবন ভরা জীবন এবং এমন জীবন যার কোনো মৃত্যু নেই, শেষ নেই।

جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِیْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَیْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِیًّا –

لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیْهَا بُكْرَةً وَّعَشِیًّا – (مریم : ٦١-٦٢)

তাদের জান্নাত দেয়া হবে মহান দয়াবান যা দেয়ার জন্য তাঁর বান্দাগণকে তা গোপনে অপ্রকাশ্য থাকা অবস্থায়ই ওয়াদা করে রেখেছেন। নিশ্চয়ই এ ওয়াদা পূর্ণ হবে। সেখানে তারা কোনো বেহুদা কথা শুনবে না। যা কিছু শুনবে, ঠিকই শুনবে। আর তাদের রিযিক তাদের সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে দেয়া হবে।

বস্তুবাদী নাস্তিক লোকেরা সাধারণ প্রচলিত অভ্যাস ও প্রকাশ্য কার্যকারণ অনুযায়ী জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে অভ্যস্ত। তার উর্ধ্বে কোনো কিছুরই কামনা-বাসনা তাদের থাকে না। কিন্তু মুমিনগণ বাহ্যিক কার্যকারণের উর্ধ্বে উঠেন। বিশ্বলোকের মূল সত্তার নিগূঢ় তত্ত্বের উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সমস্ত কার্য ও কারণের যিনি একমাত্র স্রষ্টা, সেই মহান আল্লাহ্র প্রতিই তারা উন্মুখ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ কেবলমাত্র বাহ্যিক কার্যকারণের উপরই নির্ভরশীল নয়। এ ছাড়াও এমন কতগুলো অদৃশ্য কার্যকারণ তাঁর কাছে রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের অনুভূতির উর্ধ্বে। ফলে বান্দারা যখন উপস্থিত হয় তখন তারা সেই গোপন ও অদৃশ্য কার্যকারণ থেকে আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ও আশাবাদী হয়ে থাকে। ফলে তারা কঠিন-তীব্র বিপদেও আল্লাহ্র আশ্রয় পান। নৈরাশ্যের অন্ধকারে তাদের সম্মুখে ভাস্বর হয়ে ওঠে আল্লাহ্র অসীম দয়া ও অনুগ্রহের দীপ। যে রোগীর নিরাময়তা সম্পর্কে সব চিকিৎসা বিশেষজ্ঞই নৈরাশ্য প্রকাশ করেছে, তখন এই রোগী আল্লাহ্র সেই বিশেষ রহমত পাওয়ার জন্য আশাবাদী হয়ে থাকে। রোগমুক্তির জন্য তখন তারা আল্লাহ্কেই ডাকে। সমুদ্রের অতল পানিতে যার ডুবে যাওয়া নিশ্চিত, সেই নিমজ্জমান ব্যক্তিও বেঁচে যাওয়ার আশা পোষণ করে একমাত্র আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থার অধীন। অত্যাচার-উৎপীড়নে জর্জরিত ও ওষ্ঠাগতপ্রাণ ব্যক্তিও আল্লাহ্র সাহায্যে নিষ্কৃতি লাভের আশায় বলীয়ান। কেননা মজলুমের দো'আ আল্লাহ্র কাছে শ্রুত হয় সঙ্গে সঙ্গেই। নিঃসন্তান ব্যক্তিও আশা করে আল্লাহ্র মেহেরবানীতে তার সন্তান লাভ সম্ভব

হবে। এই ধরনের সব মানুষেরই এই যে আশাবাদ, তার ভিত্তি হলো এই যে, ঠিক এই কঠিন মুহূর্তেও যখন বাহ্যিক কার্যকারণ সবই নিঃশেষ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে তখনও মহান আল্লাহ্ তার বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের উদ্ধার করতে ও রক্ষা করতে পুরোপুরি সক্ষম। আল্লাহ্র কাছে অসম্ভব বা সাধ্যাতীত বলতে কিছু নেই।

হযরত ইবরাহীম (আ) বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের আশা প্রকাশ করলেন আল্লাহ্র কাছে। আল্লাহ্ তাঁর সে আশা পূরণের ওয়াদা করলেন। কিন্তু চরম বার্ধক্যকালেও কি করে তাঁর সন্তান হতে পারে, তা ছিল তাঁর অবোধগম্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈরাশ্য ও সংশয়ের অন্ধকার দূর করে ঘোষণা করলেন ঃ

بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ - قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ

(الحجر : ٥٥-٥٦)

আমি তোমাকে সন্তানের সুসংবাদ পরিপূর্ণ সত্যতা সহকারেই দিচ্ছি। অতএব তুমি নিরাশাবাদী হবে না। বলল, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় কেবল পথভ্রষ্ট লোকেরাই।

হযরত ইয়াকুবের সন্তান ইউসুফ হারিয়ে গেছেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁর কোনো সংবাদই পাওয়া যায়নি। সময় এত বেশি অতিবাহিত হয়ে গেল যে, তাঁকে ফিরে পাওয়ার সব আশা-ভরসাই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কিছুমাত্র নিরাশ হন নি। এরূপ অবস্থায়ও তাঁর কথা ছিল ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। হয়ত শীগগীরই আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে এনে দেবেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী। (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৩)

সন্তান হারানোর বেদনা যখন তীব্র ও দুঃসহ হয়ে উঠল, তখন তিনি বললেন ঃ

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ - (يوسف : ٨٦)

আমি আমার বেদনা ও দুঃখ আল্লাহ্র কাছেই পেশ করছি।

তিনি তাঁর সন্তানদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ -

তোমরা আল্লাহ্র দয়া-অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হবে না। কেননা আল্লাহ্র দয়া-অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় কেবলমাত্র অবিশ্বাসীরাই। (ইউসুফ ঃ ৮৭)

হযরত আইয়ুব (আ) রোগে-শোকে জর্জরিত ও নিকটআত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েও আল্লাহ্‌কে ডেকে বলেছিলেন ঃ

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ -

হে আল্লাহ! আমাকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করেছ। এখন একমাত্র তুমিই সর্বাধিক দয়াবান।

আল্লাহ্ তাঁর দো'আ কবুল করলেন এবং বললেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا - (الانبياء : ٨٤)

তাঁর যেসব রোগ-শোক ছিল সবই আমরা দূর করে দিলাম এবং তাকে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরিয়ে এনে দিলাম এবং তারই মতো আর যারা তার সঙ্গী ছিল, তাদেরও রহমত দান করলাম আমার কাছ থেকে।

হযরত ইউনুস (আ) সমুদ্রে মাছের পেটের মধ্যে বন্দী হয়ে কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি প্রার্থনা করলেন ঃ

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - (الانبياء : ٨٧)

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, তুমি মহান পবিত্র। আর আমি তো জালিমদের একজন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। বললেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ - (الانبياء : ٨٨)

আমরা তাঁর দো'আ কবুল করলাম এবং তাকে মহাদুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দান করলাম— এমনিভাবে সমস্ত মুমিনকেই আমরা বিপদ থেকে মুক্তি দান করে থাকি।

অর্থাৎ বিপদে পড়ে একজন নবী আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইলে কেবল তিনিই যে সাহায্য পাবেন, সাধারণ ঈমানদার ও অ-নবী লোকেরা যে তা পাবে না এমন কথা নয়। বরং এরূপ প্রার্থনা কবুল হওয়া ও বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সাধারণভাবে সব মুমিনের পক্ষেই সম্ভব। কাজেই মুমিন কখনো নিরাশ-হতাশ হতে পারে না।

হযরত মূসা (আ) যখন রাতের অন্ধকারে বনি-ইসরাঈলীদের সঙ্গে নিয়ে মিসর থেকে রওয়ানা হলেন, মিসরাধিপতি ফিরাউন তাঁর পিছন থেকে তাঁকে

তাড়া করল। তখন পিছনে তাদের শত্রু-বাহিনী আর সম্মুখে বিশাল সমুদ্র। রক্ষা পাওয়ার কোনো পথই বাহ্যত উন্মুক্ত ছিল না তখন। তখন হতাশা ও নিরাশা ছাড়া আর কিই বা হতে পারে। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও তিনি নিরাশ হন নি, ভয় পান নি; বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন ঃ

كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ – (الشعراء : ٦٢)

না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার আল্লাহ্ তো আমার সঙ্গেই রয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাদের পথ দেখাবেন।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ ব্যবস্থায় হযরত মূসা ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সমুদ্র পার করিয়ে দিলেন এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউনী বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স) সওর গুহায় আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাঁকে ধরবার জন্য সন্ধান অভিযান চালাতে শুরু করল। তারা গুহার মুখের উপর এসে দাঁড়াল। নীচের দিকে তাকালেই তারা তাঁকে দেখতে পারে, এ সময় অবস্থা এতই সংকটপূর্ণ ছিল; না ছিল আকাশে উড়ে যাওয়ার উপায়, না ছিল জমিনে ধ্বসে যাওয়ার কোনো পথ। হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা) ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ لا تحزن ان الله معنا —দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا – (التوبة : ٤٠)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি শান্তি ও স্বস্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন যাদের তোমরা দেখতে পাও না।

এ সব ইতিহাসের সত্যায়িত ঘটনা। এ সবের সত্যতায় একবিন্দু সন্দেহ নেই। বস্তুবাদীরা যদিও এসব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করতে রাজি নয়, তাদের অনেকে আবার এসব ঘটনার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে এ সবের বিশেষত্বকেই হরণ করতে সচেষ্ট; কিন্তু তাতে আসল সত্য কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। তাই ঈমানদার লোকদের বিশ্বাস, সাধারণ প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির নিষ্ঠুর বন্ধনে আল্লাহ্র কুদরত বন্দী নয়। তার দ্বারা তা সীমাবদ্ধ ও প্রতিহত হয় না কখনো। আর সব সময় যে সাধারণ নিয়মেরই কার্যকরতা হবে তার বিপরীত কিছু হতে পারবে না— এমন কোনো কথাই নেই। প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিচারেও সে মত গ্রহণযোগ্য নয়। যা আবহমানকাল থেকে হয়ে এসেছে, যা সাধারণতই হয়ে থাকে তার বিপরীত কিছু হতেই পারে না, দুনিয়ার বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকরাও যদি তাই বিশ্বাস করতেন তা হলে, দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অভিনব বিকাশ এবং নিত্য নব আবিষ্কার

উদ্ভাবনী কখনোই সম্ভবপর হতো না। মানব-সভ্যতার এতটা উৎকর্ষ লাভও ঘটত না কোনো দিনই। তাই মানব জগতে— অন্তত দুনিয়ার ঈমানদার লোকদের কাছে নৈরাশ্য ও হতাশা বলতে কোনো কিছু থাকতে পারে না।

জীবনে আশাবাদের অপরিহার্যতা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ ও অগ্রগতির জন্য আশাবাদ অপরিহার্য, আশাবাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিভা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনী চিন্তা যদি বর্তমানের পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত তাহলে অজানাকে জানবার ও নিত্য অভিনব জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা স্তব্ধ হয়ে যেত। দুনিয়ায় মান্ধাতার আমলের সব ব্যবস্থাই চলতে থাকত। দুনিয়ায় নবাবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলত না, মানুষ চাঁদের উপর বিচরণ করতেও সক্ষম হতো না। এক কথায় কোনো পরিবর্তনই কখনো সাধিত হতো না। সংস্কারবাদী যদি পরিবর্তন সম্ভাব্যতার প্রতি অবস্থান না হয়, তাহলে বিনাযুদ্ধেই পরাজয় বরণ করে নেয়া ছাড়া আর কোনো পরিণতি হতে পারে না। আর যদি আস্থা ও আশাবাদ প্রবল হয়, তাহলে কঠিন ও দুরতিক্রম্য ব্যাপারও সহজ হয়ে যায়, দূর আসে অতি কাছে। হযরত রাসূলে করীম (স)-ই হলেন এমন একজন বড় সমাজ সংস্কারক, যাঁর তুলনা সাধারণত মেলে না। তিনি দ্বীনের দাওয়াত শুরু করে মক্কায় তেরটি বছর অতিবাহিত করেন। এ সময় তাঁর দাওয়াত ঠাট্টা ও বিদ্রূপের চরম আঘাতের সম্মুখীন হয়। কুরআন শুনতে লোকেরা রাজি হয় না। তিনি তাঁর সত্যতার স্বপক্ষে যেসব অকাট্য প্রমাণ পেশ করলেন, সবকেই তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নির্মম অত্যাচার ও উৎপীড়নে জর্জরিত করে তোলা হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে করীমের মানসলোকে চির-অনিবার্ণ আশার আলোক-মশাল মুহূর্তের তরেও নির্বাপিত হলো না।

কাফেরদের অত্যাচার-জুলুম যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তিনি সাহাবিগণকে হাবশায় চলে যেতে বললেন। এই সময় তিনি তাদের যে কথাটি বলেছিলেন তা ছিল আশাবাদ ও প্রত্যয়ে চিরভাস্বর ঃ

تَفَرَّقُوْا فِىْ الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ سَيَجْمَعُكُمْ -

তোমরা এখন দুনিয়ার যে যেখানে পারো ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ নিশ্চয়ই খুব শীঘ্র তোমাদের একত্রিত করবেন।

খাব্বাব ইবনুল ইরত (রা) তাঁর একজন সাহাবী। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁর মালিক ছিল মক্কার জনৈক স্ত্রী লোক। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে সে তাকে নিরন্তর অমানুষিক শাস্তি ও পীড়ন করত। লৌহ শলাকা আগুনে উত্তপ্ত করে তাঁর পৃষ্টে ও পেটে দাগ দিত। বারবার এই কষ্ট মানুষ কতকাল সইতে পারে ?

তিনি অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলে করীমের খেদমতে হাযির হয়ে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করেন না'। নবী করীম (স) তাঁর এ আর্তকণ্ঠস্বর শুনে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ قَبْلَكُمْ كَانَ يُمَشَّطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ وَيُنْشَرُ بِالْمُنْشَارِ فِرْقَتَيْنِ مَايُصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُظْهِرَنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضَرَ مَوْتَ لَايَخَافُ اِلَّا اللّٰهُ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

মনে রেখো, তোমাদের পূর্বের এই আদর্শে আদর্শবান লোকদেরকে লোহার চিরুণী দিয়ে সমস্ত দেহের মাংস আঁচড়িয়ে খুলে ফেলা হতো। অনেককে করাত দিয়ে দুইভাগে চিরে ফেলা হতো। কিন্তু এত সব উৎপীড়নও তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারত না। আল্লাহ্‌র শপথ; আল্লাহ্ এই দ্বীনকে অবশ্য অবশ্যই বিজয়ী করবেন। ফলে এমন একদিন আসবে, যেদিন একজন পথিক জন্তুযানে আরোহণ করে সান্‌য়া থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত চলে যাবে, পথে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না ... ছাগ শাবকেরও ভয় থাকবে না নেকড়ে বাঘের। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া শুরু করে দিয়েছ।

ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার যে কতবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, কত অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে এর, তা লিখে শেষ করা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নৈরাশ্যের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যে আশার আলো ঈমানদার লোকদের হৃদয়-মন ও জীবনের কর্মপথকে সমুজ্জ্বল ও সমুদ্ভাসিত করে তুলেছে তার কি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে! এ হচ্ছে সেই আশাবাদ যা ঈমানদারের হৃদয়ে চির-অনির্বাণ হয়ে জ্বলতে থাকে। আল্লাহ্‌র মদদের প্রতি ঈমানদারের সাহায্য পাওয়ার আশা ছাড়া এ তো আর কিছুই নয়।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ط يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - وَعْدَ اللّٰهِ ط لَايُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الروم : ٥-٦)

আল্লাহ যাকে চান সাহায্য করেন (আল্লাহ্‌র সাহায্য যে চায় তাকেও)। তিনি তো সর্ববিজয়ী, দয়াবান। এ সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্ কখনোই তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে, অনেক লোকই তা জানে না।

ঈমান ও প্রেম-প্রীতি

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَنْ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا-

(مسلم)

যে আল্লাহ্‌র মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ ও জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা কস্মিনকালেও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না, যদি না তোমরা ঈমান আনো। কস্মিনকালেও তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস। (মুসলিম)

ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির একটা বিশেষ অর্থ আছে। তা তাৎপর্যের দিক দিয়ে সন্তোষ ও স্বস্তির তুলনায় বিশিষ্ট এবং প্রভাব ও কার্যকরতার দিক দিয়ে তা অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী। কোনো একটা জিনিসের কিংবা কোনো লোকের প্রতি কারো সন্তোষ থাকলে সে যে তাকে ভালোও বাসে এবং তার সাথে তার অন্তরেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। কেননা শেষোক্তটি হচ্ছে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার ব্যাপার, আর প্রথমোক্তটি নিছক সন্তোষ ও স্বস্তির ব্যাপার মাত্র। ভালো লাগা ও ভালোবাসা যে এক নয়, তা বলাই বাহুল্য।

প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা মূল সত্তার প্রাণ-শক্তি। হৃদয়-মনের সঞ্জীবনী। মানব জাতির জন্য তা শক্তি ও নিরাপত্তার দুশ্ছেদ্য রশি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন পৃথিবী, নক্ষত্ররাজি ও গ্রহজগতকে এমন এক দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে যে, মহাশূন্যে তীব্র গতিতে প্রত্যেকটি আবর্তিত হয়েও একটি অপরটির উপর ধাক্কা লাগায় না, বাঁধায় না পারস্পরিক সংঘর্ষ— কেননা তাই যদি হতো, তাহলে এসব পরস্পরে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে কবে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতো, জ্বলে-পুড়ে চাই হয়ে যেত এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত তার কোনো ইয়ত্তা ছিল না। অনুরূপ প্রেম-ভালোবাসা ও প্রীতিও একটা মহাশক্তি। এর মূল্য ও শক্তি-সামর্থের কথা আবহমানকাল থেকেই মানুষের জানা। এজন্য বুদ্ধিমান লোকেরা বলেছেন ঃ পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা যদি সত্যি ও খাঁটি হতো, তাহলে দুনিয়ার মানুষ আইন-বিধান ও বিচার-সুবিচারের মুখোপেক্ষী হতো না। কথাটি যে কত তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত প্রেম-ভালোবাসাই তিক্তকে মিষ্ট বানায়, মাটিকে বানায় স্বর্ণ। মলিন অপরিচ্ছন্নকে বানায় স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। রোগ-শোক দূর করে পরম সুখ

ও নিরাময়তা এনে দেয়। সংকীর্ণ কয়েদখানাকে বানায় আনন্দের গুলবাগিচা। অসুখকে বানায় সুখ, ক্রোধকে পরিণত করে স্নেহ-মমতায়। প্রেম-ভালোবাসা লৌহকে দ্রবীভূত করে, পাথরকে বানায় বিন্দু বিন্দু অণুকণা। মৃত্যুকে সঞ্জীবিত করে তার নিষ্প্রাণ দেহে নব জীবনের সঞ্চার করে দেয়। ভালোবাসা মানুষের ডানা, যার উপর ভর করে সে ভারী বস্তু হয়েও শূন্যলোকে উড়ে বেড়ায়, একজগত থেকে চলে যায় আর এক জগতে। মাটির পাতালপুরী থেকে উঠে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। দুনিয়ার ধন-ঐশ্বর্য ও রাজ্য-রাজত্বের দাসানুদাসরা তাই নিয়ে মত্ত থাকুক, তাদের সাথে আমার কোনো ঝগড়া নেই। আমরা প্রেম-ভালোবাসা-প্রীতি নিয়েই মহাসুখে রয়েছি। কেননা তাদেরও সব বস্তু অপহৃত হতে পারে। কিন্তু আমার এই ধন কখনোই নিঃশেষ হবে না।

> বেঁচে থাক হে দিগন্ত উজ্জ্বলকারী ভালোবাসা। হে আমার রোগ-পীড়ার চিকিৎসক! আমার ভয়-ভীতি ও বার্ধক্যের ঔষধি।

এসব কথা মহাকবির উচ্ছ্বাস হলেও এর একটিও অসত্য নয়। প্রেম-ভালোবাসা প্রীতিই এমন এক শক্তি যা আমাদের দেয় নিরাপত্তা, স্থিতি ও শান্তি-স্বস্তি। তাই আমাদের কর্তব্য প্রত্যেকটি জিনিসকে ভালোবাসা, প্রত্যেকটি মানুষকে ভালোবাসা। এমনকি সুখ ও সম্পদকে যেমন আমরা পছন্দ করি, ভালোবাসি; তেমনি দুঃখ-দুর্দসা ও দারিদ্রকেও আমাদের ভালোবাসা উচিত। প্রথমটি মৃদু মন্দ বায়ু— সংগ্রাম সংঘর্ষের উত্তাপকে শীতল করে, আর দ্বিতীয়টি আমাদের মনে প্রতিরোধ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের উচিত সমগ্র অস্তিত্বটাকেই ভালোবাসা। তার শুরুকেও যেমন, তেমন তার শেষকেও। মৃত্যু এবং জীবন এই অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

এই ধরনের ভালোবাসা আছে কার হৃদয়ে ? যদি থেকে থাকে, তাহলে বলতে হবে, সে মানুষ হয়েও ফেরেশতা।

এ প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারি এবং বলতে পারি, মানব সমাজের একটি বিরাট গোষ্ঠীই এই ধরনের ভালোবাসার অধিকারী। আর তারা সেই লোক, যাদের হৃদয়-মন জুড়ে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান।

এই ঈমানই স্বচ্ছ নির্মল ভালোবাসার উৎস। মুমিন সেই একক সত্তা, যে সবকিছুকেই ভালোবাসতে পারে, পারে দুঃখ-বিপদ ও নির্যাতন উৎপীড়নের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত আবেগে গলাগলি করতে। কেননা সে-ই সমগ্র অস্তিত্বকে ভালোবাসে, ভালোবাসে মৃত্যুকেও, যেমন ভালোবাসে জীবনকে।

আল্লাহ্ প্রেম

ইসলামের আকীদা অনুযায়ী মুমিন সমগ্র সত্তার অন্তর্নিহিত গভীর রহস্যের সাথে পরিচিত হতে পারে। ফলে সে ভালোবাসে জীবনদাতা আল্লাহ তা'আলাকে। কেননা তিনিই সমস্ত সৃষ্টি মূল, সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই মুঠোর মধ্যে।

মানুষ ভালোবাসে রূপ ও সৌন্দর্যকে, ভালোবাসে নিত্য নবসৃষ্টি ও শৃংখলপূর্ণ দৃঢ়তাকে। তাই ভালোবাসে সমগ্র জগতকে।

مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ – (الملك : ٣)

আল্লাহ্র সৃষ্টিলোকে একবিন্দু ব্যতিক্রম বা পার্থক্য দেখতে পাবে না।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ – (النمل : ٨٨)

আল্লাহ্র সৃষ্টি কুশলতা, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় করে বানিয়েছেন।

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ – (السجدة : ٧)

সেই মহান আল্লাহ্ই সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসকে অতীব সুন্দর ও সুদর্শন করে বানিয়েছেন।

মানুষ পূর্ণত্বকে ভালোবাসে। কিন্তু মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনোরূপ পূর্ণত্ব আছে কি ? যেখানে যা কিছু পূর্ণত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা এমন সব অণু ও বিন্দু, প্রতিমুহূর্তে যা আল্লাহ্র কাছে থেকে শক্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।

মানুষ পরোপকার ভালোবাসে, ভালোবাসে পরোপকারকারীকে। কিন্তু যিনি মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে টেনে বের করে আনলেন অস্তিত্বের আলোকোদ্ভাসিত জগতে, যিনি তাকে জন্তু বা নিরেট বস্তু না বানিয়ে মানুষ বানালেন, পৃথিবীতে অভিষিক্ত করলেন মহান খিলাফতের মর্যাদায় এবং সমগ্র জগতকে তার কর্মক্ষেত্র বানিয়ে এর সবকিছু তার অধিন করে দিলেন, তাঁর চাইতেও মানুষের উপকারী আর কেউ আছে কি ?

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا –

সেই মহান আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এই দুনিয়ার সবকিছু।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً – (لقمن : ٢٠)

তোমরা দেখছ না— লক্ষ্য করছ না, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য কর্মনিরত করে রেখেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সবকিছু এবং তোমাদের প্রতি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন অফুরন্ত নেয়ামতসমূহ।

মানুষ ভালোবাসে পিতা-মাতাকে, ভালোবাসে নিজ ঔরসজাত সন্তানকে, ভালোবাসে নিজেকে। কিন্তু মানুষের সবচাইতে বেশি ভালোবাসা উচিত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হওয়া কিতাবকে— কিতাবের বাহক-ধারক-উপস্থাপক রাসূলে করীম (স)-কে। কেননা এই কিতাব ও নবী আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছেন, এসেছেন বিশ্বমানবতাকে মূর্খতা ও কুফরির পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে। নবীকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন রাহমাতুল-লিল আলামীন রূপে। ভালোবাসা উচিত ন্যায়পন্থী ও কল্যাণকামী প্রত্যেকটি মানুষকে। কেননা এরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে, আল্লাহ্‌ও ভালোবাসেন এদেরকে। তাই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মুখে যে দো'আ উচ্চারিত হয়েছে, তার ভাষা ছিল এইঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ -

হে আল্লাহ, আমাকে তোমার ভালোবাসার রিযিক দাও, তার ভালোবাসা দাও, যে তোমাকে ভালোবাসে। আর তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে শীতল পানির চেয়েও অধিক প্রিয় বানিয়ে দাও।

বিশ্বপ্রকৃতির ভালোবাসা

ইসলামের আলোকে মুমিন যেমন আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে তেমনি ভালোবাসে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে— সমগ্র সৃষ্টিলোককে। কেননা এ সবই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ, সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সাক্ষী।

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى - وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى - (الاعلى : ٢-٣)

সেই আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন, সুষ্ঠু সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং তিনিই সবকিছুর পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন ও কর্মপথ দেখিয়েছেন।

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ - (القمر : ٤٩)

আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকেই পরিমাণে হিসাব মতো সৃষ্টি করেছি।

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ - (الحجر : ٢١)

প্রত্যেকটি জিনিসের সঞ্চিত সম্পদের স্তূপ আমার কাছে বিদ্যমান। আমরা তা জানাশুনা পরিমাণ অনুযায়ীই নাযিল করি।

এই বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের প্রতিকূল নয়— শত্রু নয়, তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সতত নিয়োজিত। মানুষ যাতে করে এই দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র খিলাফতের কঠিন দায়িত্ব সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করতে পারে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সেজন্য তার সাথে পূর্ণ আনুকূল্য ও সহযোগিতা করছে। সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিস— প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু মহাসত্যের প্রবক্তা। তা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, প্রকাশ করছে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা। বিশ্বপ্রকৃতির এই ঘোষণা ও প্রকাশ এমন ভাষায় হয়, যা মানুষের সীমাবদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি অনুধাবন করতে পারে না।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ - (بنى السرآءيل : ٤٣)

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুটোতে যারা-ই এবং যা কিছু রয়েছে সব-ই আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ করে। প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে তার প্রশংসা সহকারে। কিন্তু তোমরা তাদের তস্‌বীহ্ বুঝতে পার না।

অতএব এ বিশ্বলোক মন্দ নয়— মন্দে ভরা নয়। কাজেই এটার খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, এমন কথার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এই বিশ্বলোক আল্লাহ্‌র এক উন্মুক্ত কিতাব। এ কিতাব শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই পড়তে পারে, এর বক্তব্য বুঝতে পারে। তা পড়ার জন্য বর্ণজ্ঞানের প্রয়োজন নেই এবং তা বোঝার জন্য প্রয়োজন নেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বা দর্শনের উচ্চ ডিগ্রীধারী হওয়ার। এ বিশ্বলোকের প্রতিটি বিন্দুতে— প্রতি পরতে পরতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে আল্লাহ্‌র অসীম অনন্য সাধারণ কুদরতের কথা, অপরিমেয় অশেষ রহমতের কথা, তাঁর বিরাটত্ব ও মহানত্বের কথা, তাঁর অতুলনীয় নেয়ামত ও অবদানের কথা।

এই বিশ্বালোক— তার উচ্চভাগ বা নিম্নভাগ আল্লাহ্‌র অতুলনীয় কুদরতের বাস্তব প্রমাণ। প্রত্যেকটি জিনিসের মৌল সৃষ্টি উপাদান তিনিই দিয়েছেন। তিনিই নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিলোক ব্যাপী একটা নিরংকুশ একত্ব ও ঐকিকতা বিরাজিত। আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, জীব-জন্তু, প্রাণীলোক, উদ্ভিদ জগত ও সমুদ্রতল সবকিছুই সেই ঐকিকের অবিভাজ্য অংশ। এ যেন একটা অখণ্ড দেহসত্তা। এর প্রত্যেকটি অংশ অপর অংশের সহযোগী, সাহায্যকারী ও পরিপূরক। সবকিছুর মধ্যে পরস্পরের পূর্ণ সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য এবং ঐকান্তিক মিলমিশ বিরাজতি।

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَاالَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ - (يٰس : ٤٠)

সূর্য এমন নয় যে তার জন্য চন্দ্রকে ধরে ফেলা বাঞ্ছনীয় হতে পারে, রাত্রির জন্যও বাঞ্ছনীয় নয় দিনকে অতিক্রম করে যাওয়া। ... এ সবের প্রত্যেকটি সমষ্টিগতভাবে মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।

এ বিশ্বলোকের কোনো একটা জিনিসও অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টি করা হয়নি। এ বিশ্বলোক সৃষ্টির যে মৌল পরিকল্পনা ও লক্ষ্য, তারই সাথে আনুকূল্য করছে এর প্রত্যেকটি জিনিস। এ বিশ্বলোক চলমান থাকুক, পৃথিবী আবাদ থাকুক, এখানে জীবনের ধারা চলতে থাকুক, অক্ষুণ্ন ও অব্যাহতভাবে চলুক আল্লাহ্‌র খলীফা মানুষের খেদমত।

কিছু সংখ্যক লোক অন্ধকারকে ভীতি ও আতংকের চোখে দেখছিল। আর এ কারণে তারা রাতের অন্ধকারকে করত ঘৃণা। রাতের অন্ধকারকে তারা মন্দের স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি মনে করত, যার কাজ হলো আলো ও মংগলের আল্লাহ্‌র সাথে নিরন্তর লড়াই করা। ইসলাম এই কুসংস্কারের কুহেলিকা দীর্ণ করেছে। জানিয়েছে, সময় ও কালের নিরবচ্ছিন্ন ধারা দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ আলোকোদ্ভাসিত— দিন এবং অন্য ভাগটি সূর্যালোক বঞ্চিত রাত। আর এই আলো ও আঁধার মহান আল্লাহ্‌র এক অকাট্য নিদর্শন। সমগ্র সৃষ্টিলোকের প্রতি তাঁর এই ব্যবস্থা এক মহান অবদান। কাজেই তাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই, অর্থ নেই। এ ব্যবস্থার জন্য বরং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা উচিত।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ - وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (القصص : ٧٢-٧٣)

বলো, তোমরা কি ভেবে দেখছ, আল্লাহ যদি রাতটিকে তোমাদের জন্য চিরন্তন ও স্থায়ী বানিয়ে দিতেন কেয়ামত পর্যন্ত, তাহলে আল্লাহ ছাড়া এমন ইলাহ্ আর কে আছে যে তোমাদের একটু আলো এনে দিত ? তোমরা কি শুনতে পাও না ? বলো, তোমরা কি বিবেচনা করেছ— আল্লাহ যদি দিনটিকে তোমাদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অনড় বানিয়ে দিতেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ তোমাদের কাছে রাত এনে দিত, যাতে তোমরা সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ করতে পারতে ? তোমরা কি ভেবে দেখো না ? এটা

তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই রহমতের ব্যাপার যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা সান্তনা পেতে পার ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার, আর আশা করা যায়, এজন্য তোমরা শোকর করবে।

দুনিয়ায় যদি কেবল রাত হতো তাহলে কে দিন এনে দিত, আর দুনিয়ায় যদি কেবল দিন হতো, তাহলে রাত কে এনে দিত? ... এই হলো উপরোদ্ধৃত দীর্ঘ আয়াতের প্রথম প্রশ্ন। এনে দেয়ার এই প্রশ্ন এ কারণে যে, কেবল রাত হলে ও দিন আদৌ না হলে এখানে জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে এখানে যদি কেবল দিন হতো, রাত আদৌ না হতো, তাহলেও জীবনের জীবন এখানে বাঁচতে পারত না। আর রাতের পরে দিন আনা বা দিনের পরে রাত আনা যার তার কর্ম নয়। তা পারে কেবল সেই শক্তি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির উপর যার একচ্ছত্র আধিপত্য, প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চলে। এরূপ শক্তি— আল্লাহ ভিন্ন আর কারো নেই। কাজেই তা হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহ যে ব্যবস্থা করেছেন, তার গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করাই মানুষের কর্তব্য। মানুষের জীবনে যেমন কাজ দরকার, তেমনি কর্মক্লান্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে একাধারে দীর্ঘক্ষণের বিশ্রাম ও নিদ্রা। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা সময় ও কালকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি ভাগ হলো দিন আর দ্বিতীয় ভাগটি হলো রাত। দিন শেষ হওয়ার পর রাত। রাতটির শেষে আবার একটি দিন। আবহমানকাল থেকে কালস্রোত এমনিভাবেই বয়ে এসেছে। দিনের বেলা সাধারণত কাজকর্ম ও উপায়-উপার্জনের সময়। আর রাতেরবেলা বিশ্রামকাল। মানুষের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে কালস্রোতকে এ দুভাগে বিভক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বমানবতার প্রতি মহাকল্যাণ সাধন করেছেন, এজন্য মানুষের কতর্ব্য— আল্লাহ্‌র অকৃত্রিম শোকর আদায় করা। এই হচ্ছে উপরোদ্ধৃত আয়াতের শেষাংশের বক্তব্য।

আল্লাহ্ সৃষ্ট এই বিশ্বপ্রকৃতিকে পছন্দ করা এবং একে ভালোবাসা প্রত্যেক ঈমানদার লোকের কর্তব্য। কেননা দিন ও রাতের এ আবর্তন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত ও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপর একমাত্র তাঁরই নিরংকুশ কর্তৃত্ব চালু থাকার অকাট্য প্রমাণ। এ হচ্ছে ভাষাহীন 'কুরআন'। এই 'কুরআন' তার নীরব ভাষায় আল্লাহ্‌র ইলাহিয়ত্ব প্রমাণ করছে।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ - (اٰل عمرٰن : ١٩٠-١٩١)

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিঃসন্দেহে স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে সেই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করে, আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চালায়। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, হে আমাদের আল্লাহ! তুমি এগুলো নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করনি, অতীব পবিত্র।

জীবনের প্রীতি

মুমিন-মুসলমান বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালোবাসে, ভালোবাসে এই জীবনকেও। তারা এই জীবনটাকে কোনো পাপ মনে করে না, অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন মনে করে না। এ জীবনকে তারা এমন জেলখানাও মনে করে না, যেখান থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করার আবশ্যক হতে পারে। এ জীবন তো মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র একটা বিশেষ দান, একটা অতি বড় দায়িত্ব এবং এমন একটা নেয়ামত, যার জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করেও শেষ করা যায় না। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ - (مسند احمد، ترمذى)

মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল হয়েছে উত্তম।

কজেই কোনো মুমিন-মুসলমান মৃত্যু কামনা করতে পারে না, মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তা আসুক, এই বাসনাও তাদের মনে জাগতে পারে না কখনো—কোনো অবস্থাতেই। কেননা তা এসে গেলে তার কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। আর মুমিন তো সারাটি জীবন ভরে নেক আমল করতে থাকে, তা যত দীর্ঘই হোক-না কেন। তাই রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

لَايَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَاِمَّامُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبَ -

তোমাদের কারোরই মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়। যদি তুমি নেক আমলকারী হও, তাহলে বেঁচে থেকে বেশি বেশি নেক আমল করবার সুযোগ পাবে। আর যদি মন্দ আমলকারী হও, তাহলে হয়ত জীবনের কোনো এক সময় তওবা ও অনুতাপ করার সুযোগ পাবে। (বুখারী)

অতএব এই জীবনটা সর্বাবস্থায়ই ভালো, এক মহামূল্য সম্পদ। তোমার সাহস থাকলে তুমি তো এই দো'আই করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِىْ -

(نسائى، حاكم)

হে আমাদের মাওলা! আমাকে বাঁচিয়ে রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই জীবনকে আমার জন্য কল্যাণকর মনে করবে। আর আমাকে মৃত্যু দাও, যখন মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গলজনক হবে।

মৃত্যু প্রেম

মুমিন জীবনকে ভালোবাসে। তবে সে রকমের ভালোবাসা নয় যেমন লোভী ব্যক্তি অতি সামান্য নগণ্য জিনিসের জন্য পাগল হয়ে যায়। দুনিয়ায় স্বাধ আস্বাদনের মহা সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের জন্য পাগল হওয়া মুমিনের কাজ নয়। দুনিয়া লোভীরা মৃত্যুকে ভয় করে। মরতে তারা চায় না। কিন্তু মুমিন সে রকম হয় না। তারা জীবনকে ভালোবাসে এ কারণে যে, বেঁচে থাকলে সে দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র সত্য দ্বীনের কাজ বেশি বেশি করতে পারবে, মরে গেলে সে কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে মৃত্যু প্রেমও তার রয়েছে। কেননা সে জানে, মরলেই সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অবিলম্বে পাবে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ - (بخاری، مسلم)

যে লোক আল্লাহ্‌র সাক্ষাত ভালোবাসে, আল্লাহ্‌ও ভালোবাসেন তার সাক্ষাত।

রাসূলে করীম (স)-কে দুনিয়ায় বেশি দিন বেঁচে থাকা ও অবিলম্বে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ এ দুটির যে কোনো একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি আমার সর্বোচ্চ বস্তুকেই গ্রহণ করলাম। হযরত আলী (রা) যখন আততায়ী আবদুর রহমান ইবনে মূলজামের তরবারির আঘাত পেলেন, তখন উচ্চস্বরে বলে উঠলেন ঃ

فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ -

কাবার মাবুদের শপথ, আমি সফল হয়েছি।

হযরত বিলালের মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে তিনি বলে উঠলেন ঃ

আমি কালই হযরত মুহাম্মাদের প্রেমিকদের সাথে মিলিত হচ্ছি।

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) কাফির-মুশরিকদের বলতেন ঃ

رَمَيْتُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ -

তোমরা এমন লোকদের সাথে সংঘর্ষে নেমেছ যারা মৃত্যুকে ভালোবাসে, যেমন তোমরা ভালোবাস জীবনকে।

মানুষ প্রেম

মুমিন মানুষকে ভালোবাসে, ভালোবাসে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে। কেননা মানুষ হিসাবে সব মানুষই পরস্পরের ভাই। দুটো দিক দিয়ে সব মানুষ এক। বংশের দিক দিয়ে সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান। সকলের দেহে একই পিতা-মাতার রক্ত প্রবাহিত। আর দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র বান্দাহ হিসাবে সব মানুষ এক ও অভিন্ন কেউ আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও বন্দেগী কার্যত অস্বীকার করলেও আল্লাহ সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌র বান্দাহ হিসাবে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী কার্যত করার উদ্দেশ্যে। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -

হে মানুষ! ভয় করো তোমাদের সেই আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদের একটি মাত্র প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করছেন তার জুড়ি, আর এই দুজনের বংশে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা ভয় করো সেই আল্লাহ্‌কে যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছে দাবি জানাও এবং রক্ত সম্পর্ককে ...। (সূরা নিসা ঃ ১)

এখানে যে রক্ত সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তা-ই দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ঐক্য ও একত্বের সূত্রে গেঁথে রেখেছে এবং এই ভিত্তিতেই এখানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি সমষ্টি ও ঐকিক হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সমস্ত মানুষের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন করা হয়েছে এ আয়াতে। সে লক্ষ্য এক আল্লাহ্‌কে ভয় করা। কেননা তিনিই সমস্ত মানুষের সৃষ্টিকর্তা। সমস্ত মানুষের শত্রুও এক ও অভিন্ন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وقفة وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ - اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط اِنَّمَا يَدْعُوْا - (فاطر : ٥-٦)

হে মানুষ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ ওয়াদা সত্য। অতএব বৈষয়িক জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে, আর অন্য কোনো প্রতারণাও যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে প্রতারিত না করে। নিশ্চয় জেনো, শয়তান তোমাদের জন্য শত্রু। অতএব তোমরা তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ করো।

এ আয়াত অনুযায়ী সমস্ত মানুষের জন্য পরকালীন চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনই অভিন্ন লক্ষ্য। আর পরকালের ব্যাপারে মহাপ্রতারক শয়তান হচ্ছে সমস্ত মানুষের অভিন্ন শত্রু।

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সংকীর্ণ জাতীয়তায় বিশ্বাসী নয়। এ কারণে মুসলিম মুমিনের বিশ্বাস, সমস্ত মানুষই আদম সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। তবে দুনিয়ার মানুষে মানুষে ভাষা ও বর্ণে যে পার্থক্য, তা অন্য কিছু নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের প্রমাণ মাত্র। সৃষ্টিকর্তা যে একই মৌল উপাদানের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সীমা-সংখ্যাহীন বৈচিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম— এটা তারও প্রমাণ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ - (الروم : ٢٢)

আকাশগুল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের যে পার্থক্য তা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে শামিল। নিশ্চয়ই তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য।

সমস্ত মানুষকে ভাই মনে করার ভাবধারা মুসলিম মনের গৌণ ব্যাপার নয়। দ্বীনের দিক দিয়ে তা নিতান্ত বাজে কথাও নয়। এ এমন একটা বিশ্বাস, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা বিচার করবেন এবং কেয়ামতের দিন মানুষ তার মুখোমুখি হবে। আল্লাহ্‌র যিকির করতে করতে এ ব্যাপারে তার মুখ হবে সদা বাঙ্‌ময় এবং এর দরুনই আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাওয়ার আশা করা হবে। রাসূলে করীম (স) প্রত্যেক নামাযের পরে যে দো'আ করতেন, তার শেষ বাক্যটি ছিল এরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ -

হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভূ, সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সমস্ত ও প্রত্যেক জিনিসের, আমি সাক্ষী এ কথার যে, সমস্ত বান্দাই পরস্পর ভাই।

বস্তুত সমস্ত মানুষের পরস্পর ভাই হওয়ার আকীদা আল্লাহ্‌র তওহীদ বিশ্বাসের পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আকীদার ব্যাপার। অতএব তা যে মুসলিম-মানবের অন্তরে সুদৃঢ় আসন পাওয়ার যোগ্য বিশ্বাস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষ যদি সত্যিই বিভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে কুরআন তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়। তা হলো সৃষ্টিকুলের জাতি বিভাগ। আর মোটামুটি তা হলো জীব-জন্তু, পোকা-মাকড় ও পাখ-পাখালি।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ - (الا نعام : ٣٨)

জমিনের উপর যারাই চলাফেরা করে এবং যে সব পাখি তাদের দুই ডানার উপর ভর করে বায়ুলোকে উড়ে বেড়ায়, তারা সবই তোমাদের মতোই বিভিন্ন জাতি। কুরআনে আমরা এদের কারো উল্লেখই বাদ দেইনি— শেষে সকলকেই আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হতে হবে।

এ প্রেক্ষিতেই নবী করীম (স) বলতেন ঃ কুকুররাও যদি আল্লাহ্র সৃষ্টি জাতিসমূহের একটি জাতি না হতো তাহলে আমি সবগুলোকেই হত্যা করার নির্দেশ দিতাম।

দুনিয়ার মানুষ ও মানবতা সম্পর্কে ইসলামের আকিদা অতীব উদার। এখানে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্যের উন্নাসিকতা নেই, আঞ্চলিক বিদ্বেষ নেই, তেমনি শ্রেণীগত ঈর্ষা নেই, ব্যক্তিগত হিংসা নেই। এখানে আছে সমগ্র মানুষের প্রতি— সমগ্র সৃষ্টির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা।

মুমিন উদার নির্মল হৃদয়

ঈমান মুমিনদের হৃদয়-মনে ভালোবাসা ও প্রীতির যে বৃক্ষ রচনা করে তার একটা বিরাট ফলাফল হলো মুমিনের হৃদয়-মন হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত থাকে। ঈমানের নূর হিংসা-বিদ্বেষের অন্ধকারকে নিঃশেষে শূন্যে মিলিয়ে দেয়। এর ফলেই সে হতে পারে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ হৃদয়। তাদের কণ্ঠে আল্লাহ্র কাছে যে দো'আ স্বতঃই মূর্ত ও ধ্বনিত হয়, তাই এর অকাট্য প্রমাণ। একটি দো'আ এই ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (الحشر : ١٠)

হে আমাদের আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাদের সেই ভাইদেরও যারা ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের অতিক্রম করে গেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদার লোকদের প্রতি কোনোরূপ হিংসা ও বৈরী মানসিকতার সৃষ্টি করে দিও না। হে আল্লাহ! তুমি দয়াবান— অনুগ্রহপরায়ণ।

মুমিন লোক হিংসা করে না। কেননা রাসূলে করীম (স) হিংসাকে একটা রোগ বা পীড়া বলে অভিহিত করেছেন। আর বস্তুতই তা দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে একটা মারাত্মক রোগ বিশেষ। এ রোগটা মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক। তা মানুষের আত্মাকে কুরে কুরে খায়, যেমন ঘুণ খায় ঘাছ। এ রোগ কারো মনে লেগে গেলে তা কেবল তাকেই ধ্বংস করে না, ধ্বংস করে গোটা মানব সমাজকে। কেবল মানসিক দিক দিয়েই নয়, দৈহিক ও আত্মিক দিক দিয়েও।

মুমিন হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে না কখনো। মুমিন তো আল্লাহ্‌র সমস্ত বান্দাদের জন্য সামষ্টিক ও নির্বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে। কেউ বৈষয়িক বৈভব অপেক্ষাকৃত বেশি পেয়ে গেলে সে জন্য মুমিনের হৃদয়ে কোনো হিংসার আগুন জ্বলে না। কেননা তার ঈমান হলো, রিযিক বণ্টন সম্পূর্ণত আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারভুক্ত।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا -

(بنى اسرائيل : ٣٠)

তোমার আল্লাহ্‌ই যাকে ইচ্ছা প্রশস্ত রিযিক দান করেন, যাকে ইচ্ছা দেন পরিমিত। তিনিই তাঁর বান্দাদের বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত ও দৃষ্টিমান।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে অংশ দান করেছেন, তাঁর ন্যায়পরতা ও সুবিচারনীতির উপর মুমিনের অবিচল-অকৃত্রিম আস্থা রয়েছে। সে বিশ্বাস করে, সৃষ্টিকুলের জন্য আল্লাহ্‌র যে ফয়সালাই হয়, তার মূলে নিহিত থাকে পূর্ণাঙ্গ সুবিচার-বিবেচনা ও যুক্তিসঙ্গত বণ্টন নীতি। এ জন্য বলা হয় ঃ

اَلْحَاسِدُ جَاحِدٌ لِاَنَّهٗ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ الْوَاحِدِ -

হিংসুক ব্যক্তি অস্বীকারকারী। কেননা সে এক আল্লাহ্‌র বিচার-ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়।

কুরআনের কথা হলো ঃ

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ - (النساء : ٥٤)

আল্লাহ্ লোকদের যে অনুগ্রহ দান করেছেন, সেই ব্যাপারে ওরা লোকদের প্রতি হিংসা পোষণ করে?

এ জন্যই লক্ষ্য করা যায়, অন্য লোকদের উপর আপদকাল আপতিত হলে তাতে মুমিনরা কখনো সুখী ও আনন্দিত-উৎফুল্ল হয় না। আল্লাহ্ যদি কাউকে কোনো নেয়ামত দেন, তাতেও তাদের গায়ে আগুন জ্বলে ওঠে না। বরং নবী করীম (স) যে দো'আ শিখিয়েছেন, তা-ই সে পড়ে ঃ

اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْبِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ -

হে আল্লাহ্, তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে অথবা আমার প্রতি যে নেয়ামত এসেছে তা কেবলমাত্র তোমার কাছ থেকেই এসেছে। তোমার কেউ শরীক নেই। তোমার জন্যই সব প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

মুমিন হিংসা করে না। কেননা তার মনোভাব হীন নয়, নীচ নয়। হীনতা ও নীচতাকে সে বরদাশ্‌ত করতে পারে না। তার হৃদয়-মন সব সময় উচ্চ মহান ভাবধারা ও চিন্তা-ভাবনায় ভরপুর থাকে। হিংসা-দ্বেষের মতো হীন ও নীচ কাজ করার কোনো অবসর তার হয় না— তার মনেরও নয়, নয় তার কর্মশক্তির। তার মন-মগজের ব্যস্ততা থাকে সব বড় বড় চিন্তা-ভাবনা ও উচ্চাভিলাষ নিয়ে। তার সমস্ত কর্মতৎপতা ও চিন্তা-ভাবনার চরম লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে পরকাল ও জান্নাতের উপর। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاحَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا –

মাত্র দুজন লোকের ব্যাপারেই হিংসা করা যায়। একজন, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধনমাল দিয়েছেন এবং সে তা ন্যায় ও সত্যের পথে ব্যয় করার জন্য সম্পূর্ণ নিয়োজিত করে দিয়েছে। আর একজন সে, যাকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সে তার শিক্ষাও দেয় এবং তারই ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালাও করে।

কুরআনের নির্দেশ হলো ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ – (المطففين : ٢٦)

জান্নাত আগেভাগে নিজেই পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হওয়া সকলের কর্তব্য।

এখানে যে-হিংসার কথা বলা হয়েছে, তা পরের ধন বিনষ্ট হওয়ার কামনা নয়, তা হচ্ছে, অনুরূপ ধন ও গুণ লাভ করার কামনা-বাসনা প্রার্থনা। আর এ অর্থে হিংসা না দুষণীয়, না কোনো ব্যাধি। বরং তা কোনো ব্যক্তির থাকলে সে বড় হতে পারে, কোনো জাতির থাকলে সে জাতিও দুনিয়ায় উন্নতি করতে পারে, পারে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের পর্যায়ে নিজেদেরও উন্নীত করতে।

ইমাম হাসান বসরী বলেছেন ঃ তুমি তোমার ভাইকে হিংসা করো কেন ? কারো নিজস্ব গুণের কারণে আল্লাহ যদি তাকে কিছু দিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্‌র এই দানের জন্য তুমি তাকে হিংসা করবে কোন অধিকারে ? আর যদি তার বিপরীত কিছু থাকে, তাহলে যার পরিণতি জাহান্নাম, তাকে তুমি হিংসা করবে কোন কারণে ?

ইবনে সিরীন বলেছেন ঃ আমি দুনিয়ার কোনো ব্যাপারে কাউকে হিংসা করি না। সে যদি বেহেশতী লোক হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাকে দুনিয়ার ব্যাপারে

হিংসা করতে পারি কিরূপ ? জান্নাতের পাশে দুনিয়া তো অত্যন্ত হীন ও নগণ্য। আর সে যদি জাহান্নামী হয়ে থাকে, তাহলেই বা আমি দুনিয়ার ব্যাপারে তার প্রতি হিংসা কি করে করতে পারি, যার পরিণাম জাহান্নাম ?

মুমিন প্রতিহিংসার বশবর্তী হয় না। কেননা সে তো ক্ষমশীল-দয়ালু। সে তার ক্রোধকে দমন করবে, হজম করবে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকলেও। নিজের হক জেনেও সে উপেক্ষা করবে। সে নিজেকে কখনো শত্রুতার যুদ্ধে জড়াতে পারে না। কেননা জীবনটা তো খবুই সংকীর্ণ। এর মধ্যে পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়ার অবসর পাওয়া যাবে কেমন করে! মুমিনের দৃষ্টিতে দুনিয়াটা এমন বস্তু নয়, যা পাওয়ার জন্য লোকদের সাথে লড়াই-ঝগড়ার কাজে লিপ্ত হওয়া যেতে পারে। ফলে তার হৃদয় মনে কখনোই হিংসার আগুন জ্বলে উঠতে পারে না, প্রতিহিংসা ও ঈর্ষার বিষধর অজগর পারে না ফনা তুলে দংশনে উদ্বত হতে। মুমিন তার এক ভাইর প্রতিহিংসা ও ঈর্ষা নিয়ে রাত্রি যাপন করতে পারে না। কেননা তাহলে তার সারাটি রাত কেটে যাবে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া অবস্থায়। রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ

প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বান্দাহদের সমস্ত আমল আল্লাহ্র কাছে পেশ করা হয়। তখন তিনি শির্ক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তবে দুই জন লোকের ব্যাপারে ক্ষমা হয় না। সে দুজন তারা, যাদের পরস্পরে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। তখন আল্লাহ্র বলেন ঃ এ দুজনের ব্যাপার এখন রেখে দাও— যতক্ষণ না তারা পরস্পর মিলমিশ ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। (মুসলিম)

মুমিন হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় নিমজ্জিত হয় না। কেননা হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা শয়তানের বীজ। আর ভালোবাসা ও উদারতা আল্লাহ্র জন্মানো গাছ।

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ - (المائدة : ٩١)

শয়তান তোমাদের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও প্রতিহিংসা সৃষ্টি করার চেষ্টায় সদা তৎপর হয়ে থাকে।

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً - (الممتحنة : ٧)

তোমরা যাদের সাথে শত্রুতা করেছ তাদেরও তোমাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা খুব শীগগীরই বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।

বস্তুত হিংসা-বিদ্বেষ বৈরী-মানসিকতামুক্ত হৃদয় হওয়া মুমিনের প্রথম গুণ— মুমিন হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। বরং এটা হচ্ছে নিম্নতম বা ন্যূনতম শর্ত। মুমিন

নিজের জন্য যা পছন্দ করে তাই যদি তার ভাইর জন্য না করে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করে, অন্য ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ না করে, তাহলে তার ঈমানই পূর্ণ হতে পারে না।

এ প্রেক্ষিতে দুনিয়ায় পারস্পরিক বিদ্বেষ-হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচারিত মতবাদ-মতাদর্শ ও শ্লোগানসমূহের যাচাই করা যেতে পারে। বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, ঈমান মানুষের জন্য কল্যাণকর, না বিভেদ-বিচ্ছেদ ও লড়াই-সংগ্রাম-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী এ সব মতবাদ-মতাদর্শ। সেই সঙ্গে দুনিয়ায় মানুষের সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করার জন্য ঈমানই যে একমাত্র পথ, তা যাঁচাই পরখের কৃষ্টিপাথরে নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ প্রমাণিত হবে।

ত্যাগ-তিতিক্ষা মুমিনের বিশেষত্ব

প্রীতি ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ নিদর্শন হচ্ছে, মানুষ তার ভাইকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেবে এবং সে ভাইর প্রয়োজন পূরণের জন্য সে দান করবে। সে নিজে ক্ষুধার্ত থাকবে, যেন তার ভাই পরিতৃপ্ত হতে পারে। নিজে কষ্ট স্বীকার করবে যেন তার ভাই আরাম লাভ করতে পারে, সে নিজে রাত জাগরণ করবে যেন তার ভাই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। এ হচ্ছে সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষা যা একজন মুমিন তার অপর ভাইয়ের জন্য অকপটে মনের ঐকান্তিক আগ্রহে স্বীকার করবে। মুমিনের ঈমানী জিন্দেগীর এই হলো বিশেষত্ব, আর এই হলো মানবীয় বৈশিষ্ট্যও।

কিন্তু নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের সমাজে এই ভাবধারার এক বিন্দুও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজে।

মুমিনরা এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ এবং তার কাছ থেকে বিপুল সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু নাস্তিক বস্তুবাদী কমিউনিস্টরা এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা স্বীকার করবে কেন ? কার সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে ? কার কাছ থেকে সওয়াব পাওয়ার আশায় ?

মানব হৃদয়ে থাকে প্রেম-ভালোবাসা-প্রীতি, আছে স্বার্থবোধ, সুবিধালাভ প্রবণতা। একটি অপরটির দ্বারা পরাজিত হবে বা একটি অপরটির উপর জয়ী হবে— যদি তার মূলে প্রকৃত কোনো বলিষ্ঠ কারণ নিহিত থাকে। মুমিনের ক্ষেত্রে সে কারণ সুস্পষ্ট। কেননা তার কাছে নিজের প্রবৃত্তির চরিতার্থতার তুলনায় আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহকালের পরিবর্তে পরকালীন সওয়াব লাভ অধিক লোভনীয়, আকর্ষণীয়। ইসলামী সমাজে এই ভাবধারা অধিক প্রবল ও ব্যাপক করে তোলাই ইসলামের বিরাট অবদান। অন্য কোনো সমাজই এদিক

দিয়ে তার সাথে মুকাবিলা করতে পারে না। ইসলামী সমাজের কোনো তুলনাই পাওয়া যেতে পারে না দুনিয়ার কোথাও।

মক্কা ও আশে-পাশের অঞ্চলের ইসলাম গ্রহণকারী লোকেরা নিজেদের বসতি থেকে উৎখাত ও বহিষ্কৃত হলেন। তাঁরা নিঃস্ব ও ফকীর হয়ে দলে দলে মদীনায় উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন। তাঁদের সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ, পরকালীন মুক্তি ও নিষ্কৃতি এবং আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গি-সাথী হয়ে দ্বীন-ইসলামের বিজয় সাধনের সংগ্রামে পুরোপুরি অংশ গ্রহণের সুযোগ পাওয়া। তখন মদীনার আনসার ভাইরা তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা জানালেন, তাঁদের গ্রহণ করলেন বুক পেতে অতুলনীয় আন্তরিকতা ও স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ও সহানুভূতি সহকারে। মনে হচ্ছিল, এদের উদগ্রীব প্রতীক্ষায়ই যেন এরা মুহূর্ত গুণছিলেন এতদিন পর্যন্ত। দীর্ঘ দিনের তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি সহসা যদি সুমিষ্ট সুস্বাদু শীতল পানি পায় তাহলে তারা পানিকে যেমন করে গ্রহণ করে, মদীনার লোকেরাও ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করলেন মুহাজির ভাইদের। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘর পেশ করলেন সেখানে অবস্থানের জন্য। শেষ পর্যন্ত কুরয়ার Lottery ভিত্তিতে এ বিষয়ে মীমাংসা গ্রহণ করতে হয়। পরে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এ ভ্রাতৃত্ব স্ববংশ, দেশ-মাতৃকা, স্বভাষা ইত্যাদি বস্তুগত ও হীন ধারণার ভিত্তিতে গড়া হয়নি। গড়া হয়েছিল একমাত্র ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের ঐক্য ও একাত্মতার ভিত্তির উপর। অতঃপর এখানে কারোরই এসব দিক দিয়ে কোনো পরিচিত থাকল না। থাকল না কেউ আমীর-গরীব, আশরাফ-আতরাফ, ছোটজাত-বড় বা উচ্চজাত, দেশী-বিদেশী, স্থানীয়-অস্থানীয়, আরব-অনারব। সব মানুষ একাকার হয়ে গেল, এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেল সমান মাথায় সমান পায়ে। এ ভ্রাতৃত্ব ছিল গভীর আন্তরিকতা ও সহৃদয়তামূলক। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একত্মতার পূত-পবিত্র ভাবধারা প্রবাহিত ছিল এর পরতে পরতে, শিরায় শিরায়, বিন্দুতে বিন্দুতে। এই ভ্রাতৃত্ব দুনিয়ার সব ধন-সম্পদের বিনিময়েও পাওয়া যেতে পারে না। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনায় উপনীত হলাম তখন রাসূলে করীম (স) আমার ও সায়াদ ইবনে রবীউল আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। তখন সায়াদ আমাকে বললেন— সমস্ত আনসারদের মধ্যে আমিই হচ্ছি সবচাইতে বড় ধনী ব্যক্তি। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ ও সম্পত্তি তোমাকে দেব। আর আমার কোন স্ত্রী তুমি গ্রহণ করবে বলো, আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দেব। এই অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার দেখে হযরত আবদুর রহমান মুগ্ধ হলেন। কিন্তু বললেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ .... دُلُّوْنِىْ عَلَى السُّوْقِ -

আল্লাহ্‌র তা'আলা তোমার ধন-জন আরও বৃদ্ধি করে দিন। আমার তার প্রয়োজন হবে না। আমাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দাও তো।

মুহাজির ও আনসারদের এই দৃষ্টান্তহীন আত্মত্যাগের কথা আল্লাহ্‌র তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ না করে পারেন নি। তাই তিনি বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوالدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْاوَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - (الحشر : ٩)

(জাতীয় আয়ের অংশ তাদের জন্যও) যারা এই মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে মদীনাতেই বসবাস করছিল। এরা হিজরত করে তাদের কাছে আসা লোকদেরকে ভালোবাসে। আর তাদের যা দেয়া হয় তার কোনো প্রয়োজনই এরা নিজেদের মনে অনুভব করে না; বরং নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়— নিজে যতই অভাবগ্রস্ত হোক-না কেন।

বস্তুত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, সমাজ সংস্কার-সংশোধন ও পারস্পরিক ব্যাপারসমূহ যথাযথ সুসম্পন্ন করা, ন্যায়বিচারের নিয়মাবলী প্রবর্তন, অশান্তি ও বিপর্যয় প্রতিরোধ করেই ক্ষান্ত হয়না, সমাজ জীবনের বিপুল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করণে তার একটা ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকাও রয়েছে। আর তা হলো, সমাজের বিভিন্ন লোকদের পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, সহানুভূতি-সহৃদয়তা ও সাহায্য-তিতিক্ষার সুদৃঢ় বন্ধান সৃষ্টি করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা। এই বন্ধন ও ঐক্যবদ্ধতার কোনো তুলনাই পাওয়া যায় না জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা, বংশ-রক্ত-আত্মীয়তা ও ভাষা-বর্ণ বা অভিন্ন স্বার্থভিত্তিক সামষ্টিক সংস্থায়। এ এমন এক আত্মীয়তা ও একাত্মতার বন্ধন, যা বাহ্যত পরস্পরের কষ্ট-দুঃখ-বিপদ বিদূরণ এবং পরস্পর ত্যাগ-তিতিক্ষ স্বীকার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা আকীদা ও আমল— উভয় ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন করে। ফলে বহু সেখানে এক-এ পরিণত হয়। মানুষগুলো সেখানে পরস্পরের উজ্জ্বল নির্মল দর্পণে পরিণত হয়। একজনের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় অন্যজনের উপর। এ ধরনের একাত্মতা একবার যে সমাজে সংস্থাপিত হয়, সেখানে অন্য কোনো ধরনের একাত্মতার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। তখন বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-ভাষা-বংশ-অঞ্চলের লোকেরাও একটি সুসংবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তাদের পারস্পরিক বিরোধ ও পার্থক্যের সব প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। একই স্বার্থ সমন্বিত কিংবা একই ভাষাভিত্তিক বা একই অঞ্চলভিত্তিক বহু জাতীয়তাই শেষ পর্যন্ত ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। যদি সেখানে মত-আদর্শ, আকীদার ও মন-মানসিকতার এই ঐক্যবদ্ধতা ও একাত্মতা

বাস্তবায়িত না হয়, তখন এই ধরনের জাতীয়তা ও আদর্শিক ঐক্যবদ্ধতার তীব্র অভাব অনুভব করতে ও সমাজে সমআদর্শিক ভাবধারার পূনর্জাগরণ করতে বাধ্য হয়। এজন্য চিন্তাবিদেরা বলেছেন :

> যে স্বদেশিকতা সম-আদর্শিকতা ও নৈতিকতার উপর ভিত্তিশীল নয়, তা হচ্ছে এমন একটা দুর্গ, যার প্রাচীর ও প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে খুব বেশি দেরী নেই।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সামাজিক-সামষ্টিক জীবনে আদর্শ ও বিশ্বাসগত ঐক্য ও একাত্মতা মানবদেহে প্রাঁণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রবল প্রভাব সৃষ্টিকারী।

ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবধারা

এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ছাড়াও মানব প্রকৃতিতে তার বিপরীত ভাবধারা বহু রয়েছে। তা হলো হিংসা, ভয় ও নিপীড়ন। আর সব ভাবধারাই মানব সমাজে প্রচণ্ড ঈর্ষা, জুলুম-নিপীড়ন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতের সৃষ্টি করে। দ্বীন ও ঈমান মানুষের এসব ভাবধারার প্রতি কি আচরণ গ্রহণ করেছে? ... এ পর্যায়ে লণ্ডনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক জোড এর রচনার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

> যেসব ভাবধারা.অভিন্ন এবং যা সহজেই উত্তপ্ত ও উত্তেজিত করা যায়, যা বহু বড় বড় জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় ও সংগ্রামমুখী বানাতে পারে, তা দয়া, বদান্যতা ও প্রেম-ভালোবাসার ভাবধারা নয়, তা হচ্ছে ঘৃণা ও ভীতির ভাবধারা। যারা অপর কোনো জাতির উপর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে শাসন-কর্তৃত্ব চাপাতে চায়, তারা সফলকাম হতে পারে না। যতক্ষন না তারা এমন একটা জিনিসকে বের করবে যাকে তারা ঘৃণা করবে এবং যতক্ষণ না তার জন্য এমন কোনো ব্যক্তিত্ব বা জাতি বানিয়ে না নেবে যাকে তারা ভয় করবে। আমিই যদি বহু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ইচ্ছা করি, তাহলে আমাকে এখানে না হোক অপর কোনো গ্রহে বা চাঁদে এমন এক শত্রু আবিষ্কার করতে হবে, যাকে এ জাতিগুলো ভয় করবে। এ কারণে এ যুগের জাতীয় সরকারসমূহ যদি নিজেদের প্রতিবেশী জাতিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ঘৃণা ও ভীতির ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে কিছুমাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেননা এ সব রাষ্ট্র-সরকারের উপর কর্তৃত্বকারী লোকদের জীবন এসব ভাবধারার উপরই নির্ভরশীল। আর জাতীয় ঐক্যও এসব ভাবধারার উপর সংস্থাপিত। (Guide To Modern Wickedness, P. 153)

দুনিয়ার জাতিসমূহের সংকট উত্তরণের, যুদ্ধে আগুন প্রজ্জ্বলনের এবং জাতীয় হিংসা-বিদ্বেষকে তীব্র বানাবার জন্য যে পথ তিনি দেখিয়েছেন তা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত বলতে হবে। এ পথে বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে হয়ত শত্রুতার আগুন জ্বলবে না। ফলে এদের বাইরে অন্য এক জগতে এক শত্রুপক্ষ চিহ্নিত করতে হবে। যাকে সকলে সমানভাবে ঘৃণা করবে, সমানভাবে ভয় করবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কাজে সকলেই পূর্ণশক্তি দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। কিন্তু এ এমন একটা অভিনব ও বিস্ময়কর পথ নয়, যা এ দুনিয়ায় কারোই জানা ছিল না বা যা নতুন করে আবিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। উপরন্তু সেজন্য অন্য কোনো দূরবর্তী স্থানে— চন্দ্র বা মংগল গ্রহে— কোনো শত্রু আবিষ্কারেরও প্রয়োজন হয় না। মানুষের এ অভিন্ন ও সমান শত্রু (Common Enemy) মানুষের অতি কাছেই রয়েছে। সে শত্রু সমানভাবে সমস্ত মানুষের। সেই সমস্ত মানব বংশের প্রধানতম শত্রু এই পৃথিবীর বুকে। সে শত্রু দুনিয়ার নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সঙ্গেই শত্রুতা করছে প্রতি মুহূর্তে। কাজেই দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পারস্পরিক ও জাতি বা গোষ্ঠী ভিত্তিক সর্বপ্রকারের শত্রুতা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে মানব বহির্ভূত সেই সমান ও অভিন্ন শত্রুর সাথে শত্রুতা করা, তাকে শত্রু বলে জানা এবং মানবীয় সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগে মানব সমাজ থেকে তাকে চিরতরে উৎখাত করা। সেই শত্রু কে ? ... আল্লাহ কিতাব কুরআন মজীদ সমস্ত মানুষের সেই অভিন্ন (common) শত্রুকে চিহ্নিত করে ঘোষণা করেছে ঃ

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ - (فاطر : ٦)

নিশ্চিত জেনো, শয়তান তোমাদের সকলের শত্রু। অতএব তোমরা সকলে তাকে শত্রুই মনে করো— শত্রু রূপেই গ্রহণ করো। শয়তান তার সঙ্গী-সাথীদের এমন কাজের প্ররোচনা দেয় যার পরিণতিতে তারা জাহান্নামী হবে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - (البقرة : ٢٠٨)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হয়ে যাও। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা এই শয়তানই তোমাদের সকলের প্রকাশ্য শত্রু।

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে দুভাগে ভাগ করেছে। একভাগ আল্লাহ্‌র বন্ধু, আর অন্যভাগ শয়তানের বন্ধু। একভাগ মহাসত্যের সহায়ক-সমর্থক পক্ষপাতী, আর অন্যভাগ অন্যায়-অসত্য-মিথ্যা ও প্রতারণার নিশানবরদার। ইসলাম মুসলমানকে শক্তি প্রয়োগ, যুদ্ধ ও রক্তপাতের অনুমতি দিয়েছে কেবলমাত্র শয়তানের বন্ধু ও অন্যায়ের সমর্থক-নিশানবরদারদে বিরুদ্ধে— তারা যেখানেই থাকুক না কেন, যে রূপই হোক না কেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا – (النسآء : ٧٦)

যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে বাতিল শক্তির পক্ষে ও পথে। অতএব তোমরা ঈমানদার লোকেরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। মনে রেখো, শয়তানের ষড়যন্ত্রজাল কিছুমাত্র শক্ত নয়।

এভাবে মুমিনের ক্রোধ ও প্রতিহিংসার পরিধি খুবই সংকীর্ণ হয়ে যায়। মুমিনদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মুমিন কোনো বৈষয়িক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ক্রুদ্ধ হবে না। ক্রোধকে প্রয়োগ করবে না। কোনো বংশীয়, গোত্রীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক বা শ্রেণীস্বার্থের জন্যও তার ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠবে না। আর হিংসা বা ঈর্ষার বশবর্তী হয়েও সে ক্রোধ প্রকাশ করবে না। হিংসা-ঈর্ষা-পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুমিনের ক্রোধ-রিপুর কোনো ব্যবহার হতে পারে না। তা সবই হবে একটি মাত্র ক্ষেত্রে, আর তা হলো আল্লাহ্‌র ব্যাপার আল্লাহ্‌র বিষয়। কেবলমাত্র সত্যের জন্যেই হবে, সত্যের বিষয় নিয়ে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে।

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ –

যে লোক কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসে, আল্লাহ্‌র জন্যই করে হিংসা বা ঘৃণা বা শত্রুতা, কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে দেয় ও কাউকে দেয়া বন্ধ করে, তার ঈমান পূর্ণত্ব লাভ করেছে মনে করতে হবে।

মনে রাখা আবশ্যক, এই পূর্ণ ঈমান— পূর্ণত্বপ্রাপ্ত ঈমানই ইসলামের কাম্য, অসম্পূর্ণ ঈমান নয়।

ক্ষমা-সহনশীলতা ঈমানের অঙ্গ

মুমিনের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ক্রোধ-আক্রোশ সীমাবদ্ধ হয় শুধুমাত্র বাতিলপন্থী, পাপী-নাফরমান ও বিদ্রোহী-সীমালংঘনকারীদের প্রতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও

ক্রোধ-বিদ্বেষ-ঘৃণার সংমিশ্রণ হয় দয়া-সহানুভূতি ক্ষমা-সহমর্মিতার সাথে। ঘৃণা করবে, কিন্তু করবে দয়া সহকারে, অন্তরে ব্যাথানুভব করবে সে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্য। তাদের কল্যাণ কামনা করতে হবে অন্তর দিয়ে। তাদের কল্যাণ ও হেদায়েত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে হবে সদা-সর্বদা। রাসূলে করীম (স) কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েও আল্লাহ্‌র কাছে কাতর কণ্ঠে দো'আ করেছিলেন এ ভাষায় ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

হে আল্লাহ! তুমি আমার জনগণকে সঠিক পথ দেখাও— নির্ভুল পথে পরিচালিত করো। কেননা তারা হেদায়েতের পথ জানে না।

নবী করীম (স) কাফেরদের গুমরাহী ও সত্যবিরোধিতা দেখে মর্মে-মর্মে নিদারুণ ব্যাথা অনুভব করতেন। সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিষেধ করার প্রয়োজন মনে করেছেন ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (الشعرآء : ٣)

সম্ভবত তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে এ চিন্তায় যে, লোকেরা ঈমান গ্রহণ করছে না।

দুটি বিশ্বাস এমন, যার বলে মুমিন-মুসলমান নিজের দ্বীনের উপর অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সর্বাধিক ক্ষমাশীল হতে পারে ঃ

প্রথম, মুসলমান বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলো লোকদের মধ্যে দ্বীন ও ঈমানের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকা। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কখনো নিগূঢ় যুক্তি ও কার্যকারণহীন হতে পারে না।

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَايَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ - (هود : ١١٨)

তোমার আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে সমস্ত মানুষকে তিনি এক অভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের উপর ঐক্যবদ্ধ বানিয়ে দিতেন এবং তারা পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে থাকতে পারত না।

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ط اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (يونس : ٩٩)

তোমার আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমষ্টিগতভাবে মুসলমান হয়ে যেত। তাহলে তুমি কি লোকদের উপর জবরদস্তি করবে তাদের মুসলমান হওয়ার জন্য ?

বস্তুত এই যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই যখন বিজয় লাভ করবে— আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মূলে যখন গভীর বিচক্ষণতা ও যুক্তিবত্তা নিহিত রয়েছে— তখন মুমিন কি করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করতে পারে? কিংবা পারে তা অস্বীকার করতে এবং তার বিপরীত হলে তার জন্য ক্রুদ্ধ ও অসহনশীল হয়ে উঠতে?

দ্বিতীয়, আল্লাহ তা'আলা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে কোনোরূপ তোয়াজ না করতে বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন তাদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিতে, একথা ঘোষণা করে দিতে যে, কেয়ামতের দিনই তাদের পারস্পরিক বিরোধীয় বিষয়াদির চূড়ান্ত মীমাংসা করা হবে। কাজেই দ্বীনের কোনো আহবানকারীই অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না এবং সে ব্যাপারে হৃদয় মনকে সংকীর্ণ করাও তাদের রীতি হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন:

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ - (الحج : ٦٨-٦٩)

বিরুদ্ধবাদীরা যদি তোমার সাথে ঝগড়া-বিতর্ক করে, তাহলে তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের আমল-চরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের পরস্পরের মধ্যকার যাবতীয় বিরোধীয় বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন।

আরও বলা হয়েছে:

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ج وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ج وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

অতএব এজন্য তুমি আহবান জানাও, আর তোমাকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। লোকদের ইচ্ছা-বাসনাকে অনুসরণ করো না। বলো, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার প্রতিই বিশ্বাসী। তোমাদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদেরও, তোমাদেরও। আমাদের আমল-আমাদের জন্য, তোমাদের আমল তোমাদের জন্য, তোমাদের ও

আমাদের মাঝে কোনো বিতর্ক নেই। আল্লাহ্ আমাদের একত্রিত করবেন। আর তাঁরই দিকে পরিণতি হবে সকলের। (সূরা শু'আরা ঃ১৫)

মুমিন-মুসলমানদের এই হয় আকীদা। এই আকীদা-বিশ্বাসই তাদের সর্বাধিক প্রিয়। এ কারণেই তারা যেমন আল্লাহ্কে ভালোবাসে, তেমনি ভালোবাসে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে, ভালোবাসে জীবন ও মৃত্যুকে। তক্‌দীরকেও ভালোবাসে— তা তিক্ত হোক, কি মিষ্ট। সে ভালোবাসে সমস্ত মানুষকে। সে ঘৃণাও করে— কিন্তু ঘৃণা করে শয়তানকে, শয়তানের বাহিনীকে এবং তাদের কার্যকলাপকে। এ ঘৃণা তীব্র হলেও এর সাথে মিশ্রিত রয়েছে সহানুভূতি, সহৃদয়তা।

এরূপ ভালোবাসাই মুমিনের ঈমানের অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই ঈমানই তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর রাসূলে করীমের এই বাণীটির যথার্থতার প্রমাণ এখানেই ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَنْ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا -

যে আল্লাহ্‌র মুষ্ঠিতে আমার জীবন ও প্রাণ বন্দী, তাঁরই শপথ, তোমরা কস্মিনকালেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যদি না ঈমানদার হও। এবং কস্মিনকালেও তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যদি না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস।

কঠোর-কঠিন বিপদে অবিচলতা

রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ - اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَبَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَفَكَانَ خَيْرَ الَّهُ- (مسلم)

মুমিনের ব্যাপারটাই বড় আশ্চর্যজনক। তার সবকিছুতেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত। এ ব্যাপার মুমিন ছাড়া আর কারোই নয়— তার যদি সুখ-শান্তিপূর্ণ অবস্থা হয়, তাহলে সে শোকর আদায় করে, সেটা তার জন্য খুবই কল্যাণময় হয়ে থাকে। আর যদি কোনো দুঃখ-কষ্ট-বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে সে ধৈর্য ধারণ করে, আর এটাও তার জন্য খুবই মংগলজনক হয়ে থাকে। (মুসলিম)

আশাবাদ এবং শান্তি, সন্তোষ ও ভালোবাসা এবং মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি মুমিনের হৃদয়-লোকে সুদৃঢ়ভাবে বসা ঈমান-বৃক্ষের মিষ্টি ফল। ঈমান বৃক্ষের ফল প্রচুর ও বিপুল। জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি বাঁকে ও ক্ষেত্রে তার যোগান আসে অফুরন্তভাবে। জীবন-সংগ্রাম একটা দীর্ঘ অবিশ্রান্ত সাধনা। এতে কত যে কষ্ট ও দুঃখ-দুর্বিপাকের সম্মুখীন হতে হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এখানে পদে পদে বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট লেগেই আছে।

মানুষের বৈষয়িক জীবনের প্রকৃতিই এমনি। মানব স্বভাবে এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায় না কুত্রাপি। বৈষয়িক জীবনের প্রকৃতি ও মানব সত্তার ধর্ম এ দুটিই এখানে সমান ভূমিকা পালন করে। বিপদশূণ্য জীবন এখানে সম্ভব নয়। দুঃখ, বিপদ ও কষ্টে পড়েনি— এমন একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। ফলে মানুষের কত কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়, কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাকে হতে হয় ব্যর্থ, বঞ্চিত। হয় তার কোনো আপন জনের মৃত্যু ঘটে, না হয় তার শরীর হয় রোগাক্রান্ত। কিংবা হয় তার ধন-মালের ক্ষয় ও ক্ষতি। এসব ঘটনা-দুর্ঘটনাই তো মানুষের জীবনকে কানায়-কানায় ভরে রেখেছে। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র জারী করা স্থায়ী নিয়ম।

সাধারণভাবে জীবন মাত্রেরই— আর বিশেষভাবে মানব-জীবনের জন্য এই যখন আল্লাহ্‌র নিয়ম, তখন বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালনকারী লোকেরা যে

অধিকতর বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, সে আর বিচিত্র কি ? বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যারা জন-সমাজে আবির্ভূত হয়, তাদের প্রথমেই সংগ্রাম করতে হয় আল্লাহদ্রোহী শক্তিগুলোর সাথে। কেননা এ শক্তিগুলো মানব সমাজ থেকে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে নির্মূল করে কায়েম করতে চায় শয়তানী রাজত্ব। এরা যখন সত্যের আওয়াজ উচ্চ করে প্রচার করতে সচেষ্ট হয়, তখনি বাতিল পন্থীরা হয় তাদের প্রতি খড়গহস্ত। তাদের উপর অমানুষিক আক্রমণ চালায় নির্মমভাবে। এরা মানুষকে চিরন্তন কল্যাণের দিকে আহবান জানায়। বাতিলপন্থীরা তখন সে আহ্‌বানকে স্তব্ধ করে দেয়ার অসৎ মতলবে সর্বশক্তিতে চিৎকার করে ওঠে। এরা বলে ন্যায় পথে চলতে অপর দিকে অন্যায় পথের পথিকরা তাদের টানেত চেষ্টা করে মহাধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে। আর তখন সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই কারণে সত্যদ্বীনপন্থী মানুষকে এক চিরন্তন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মধ্যেই জীবন যাপন করতে হয়। এ জীবনে কত দিক দিয়ে কত আঘাত যে আসতে থাকে, তার আর কোনো লেখা-জোখা থাকে না। মানবেতিহাসে আমরা এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা আদমের সঙ্গে সঙ্গেই ইবলীসকেও পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়, ইবরাহীমের সময়ই ছিল নমরূদ, মূসার সঙ্গেই ফিরাউন, আর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সমাজেই ছিল আবূ জেহেল, আবু লাহাব। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا – (الانعام : ١١٢)

এমনিভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি আমরা জ্বিন ও মানুষ শয়তানদেরকে। তারা পরস্পরকে চাকচিক্যপূর্ণ কতাবার্তা গোপনে বলে প্রতারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ – (الفرقان : ٣١)

এমনি করেই আমরা প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি সব পাপিষ্ট ও অপরাধপ্রবণ লোকদের।

নবী-রাসূলগণের অবস্থাই এই। তাঁদের উত্তরাধিকারী, তাঁদের পথের অনুসারী এবং তাঁদের দ্বীনি দাওয়াতের ধারক-বাহকদের অবস্থাও অনুরূপ হতে বাধ্য। আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সচেষ্ট লোকদের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ ও সংগ্রাম হবেই। এ থেকে কখনো নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে না। এর ব্যতিক্রম হয় না কখনো।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ – (البروج : ٨)

কাফেররা ঈমানদার লোকদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়েছে অন্য কোনো কারণে নয় কেবলমাত্র এজন্য যে, তারা মহাপরাক্রমশালী সর্ব প্রশংসিত আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে।

রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ কোন লোকদের উপর সর্বাধিক বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ – يَبْتَلِيَ الرَّجُلُ عَلٰى حَسْبِ دِيْنِهٖ فَاِنْ كَانَ دِيْنُهٗ صَلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاءُهٗ وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ رِقَّةٌ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ حَسَبَ دِيْنِهٖ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتّٰى يَمْشِيَ عَلَ الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ – (ترمذى)

সবচাইতে বেশি বিপদ আসে নবী-রাসূলগণের উপর, তাঁদের পরে যারা নিকটবর্তী তাদের উপর। এভাবে আরো নিচের দিকে চলতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তার দ্বীনদারীর অবস্থানুযায়ী। যার দ্বীনদারী অতিশয় শক্ত, তার উপর পরীক্ষাও আসে অত্যন্ত কঠিন। আর যার দ্বীনদারী নমনীয়, তাকেও দ্বীনদারীর অবস্থানুপাতে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে আল্লাহ্র বান্দাগণের উপর বিপদ ও পরীক্ষা আসতেই থাকে। যতদিন সে দুনিয়ায় চলতে-ফিরতে থাকে বিপদ-পরীক্ষা আসা বন্ধ হবে না। এমনিভাবে তার সব গুনাহ-খাতা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

নাস্তিকরা সবচেয়ে বেশি ভীরু

নাস্তিক, আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাসী লোকেরা সবচাইতে বেশি ভীরু, কাপুরুষ। জীবনে কোনো দুঃখ বিপদ এলেই তারা খুব তাড়াতাড়িই এলিয়ে পড়ে, ভয়ে তাদের কলিজা কেঁপে ওঠে দুরু দুরু। এ ব্যাপারে নাস্তিক, আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা সমান। একথা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে সত্য বলে প্রমাণিত। কুরআন মজীদে এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ج اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ – (هود : ٩)

মানুষের প্রকৃতি এমন যে, তাদের প্রতি রহমত নাযিল করার পর যদি তা তার থেকে কেড়ে নেই, তা হলেই নিরাশ-হতাশ-নাশোকর হয়ে পড়ে।

وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ- (حم السجدة : ٤٩)

তাকে কোনো মন্দ স্পর্শ করলেই সে নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

এমন লোক রয়েছে যারা একপাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে। যদি ভালো অবস্থা লাভ করে তাহলে সে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন হয়, আর যদি কোনো বিপদ আপতিত হয়, অমনি সে সরে দাঁড়ায়। এরা ইহকাল-পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত। আর এ এক বিরাট ও সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা। (হজ্জ ঃ ১১)

কেননা এ সব লোক তক্‌দীর বিশ্বাস করে না। তক্‌দীর বিশ্বাস করলে তাদের অবস্থা এমন হতো না। তখন তারা যে অবস্থাই আসত সন্তুষ্ট বা রাজি থাকত, অস্থির হয়ে পড়ত না। আল্লাহ্‌র প্রতিও তাদের ঈমান নেই। তাই এ সব বিপদ-আপদে যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তা তারা বুঝতে পারে না। নবী-রাসূলগণের প্রতিও তারা অবিশ্বাসী। বিশ্বাস থাকলে তারা দেখতে পেত, বিপদ আসা নবী-রাসূলগণের প্রতিও তারা অবিশ্বাসী। বিশ্বাস থাকলে তারা দেখতে পেত, বিপদ আসা নবী-রাসূলগণের পবিত্র জীবনের বৈশিষ্ট্য। তারা পরকালে প্রতিও বিশ্বাসী নয়। তাহলে তারা মনে করে নিতে পারত যে, এসব বৈষয়িক বিপদ-আপদ পরকালের কঠিন আযাবের তুলনায় অত্যন্ত হীন ও নগণ্য এবং এর ফলে তার গুনাহ খাতা মাফ পেয়ে যাবে ও পরকালে সে আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

এরা দাঁড়-বৈঠাহীন নৌকার মাঝির মতো। নদী-সমুদ্রের সামান্য দোলায় এদের জীবনতরী দুলে ওঠে, কেঁপে ওঠে, লক্ষ্য হারা হয়ে ভাসে। আর শেষ পর্যন্ত অতলস্পর্শ জলরাশির তলে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া এদের অন্য কোনো পরিণতি হয় না।

মুমিনের অবিচল দৃঢ়তা

কিন্তু মুমিনরা সে রকম নয়। তারা দুঃখ-বিপদ-মুসীবত খুব বেশি সইতে পারে। বিপদে, দুঃখে-কষ্টে তারা থাকে অবিচল, অনড়-অটল। কেননা তারা পরকালীন চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনের তুলনায় এই জীবনের সংকীর্ণতা-সংক্ষিপ্ততা ও তুচ্ছতা-নগণ্যতা খুব ভালো করেই জানে। এ কারণে তারা কখনো মনে করে না যে, এই দুনিয়ায়ই তাদের জন্য জান্নাত নেমে আসবে।

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى قف وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -

বলো, দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রী খুবই সামান্য-নগণ্য। মুত্তাকী লোকদের জন্য পরকালই অতীব উত্তম ও অধিক কল্যাণময়। (সূরা নিসা ঃ ৭৭)

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - (اٰل عمرٰن : ١٨٥)

বৈষয়িক জীবনের দ্রব্য-সামগ্রী তো মূলত ধোঁকা ও প্রতারণার বস্তু।

দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছার স্বাধীনতার অতীব মূল্যবান নেয়ামত দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাকে দিয়েছেন খিলাফতের মহান মর্যাদা। এ কথা তারা ভালোভাবেই জানে। ফলে তারা এ দুনিয়ায় পক্ষ সম্পন্ন ফেরেশতা হবার কথা চিন্তা করে না কখনো।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ - (الدّهر : ٢)

আমরা মানুষকে সংমিশ্রিত শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি তাদের পরীক্ষা করব বলে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ - (البلد : ٤)

আমরা মানুষকে সংমিশ্রিত শুক্রকীট হতে সৃষ্টি ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।

অর্থাৎ মানুষকে এই দুনিয়ায় কেবল সুখের বাঁশি বাজানোর ও মজা লুটবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়নি। এ দুনিয়াটা মূলতই কঠোর শ্রম, খাটা-খাটুনী, কষ্ট ও দুঃখ করার স্থান। কোনো মানুষই তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

মুমিনরা জানে, নবী-রাসূলগণই দুনিয়ায় সব মানুষের তুলনায় অধিক দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করে থাকেন। এখানে সুখ ভোগ করে ও আয়েশ-আরামে দিন কাটাতে পারে খুব কম লোকই। কাজেই নবী-রাসূলগণের জীবন-পদ্ধতির বিপরীত তারা এখানে খুব যে সুখ-শান্তি ভোগ করবার সুযোগ পাবে এমন কথা তারা কল্পনা করে না, তার জন্য তারা লালায়িতও হয় না। কেননা তাদের আদর্শ ও অনুসরণীয় তো এই নবী-রাসূলগণই।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ - (البقرة : ٢١٤)

তোমরা জান্নাতে যাবে বলে ধারণা করে বসেছ ? অথচ তোমাদের উপর তেমন অবস্থা তো এখনো আসেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর এসেছিল। তাদের তো দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক, পীড়া-জর্জরিত করে দিয়েছিল, তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল, এমন কি শেষ পর্যন্ত রাসূল ও তাঁর সঙ্গের ঈমানদার লোকেরা ফরিয়াদ করে উঠেছিল এই বলেঃ আল্লাহ্র মদদ কবে আসবে। তোমরা জেনে রাখো আল্লাহ্র মদদ তো অতি নিকটে।

বস্তুত এ পথ অত্যন্ত কষ্ট ও দুঃখ-বিপদের। এ পথেই কষ্ট ভোগ করেছেন হযরত আদম, ফরিয়াদ করেছেন হযরত নূহ, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন হযরত ইবরাহীম, যাচাই হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করেছেন হযরত ইসমাঈল, করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়েছেন হযরত যাকারিয়া। নিহত-শহীদ হয়েছেন হযরত ইয়াহ্ইয়া।

তক্দীর বিশ্বাসে কষ্টবোধ লাঘব হয়

মুমিনরা নিশ্চিত জানে, তাদের উপর যেসব বিপদ-মুসীবত আসে তা উদ্দেশ্যহীন নয়, নিষ্ফল নয়, কোনোরূপ পরিকল্পনা ব্যতিরেকেও নয়। মূলত তা পূর্বজ্ঞাত, পূর্বনির্দিষ্ট পরিমিতি অনুরূপ। তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হয়েছে বলেই তা হতে পারছে। আর তার মূলে নিহিত রয়েছে গভীর সূক্ষ্ম বিচক্ষণতা, যৌক্তিকতা। এ হচ্ছে আল্লাহ্র লেখন। এজন্য তাদের ঈমান হলো, যা তাদের উপর পৌঁছেছে তা অনিবার্য, তা অপ্রতিরোধ্য। আর যা পৌঁছেনি, তা কখনো পৌঁছতে পারবে না।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط

اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - (الحديد : ٢٢)

পৃথিবীতে বা নিজেদের মধ্যে যে বিপদ-মুসীবতই আসে তা তাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই একখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আর তা আল্লাহ্ জন্য খুবই সহজসাধ্য।

ঈমানদার লোকদের এ কথা জানা আছে যে, আল্লাহ্র যেমন তক্দীর নির্দিষ্ট করেন, তেমনি তাঁর মেহেরবানীও রয়েছে। তিনি মানুষকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করেন, কষ্টের মাত্রা লাঘব করেও দেন। যদি কেউ মনে করে থাকে যে, আল্লাহও বুঝি অন্ধ রাষ্ট্রশক্তির মতো কেবল কষ্টই দেন, দয়া-রহম করেন না মোটেও, তবে তা নিঃসন্দেহে তাদের বুদ্ধির ভুল, বুঝবার অক্ষমতা।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ط إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - (يوسف : ١٠٠)

আমার আল্লাহ্‌ অতীব সূক্ষ্ম দয়ালু তার ব্যাপারে যাই তিনি চান। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী।

তারা এ বিষয়ে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল যে, দুনিয়ায় মানুষের উপর যে সব বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট আসে, তাতে রয়েছে অমূল্য শিক্ষা এবং মানুষের বৈষয়িক ও পরকালীন জীবনের পরিপুষ্টির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এর ফলে তাদের নফস হবে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন। তাদের ঈমান হবে স্বচ্ছ ও নির্মল। বিপদ-আপদের আঘাতে তাদের হৃদয়-মনের বন্ধ কপাট উন্মুক্ত হয়।

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ تُصِيبُهُ الْوَعْكَةُ مِنَ الْبَلَاءِ كَمَثَلِ الْحَدِيدَةِ تَدْخُلُ النَّارَ فَيَذْهَبُ خَبَثُهَا وَيَبْقِي طَيِّبُهَا -

বিপদগ্রস্ত মুমিন সেই লৌহদণ্ডের মতো যা আগুনে জ্বলে ও তার উপর পুঞ্জীভূত আবর্জনা রাবিশ দূর হয়ে যায় এবং যা কিছু আসল ও সার, তাই অবশিষ্ট থাকে।

বিপদ-মুসীবত পরিবেষ্টিত মুমিন যেন ডিমের খোসা পরিবেষ্টিত সদ্যজাত মুরগীর বাচ্চা। প্রথমে তো মনে করে সে বন্দীশালায় আটকে পড়েছে। অথচ তাই তাকে লালন-পালন করে, তার পূর্ণতা লাভের কাজে তার সহায়তা করে। এ সময় মুরগী-বাচ্চার ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া আর কোনোই উপায় থাকে না। তাকে কেন্দ্র করে যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎপরতা চলছে, তাতে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পরে নির্দিষ্ট সময়ে বাচ্চার চঞ্চুর উপর গজিয়ে ওঠা কাঁটার আঘাতে খোসাটি ভেঙে যায় এবং বাচ্চা বাইরে বের হয়ে আসে। এ দুনিয়ার জীবনে মুমিনের অবস্থাও ঠিক তাই। তাকে কেন্দ্র করে এখানে যা কিছু ঘটে তার পূর্ণতা ও পরিপক্কতার জন্যই হয়। এসবের মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও মন-মানসিকতা পূর্ণত্ব পায়, তার মধ্যকার সব দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং সে গড়ে ওঠে এক পূর্ণাঙ্গ সোনার মানুষ হিসাবে।

সুখ ও দুঃখে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের চেতনা

মুমিনরা আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত, দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে সর্বাবস্থায়ই পূর্ণ সচেতন থাকে। সুখে-স্বচ্ছন্দেও সে নেয়ামতের কথা ভুলে না, ভুলে না দুঃখ-বিপদ কালেও। এ ব্যাপারে ঈমানদারের চেতনা হলো, যখনি কোনো বিপদ এসেছে তখনি তাতে আল্লাহ তা'আলার তিনটি বড় ও সুস্পষ্ট নেয়ামত দেখতে

পেয়েছি। প্রথম, সে বিপদটা আমার দ্বীনের ব্যাপারে হয়নি। দ্বিতীয়, সে বিপদটা দ্বীনের বিপদের তুলনায় খুবই নগণ্য। আর তৃতীয় এই যে, সে বিপদ সহ্য করে আমি আল্লাহ্র কাছ থেকে অশেষ সওয়াব পাওয়ার আশা করি।

এ ভাবধারা এমন, যা প্রত্যেকটি বিপদকালেই মুমিনের হৃদয়-মনকে প্রশান্ত করে রাখে। ফলে সে শুধু তকদীর বিশ্বাস করে এবং তাতে রাজি থেকেই ক্ষান্ত হয় না। সে আদায় করে আল্লাহ্র শোকর তার অন্তর দিয়ে, তার প্রতি লোমকূপ দিয়ে, তার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে।

দুনিয়ার বিপদ খুব-ই হালকা বোধ করে ঈমানদার ব্যক্তি। কেননা যখন যে বিপদই আসে তা থেকেই সে লাভ করে অনেক কল্যাণ। অবশ্য দ্বীনের কোনো বিপদকে সে মেনে নেয় না। কেননা দ্বীনের দিক দিয়ে বিপদ এলে তা এত বিরাট ক্ষতির কারণ হয়, যা পূরণ করা কখনোই সম্ভব হয় না। হযরত ইউসুফের সম্মুখে এক সাথে দু' ধরনের বিপদ এসেছিল এবং তাঁর ইখতিয়ার ছিল দুটোর যে-কোনো একটা গ্রহণ করার। হয় তাঁকে কারাবরণ করতে হবে এবং তার ফলে তিনি হবেন হীন ও নগণ্য; কিংবা তিনি দ্বীনের বিপদ কবুল করবেন, একটি নারীর যৌন কামনা চরিতার্থ করার হাতিয়ার হতে রাজি হবেন এবং ফলে তিনি হবেন নিতান্ত জাহিল পর্যায়ের লোক। স্ত্রীলোকটি বলেছিল ঃ

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ط وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ – (يوسف : ٣٢)

নিঃসন্দেহে আমিই তাকে পাওয়ার জন্য কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে বিরত রেখেছে। আর সে যদি আমার আদেশ পালন না করে (ইচ্ছাপূরণ না করে) তাহলে তাকে অবশ্য অবশ্যই কারারুদ্ধ হতে হবে এবং ফলে সে হবে লাঞ্ছিত-অপমানিত।

কিন্তু হযরত ইউসুফ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে দ্বীনের বিপদে লিপ্ত হতে প্রস্তুত হলেন না। তার পরিবর্তে তিনি বৈষয়িক বিপদ— কারাবরণকেই মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। বললেন ঃ

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ – (يوسف : ٣٤)

হে আল্লাহ! কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয় সে কাজ থেকে যে দিকে ওরা আমাকে ডাকে।

নবী করীম (স) এই কারণে দো'আ করতেন, দো'আ করতে বলেছেন উম্মতকে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَاتَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا -
(ترمذی، حاکم)

হে আল্লাহ্! আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তুমি কোনো বিপদ দিও না। আর দুনিয়াটাকে আমাদের জন্য প্রধান চিন্তা ও ভাবনার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমার জিনিস বানিয়ে দিও না।

বিপদে বিপদে তারতম্য

বিপদ বিপদ-ই। তা সমানভাবে মানুষকে কাতর ও দুঃখিত বানায়। এ জন্য বলা যেতে পারে, সব বিপদই কঠিন ও দুঃসহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, কোনো কোনো বিপদ অপর কোনো কোনো বিপদের তুলনায় হালকা ও কম কষ্টকর। আবার অনেক সময় অন্য লোকের বিপদের দিকে নজর দিলে নিজের বিপদটা অনেক হালকা মনে হয়।

মুমিন তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেকটি বিপদের মূল্যায়ন করে। ফলে সে দুটো কারণে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে। প্রথম, যে বিপদ এসেছে তার চাইতেও কঠিন ও বড় বিপদও আসতে পারত। তা যে আসেনি এটা আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ। আর দ্বিতীয়, আল্লাহ্র যে-সব নেয়ামত থাকতে পারত— না থাকলেও বলবার কিছু ছিল না— তা যে এখানো আছে, নিঃশেষ হয়ে যায়নি, সেজন্য আল্লাহ্র শোকর। যা হারিয়ে গেছে সেজন্য চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে যা বর্তমান আছে তার দিকে নজর রেখে আল্লাহ্র শোকর আদায় করাই ঈমানদারের কাজ। এই তার স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্য। কেননা যা গেছে তার তুলনায় যা রয়েছে, সংখ্যা ও মূল্য বিবেচনায় তাও কিছুমাত্র কম বা সামান্য নয়।

উরওয়া ইবনে যুবাইর একজন তাবেয়ী ফিকাহ্‌বিদ। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি একজন অতিবড় ধৈর্যশীল ও আল্লাহ্র নেয়ামতের মূল্য অনুভবকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পায়ের নীচের দিকে পচন ধরেছিল। আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, পচন উপরের দিকে উঠে সমস্ত পা-টাকে পঁচিয়ে নষ্ট করে দেবে। তারপরে ধরবে গোটা দেহ। দেহকেও খেয়ে জরাজীর্ণ করে ফেলবে। এজন্য চিকিৎসকরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পাটা নীচের দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন করার জন্য তারা প্রথমে তাকে কিছু খাইয়ে বেহুশ করার সিদ্ধান্ত নিল, যেন কাটার সময় ব্যথা অনুভব না করেন। কিন্তু এ প্রস্তাব শুনে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ

مَاظَنَنْتُ اَنَّ اَحَدًا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ يَشْرَبُ شَيْئًا يُغَيِّبُ عَقْلَهُ حَتّٰى لَايَعْرِفُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَلٰكِنَّ هَلُمُّوْا فَاقْطَعُوْهَا -

আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার কোনো লোক এমন কোনো জিনিস পান করতে রাজি হতে পারে বলে আমি মনে করি না, যা তার বিবেক-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেবে এবং তার ফলে সে তার আল্লাহ্কেও চিনতে পারবে না। কাজেই আমি তার প্রয়োজনবোধ করি না। তোমরা তৈরী হও এবং পা কেটে ফেল।

অতঃপর তাঁর পা কেটে ফেলা হয়। এ সময় তিনি চুপচাপ নির্বাক থাকেন। কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। তখন তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়নি যে তিনি কিছুমাত্র কষ্টবোধ করছেন।

প্রত্যেকটি লোককে তার ঈমান অনুপাতে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। যে রাতে উরওয়া ইবনুয যুবাইরের পা কেটে ফেলা হয়, ঠিক সে রাতেই তাঁর প্রিয়তম পুত্র বাড়ির ছাদের উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। বহু লোক তাঁর কাছে শোক প্রকাশার্থে উপস্থিত হয় এবং তাঁর এই ক্রমাগত বিপদের জন্য তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলে সকলের সামনে তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ - كَانُوْا سَبْعَةً فَاَخَذْتَ وَاحِدًا وَاَبْقَيْتَ سِتَّةً وَكَانَ لِىْ اَطْرَافُ اَرْبَعَةً فَاَخَذْتَ وَاحِدًا وَاَبْقَيْتَ ثَلَاثَةً فَاِنْ كُنْتَ اَخَذْتَ فَلَقَدْ اَعْطَيْتَ وَلَئِنْ كُنْتُ قَدْ اِبْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ -

হে আল্লাহ্! তোমারই প্রশংসা! ছেলে সাতজন ছিল, একজন তুমি তুলে নিলে, আর ছয়জন এখনো বেঁচে আছে। আর আমার হাত-পা চারখানা ছিল, একখানা পা তুমি নিয়ে নিলে, বাকী রাখলে তিনখানা। তুমি নিয়েছ, দিয়েছও তুমিই। আমি বিপদে পড়েছিলাম তা থেকে তুমিই মুক্তি দিয়েছ।

সওয়াবের মিষ্টতা ঃ দুঃখ-বিপদের তিক্ততা

দুনিয়ায় মানুষ যে-সব বিপদের সম্মুখীন হয় আসলে তা সব আল্লাহ্র পরীক্ষা বিশেষ। এই পরীক্ষা ব্যাপদেশে ধৈর্য ধারণ করতে পারলে পরকালে আল্লাহ্র কাছে অশেষ সওয়াব পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন একটি আত্মিক নেয়ামত যা কঠিনতম বিপদও মানুষের কাছে অতি সহজ ও সু-সহ্য করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে থেকে যে সওয়াব পাওয়ার আশা, তার বাস্তবতা কি ? তার

বাস্তবতা হচ্ছে ব্যক্তির গুনাহখাতার ক্ষমা পেয়ে যাওয়া, তা যত বেশিই হোক-না কেন ! আর পূণ্য ও নেক আমলের পাল্লা অধিক ভারী হওয়া। মানুষ প্রকৃতপক্ষে এ জিনিসেরই অধিক মুখাপেক্ষী। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمُ مِنْ هَمٍّ وَّلَا غَمٍّ وَّلَا نَصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا الَّا كَفَرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ -

মুসলমান যে চিন্তা-দুঃখ ও বিপদ-আপদে পতিত হয়, এমনকি তার পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার অনেক গুনাহ্ খাতা ক্ষমা করে দেন।

একজন ইসলামী আদর্শবাদী ব্যক্তির পায়ে সাংঘাতিক আঘাত লাগল। কিন্তু সে সেজন্য ব্যথানুভব করল না। একটু উহ্-আহ্ও তার মুখে শোনা গেল না। বরং মুচকি হাসিতে তার মুখখান উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাকে বলা হলো, এত বড় আঘাত পেয়েও তুমি ব্যথানুভব করছ না; বরং হাসছ ? জবাবে সে বলল ঃ

اِنَّ حَلَاوَةَ ثَوَابِهِ اَنْسَتْنِىْ مَرَارَةَ وَجْعِهِ -

এ আঘাতের জন্য যে সওয়াব পাব, তাঁর মিষ্টতা আমাকে ব্যাথার তীব্রতার তিক্ততা ভুলিয়ে দিয়েছে।

নাস্তিক-বস্তুবাদীরা অকপটে স্বীকার করে যে, তাদের সমাজ সংস্থা ও বন্ধ্যা বস্তুবাদী দর্শন মানুষের আত্মিক সুখানুভূতি ও প্রশান্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারে না। কঠিন বিপদে দুঃখে তাদের মন ও মানসকে একবিন্দু সান্ত্বনা ও সুস্থতা দেবে বা তার অনুভূতিটাকে সামান্য হালকা করে দেবে, এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতাও তার নেই। কেননা বস্তুবাদী চিন্তা-বিশ্বাসের উপস্থিতিকে নিয়েই সব কারবার। আর উপস্থিত যখন বিপদাপন্ন তখন ধৈর্যশীলতা ও সান্ত্বনা দানের প্রবণতা বলতে কোনো কিছুই তাতে পাওয়া যায় না। বস্তুবাদী চিন্তা-বিশ্বাস ও মতবাদ-মতাদর্শ যে মানব প্রকৃতির সাথে কিছুমাত্র সামঞ্জস্যশীল নয়, তা এ থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

ঈমানভিত্তিক সমাজ জীবন

ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও ওতোপ্রোত জড়িত। দুটিরই সীমা পরস্পরের সীমানার মধ্যে এমনভাবে প্রবিষ্ট যে, কোনোটিরই সীমা শেষ চিহ্নিত করা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর নয়। এ জিনিসটি কেবলমাত্র ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, সমাজ জীবনের উপর এর কোনো প্রভাবই পড়ে না— এমন কথা বলা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি এ জিনিসটির সম্পর্ক কেবল সমাজ-সমষ্টির সঙ্গে, ব্যক্তির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই— এমন কথার মূলেও আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। কেননা আসলে সমাজ তো ব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত। পরস্পর সম্পর্কশীল সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ ব্যক্তিদের নামই সমাজ। কাজেই সৎ-ব্যক্তি সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা, মূলত তাই সৎ-সমাজ গঠনের কার্যক্রম।

মানুষের সমাজ যেন একটা প্রাচীর। আর ব্যক্তিরা হচ্ছে এই প্রাচীরের এক-একখানি ইট। ইটগুলো যদি সুদৃঢ় ও পরিপক্ক হয় এবং সংযুক্তির উপকরণ যদি হয় তীব্র-দৃঢ় আকর্ষক— তাহলে তা দিয়ে এক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব। এ কারণে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে ইটগুলো পাকা-পোখত ও শক্ত বানানো। এটা স্থপতি বা নির্মাণ শিল্পের মূল কথা। আর সমাজ দর্শনেরও মূল কথা এই-ই।

ব্যক্তি জীবনে ঈমানের প্রভাব পর্যায়ে ইতিপূর্বে যে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতেই একথা বলা যায় যে, ব্যক্তি যে মানসিক প্রশান্তি ও আত্মার স্থিতি লাভ করে, সন্তোষ-নেয়ামতের যে স্বাদ আস্বাদন করে, ব্যক্তি-হৃদয়ে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বলে, উদার বিশাল ভালোবাসার সুশীতল ছায়াতলে জীবন-যাপন করে, শক্তি অনুভব করে ও মান-মর্যাদার চেতনা পায়— তা সব-ই হচ্ছে এক উন্নতিশীল সামাজিক মানুষের ব্যাপার। তা সে পরিপক্ক সুদৃঢ় ইট বানানোর সাধনা, যা দ্বারা একটি সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ সমাজ-সংস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। যে সমাজের ব্যক্তিগণের পরস্পরের শান্তি-স্থিতি, সন্তোষ, হাসি-খুশি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা-প্রীতি ও আত্মমর্যাদাবোধ জাজ্বল্যমান নয়, সে সমাজের পক্ষে পরম সৌভাগ্য, প্রগতি, উন্নতি, উৎকর্ষ ও পরিস্থিতির পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

বস্তুত উন্নতিশীল সমাজ, সুসমৃদ্ধ সমাজ, সৌভাগ্যবান সমাজ— এর একটা বিশেষত্ব আছে। তার দরুনই অন্যান্য ধরনের সব সমাজ থেকে তা হয় ভিন্নতর ও বিশিষ্ট। আর তা হলো, সমাজের ব্যক্তিগণের পারস্পরিক বন্ধন ও সম্পর্ক গড়ার প্রচণ্ড ভাবধারা। যে সমাজের ব্যক্তিগণ পরস্পরে সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ— একজন অপরজনকে জানে, চিনে, পারস্পরিক অপরিচিত বা নিঃসম্পর্কতার ভাবধারা নেই, ব্যক্তিগণ পরস্পরকে ভালোবাসে, পরস্পরে হিংসা ও বিদ্বেষ নেই। যেখানে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ ও আন্তরিক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রবণতা আছে— পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়ার প্রচেষ্টা নেই, যেখানে পরস্পরের মধ্যে নিরপেক্ষ সুবিচার, নির্বিশেষ ন্যায়পরতা, পক্ষপাতশূন্যতা ও দয়া-অনুকম্পার আচরণ গ্রহণ করা হয়— ফলে কেউ কারো প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন করে না, যেখানে প্রাপ্ত লোকেরা বঞ্চিতকে ভুলে থাকে না, শক্তিমান-সক্ষম শক্তিহীন অক্ষমকে উপেক্ষা অবহেলা করে না, বড় ছোটকে ভক্ষণ করে না— যেমন মাছ ও পাখির জগতে হয়ে থাকে, শক্তিশালী দুর্বলকে লোপাট করে না— অরণ্যলোকে যা নিত্যনৈমিত্তিক, প্রকৃতপক্ষে সে সমাজই হচ্ছে আদর্শ সমাজ, সমৃদ্ধ সমাজ, উন্নতিশীল সমাজ, সুখী সমাজ।

পক্ষান্তরে যে সমাজের ব্যক্তিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত, পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধন ঢিলা-অশক্ত, ব্যক্তিগণকে সম্মিলিত করার মসলা দুর্বল— তা সর্বদিক দিয়েই অত্যন্ত খারাপ-অসুবিধাজনক এবং মানুষের বাসানুপযোগী সমাজ। যেখানে সমাজের ব্যক্তিদের মনে অহংবোধ হয় প্রচণ্ড, ব্যক্তি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, ভুলে যায় তার ভাই-বাপকে; প্রত্যেকের মুখে ধ্বনিত হয় শুধু আমি। তাদের লালসা-কামনা দেবীর সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে জনগণের স্বার্থ ও অধিকার নিত্য বলি দেয়া হয়। কিন্তু সেজন্য সে না হয় একবিন্দু ভাবিত বা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত।

যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের অধিকার নিজের পাওনার জন্য চিৎকার করে, নিজের কর্তব্য ও দায়িত্বের ব্যাপারে একবিন্দু সচেতন নয়, অন্য লোকের অধিকার হরণ করে, অন্যের রক্ত শোষণ করে কেবল নিজেকেই স্ফীত করে, নিজেকে মনে করে বিরাট কিছু আর অন্যদের করে ঘৃণা, বানায় হীন ও নীচ— তার মতো খারাপ সমাজ আর হতে পারে না।

অনুরূপ খারাপ সমাজ সেটাও, যেখানকার ব্যক্তিগণ আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলে। নিজের মান-মর্যাদার কথা ভুলে যায়, নিজের শক্তি ও বুদ্ধি-বিবেককে করে অবহেলা-উপেক্ষা, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া নেয়ামতসমূহের একবিন্দু মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়; সেখানে ব্যক্তির সত্তা নিহিত সুকোমল ভাবধারা মরে যায়, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ বিলুপ্ত হয়। নিজের প্রতি তীব্র হয়ে দেখা দেয় অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, অনাস্থা। এটা আসলে ব্যক্তিনিধন কেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়। আর ব্যক্তি

নিধনের এ অভিযান চলতে থাকে, যদ্দিন না গোটা সমাজ প্রাসাদই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

এ কারণে একটা মধ্যবর্তী সীমানা দাঁড় করানো আবশ্যক, যেখান পর্যন্ত এসে ব্যক্তি থেমে যাবে, তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হবে না অন্য ব্যক্তির সীমানা পায়ে দলে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সচেতন হবে নিজ সত্তা ও স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে। এ চেতনায় অন্য ব্যক্তির স্বার্থ ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না। মানুষ হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষই সেখানে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ সুদৃঢ় এক-একখানি ইট বিশেষ। এই ব্যক্তিরাই একটি আদর্শ সমাজ সংস্থা গড়ে তুলতে পারে। এ সমাজই অর্জন করতে পারে তার সামষ্টিক সম্মিলিত ও অভিন্ন লক্ষ্য। সর্বদিকে দিয়ে উপনিত হতে পারে উন্নতি ও উৎকর্ষের চরম উন্নত মনযিলে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতাকারী— নেক কাজে, কল্যাণময় কাজে ও আল্লাহ্ ভীরুতা সম্পন্ন কাজে। তারাই পরস্পরকে উপদেশ দেবে ন্যায় ও সত্যের জন্য, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্য। সেখানে সকলেই সকলের আপন— কেউ কারো পর নয়, অনাত্মীয় নয়, শত্রু নয়। বরং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য দরদী, সহানুভূতিশীল ও কল্যাণকামী।

এ ধরনের সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন কতগুলো জরুরী বিধি-বিধান ও নিয়ম-প্রণালী, যা ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে, যা পারস্পরিক কাজে-কর্মে একজনকে অপরজনের জন্য সাহায্যকারী ও পরিপুরক বানিয়ে দেবে। ব্যক্তিদের হৃদয়াবেগ বিবেক বুদ্ধির উপর জয়ী হয়ে উঠবে না, সাধারণ কল্যাণ-বোধ সেখানে হবে না পরাজিত, স্তব্ধ নিষ্ক্রিয়। শক্তি সেখানে সত্যকে করবে না পরাজিত, পদদলিত ও মথিত। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল হয়ে উঠবে না কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব জ্ঞানের উপর। ব্যক্তি-স্বার্থ সেখানে উপেক্ষা করবে— আঘাত হানবে না সমাজ ও সমষ্টি স্বার্থকে। আর এই বিধি-বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতিগুলো কোনো কল্যাণই সাধন করতে পারে না, যদি না সেগুলো নৈতিক মূল্যবোধমূলক হয়। কেবলমাত্র নৈতিক আদর্শভিত্তিক বিধি-বিধান পারে এ ধরনের কল্যাণপন্থী সমাজ গঠন করতে, যার পিছনে থাকবে মানুষের শুভ বুদ্ধি ও বিবেকের বলিষ্ঠ সমর্থন। নৈতিক আদর্শহীন কোনো সমাজ সংস্থা, কোনো সংস্কার প্রচেষ্টা বা কোনো সামাজিক পরিবর্তন-পরিকল্পনাই ব্যক্তিগণের মন ও মানসের সংশোধন পরিশুদ্ধ বিধান করতে সমর্থ হয় না। পারে না ব্যক্তিদের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগ্রত করতে, ব্যক্তিদের চরিত্রকে পবিত্র ও নির্মল করে তুলতে। তখন গোটা সমাজ-প্রাসাদটাই হয়ে পড়ে বালুর স্তূপের উপর নির্মিত বিরাট প্রসাদের মতো।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

আল্লাহ্ তা'আলা কোনো জাতির জীবনেই একবিন্দু পরিবর্তন আনেন না, যতক্ষণ না সেই জাতির লোকেরা নিজেদের জীবনে নিজেরাই পরিবর্তন আনে।

তাই ঈমান মুমিন সমাজের উপর কতটা প্রবাব বিস্তার করে, কতটা পরিবর্তন আনে এবং কিভাবে তাকে পরিচালিত করে উন্নত সমাজ সংস্থার দিকে, যা দেখে বস্তুবাদী লোকদেরও মস্তক অবনমিত হয়ে আসে, তা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

ঈমান ও চরিত্র

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (ترمذى)

ঈমানের দিক দিয়ে সেই মুমিনরা পরিপূর্ণ, যারা চরিত্রের দিকে দিয়ে সবচাইতে উত্তম ও অধিক সুন্দর।

জীব-জন্তুর জন্য স্বভাবজাত জ্ঞান ও আবেগই যথেষ্ট

সাধারণ জীব ও পশু জগত সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে স্পষ্টরূপে জানা যায়, তাদের জীবন সংগঠন ও কর্মস্পন্দনের জন্য— তা ব্যক্তিগত হোক কি সমষ্টিগত স্বভাবজাত জ্ঞান ও আবেগই যথেষ্ট। তার অধিক কোনো জ্ঞান তথ্যের কোনো প্রয়োজনই হয় না। পিপীলিকার ব্যাপারটি এ কথার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। পিপীলিকারা কিরূপে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শীতকালের জন্য ওরা সবাই মিলেমিশে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটির গর্ভে তা সঞ্চয় করে রাখে। কেননা শীতকালে তারা খাদ্য সংগ্রহের অভিযানে বাইরে বের হতে পারে না। এর চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায় মৌমাছিদের জগতে। একজন অদৃশ্য রাণীকে কেন্দ্র করে কতগুলো কর্মচারী ও পুরুষ মাছি নিয়ে এই জগত চলে। এখানকার প্রত্যেকটি মাছিই পূর্ণ আনুগত্য, সহযোগিতা ও মিলমিশের মাধ্যমে মৌচাক নির্মাণ করে কত বিচিত্র ধরনের মাল মসলা সংগ্রহ করে। অতঃপর চতুর্দিকের বাগ-বাগিচার প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি থেকে মধু আহরণ করে মৌচাকের প্রতিটি খোপ ভর্তি করে রাখে। চিন্তাশীল লোকদের জন্য এ ব্যাপারে একটা গভীর চিন্তা ও বিবেচনার বিষয় নিহিত রয়েছে। বস্তুত তাদের সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য। এ ব্যবস্থা কায়েম করা ও চালানো তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে কেবলমাত্র এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে স্বভাবতই এর প্রবণতা শামিল করে দিয়েছেন। এই জ্ঞান দানকেও কুরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'ওহী'। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ - ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

তোমার আল্লাহ মৌমাছির প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন যে, পাহাড় ও গাছপালা ও অপর কোনো উচ্চস্থানে ঘর নির্মাণ করো। পরে সমস্ত ফুলরাজির মধু খাও, তারপর তোমার আল্লাহ্‌র পথে চলতে থাক। তখন তাদের পেট থেকে এক প্রকার পানীয় নির্গত হবে, যার বর্ণ বিভিন্ন। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের নিরাময়তা। নিশ্চয়ই তাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। (নহ্‌ল ঃ ৬.৮-৬.৯)

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা বিভিন্ন

মানুষের মধ্যেও স্বভাবজাত প্রবণতা বিদ্যমান। কিন্তু এই প্রবণতা বিভিন্ন, রকমারি ও পরস্পর অনৈক্যবদ্ধ। তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অসহজবোধ্য। তা ঐকিক নয়, সংমিশ্রিত। এক প্রকারের প্রবণতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাই মানুষকে বানায় স্বার্থপর, দাম্ভিক। আর এক প্রকারের প্রবণতা সামষ্টিক। তা সমাজবদ্ধ মানুষকে পরস্পরের প্রতি সহযোগী, সহানুভূতিসম্পন্ন বানায় ও অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে। একটি প্রবণতার ফলে মানুষ হয়ে যায় অত্যন্ত হীন ও নীচ, নিতান্তই বস্তুবাদী। অন্য প্রকারের প্রবণতা মানবাত্মার উৎকর্ষ বিধান করে। এর কারণ এই যে, মানুষ মূলত বিভিন্ন ভাবধারা সমন্বিত এক সৃষ্টি। তার দেহ সত্তায় যেমন রয়েছে মৃত্তিকার অংশ, তেমনি রয়েছে নৈসর্গিক-আসমানী অংশ। মানব সত্তার যেমন দেহ রয়েছে, তেমনি রয়েছে আত্মা বা 'রূহ'। তার আছে লোভ-লালসা, যৌন প্রবৃত্তি যেমন তেমনি বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি। অন্য কথায়, মানুষ এক দিক দিয়ে নিতান্তই জীব-জন্তু পর্যায়ের, আর অপর দিক দিয়ে সে মানুষ। মানুষ ফেরেশতাও, শয়তানও। মানুষের দ্বৈত রূপ— আত্মিক জগত ও বস্তুগত উভয় দিকের সাথে সমান সম্পর্ক রাখার দরুন কোনো দার্শনিক বলেছেন ঃ মানুষ অন্তত দুটি জগতের সমন্বয়, দুটি জগতের মিলনকেন্দ্র। অপর একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের মতেঃ 'মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও প্রবণতা অন্য যে-কোনো জন্তু-জানোয়ারের তুলনায় অত্যধিক সূক্ষ্ম ও জটিল। আর এই সূক্ষতা ও দুর্বোধ্যতার দরুন মানুষকে যাথার্থভাবে বোঝা ও চেনা অত্যন্ত কঠিন। কেননা মানুষ পুরামাত্রায় সমাজ প্রবণ নয় যেমন পিপীলিকা ও মৌমাছি। পরন্তু সে নয় পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব— যেমন সাপ ও চিতা। মানুষ হচ্ছে প্রায় সামাজিক জীব। তার কোনো কোনো ভাবধারা সমাজকেন্দ্রিক, আর কোনো কোনোটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মানব প্রকৃতিতে সামষ্টিক প্রবণতা— তা বিশেষভাবে প্রমাণিত এ কারণে যে, কারাগারের একক ও নিঃসঙ্গ বন্দীদশা (Segregation) -ই অধিক কঠিন ও দুঃসহ শাস্তি বলে সারা দুনিয়ায় বিবেচিত। অপরদিকে সে নিজস্ব কতগুলো বিশেষ ব্যাপার নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সে-সব বিষয় সে অপরিচিত লোকদের কাছে কখনো ব্যক্ত হতে দিতে প্রস্তুত হয় না। আর আমরা

মানুষেরা যেহেতু পুরোমাত্রায় সমাজ প্রবণ নই, এ কারণে আমাদের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে নৈতিক চরিত্র। এই চরিত্রই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও দায়িত্বের কথা বলে দিতে পারে। আর সেই জন্যই দরকার নৈতিক নিয়ম-বিধান ও চারিত্রিক আদর্শ। তা-ই আমাদের কর্মজীবনের পথ দেখাবে, আচার-আচরণ শেখাবে। কিন্তু মৌমাছিরা বাইরে থেকে শেখা কোনো চরিত্রের মুখাপেক্ষী নয়। কেননা তারা স্বভাবতই সামষ্টিক কল্যাণের দিকে পরিচালিত। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে, মানুষের জন্য সুস্থ বিশুদ্ধ নির্ভুল নৈতিক নিয়ম-বিধান কে বানিয়ে দেবে ?

এই সমস্যাসংকুল দুনিয়ায় সঠিক পথে চলার নিয়ম-নীতি কে নির্দিষ্ট করে দেবে মানুষকে ? তাকে পৌছে দেবে এমন এক উচ্চতর লক্ষ্যে যেখানে বক্রতা বলতে কিছু নেই ?

তা কি দেশের আইন ?

তা কি নীতি দর্শন ?

তা কি দ্বীন বা ধর্ম ?

এ তিনটি সম্পর্কেই আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চেষ্টা করছি।

মানুষের জীবন আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য আইন যথেষ্ট নয়

সমাজ সংগঠন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে আইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধুমাত্র আইনই মানুষের সমগ্র জীবনের আচার-আচরণ নির্ধারণে যথেষ্ট নয়। কেননা আইনের সমস্ত কর্তৃত্ব ও প্রভাব কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, মানুষের হৃদয়মন ও অন্তর্নিহিত জীবন তার আওতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। আইনের সমস্ত কারবার মানুষের সাধারণ জীবন ক্ষেত্রে সীমিত, বিশেষ ক্ষেত্র ও ব্যাপারে আইনের কোনো কর্তৃত্ব চলে না। যে সব অপরাধী ধরা পড়ে যায় ঘটনাবশতই, আইন কেবল তাদেরকেই শাস্তি দিতে পারে— যে শাস্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু অনুরূপ অপরাধে সেই শাস্তিই যথেষ্ট কিনা, সে প্রশ্নের কোনো উত্তম নেই। তাছাড়া সাধারণ সদাচারী নাগরিকদের জন্য আইনের কাছে কোনো পুরস্কার নেই, সদাচরণের নেই কোনো স্বীকৃতি বা সম্মান। দ্বিতীয়ত আইনকে ফাঁকি দেয়া তো বাম হাতের খেলা। ইচ্ছা মতো আইনের ব্যাখ্যা দান দুনিয়ার আইন শিক্ষার মৌল তত্ত্ব এবং ওকালতীর মারপ্যাচে অপরাধীকে সম্পূর্ণ 'বে-কসুর খালাস' দেয়ানো ওকালতীর প্রধান জীবিকা। বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডিত হয়েও পুলিশকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখিয়ে আত্মগোপন করে থাকাও তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কথা, আইন অপরাধকে দমন করতেও পারে না আর তা যে মানুষকে

সদাচরণ ন্যায়-নীতির দিকে পরিচালিত করতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে স্বতঃই চলমান বানানো এবং নেক ও কল্যাণময় কাজের উদ্যোগী বানানো আইনের সাধ্যাতীত। এ ব্যাপারে তার আদৌ কোনো ক্ষমতা নেই। সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ডে আইনের বিচার করলে আমাদের আরও হতাশ হতে হয়। তবে বিশেষ বিশেষ সরকার ও আইন রচয়িতা সংস্থার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন হয়ে থাকে, তাও আমরা অস্বীকার করি না।

কিন্তু সরকার সম্পর্কে এ কথা অমূলক নয় যে, তা মানুষকে ন্যায় ও সুবিচার নীতির অনুসারী বানাতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তিও যে অনেক সময় ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সীমা লংঘন করে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের স্টীম রোলার চালায়, তাও কি অস্বীকার করা যায় ? সাধারণত দুনিয়ার সরকারসমূহ সত্য-মিথ্যা-অন্যায়, হক ও বাতিল, শৃঙ্খলা ও বিপর্যয় এবং কল্যাণ, অকল্যাণের সংমিশ্রণ করে মানুষকে একটা কঠিন প্রতারণা জালে বন্দী করে। দুর্নীতিপরায়ণ ও মানবতার দুশমন লোকেরা যখন সরকারী ক্ষমতা দখল করে বসে, তখনি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এ অবস্থায়ই বা তাদের উদ্ধত হস্তকে দমন করবে কে ? তাদের নির্মম নিপীড়ন থেকে সাধারণ শক্তিহীন জনগণকে রক্ষা করবে কে ? কে তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে লোভ-লালসা ও অশুভ প্রবণতার উপর বিজয়ী করে দেবে ? তখন দুর্বল, অক্ষম, নির্যাতিত জনতার আর্তচিৎকার কে শুনবে, আর কে আসবে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে ?

বলা বাহুল্য, পারস্পরিক সহৃদয়তা, সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ভিন্ন সামাজিক জীবন কখনোই সম্ভবপর হয় না। আর এ জিনিস হতে পারে এমন একটা সামগ্রিক বিধানের ভিত্তিতে, যা সমাজের লোকদের পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে। প্রত্যেকের অধিকারও যেমন নির্দিষ্ট করে দেবে, তেমনি স্পষ্ট করে বলে দেবে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান কার্যকর করা রাষ্ট্র ব্যতিরেকে অসম্ভব। এই রাষ্ট্র শক্তিই যেমন এ বিধানকে কার্যকর করবে, তেমনি তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণও রাখবে আর সঠিকভাবে তার সংরক্ষণও করবে।

কিন্তু পৃথিবীর বুকে এরূপ যোগ্যতা ও সামর্থ্যসম্পন্ন শক্তি রয়েছে একমাত্র ধর্মের— ধর্ম বিশ্বাসের। এ ক্ষেত্রের বিকল্প কিছু হতে পারে বা অনুরূপ কাজ অন্য কিছু দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে বলে মনে করা নিতান্তই বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আইনের মর্যাদাবোধ, সম্ভ্রম রক্ষা এবং সেই সঙ্গে সমাজ সংস্থার দৃঢ়তা সাধন আর জনগণের জন্য নির্বিঘ্ন শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির নিরাপত্তা বিধান সম্ভব হতে পারে যদি মানব রচিত আইনের পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক আইনকে দেশের আইন Law of land রূপে গ্রহণ ও চালু করা হয়।

তার কারণ, মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত জীবন্ত জীব-জন্তু থেকে বহু দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তার কর্মতৎপরতা, গতিবিধি ও ইচ্ছামূলক হস্তক্ষেপে এমন একটা জিনিস কাজ করে যার উপর না তার চোখ পড়ে, না কানে কিছু শুনতে পায়। তা তার হাতেও আসে না, তার গর্দানেও পড়ে না। অথচ তাই হচ্ছে মানুষের আসল বৈশিষ্ট। তাই হচ্ছে মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস। বহু মানুষ এ দুটো জিনিসের মর্যাদা পালটে দিয়েছে। তারা মনে করেছে চিন্তা ও মননশীলতা মানুষের বস্তুজীবন ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। বরং চিন্তা ও মননই প্রভাবিত হয় মানুষের বস্তুগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা।

কিন্তু আসল কথা হলো, মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা চালিত হয়, বাহ্যিক ও আববয়িক শক্তি দ্বারা নয়। এ কারণে এমন উন্নতমানের সমাজ সংস্থা গড়ে তোলা নিছক সামাজিক নিয়ম-প্রণালী ও বিধি-বিধান এবং প্রশাসন ক্ষমতার সাধ্য নয়, যেখানে সকলের অধিকারসমূহ যথাযথ মর্যাদা পাবে এবং কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ পুরোপুরিভাবে প্রতিপালিত হবে। কেননা মানুষ যখন মনে করে যে, আইন ফাঁকি দিয়ে চলা তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়, তখন কোনো চাবুকের, গ্রেফতারীর বা অর্থদণ্ডের ভয়ে তাকে সামান্যও ভীত করা এবং লোকদের অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনে ব্রতী বানানো সম্ভবপর হয় না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার সাহায্যেই সমাজে ও দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্ভব এবং তার ফলে কোনো দ্বীনি ও নৈতিক প্রশিক্ষণের কোনো প্রয়োজন হবে না— এরূপ মনে করাও নিতান্তই বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। কেননা নিছক বিদ্যাশিক্ষা দুধারি তরবারির মতো। তা যেমন ভাঙতে ও ধ্বংস করতে সক্ষম, তেমনি গঠন ও প্রতিষ্ঠার যোগ্যতাও তার রয়েছে। তার সঙ্গে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার যোগ না হলে এবং সমস্ত শিক্ষার মূল নিয়ামক ও মৌল ভাবধারা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা না হলে প্রকৃত কল্যাণমূলক ও সমাজ গঠন সম্ভবপর হয় না। মানুষের জ্ঞান শক্তিকে অন্যায় ও বিপর্যয়ের দিক থেকে ফিরিয়ে রাখা ও অসম্ভব হয়ে দাঁড় করাতে হবে ঈমান ও অন্তরের নিবিড় বিশ্বাসকে।

নৈতিক দর্শন এ প্রয়োজন পূরণ করে না

কেবল নৈতিক দর্শনও সর্বসাধারণ মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম নয়। নীতি দর্শন সমাজের বিশেষ ও কতিপয় লোককেই আদর্শবাদী বানাতে পারে। সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে তা বানাতে পারে না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকও যদি নীতিবাদী হয়ে গড়ে ওঠে, তবু তাতে সামষ্টিক কল্যাণ

সাধিত হতে পারে না। উপরন্তু নীতিদর্শন অত্যন্ত স্থুল ও সীমাবদ্ধ, তা দ্বীনের প্রভাবের মতো কখনো গভীর হয় না, ব্যাপকও হয় না।

কিন্তু এ পর্যায়ে আসল প্রশ্ন হয়, মানুষ কোন নীতি-দর্শনটিকে মেনে নেবে? প্রত্যেক দার্শনিকেরও একটা নিজস্ব একক নীতি-দর্শন রয়েছে। আর প্রত্যেক ধর্মমতের নীতি দর্শনও স্বতন্ত্র এবং একক মানদণ্ডের ধারক। উইলিয়াম জেমস্ নীতি-দর্শনরূপে পেশ করেছেন সুবিধাবাদকে (utility) মানুষ কি তার অনুসরণ করবে? এ্যারিস্টটল ও এ্যাপিকিউর উপস্থাপিত করেছেন সুস্বাদের দর্শন— যা কিছুই সুস্বাদু তাই ভালো— এই মত। মানুষ কি সেটাই মেনে নেবে? নিট্‌শে পেশ করেছেন শক্তি দর্শন— শক্তিই সত্য। আর কান্ট বলেছেন কর্তব্য দর্শনের কথা। মানুষ এর মধ্যে কোনটাকে সত্য বলে মেনে নেবে এবং অনুসরণ করে চলবে?

এর উপর আরও একটি প্রশ্ন। মানুষ নির্দিষ্ট ধারণানুযায়ী উত্তম নৈতিকতা গ্রহণ ও অনুসরণ করে তার বিনিময়ে সে কি প্রতিফল পাবে? তা কি এমন প্রতিফল, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রসন্ন ও মনকে সন্তুষ্ট করবে? কিংবা তা মরুভূমির মরীচিকার মতো, অর্থাৎ যত নিকটে যাওয়া যায়, পানি ততই শূন্যে মিলিয়ে যায়, কোনো এক স্থানেও তা ধরতে পারা যায় না?

যে সৈনিক কোনো জাতির জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করল এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিল, তাকে কেউ জানল না, কেউ তাকে পুরস্কৃত করল না, তার কথা কেউ স্মরণও করল না। সে এই কষ্ট স্বীকার ও অকাতরে প্রাণদানের বিনিময়ে কি পেল? যে সৈনিক দেশ ও জাতির প্রতিরক্ষা সংগ্রামে প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকার করে আত্মদান করল, সেই বা কি লাভ করল? নীতি-দার্শনিকরা যে মানসিক শান্তি ও তৃপ্তির দোহাই পাড়েন, এখানে তার তো কোনো অবকাশও সে পেল না। তাহলে তার এই অতুলনীয় আত্মদান কি পানিতে ভেসে গেল?

প্রশ্নগুলোর আরও একটি দিক রয়েছে। যে-লোক দীর্ঘদিন পর্যন্ত জীবিত থেকে মানুষের উপর অমানুষিক জুলুম নির্যাতন চালাল এবং নিজের বিষাক্ত লালসার ফনা তুলে দংশন করল অসংখ্য মানুষকে; তার মনে সেজন্য একবিন্দু অনুতাপও জাগল না— কেননা তার মন তো আগেই মরে গেছে, মরে গেছে বলেই তো সে এত অত্যাচার-জুলুম চালাতে পেরেছিল— কিন্তু তার এই অত্যাচার-জুলুমের কোনো শাস্তিই কি তাকে ভোগ করতে হবে না কখনো? এ এমন একটা সমস্যা, যার কোনো সমাধান পেশ করা তথাকথিত নীতি-দার্শনিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সমস্যার সঠিক ও নির্ভুল সমাধান দিতে পারে একমাত্র ঈমান, দ্বীন ও ধর্ম। দ্বীনই এ বিষয়ে ঘোষণা করেছে ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

যে লোক একবিন্দু ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে, আর যে লোক একবিন্দু মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল ঃ৭-৮)

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ - سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ - وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ - (محمد : ٤-٦)

যে লোক আল্লাহ্‌র পথে নিহত হবে, আল্লাহ তাদের কার্যসমূহকে কখনোই ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দেবেন না। তিনি তাদের পথ দেখাবেন, তাদের অবস্থার উন্নয়ন করবেন এবং তাদের তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার সাথে তিনি তাদের আগেই পরিচিত করেছেন।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَاسَعٰى - وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى - فَاَمَّا مَنْ طَغٰى - وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى - وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى - (النّٰزعٰت : ٣٥-٤١)

যেদিন মানুষ তার সব কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দৃষ্টিমানের সম্মুখে দোযখ উন্মুক্ত করে রাখবে, তখন যে লোক (দুনিয়ায়) আল্লাহ্‌দ্রোহিতা করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল, এই দোযখই হবে তার পরিণাম। আর যে লোক নিজের আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ কামনা-বাসনা হতে বিরত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

নীতি-দর্শন নয়, চরিত্রই আসল

নীতি-দর্শন গ্রহণ করলেই নৈতিক চরিত্র গ্রহণ করা হয় না। নীতি-দর্শন এক জিনিস, আর প্রকৃত নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নতর। নৈতিক চরিত্র হলো এক ব্যক্তির সবচাইতে উন্নত গুণ ও বৈশিষ্ট্য, একটি উন্নত জাতির জীবনীশক্তি। জাতির চরিত্র যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, জাতিও ততদিন অক্ষয় হয়ে থাকে। যে জাতির চরিত্র নেই, সে জাতি এ দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারে না। চরিত্রহীন জাতির জীবন অসম্ভব।

সাধারণভাবে ধর্মের দৃষ্টিতে— বিশেষভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। তার বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত। কুরআন মজীদ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চারিত্রিক গুণ-গরিমার সর্বাধিক প্রশংসা করেছে। তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

এবং নিশ্চয়ই আপনি অতীব উচ্চ নৈতিক গুণে গুণান্বিত।

নবী করীম (স) নিজে স্বীয় নবুয়তির দায়িত্বের দিক দিয়ে বিশেষভাবে বলেছেন ঃ

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ - (حاكم، بيهقى)

মহান নৈতিক গুণাবলী পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।

ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞগণ এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বলেছেন ঃ

اَلدِّيْنُ هُوَ الْخُلُقُ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِىْ الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِى الدِّيْنِ-

(مدارج السالكين لابن القيم)

চরিত্রই হচ্ছে ধর্ম। চরিত্রের দিক দিয়ে যে লোক তোমার চাইতে বেশি অগ্রসর, ধর্মের দিক দিয়েও সে তোমা অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর।

আসলে এ কথাটি একটি হাদীসেরই ব্যাখ্যা বিশেষ। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (ترمذى)

চরিত্রের বিচারে যে লোক উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সে-ই পূর্ণতম ঈমানের অধিকারী।

হাদীসের কথা হলো ঃ

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ - (مسلم)

উত্তম চরিত্রই হলো সমস্ত পূর্ণশীলতার মূলকথা।

مَامِنْ شَىْءٍ اَثْقَلُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ - (ترمذى)

মুমিনের পরিমাপদণ্ডে কেয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছু নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক চরিত্রের যে গুরুত্ব, তা এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের সার নির্যাস হলো এই চরিত্র। আসলে ধর্মীয় জীবনের প্রধান স্তম্ভ হলো চরিত্র। আর সমাজ জীবনে চরিত্র হচ্ছে আসল ভিত্তি।

ধর্ম ছাড়া চরিত্র হয় না

তবে ধর্ম কেবল উত্তম পবিত্র চরিত্র গ্রহণের আহবান জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, ধর্ম নৈতিক চরিত্রের বিধি-বিধান, রীতি-নীতি ও মৌল আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আচার-আচরণের খুঁটিনাটিও বলে দেয় এবং তার উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। চরিত্র হারালে তার কি নির্মম পরিণতি হতে পারে, তার কথা বলে মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়। আর চরিত্রবান কি উচ্চ সওয়াব পেতে পারে এবং চরিত্র হারালে কি আযাব ভোগ করতে হতে পারে, তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বলা ধর্মের কাজ। আলমানীয় দার্শনিক বলেছেন ঃ 'ধর্ম ছাড়া চরিত্র নিষ্ফল।' ভারতীয় চিন্তাবিদের উক্তি হলো 'ধর্ম ও উত্তম চরিত্র আসলে দুটো একই জিনিস, এ দুটো কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যেখানে ধর্ম সেখানেই চরিত্র আর যেখানে চরিত্র, সেখানেই ধর্ম। এ দুটো অবিভাজ্য একক।' ধর্ম হচ্ছে চরিত্রের প্রাণশক্তি। আর চরিত্র হচ্ছে ধর্মের অবয়ব। অন্য কথায়, ধর্ম চরিত্রের জীবিকা, ধর্মই চরিত্রকে পরিবর্ধিত করে, সঞ্জীবিত রাখে— যেমন করে পানি খাদ্য দেয় ও ক্রমবর্ধিত করে কৃষি ফসলকে। জন প্রফুমো ও তার প্রেমিকা কৃস্টান কিলারের মামলার রায় দান প্রসঙ্গে বৃটিশ বিচারপতি বলেছিলেন ঃ

ধর্ম ছাড়া কখনো চরিত্র হতে পারে না। আর চরিত্র ছাড়া আইনের কার্যকরতা অসম্ভব।

অ-কলংক উত্তম চরিত্র পাওয়ার একমাত্র উৎস হলো ধর্ম। বিশ্বাসই মানুষকে সর্বপ্রকার চরিত্রহীনতা থেকে রক্ষা করে। ধর্মই মানুষকে উচ্চতর লক্ষ্য পানে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করে। মানুষ সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত.করে, তার সীমা নির্দিষ্ট করে এবং তা লংঘন করা থেকে তাকে এবং অন্যদের বিরত রাখে। তার আদত-অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাকে বিনয়ী ও অনুগত বানায় তার জীবন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য। ধর্ম-ই ব্যক্তির মন-মানসিকতাকে জীবন্ত রাখে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে এবং তাকে উৎকর্ষ দান করে।

ঈমান ও উন্নত লক্ষ্য

যে লোক কোনো ধর্ম মানে না, যার নেই কোনো বিশ্বাস বা আকীদা, তার সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়টা কি ? কি তার জীবন লক্ষ্য, এই জীবনে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি ?

আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করা তার চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। কেননা সে তো আল্লাহ্‌কে বিশ্বাসই করে না। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সে কিছু পেতেও চায় না।

চিরন্তন জীবন লাভ করে সে কি চায় চিরকালীন অফুরন্ত সুখ-শান্তি লাভ করতে? না, তাও নয়। কেননা সে এ ধরনের কোনো চিরন্তন জীবন সম্ভব বলে মনে করে না, তার মনে সে বিষয়ে কোনো চিন্তাও জাগে না কখনো।

তার নিজস্ব জগতে নিজেকে নিয়ে সদা ব্যতিব্যস্ত থাকা ছাড়া তার কোনো কর্ম নেই। আর নিজের মনের কামনা-বাসনা অনুসরণ ও লালসার চরিতার্থতা ছাড়া তার আর কোনো লক্ষ্য নেই। সে কেবল নিজেকে রক্ষা করার চিন্তায়ই সদা মশগুল, তা যেভাবেই হোক। এ-ই হয় তার একমাত্র প্রবণতা।

তার স্বভাব-প্রকৃতি যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়, তাহলে সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে ও নিজের গোটা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে জীবন কাটাবে। মনে হবে জীবিত; কিন্তু আসলে সে মৃত। দেখা যাবে সে আছে; কিন্তু আসলে সে নেই। তার বেঁচে থাকাটা কেউ টেরও পাবে না। আর এ অবস্থায়ই হবে তা দৈহিক মৃত্যু।

তার উপর যদি তার পাশবিক প্রবৃত্তি জয়ী হয়, তাহলে তার সমস্ত জীবনটা কেটে যায় লালসা-কামনা ও স্বাদ-আস্বাদন চরিতার্থতার ভিতর দিয়ে। এই পথেই হয় তার অগ্রগতি। আর এ জন্য সে যত উপায় সম্ভব, অবলম্বন করে। তার এমন কোনো লজ্জা শরমও থাকে না, যা তাকে এ পথ থেকে বিরত রাখবে। এজন্য তার মানসিক দংশন বা অনুতাপও হয় না কখনো। তার বিবেক তাকে তাড়া করে না।

তার স্বভাব-প্রকৃতি যদি হয় বিদ্বেষী, হিংসুক, তাহলে একদিকে সে নিজেকে সকলের উর্ধ্বে, সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও বড় বলে মনে করতে শুরু করে। আর বিরোধীদের উপর সে নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। মুখে ফুটে ওঠে সব অহংকার-গৌরবের কথাবার্তা। মানুষের রক্তে সে নিজের বালাখানা নির্মাণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

তার শয়তানী প্রবণতা প্রবল হলে সে লিপ্ত হয় ষড়যন্ত্রে ও শঠতার কাজে। নানা প্রতারণায় মানুষকে জর্জরিত করতেও তার কলিজা কেঁপে ওঠে না। পাপ ও যাবতীয় অন্যায় কাজ তার কাছে অত্যাধিক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা হয় তার চরিত্রের ভূষণ। লোকদের মধ্যে সে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে সমস্ত সমাজকে সে বিষ-জর্জরিত করে তোলে। এ লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলার এই কথাটি প্রযোজ্য ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ - (الرعد : ٢٥)

যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন সে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও দুনিয়ার বুকে বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, এদের উপরই অভিশাপ, আর এদেরই পরিণতি অত্যন্ত খারাপ।

এরা নিজেদের নফ্‌সের লালসা-কামনার অনুসরণ করে চলে, চলে যেদিকে মন চায়। আর নফ্‌স হচ্ছে একটা অন্ধ ও বধির শক্তি। নফ্‌স হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের উপাস্য।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ - (القصص : ٥٠)

আল্লাহ্‌র হেদায়েত বাদ দিয়ে— ত্যাগ করে যে লোক কেবলমাত্র নফ্‌সের দাসত্ব ও অনুসরণ করে চলবে, তার মতো পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে।

কিন্তু মুমিনের জীবনের রূপই এর থেকে ভিন্নতর। সে বিরাট দায়িত্বানুভূতি সহকারে জীবন যাপন করে। এক উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে তার সমস্ত কর্মতৎপরতা চালায়। এক উন্নততর বাসনার ছায়ায় সে বেঁচে থাকে। তাই নিয়েই সে জীবন-যাপন করে এবং তারই উপর তার মৃত্যু সংঘটিত হয়। আর সে দায়িত্ব হলো, আল্লাহ নৈকট্য লাভ, আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা চালানো। আর এই পথে চলতে চলতে তার নফ্‌সের সব অহংকার ও আত্মাভিমান নির্মূল হয়ে যায়। নফ্‌সের খাহেশের মস্তক চূর্ণ হয়ে যায়। কেননা প্রতিমূহূর্ত, প্রতিটি কাজে তাকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করতে হয়, ভয় করে চলতে হয় তাঁকে এবং তাঁর নিজের হাতে যা কিছু আছে তা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাঁরই সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে তাকে চেষ্টা চালাতে হয়। তার চোখের সামনে আল্লাহ্‌র এই বাণী জ্বলজ্বল করতে থাকে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ - قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ

بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ - اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -

লোকদের জন্য আকর্ষণীয় বানানো হয়েছে স্ত্রীলোকের লালসা-কামনা-ভালোবাসা, সন্তান-সন্ততি, স্তুপীকৃত ধন-মাল, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, জন্তু ও ক্ষেত-খামার, এই হচ্ছে বৈষয়িক জীবনের সামাগ্রী। আর আসলে আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বলো, আমি কি তোমাদের বলে দেব এর চাইতেও অধিক উত্তম কল্যাণকর জিনিসের কথা? তা সে সব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের আল্লাহ্র নিকট জান্নাত, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর পবিত্র জুড়ি (স্বামী-স্ত্রী) আর আল্লাহ্র সন্তোষ। আল্লাহ সেই বান্দাদের অবশ্য দেখেন যারা বলে ঃ হে আমাদের আল্লাহ! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এরা হচ্ছে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সত্যবাদী সত্যপন্থী, বিনীয়-অনুগত, সদাব্যয়কারী ও শেষ রাতে (উঠে আল্লাহ্র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনাকারী লোক। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৪-১৭)

ঈমানের ভিত্তিতে যে চরিত্র গড়ে ওঠে, এই হচ্ছে তার শুভ সুন্দর ফল। আর এই হচ্ছে সত্যিকার ঈমানদার লোকদের পরিচয়। এরা নফসের খাহেশ পূরণের পরিবর্তে আল্লাহ্র কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তাই পাওয়ার জন্য জীবনভর চেষ্টা চালিয়েছে। হীন প্রকৃতির অশ্লীল আহবানকে তারা অস্বীকার করেছে। দুনিয়ার প্রলোভনে পড়ে তারা নিজেদের চরিত্রহীন করতে প্রস্তুত হয়নি। তারা আল্লাহ্কে ভয় করেছে, তাঁরই সন্তোষ ও মাগফেরাত পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, বিপদ-আপদে ধৈর্য অবলম্বন করেছে। সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলেছে, সত্য পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্র কাছে বিনীত ও অবনত রয়েছে, আল্লাহ্র পথে সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করেছে; কিন্তু সেজন্য তাদের মনে কখনো কোনো অহংকার দানা বেঁধে ওঠেনি। বরং সব সময় নিজের অক্ষমতা তীব্রভাবে অনুভব করেছে।

মুমিনের জন্য উচ্চতর লক্ষ্য ও আদর্শ হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্য। তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করাই হয় তার বড় কাজ। এর চাইতে লড় লক্ষ্য আর কিছু হতে পারে না, এর চাইতে মহত্তর কাজও আর কিছুই নেই। এ জিনিসই তার জীবনকে উচ্চাভিলাসী বানায়, সে আপন করে গ্রহণ করে সেই সব কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণকে, যার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছতে পারবে, আল্লাহ্র

সন্তোষ লাভ করতে পারবে। জন্তু-জানোয়ার পর্যায়ের কোনো 'গুণ' গ্রহণ থেকে নিজেকে দূরে সারিয়ে রাখবে।

কেউ কেউ মনে করেছে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ বা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার নির্দেশ একটা অসম্ভব কাজের নির্দেশ। তাদের ধারণা, এ আহ্বান বুঝি মানুষের আল্লাহ্ হয়ে যাওয়ার আহবান। কিন্তু এ একটা নিতান্তই বাতিল ও ভিত্তিহীন ধারণা। কেননা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার নির্দেশের অর্থ হলো— নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে চরম উন্নতির উচ্চমার্গে আরোহণ। আল্লাহ্‌র বিশেষ বিশেষ গুণাবলীকে নিজের চরিত্রের অংশরূপে গ্রহণ করা তার সাধ্যে ও সামর্থে যতটা সম্ভব, এ জন্য তাই করতে থাকা।

আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী, সুবিজ্ঞানী-সুবিবেচক। অতএব মানুষকে চেষ্টা করতে হবে জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞান ও বিচার-বিচেনাকে পুরোপুরি উজ্জীবিত করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা দয়াবান, করুণাময়। মানুষকেও দয়া ও করুণার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ধনবান, দানশীল— মানুষকেও তাই হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বেশি ধৈর্যবান, সহিষ্ণু, অতএব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে আয়ত্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, অহংকারী, অতএব বান্দাকেও পরাক্রম প্রয়োগ করতে হবে আল্লাহদ্রোহী ও বাতিলপন্থীর বিরুদ্ধে, আত্মাভিমান রাখতে হবে হীন চরিত্রতা ও নীচ কাজ-কারবারের বিরুদ্ধে। আল্লাহ্ তা'আলা বিজয়ী দুর্জয় প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণ, অতএব মানুষকেও বিজয়ী দুর্জয় হতে হবে কাফের ও বাতিল মতাবলম্বীদের মুকাবিলায়। বিপর্যয়কারী জালিমদের বিরুদ্ধে হতে হবে প্রতিশোধ গ্রহণ প্রয়াসী। আল্লাহ তা'আলা শোকর গ্রহণকারী, ক্ষমাশীল, অতএব মানুষকেও হতে হবে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ, মার্জনা-প্রার্থীর প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ তা'আলা সদা সুদৃঢ় ঋজু পথে রয়েছেন। মানুষকেও এই পথ শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে, যেন কোনো মুহূর্তেও পথভ্রষ্ট হয়ে না পড়ে, বাঁকা-চোরা পথ যেন তাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণে পূর্ণতাপূর্ণ, সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত। মানুষের লক্ষ্যও নিবদ্ধ থাকতে হবে সব রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে থেকে সর্বগুণের পূর্ণত্ব লাভের দিকে।

বলা বাহুল্য, মানুষের করণীয় এই সব কাজই সে করবে নিজের সাধ্যানুযায়ী। তার সাধ্যের বাইরের কোনো জিনিস পাওয়ার বা পেতে চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে নয়। এ প্রেক্ষিতে বিবেচনার বিষয়, মানুষকে এর চাইতেও উন্নত, মহানতর কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দেশ দেয়া যায় কি ? আছে এর-ও বড় কোনো লক্ষ্য ? হতে পারে কিছু ? মানুষকে এ লক্ষ্য পানে চলতে বলে আল্লাহ তা'আলা

দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে এক অতীব উচ্চ ও বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। বিশ্বমানবতার প্রতি এই হচ্ছে ইসলামের বড় অবদান।

বৈষয়িক সামগ্রী ও চরিত্রের বিপদ

বস্তুত এ দুনিয়া এবং এ দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রী ও প্রতারক সব জিনিসই মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর বিপদের প্রধান কারণ। এ দুনিয়ার চাকচিক্য, স্ত্রীলোকের প্রতি লালসা, সন্তানের মায়া এবং স্তূপীকৃত ধন-মাল ও স্বর্ণ-রৌপ্য, নানা রকমের সুদর্শন যানবাহন, ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি মানুষকে লোভাতুর বানায়, আর মানুষ তা পাওয়ার জন্য পাগলের ন্যায় দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে।

দুনিয়ার প্রতি এই মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও আকর্ষণ হচ্ছে সর্বপ্রকার পাপের মূল উৎস। আর এই দিকে ঝুঁকে পড়া মানুষের ঈমান ও নৈতিকতা— উভয়ের পক্ষেই বড় মারাত্মক বিপদ। দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রী লাভের জন্যই ভাই ভাইকে বিক্রয় করে দিচ্ছে, পুত্র-পিতা বা ভাইকে হত্যা করছে; এ জন্যই মানুষ আমানতের খেয়ানত করছে, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে। এ কারণেই মানুষ জনগণের অধিকার হরণ করে নিচ্ছে, অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখছে, দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে। এ কারণে একজন মানুষ অপরজনের উপর হামলা চালাচ্ছে এবং জীবন-যাপন করছে জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর মতো কিংবা সমুদ্রের বড় বড় মাছের মতো। শক্তিশালী দুর্বলকে হেস্তনেস্ত করছে, বড় ছোটকে নির্মূল ও বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। দুনিয়ার লালসা ও প্রলোভনে পড়েই ব্যবসায়ীরা প্রতারণা করছে, খারাপ জিনিস দিয়ে ভালো জিনিসের দাম নিচ্ছে, মাপে কম দিচ্ছে, ভেজাল মিশাচ্ছে, ঠেকিয়ে বেশি মূল্য নিচ্ছে, কালোবাজারীর ও চোরা চালানির আশ্রয় নিচ্ছে। নেতৃস্থানীয় লোকেরা জনসাধারণের উপর জোর-জবরদস্তি চালাচ্ছে, অহংকারে ফেটে পড়ছে, বিচারকর্তারা অবিচার করছে, ঘুষ খাচ্ছে। ধনাঢ্যরা বিলাসিতা ও ব্যয় বাহুল্যের পর্বত রচনা করছে। দুর্বল মন-মানসিকতার লোকেরা কেবল এর জন্যই মুনাফিকী করে বেড়াচ্ছে।

এ দুনিয়ার স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর আলিম দ্বীনের মূল সত্য কথাকে গোপন করে রাখছে— প্রকাশ করে দিচ্ছে না। যা ভুল ও বাতিল বলে নিজে বিশ্বাস করে তাকে সমর্থন করে ফতোয়া জারি করছে। আদর্শহীন সাংবাদিকরা এ কারণেই মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রচার করছে এবং প্রকৃত সত্য-দিনের আলোর চাইতেও উজ্জ্বল সংবাদ গোপন করে যাচ্ছে। আত্যাচারী শাসকের ভ্রুকুটি, কুটিল কটাক্ষকে ভয় করে তার প্রশস্তি প্রচার ও মহিমা কীর্তন করছে। কবি-সাহিত্যিকরা মানব জীবনকে অধঃপাতে যাওয়ার জন্য রূপ ও যৌনতার প্রসার করছে।

দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই আজ এখানে রক্তপাত হচ্ছে, মানুষের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। ভালোকে মন্দ করা হচ্ছে। দ্বীন, মান-মর্যাদা, দেশ ও সুনাম-সুখ্যাতিকে বিক্রয় করে ফেলা হচ্ছে। এসব কিছুই করা হচ্ছে দুনিয়া— দুনিয়ার সামান্য নগণ্য স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে। কোনো নারীকে পাওয়ার জন্য, কোনো বাড়ি বা ভূখণ্ড দখলের জন্য। পানপাত্র নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করার পরিণতিতে আজ সারা দুনিয়ায় লংকাকাণ্ড নিত্য সংঘটিত হচ্ছে। সংঘাত সংঘটিত হচ্ছে ছোট-খাটো পদ, মাতব্বরী-সরদারী, কম বা বেশি পরিমাণ অর্থ ও ধন-সম্পদ লাভ করা বা দেশ-নেতার শুভ দৃষ্টিতে পড়ার মতলবে।

অবশ্য স্বীকার্য যে, জীবন-প্রেম ও আশাবাদও মানব-প্রকৃতির একটি অনিবার্য অংশ হিসাবে এসব ক্ষেত্রে কাজ করছে। আর তা-ই যদি না থাকত, তাহলে এ দুনিয়া কখনো আবাদ হতো না, জীবন বৃক্ষ হতো না শ্যামল-সবুজ শোভামণ্ডিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত। তাহলে মানুষের জন্য কামনা-বাসনা-লালসা চাকচিক্যময় ও সুষমামণ্ডিত করা যুক্তিবিরোধী নয় বলেই মনে হয়। আর সে কারণেই মানুষ কেবল দুনিয়ার প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে পড়ার আশঙ্কাটা এতটা তীব্র ও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ অবস্থায়ই মানুষের এই সংক্ষিপ্ত জীবনটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবার উপক্রম হচ্ছে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতে পারে এই দুনিয়া। আর এর পরিণতিতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে পারে পরকালকে, আল্লাহ্‌র সম্মুখবর্তী হওয়াকে এবং হাশরের ময়দানে অবশ্যই অনুষ্ঠিতব্য হিসাবে-নিকাশকে। মানুষ হয়ে যেতে পারে পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী— বেঈমান। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মানুষের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। তাই রাসূলে করীম (স) আমাদের এই দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন— যেন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে সদা-সর্বদা এই দো'আ করি এবং এই দো'আ অনুযায়ী আমাদের মন-মানসিকতাকে গড়েও তুলি ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا -

হে আল্লাহ! এই দুনিয়াটাকেই আমাদের চিন্তা-ভাবনার সবচেয়ে বড় ব্যাপার বানিয়ে দিও না এবং আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিধিও বানিও না এই দুনিয়াটিকে।

মানুষের জন্য দুনিয়ার ভাবনা-চিন্তা যে একান্তই জরুরী তা অস্বীকার করা হচ্ছে না কোনো মতেই। বরং বলা হচ্ছে কেবল দুনিয়ার ভাবনা-চিন্তাই মানুষের 'একমাত্র চিন্তা' হতে পারে না। হতে পারে না সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বড় চিন্তা।

বরং সেই সঙ্গে আরও একটি চিন্তা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকা উচিত, থাকা উচিত আরও একটি প্রেম, আরও একটি আশা-আকাঙ্ক্ষা। সেই প্রেমটিকে বৈষয়িক জীবনের প্রেমের তুলনায় অধিক বলিষ্ঠ হতে হবে, সেই আশাবাদকে হতে হবে সর্বাধিক রঙ্গীন এবং আকর্ষণীয়। সেই চিন্তাটিরই হওয়া উচিত সমস্ত চিন্তার মূল এবং আসল চিন্তাবিন্দু। সেই জিনিসটি হচ্ছে পরকালের প্রেম, পরকালে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাঁর সন্তোষ ও তাঁর কাছ থেকে সুবিপুল সওয়াব পাওয়ার বাসনাকে হতে হবে তীব্রতম, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হিসাবে-নিকাশ ও আযাব পাওয়ার ভয়টাকে হতে হবে তীব্রতর। এই প্রেম-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা ও ভয়-ভীতিই হচ্ছে মানুষের জন্য প্রধান রক্ষাকবচ। এ সবই মানুষকে দুনিয়া-প্রেম, দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রী ও সুখ-সুবিধালোভী এবং পুরোপুরি দুনিয়াবাদী হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, বিরত রাখে। মানুষকে নীতিবাদী ও আদর্শ চরিত্রবান বানায়। আর দুনিয়ার কামনা-বাসনার সমুদ্রে ডুবে যাওয়া এবং সেই দিকে অধিকতর অগ্রসর হয়ে যাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষাও করে এবং শান্তিও দান করে।

আর এই হচ্ছে ঈমানের অবদান। তা ঈমানদারের অন্তরে দৃঢ়মূল করে বসিয়ে দেয় পরকালের প্রতি প্রত্যয় ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সবকিছু পাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা। এই কারণেই কুরআন মজীদে মুমিন-মুহসিন-মুত্তাকি লোকদের গুণবর্ণনা ব্যপদেশে বলা হয়েছে ঃ

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ – (البقرة : ٤، النمل :٣، القمان : ٤)

এবং তারাই পরকালের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের অধিকারী।

এদেরই বিপরীত দিকে রয়েছে আল্লাহ্‌দ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا – وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا – (النبا : ٢٧-٢٨)

তারা তো কোনোরূপ হিসাবে-নিকাশ হওয়ার আশা পোষণ করত না এবং আমার আয়াতসমূহকে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে করে অবিশ্বাস করত।

পরকালের দৃশ্যাবলী অংকিত হয়েছে কুরআন মজীদে। একটি পর্যায়ে বলা হয়েছে, জান্নাতে বসবাসকারী মুমিনরা জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করছে ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ – قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ –
وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ – وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ – (المدثر : ٤٢-٤٦)

কোনো জিনিস তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে গেল ? ... তারা জবাবে বলবে ঃ আমরা নামায আদায়কারীদের মধ্যে ছিলাম না, মিসকীন গরীব লোকদের খাবার খাওয়াতাম না, আর সত্যের বিরুদ্ধে মনগড়া কথা রচনাকারীদের সঙ্গে মিলে আমরাও নানা কথা রচনা করার কাজে মশগুল হয়ে থাকতাম এবং বিচারের দিনকে আমরা মিথ্যা ঘোষণা করতাম।

ফিরাউন ও তার দলবলের মনোবৃত্তি ও অবস্থা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَايُرْجَعُوْنَ -

সে এবং তার সৈন্য-সামন্তরা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য ও অনধিকারভাবেই পৃথিবীতে অহংকার করল এবং তারা ধারণা করে বসেছিল যে, তারা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না। (সূরা ক্বাছাছ ঃ ৩৯)

তারা যদি সত্যিই অহংকারী না হয়ে আল্লাহ্র কাছে একদিন ফিরে যাওয়ার এবং তাঁর সমীপে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হওয়ার কথাটা মন-মানসে স্থান দিতে পারত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই সে সব অপকর্ম করতে পারত না, যা তারা জীবন ভর করে গেছে। কেননা তা ছিল অত্যন্ত অমানুষিক ও হীন আল্লাহদ্রোহিতামূলক কাজ— নির্মম অত্যাচার ও জুলুম নিপীড়নের কাজ। কোনো ঈমানদার— পরকালে বিশ্বাসী কোনো লোকই তেমন করতে পারে না।

বস্তুত আল্লাহ ও পরকাল-বিশ্বাসী মানুষেরাই পারে মনের লালসা ও দুনিয়াবী প্রেম দমন করতে, তার উপর জয়ী হতে। বৈষয়িক সুখ-সুবিধা-লোভের তীব্রতা হ্রাস করা এবং ঈমানের পরিপন্থী দুনিয়ার স্বার্থকে পদাঘাত করা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। আর এ রকম লোকই হযরত আলীর মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে পারে ঃ

হে দুনিয়ার স্বার্থ— দুনিয়ার সুখ-সুবিধা! হে শ্বেত, হে গৌর, আমার দিক থেকে দূরে সরে দাঁড়াও। তুমি কেন আমার পায়ের বেড়ি হতে চাও, কেন আমাকে আকৃষ্ট ও প্রলোভিত করতে চেষ্টা করছ ? আমি তো তোমাকে তিন তালাক বায়েন দিয়েছি, তোমাকে ফিরিয়ে নেয়ার আমার কোনো ইচ্ছা বা সুযোগই অবশিষ্ট নেই।

নবী করীম (স) একদিন একটা শক্ত ভাঙা চাটাইয়ের উপর খালিগায়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর গায়ে-পিঠে সে চাটাইর চিহ্ন বসে গিয়েছিল। হযরত উমর ফারুক (রা) এ সময় তা দেখে বললেন ঃ ইয়া রাসূল—

لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا اَوْثَرَ مِنْ هٰذَا -

আপনি যদি এর চাইতে ভালো মোলায়েম একটা শয্যা গ্রহণ করতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো ?

এ কথা শুনে নবী করীম (স) বলে উঠলেন ঃ

مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا-مَامَثَلِىْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا اِلَّاكَرَاكِبٍ سَارٍ فِىْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا - (مسند احمد، ابن حبان، بيهقى)

এ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক। এ দুনিয়ার কতটা আমার দরকার ? আমি ও এই দুনিয়া— ঠিক এমন যেমন এক অশ্বারোহী পথিক গ্রীষ্মকালের একদিনে বহু দূরের যাত্রাপথে পথিপার্শ্বস্থ একটি বৃক্ষের ছায়াতলে ঘণ্টাখানেক সময় আশ্রয় নিল, তার পর উঠে গাছটিকে অমনি রেখে সে রওয়ানা হয়ে চলে গেল।

বস্তুত এরূপ কথা তো কেবল সে লোকই বলতে পারে, যার হৃদয় মনে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

ঈমান একাই মুমিনের জীবনে এ দুনিয়ার চাইতেও অনেক বড়, অনেক মহান ও উচ্চতর একটি লক্ষ্য উপস্থাপিত করে, তাকে জ্বাজ্জ্বল্যমান করে দেয়। আর মুমিন সবকিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কেবল সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

ঈমান এমন একটা শক্তি, যা ঈমানদারকে দুনিয়াবী সর্বপ্রকার প্রলোভন ও আকর্ষণকে দমন করার শক্তি দান করে। সে দুনিয়ার মালিক হয়ে বসে, কিন্তু দুনিয়া তার মালিক হতে পারে না। সে দুনিয়াকে জয় করে, দুনিয়া তাকে জয় করতে পারে না। দুনিয়ার ধন-সম্পদে তার দুই মুঠি ভরপুর হয়ে ওঠে; কিন্তু তার হৃদয়-মনে তা একবিন্দু স্থানও দখল করতে পারে না। আর তা হয় এজন্য যে, সে দুনিয়ায় বসবাস করে দূরযাত্রীর মানসিকতা নিয়ে। সে যেন মুসাফির কিংবা পথ অতিক্রমকারী মাত্র। আর এ মনোভাব ও মানসিকতা নিয়ে যে-লোক দুনিয়ায় বাস করে, সে যদি বিপুল ধন-সম্পদেরও অধিকারী হয়, তবু তাতে কোনো আশংকার কারণ ঘটে না। কেননা সে দুনিয়ায় বাস করে পরকাল যাত্রার মনোভাব নিয়ে। সে এখানে চলাফেরা করে, তার দুপা পড়ে এই ধরিত্রীর মাটির উপর একথা সত্য; কিন্তু তখনো তার অন্তর পৌঁছে গেছে পরকালের দূর নীলিমায়।

কেবলমাত্র মুমিনই এই প্রত্যয় পোষণ করে যে, আল্লাহ্ কাছে এই জগতটার ওজন মাছির পক্ষাগ্রভাগের চাইতেও কম। আসলে এ দুনিয়াটা পরকালীন

চিরস্থায়ী জীবনের পর্যায়ে পার হয়ে যাওয়ার একটা সিঁড়ি মাত্র। আর আল্লাহ্কে ভয় করে মাত্র দুরাক'আত নামায আদায় করা হলেও তা সারা দুনিয়া ও দুনিয়াবী যাবতীয় ধন-মাল অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। জান্নাতে পা রাখার জায়গাটুকুর মূল্যও দুনিয়া ও দুনিয়াবী যাবতীয় ঐশ্বর্যের তুলনায় অনেক বেশি। আল্লাহ্র নবী-রাসূল ও ওলিগণ দুনিয়া নিপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত এবং নিতান্তই দারিদ্র্যবস্থায় জীবন-যাপন করে গেছেন, আর আল্লাহ্ ও তাঁর নবী-রাসূল ওলিগণের শত্রুরা, কাফেররা, নাস্তিকরা বিপুল প্রাচুর্য ও সুখ-সম্ভোগের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে ও করেছে— ঈমানদার লোকদের জন্য এই কথাটা জেনে নেয়াই একটা অতিবড় সান্ত্বনার কারণ ঃ

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ - وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ - وَزُخْرُفًا ط وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

সমস্ত মানুষ একই পথের পন্থী হয়ে যাবে এই আশঙ্কাটাই যদি না হতো, তাহলে পরম দয়াবান আল্লাহ্র সাথে কুফরকারীদের ঘরসমূহের ছাদ এবং সে ঘরের সিঁড়িগুলো— যা দিয়ে তারা নিজেদের উপরতলায় আরোহণ করে এবং সে ঘরের দরজা-জানালা আর সে ঘরের পালংক— যার উপর তারা তাকিয়া লাগিয়ে ঠেশ দিয়ে বসে— এ-সবই স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে বানিয়ে দিতাম। প্রকৃতপক্ষে এ সবই বৈষয়িক জীবনের দ্রব্য-সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল তোমার আল্লাহ্র কাছে কেবলমাত্র মুত্তাকীন লোকদের জন্যই। (যুখরুফ ঃ৩৩-৩৫)

কিন্তু এ কথার অর্থ কখনোই এই নয় যে, মুমিন জীবন-সংগ্রাম থেকে বিরত থাকবে, জীবনের কাজ-কাম ও দায়িত্ব-কর্তব্য কিছুই পালন করবে না। নিজেকে বঞ্চিত রাখবে দুনিয়ার পবিত্র জিনিসের ও স্বাধ-আস্বাদন থেকে এবং দুনিয়াটাকে কাফের-ফাজের লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা হুজরানশীন এবং দুনিয়া-ত্যাগী হয়ে জংগলে চলে যাবে।

কক্ষনোই নয়। মুমিনরা তো বরং দুনিয়াকে আবাদ করার জন্য আদিষ্ট। দুনিয়ার উন্নতি-উৎকর্ষ সাধনের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের। পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে, পরতে পরতে চলে-ফিরে আল্লাহ্র রিযিক সন্ধান ও পবিত্র জিনিসমূহ গ্রহণ এবং দুনিয়ার প্রাকৃতিক শক্তি ও উপকরণসমূহের উপর তার দায়িত্ব পালন ও আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপক বাস্তবায়ন ও রূপায়ণের কাজে নিয়োগ করবে— এই হলো তাদের প্রতি আল্লাহ্র স্পষ্ট হুকুম। তাদের প্রতি এও

নির্দেশ যে, তারা যেখানেই থাকবে, সরদার ও নেতা হয়ে থাকবে, নগণ্য ও দাসানুদাস হয়ে থাকবে না।

দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রী উপেক্ষা করা এবং মনের লালসা-বাসনা দমন করার অর্থ এই নয় যে, পাক-পবিত্র ও হালাল উত্তম দ্রব্যাদি গ্রহণ করা বুঝি মুমিনের জন্য হারাম। অথবা এ সবের কল্যাণ থেকে বুঝি নিজেদের বঞ্চিত রাখতে হবে; আর এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করা যাবে না— তা ভোগ ও ব্যবহার করা চলবে না। আসলে এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হলো, এই সব কিছুই তুমি গ্রহণ করো, ভোগ ও ব্যবহার করো। তবে সব সময়ই লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকতে হবে পরকালীন কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে। পরকালীন সার্বিক কল্যাণ লাভই হবে মুমিনের জীবন লক্ষ্য। মুমিন এমন কাজ করবে না, যার ফল ও ফসল কেবল দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এখানেই সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক— আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো লোকই এরূপ মনোভাব পোষণ করে না, করতে পারে না। কেননা কুরআন মজীদ এরূপ মনোভাবের লোকদের সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

طَغٰى-وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - (النّٰزِعٰت : ٣٧-٣٨)

সে আল্লাহ্‌দ্রোহিতা করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ - (النجم : ٢٩-٣٠)

অতএব হে নবী! যে ব্যক্তি আমাদের যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বৈষয়িক জীবন (সুখ-শান্তি ভোগ-সম্ভোগ) ছাড়া অন্য কোনো দিকেই যার ভ্রূক্ষেপ নেই, তাকে তার অবস্থাতেই থাকতে দাও। এদের জ্ঞান পরিধি ও সীমা এ পর্যন্তই।

পরকালের উপর লক্ষ্য নিবদ্ধকারী এবং পরকালীন কল্যাণ লাভকে চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গ্রহণকারী মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে এ দুনিয়াকে তার একটা উপায় বা মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা— চূড়ান্ত লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করা নয়। এ দুনিয়া একটা চলার পথ মাত্র। স্থিতি লাভ, অবস্থান ও পরিণতি গ্রহণের স্থান এটা নয়— এই হচ্ছে ঈমানদারের মনোভাব। কিন্তু যে লোক পরকালের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যেয়ের

অধিকারী নয়, দুনিয়া লাভে লোভ-লালসা ত্যাগ করা তার পক্ষে কঠিন— প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেননা উপস্থিত নিশ্চিত ভোগ-সম্ভোগ ত্যাগ করবে সে কোন কারণে, কিসের জন্যে ? এখনই যা পাচ্ছি তা যদি হাত পেতে না-ই নি, তাহলে কোন সুদূরের পরকালের এক অজানা-অচেনা জাগতে কি-পাব না-পাব তার নিশ্চয়তা কি আছে ? এ-ই হয় এ ধরনের লোকের মনস্তত্ত্ব।

ঈমান একটা প্রবল মহাপরাক্রম ও অনমনীয় দৃঢ় শক্তি। ভোগ-সম্ভোগের লিপ্সা, লোভ ও লালসা দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা কেবল এই ঈমানের পক্ষেই সম্ভব। নিত্যকার আদত-অভ্যাসের অক্টোপাশ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র এই ঈমানই। মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি তার মতো আর একটিও নেই এ জগতে।

আবেগের প্রভাব— ঈমানের প্রভাব

মানব-প্রকৃতি নিহিত আবেগ প্রবণতার একটা বিশেষ শক্তি রয়েছে, যা মানুষ শক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে পারে, একথা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে বলা হয় মানসিক প্রতিরোধ শক্তি। কিন্তু মুমিনের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হলো আবেগ-প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আর আবেগ নিয়ন্ত্রিত জীবনই যে প্রকৃত শান্তি-সুখ পূর্ণ ও আশঙ্কামুক্ত জীবন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষের যৌন আবেগ অন্যান্য সর্ব প্রকারের আবেগের তুলনায় প্রবল বিস্ফোরক ও বেগবান। এমন কি ফ্রয়েড এই যৌন আবেগের ভিত্তিতেই মানুষের সমস্ত সত্তা, প্রকৃতি ও তৎপরতার ব্যাখ্যা দান করে বসেছেন। কিন্তু এটা মানুষের নিতান্ত পাশবিক ও জান্তব ব্যাখ্যা, এ ব্যাখ্যায় মানব প্রকৃতি নিহিত অন্যান্য সমস্ত আবেগ ও প্রবণতাকেও যে বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে, উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা হয়েছে, তার মালাকুতি আত্মাকেও অস্বীকার করা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানবদেহে যৌবনের জোয়ার যখন আসতে শুরু করে তখনি এই আবেগটি প্রবল ও তীব্র হতে শুরু করে। তখন যৌবন হয় একটা প্রচণ্ড অগ্নিবলয়, তার পাশবিক বৃত্তি তখন অত্যন্ত প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করে। তার মনস্তাত্ত্বিক প্রাবল্যও তখন বৃদ্ধি পায়। আর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব সামান্য ও নগণ্য থাকে বলে এবং যৌবনজনিত কামনা-বাসনা-লালসা অধিকতর তীব্র হয় বলে যৌবন জোয়ারের সর্বগ্রাসী বেগ দমন করা তখন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তখন তার যৌন আবেগ যে-কোনো নারীর সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত

হওয়ার জন্য অন্ধভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে— সে যে-নারীই হোক এবং সেখানে যে ভাবেই তাকে পাওয়া সম্ভব হোক না কেন। কিন্তু এ কাজের পরিণিত কি হতে পারে, আইনের দৃষ্টিতে এ কাজ বৈধ বা সঙ্গত কিনা এবং লোকচক্ষুর দৃষ্টিতেই বা এ কাজটা কি রকম, সে সব বিচার-বিবেচনা করার অবসরও তখন থাকে না, আর ইচ্ছাও থাকে না।

এরূপ অবস্থায় একজন মানুষকে পাপের পিচ্ছিল পথে আছাড় খাওয়া থেকে কে রক্ষা করতে পারে ? পারে কেবলমাত্র মানুষের ঈমান। হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছিল। কুরআন মজীদে এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন যুবক। যৌবন জোয়ার তাঁর দেহের কানায় কানায় উপচে পড়ছিল যেন। পৌরুষ তার পূর্ণতাপ্রাপ্ত। যৌবনজনিত তেজস্বিতা ও বীর্যবত্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। এই সময় একজন অসামান্য রূপসী, সুন্দরী, উচ্চতর পদমর্যাদাসম্পন্ন নারী তাকে আকর্ষণ করে, আকুল আহবান জানায়। সে অন্য কেউ নয়, যার ঘরে তিনি ক্রীতদাস রূপে গৃহীত সেই ঘরেরই কর্ত্রী সে। নিবিড় একাকীত্ব বিরাজিত, গোপনীয়তা পুরোপুরিভাবে রক্ষিত, কক্ষের দ্বার রুদ্ধ, তৃষ্ণার্ত পথিকের সম্মুখে সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত সুমিষ্ট সুস্বাদু পানপাত্র সমুপস্থিত .... কুরআন মজীদে এই সময়কার দৃশ্য-চিত্র এ ভাষায় অংকিত হয়েছে ঃ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِیْ هُوَ فِیْ بَیْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابُ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ -

ইউসুফ যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সেই নারী নিজেই তার প্রতি আকৃষ্ট। দ্বারসমূহ বন্ধ। এই সময় বললে ঃ এসে যাও।

এ যে কতখানি সংকটপূর্ণ মুহূর্ত তা কল্পনা করা কঠিন নয়, এ সময় যে কোনো যৌন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই নিজেকে সংযত— বিরত রাখা সম্ভবপর হয় না, তা স্পষ্ট। কিন্তু না, হযরত ইউসুফ চট করে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করলেন এবং বলে উঠলেন ঃ

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْ اَحْسَنَ مَثْوَایَ - اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ -

না, আমি আল্লাহ্র পানাহ চাই, তিনিই আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তিনিই আমাকে অতীব উত্তম আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর জালিম লোকেরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

অতঃপর নারীটি কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না। তাঁকে আয়ত্তে আনার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তার সাধ্যানুযায়ী সমস্ত চেষ্টাই চালাতে থাকে।

তার যৌন হৃদয়াবেগে এ সময় যে বিস্ফোরণ অগ্ন্যুদগীরণ সূচিত হয়েছিল, তা প্রকট হয় তার নিজেরই কথা থেকে, যা সে নিমন্ত্রিত উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত মহিলাদের বৈঠকে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করেছিল ঃ

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ -

আসলে আমি নিজ থেকেই ওকে পেতে চেয়েছি— ও নারাজ; কিন্তু আমিই এ প্রস্তাব ওকে দিয়েছি ও এ-কাজে ওকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করেই চলেছে। ভবিষ্যতে সে যদি আমার নির্দেশ পরিপূর্ণ ও প্রতিপালনে প্রস্তুত না হয় তাহলে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ হতে হবে এবং সে অবশ্যই লাঞ্ছিত ও হীন প্রমাণিত হবে।

কিন্তু না, সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সব আহবান-আকর্ষণ, অনুরোধ-উপরোধ, কামনা-বাসনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল, কোনো কিছুই কাজে আসল না। হযরত ইউসুফ একমাত্র আল্লাহ্র দিকেই মুখ করে শক্ত অবিচল হয়ে থাকলেন। এই কঠিন বিপদ ও ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য ও সংরক্ষণ প্রার্থনা করলেন। নির্ভীক কণ্ঠে বললেন ঃ

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ -

হে আল্লাহ্, ওরা যে দিকে আমাকে আহবান করে, তার চাইতে জেলখানাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। হে আল্লাহ! তুমিই যদি ওদের ষড়যন্ত্র আমার দিক থেকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে না দাও, তাহলে আমি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং পরিণামে আমি জাহিলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।

পরিস্থিতিটি অনুধাবনীয়। এই দিকে মুমিনের মনস্তত্ত্ব, অপরদিকে পাপের প্রবল আকর্ষণ। এখানে পাপের আকর্ষণ পরাজিত ও পর্যুদস্ত হলো, আর ঈমান রক্ষা পেল— বিজয়ী হলো। হৃদয়াবেগ অভিব্যক্তি চায়। যদি তা দীর্ঘদিন অ-অভিব্যক্ত ও মুখ বন্ধ হয়ে থাকে, তবে তার বিস্ফোরিত হওয়ার আশঙ্কা তীব্র হয়ে ওঠা অতীব স্বাভাবিক। এ হচ্ছে সাধারণ অবস্থা। কিন্তু ঈমান যদি থাকে, তবে কেবল তার পক্ষেই সম্ভব এই আবেগের বিস্ফোরণ রুদ্ধ করা।

অপর দিকে স্ত্রী লোকটির অবস্থা কি ছিল ? সে ছিল এক উদ্ভিন্ন যৌবনা রাজ-রাণী। যে সময় স্বামী-সান্নিধ্য প্রতি-মুহূর্তে কাম্য, তখনই দীর্ঘদিন পর্যন্ত

তার স্বামী অনুপস্থিত— দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে স্বামী সান্নিধ্য বঞ্চিতা। বিরহ ও একাকীত্বের জ্বালা তাকে পাগল করে দিয়েছে, যৌন তৃপ্তির কামনা তার দেহের দুকূল ছাপিয়ে উঠে সকল প্রকার বাঁধ ভেঙ্গে অগ্রসর হওয়ার জন্য উন্মুখ। যৌবন জোয়ারের এ জলোচ্ছ্বাসকে রুখতে পারে কে ? পারে একমাত্র ঈমান। কিন্তু তার কাছে তা ছিল না। তাই তার বাঁধ ভেঙ্গে চারদিক প্লাবিত করে দিত নির্ঘাত — যদি মাঝখানে হযরত ইউসুফের দুর্ভেদ্য ঈমান-প্রাচীর দাঁড়িয়ে না যেত।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-কাটাকাটির প্রবণতা ও আবেগ মানুষের প্রকৃতিতে স্বভাবতই প্রবল। এ কালের লোকেরা তার নাম দিয়েছে ক্রোধ-শক্তি, কিংবা হিংস্র পাশবিক শক্তি। এই শক্তিই মানুষকে আঘাতের উপর আঘাত দিতে প্রবুদ্ধ করে, সবকিছু চুরমার করে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত করে। আসলে এ একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তা যখন জ্বলে ওঠে, তখন তা নেভাতে পারে কে ? পারে একমাত্র ঈমান। ঈমানই মুমিনকে ক্রোধ দমন করতে সক্ষম করে। যে তার উপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দিতে প্রবুদ্ধ করতে। যে তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে, তার প্রতি তাকে সহিষ্ণু বানায়, যে তার ক্ষতি করেছে, তার ক্ষতি না করে কল্যাণ করতেই চেষ্টা করায়। ক্রোধের তিক্ত বিষ পান করতে গিয়ে সে বোধ করে ক্ষমা-সহিষ্ণুতার মিষ্টতা, মাধুর্য এবং তা সে নিজের অন্তর থেকেই সিঞ্চন করে।

হযরত আদম (আ)-এর দুই পুত্রের বিবাদের কাহিনী কুরআন মজীদ বিবৃত করেছে ঃ

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ -

দুই ভাই একসঙ্গে কুরবানী দেয়। কিন্তু তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হয়; অপর জনের কুরবানী গ্রহণ করা হয় না।

আর এই ছিল দুই ভাইয়ের মাঝে বিরোধ-বিবাদের মূল কারণ। তখন দুষ্ট প্রকৃতির আদম-সন্তান অন্য জনকে সম্বোধন করে বললে ঃ لاقتلنك —আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। কিন্তু ঈমানদার নেককার সন্তান জবাবে বললে ঃ

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ - لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ - اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

মনে রেখো, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকী লোকদের কুরবানীই কবুল করেন। এখন সেজন্য তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার হস্ত প্রসারিত করো, তাহলেও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার হস্ত প্রসারিত

করব না। আমি তো আল্লাহ্কে ভয় করি, যিনি সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক।

এখানে স্পষ্ট, আল্লাহ্র ভয়ই মানুষের হস্তকে অত্যাচার জুলুম করা থেকে বিরত রাখছে। অন্য কিছুই নেই, যা মানুষকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهٗ وَمَنْ خَافَ اللّٰهَ لَمْ يَفْعَلْ مَا يُرِيْدُ وَلَوْ لَا الْقِيَامَةَ لَكَانَ غَيْرُ مَا تَرَوْنَ –

যে লোক আল্লাহ্কে ভয় করে, তার ক্রোধ কখনোই সীমালংঘন করে না। আর যে লোক আল্লাহ্কে ভয় পায় সে নিজে ইচ্ছামত কাজ কখনোই করে না। যদি কেয়ামত না হতো তাহলে এখন যা দেখতে পাচ্ছ, তার বিপরীত হতো সবকিছু।

একদিন এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সাথে কথা বলছিল। তার কথাই এমন ছিল যে, তাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি আমীরুল মুমিনীন। তাঁর মনে সহসা এই চিন্তা জাগ্রত হলো। তিনি নিজেকে সংযত করলেন। লোকটিকে তিনি বললেন, তুমি চেয়েছ, শয়তান আমাকে উত্তেজিত করুক এবং আমি আগামী কল্য (পরকালে) যা পাব, তা এখনি তোমার কাছ থেকে আদায় করে নিই। যাও, ওঠ, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। তোমার সাথে কথোপকথনের কোনো প্রয়োজন নেই আমার।

ঈমান দাম্ভিকতা দমন করে

মানব-প্রকৃতিতে অহংজ্ঞান বা আত্মপ্রেম যখন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন তা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। তখন সে করতে পারে না এমন কোনো জুলুম অত্যাচার অন্যায় কাজ নেই। আর তা মানুষের সব মানবিক সুকোমল ভাবধারাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নির্মূল করে দেয়। কত মানুষ আত্মপ্রেমের বশবর্তী হয়ে দুনিয়া ও দুনিয়াবী দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য প্রলোভিত হয়ে পড়ে এবং সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তখন মানুষ এমন সব জিনিস দাবি করে, যার উপর প্রকৃতপক্ষে তার কোনোই অধিকার নেই। আর অস্বীকার করে এমন সব অধিকার ও দায়িত্ব, যা যথাযথভাবে আদায় করা একান্তই কর্তব্য। এ অবস্থায় মানুষ নিতান্ত অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-মাল লুটে-পুটে নেয়। আর সংঘর্ষ দেখা দিলে সে যে-কোনো মূল্যে আর যে-কোনো উপায়ে সম্ভব নিজেকে বিজয়ী রাখতে বদ্ধপরিকর হয়।

কিন্তু এ সংঘর্ষের ময়দানে যদি ঈমান আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তা মানুষের ক্রোধের প্রচণ্ড আকারে জ্বলে উঠা আগুনকেও নিভিয়ে দিতে পারে। তখন আগুন হয়ে যায় তাপহীন, ঠাণ্ডা, শীতল, হিম এবং নিরাপদ। আত্ম-অংকারের উন্মাদনা তখন হয় প্রশমিত। তখন ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা বিদূরিত হয়। ত্যাগ ও তিতিক্ষা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তখন মানুষ হীন নগণ্য জিনিসের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে উন্নত মহান আদর্শ স্থানীয় জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নবী করীম (স)-এর বেগম হযরত উম্মে সালমা (রা) একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত কথার বাস্তব দৃষ্টান্ত সে ঘটনায় প্রকট। দুই ব্যক্তি মীরাসী সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কারো কাছেই কোনো অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য নেই। দুজনই শুধু বলছে এ আমার হক— আমি পাব। অপর জন তা অস্বীকার করে নিজের অধিকার ও পাওনার কথা বলে। শেষ পর্যন্ত দুজনই নবী করীম (স)-এর কাছে বিচার প্রার্থী হয়। এ সময় দু জনারই বুক অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় ভরপুর হয়েছিল। নবী করীম (স) দুজনারই কথা নীরবে শুনলেন এবং শেষে বললেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَّ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهٖ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضَىْ لَهٗ عَلٰى نَحْوِ اَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهٗ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ فَلَا يَاْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهٗ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ -

দেখ, আমি এজন মানুষ বটে, তোমরা তোমাদের বিবাদীয় বিষয়ে রায় দানের জন্য আমার কাছে এসেছ। তোমাদের একজন হয়ত অপর জনের তুলনায় অধিক বাকপটু এবং যুক্তি পেশ করার অধিক দক্ষতাসম্পন্ন। আমি যদি তার কথা শুনে সেই মত অনুযায়ী তার ভাইয়ের অধিকার তাকেই দিয়ে দেই, সে যেন তার একবিন্দু জিনিসও গ্রহণ না করে। কেননা আসলে জাহান্নামেরই একটা টুকরা তাকে দেয়া হবে।

বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় রাসূলে করীমের এই হৃদকম্প সৃষ্টিকারী কথাগুলো শুনতে পেল। তখন তাদের হৃদয়ে নিহিত ঈমানী ভাবধারা প্রবলভাবে জেগে উঠল। তাদের দুজনার হৃদয়ে আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় তীব্রভাবে জাগিয়ে দিল। ফলে দুজনই কাঁদতে শুরু করে দিল এবং প্রত্যেকেই অপর জনকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল ঃ 'আমার হক আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি নেব না।

তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِمَّا اِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتُوَخِّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَا -(ابوداود)

তোমরা যা করার তা যখন করেই ফেললে তখন তোমরা দুজনে পরস্পর ভাগ করে লও এবং প্রত্যেকের পাওনার পরিমাণ অনুমান করো। অতঃপর কোরয়া করো। অতঃপর তোমরা দুজন প্রত্যেকে অপরের প্রাপ্তকে হালাল করে দাও।

এখানে যা যা ঘটল, তার মূলে ঈমানই ছিল এমন জিনিস যা দুজনের হৃদয়-মন ও বিবেককে জাগ্রত করে দিয়েছিল। ঈমানই হলো চূড়ান্ত ফয়সালার মৌল কারণ ও ভিত্তি। বস্তুত যেখানে কোনো বিরোধীয় ও বিচার্য বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালার ব্যাপারে নিছক আইন অক্ষম ও ব্যর্থ হয়ে যায়, আর পক্ষদ্বয় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নিজের দাবিতে অবিচল থাকে ততক্ষণ কোনো বিচার মীমাংসা কার্যকর করাও কার্যত সম্ভব হয় না। কেননা দুজনার কারো কাছেই প্রমাণ নেই স্বীয় দাবির পক্ষে। সেখানে ঈমানই অতবড় একটা বিরোধীয় ব্যাপারকে মীমাংসা করে দিল এবং বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে যারপরনাই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঞ্চার হলো।

স্বয়ং নবী করীম (স) দুজন মুমিনের পারস্পরিক একটা ব্যাপার সংক্রান্ত কাহিনী সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করে। জমি ক্রয়কারী ব্যক্তি জমির দখল নিয়ে যখন খোদাইয়ের কাজ করল, তখন সে মাটি গর্ভে স্বর্ণ ভর্তি একটি পাত্র পেয়ে গেল। তখন ক্রয়কারী ব্যক্তি জমির পূর্ব মালিককে বলল ঃ "তোমার স্বর্ণ তুমি নিয়ে যাও। আমি তো তোমার কাছ থেকে জমি কিনেছি, স্বর্ণ নয়।"

জমির পূর্ব মালিক বলল, "আমি তোমার নিকট জমি ও জমির গর্ভস্থ সবকিছুই বিক্রয় করেছি। কাজেই তাতে তুমি স্বর্ণ পেয়ে থাকলে সেটা তোমারই হবে। আমার কি অধিকার থাকতে পারে তাতে ?"

তখন দুজনার মধ্যে যে বিতর্ক হয়, তার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার দিল একজন লোকের উপর। সে লোকটি সব কথা শুনে জিজ্ঞেস করলঃ

তোমাদের কি ছেলেমেয়ে আছে ?

একজন বলল, 'আমার একটি ছেলে আছে। আর অপরজন বললে, 'আমার একটি মেয়ে আছে। তখন বিচারক বলল, তাহলে মীমংসা খুবই সহজ। তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়ের পরস্পর বিয়ে দাও এবং তোমার তোমাদের নিজেদের উপরই এ সম্পদ ব্যয় ও হেবা করে দাও। (মুসলিম শরীফ)

ব্যাপারটি নেহাত ছেলেখেলা নয়। দুজনার সামনেই সোনার চাক পড়ে রয়েছে। একজন অপর জনকে নেবার জন্য সাধছে। একজন অপর জনের কথা

মেনে নিলেই সে নির্বিবাদে এই মহামূল্য সম্পদ পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু না, তারা তা করছে না। উপরন্তু যা পাওয়ার জন্য সমাজে নিত্য মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে, এরা দুজন তা করছে না। প্রত্যেকেই অপরজনকে বলছে ঃ ওটা তোমার, আমার নয়। অথচ সর্বকালের সমাজের চারদিকে কেবল চিৎকার হচ্ছে, এটা আমার, ওটা আমার ইত্যাদি।

অভ্যাস-স্বভাব ও ঈমান

বস্তুত মানবীয় হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ও সীমালংঘন প্রবণতাকে দমন করতে পারে কেবল ঈমান। ঈমানই তাকে সীমার মধ্যে রেখে তার দ্বারা যথাযথ ও যথার্থ কাজ আদায় করতে সক্ষম। তা-ই তাকে বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত রাখতে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতে পারে। এই শক্তিকে ব্যক্তি ও সমষ্ঠিগত কল্যাণে প্রয়োগ করাও কেবল ঈমানের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু মানুষ তো কেবল হৃদয়াবেগের নিকটই নতি স্বীকার করে না। মানুষকে আরও একটা জিনিস নিয়ন্ত্রিত করে, সে জিনিসের প্রবল আধিপত্য স্থাপিত থাকে মানুষের উপর। তা হচ্ছে মানুষের অভ্যাস, নিত্যকার স্বভাব। অভ্যাস ও স্বভাব অত্যন্ত প্রভাবশালী, মানুষ তার দাস হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

মানুষের অভ্যাস ও স্বভাব মানব প্রকৃতি ও প্রবণতাকে গড়ে ও নিয়ন্ত্রিত করে। এ প্রবণতার ডাক মানুষ উপেক্ষা করে চলতে পারে না। মানুষ সাধারণত তাই করে যা তার স্বভাব ও অভ্যাস। একটা কাজ মানুষ যখন একবারের পর দুবার, তিনবার, শতবার করে, দিনে পর দিন, মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে থাকে, তখন তা মানুষের স্নায়ুর সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন সে এমন কাজও করে যা তার মতো অন্য মানুষ করে না, তার সমাজ পরিবেশের মধ্যে হয়ত অন্য কেউ করে না। এবং তা সে করে এই অভ্যাস ও স্বভাবের কারণে। অতঃপর সে সেই কাজ করে— করতে থাকে অকুণ্ঠিতভাবে চিরাচরিত নিয়মে। এরূপ কাজ করার জন্য বিশেষ শিক্ষা বা সতর্কতার কোনো প্রয়োজন হয় না। আপনা-আপনি ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই কাজটা সুসম্পন্ন হতে থাকে। তখন অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তার বিপরীত কিছু করা কিংবা সে কাজ না করে অন্য কিছু করা হয়ে যায় অত্যন্ত কঠিন।

নৃতত্ত্ব বিশারদদের কেউ কেউ বলেছেন, মানুষ কতগুলো অভ্যাসের সমষ্টি এবং সেগুলো এই জীবনেই সদা সচল। রুশো বলেছেন, মানুষ জন্ম নেয় ও মরে নিতান্তই দাসানুদাস হিসাবে। জন্ম দিন থেকেই সে হয় দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী, আর মৃত্যুদিনে বন্দী হয় কাফন-বেষ্টনে। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কেবল আদত-অভ্যাস রশিতে বন্দী থাকে। অনুসরণ ও অনুকরণ শৃঙ্খলে থাকে বাঁধা।

প্রচীন কালের চিন্তাবিদরা বলতেন, 'অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব'। এর অর্থ হচ্ছে, অভ্যাসের একটা প্রবল শক্তি রয়েছে, যা তার 'প্রথম প্রকৃতির মতোই বদ্ধমূল, অনড় ও অপরিবর্তণীয় হয়ে থাকে।' আর 'প্রথম প্রকৃতি' বলতে বোঝায় তা, যে প্রকৃর্তির উপর মানুষ জন্মগ্রহণ করে, মানুষের সত্তাটা যে প্রকৃতি-সাজে ঢালাই করে তৈরী করা হয়েছে, তাই। এ দুনিয়ায় মানুষ বহু প্রকার অস্ত্র ও হাতিয়ার লয়ে জন্ম নিয়েছে। সেগুলো স্বতঃই কর্মোপযোগী, যথাযথ কর্ম সাধনে সমর্থ। চক্ষু দেখতে পারে, কান শুনতে পারে। পাকস্থলী হজমকার্য সম্পন্ন করতে পারে। এ ছাড়াও রয়েছে স্বভাবগত কতগুলো আবেগ পর্যায়ের ভাবধারা। এ সবই এমন যে, এগুলো নিয়েই আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েছি এবং বাপ দাদা, পূর্ব পুরুষ থেকে আমরা এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে গেছি। তাই এগুলো হচ্ছে আমাদের 'প্রথম প্রকৃতি' First Nature —মানুষের উপর এই 'প্রথম প্রকৃতি'র বিরাট আধিপত্য। যে 'অস্ত্র' যে কাজের জন্য সৃষ্ট, সে অস্ত্র দ্বারা সে কাজ করাই সম্ভব, অন্যটা নয়। কান দ্বারা দেখা যায় না, চোখ দ্বারা শোনা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ জন্মগ্রত প্রকৃতির অধীন। এই প্রকৃতিতে যা কিছু প্রবেশ করে— পরে এসে শামিল হয়, তা ভালো হোক, কি মন্দ, —তাকেই বলা হয় 'দ্বিতীয় প্রকৃতি'। আর এরই নাম অভ্যাস বা আদত। মানুষের উপরে এর আধিপত্যও অনুরূপভাবে প্রবল। আমরা জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য যে পথ অবলম্বন করি, জীবনে যে ধারা ও ধরন-ধারণ অনুসরণ করে চলি, যে অভ্যাসকে নিজের উপর চাপিয়ে নেই, আমাদের উপর তার যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি, তা প্রকৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তিস্বরূপ। অতএব বলা যায়, আমরা জন্মের পর প্রাথমিক কয়েকটি বছরকাল থাকি নিতান্তই স্বাধীন। তখন আমাদের অভ্যাস বলতে তেমন কিছু থাকে না এবং বিশেষ কোনো আদত-অভ্যাসেরও আধিপত্য স্থাপিত হয় না আমাদের উপর। কিন্তু পরে আমরা যখন বড় হই তখন পানাহার, পোশাক পরা ও খোলা, কথা বলা, সালাম দেওয়া, পদচারণা করা, পারস্পরিক লেন-দেন ও সম্পর্ক রক্ষা করা পর্যায়ে একশটি কাজের মধ্যে প্রায় নব্বইটাই আমাদের নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন এ কাজগুলো আমরা কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা বা পূর্ব চেতনা বা মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই করি, করি এমন ভাবে যে, তার বিপরীতটা কিংবা তা ছাড়া অন্যটা করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জীবনের প্রথম পর্যায়ে আমরা যে আদত-অভ্যাস বানিয়ে নেই, পরবর্তীকালে আমাদের জীবনটা তারই পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়ে যায়।

ব্যক্তি হোক কি সমষ্টি, সমস্ত মানুষের আদত-অভ্যাস সম্পর্কে এই কথা চূড়ান্ত। তাই এ আদত-অভ্যাসগুলো যদি ভালো হয়, তাহলে মানুষ তদ্দরুন সৌভাগ্যবান হতে পারে। আর সেগুলো যদি মন্দ হয়, হীন ও ঘৃণ্য ধরনের হয়,

তাহলে তা-ই হয় মানুষের চরম দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার কারণ। তখন সে তার নিজের দেহ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিনিস খায়, পান করে, —জেনে শুনেও এমন জিনিস পান করে, যা তার স্বাভাবিক সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এমন পোশাক পরে তা যেমন আঁটসাট, শ্বাস রুদ্ধকর, তেমনি বিশ্রী অশ্লীল। তখন সে এমন সব কাজ করে, যা তাকে পদে পদে লাঞ্ছিত অবমানিত করে। আর তা হয় নিতান্তই বদ-অভ্যাসের কারণে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির অবলুপ্তি ঘটার দরুন। এ কথার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণের জন্য খুব বেশি যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার আবশ্যক করে না। মদ্য ও মাদক দ্রব্যাদি পান করা, তিক্ত বিষাক্ত জিনিস ভক্ষণ করা, জুয়া ও যাদু খেলার যেসব ঘটনাবলী নিত্য দিন আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করি, তা কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

ঈমানের আধিপত্য অধিক প্রবল

মানব চরিত্রের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তারকারী বদ-অভ্যাসগুলোর নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও তা নির্মূল সাধনে প্রবল যুদ্ধাভিযান শুরু করা একান্তই আবশ্যক। এ বিদ্রোহ হবে সর্বাত্মক, এ যুদ্ধ ক্ষমাহীন ও নিরবচ্ছিন্ন। আর এ কাজে প্রবল ইচ্ছা ও সুদৃঢ় সংকল্প-শক্তিই একমাত্র শাণিত ও কার্যকর হাতিয়ার। কেবলমাত্র ইস্পাত-কঠিন দৃঢ় সংকল্পই এ যুদ্ধে বিজয় সুচিত করতে পারে, যা নড়বড়েও হবে না, দুর্বল দ্রবীভূতও হবে না। এ প্রচেষ্টা চালাতে থাকতে হবে ক্রমাগতভাবে। কোনোরূপ নৈরাশ্য, হতাশা, কুণ্ঠা বা ইতস্তত মানসিকতার একবিন্দু স্থানও এখানে থাকতে দেয়া যেতে পারে না।

ব্যক্তি ও সমাজের বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অদৃশ্য বদ অভ্যাস ও ক্ষতিকর স্বভাব-প্রকৃতির দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তিলাভের এই হচ্ছে একমাত্র পথ। নির্দয় কৃচ্ছ্র সাধনা ও উৎপীড়নমূলক আইন বিধান নিজের উপর চাপিয়ে দিলেই এই অভ্যাস থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি সম্ভব হবে মনে করাও মারাত্মক ভুল। অতীতে ও বর্তমানে এ ধরনের বহু কৃচ্ছ্র সাধনা ও নিপীড়ক আইন-কানুন আমরা বিভিন্ন সমাজে চালু হতে দেখেছি, ও এখন দেখছি, কিন্তু তা সবই আদত ও অভ্যাসের পরাক্রমের নিকট পরাজয় ও ব্যর্থতা বরণ করছে— সে দৃশ্যও আমাদের চোখ এড়াতে পারেনি। তাহলে সে দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছা কি এমন হতে পারে, যা আমাদেরকে এ ধরনের আদত-অভ্যাসের শৃংখল থেকে মুক্তি দিতে পারে? হ্যাঁ তা হচ্ছে একমাত্র ঈমান— ঈমান ছাড়া আর কিছু নয়। এই ঈমানই আমাদের ইচ্ছা ও সংকল্পকে সুসংবদ্ধ, সুসংহত ও প্রবলতর বানাতে পারে, তা মানবীয় প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, প্রচণ্ড বিরোধী শক্তির সাথে মুকাবিলা

করাও এই ঈমানী শক্তির পক্ষেই সম্ভব। বদ আদত-অভ্যাস ও অন্ধ অনুসরণ অনুকরণ প্রবৃত্তি কেবল ঈমানের সম্মুখেই হতে পারে পদানত, অনুগত ও বিনীত।

একই বিষয়ে দুটি দৃষ্টান্ত

প্রচণ্ড প্রতিষ্ঠিত আদত-অভ্যাস পরিবর্তন করা এবং মানব মনকে মঙ্গলময় কাজের প্রশিক্ষণ দান— তা যতই কষ্টকর হোক, অন্যায় ও খারাপ কাজের অভ্যাস পরিহার— তা যতই প্রিয় মনোমুগ্ধকর ও অভ্যাসগত হোক, এসব ক্ষেত্রে ঈমানের যে প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। এ পর্যায়ে একই সমস্যার সমাধানে দুটি পদক্ষেপের কার্যকরতা দর্শনীয়। একটি পদক্ষেপ একালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আর একটি পদক্ষেপ প্রাচীনকালের ইতিহাসে বিধৃত। এ সমস্যার সমাধানে ঈমানী শক্তি সম্পন্ন লোকেরাই বা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, আর ঈমানী শক্তি বঞ্চিত কেবলমাত্র রাষ্ট্রশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই বা কি পদক্ষেপ নিয়েছে, তুলনামূলকভাবে তার অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক।

একালের ঘটনাটি আমেরিকার। মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও মদ্য পান সেখানে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মদ্য পান করে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতে শুরু করে। জনগণের স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হতে খারাপতর হতে শুরু হয়। তা দেখে সরকার গোটা জাতির আসন্ন ধ্বংসের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সরকার মদ্যপান নিষিদ্ধ করে আইন জারী করে। সারা দেশে তার ব্যাপক প্রচার কার্য চালানো হয়। আর তাতে ব্যয় করা হয় কোটি কোটি ডলার। সরকার আইন জারী হওয়ার পর প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তা গোপনীয় পথে পূর্বাপেক্ষাও ব্যাপক ও মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার স্পষ্টত বুঝতে পারে, সে আইন কার্যকর করতে অক্ষম। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের লোকের তো দূরের কথা, আইন রচয়িতা কংগ্রেস সদস্যরাও গোপনে মদ্য পানে লিপ্ত রয়েছে। পূর্বে প্রকাশ্যভাবে অপেক্ষাকৃত ভালো মদ্য তৈরী হতো, আর এক্ষণে গোপন কারখানাসমূহে অত্যন্ত মারাত্মক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক ক্ষতিকর মদ্য তৈরী ও পূর্বাপেক্ষা অধিক বেশি মূল্যে তা ঘরে ঘরে বিক্রয় হতে শুরু করেছে। মদ্য উৎপাদন, মদ্য ব্যবসা ও মদ্যপান গোটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। লক্ষণীয় হচ্ছে, সরকার মদ্য পানের ন্যায় একটা মারাত্মক কাজ থেকে জাতিকে বিরত রাখার জন্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপরই নির্ভর করেছিল। একথা সত্য যে, এ আইনটি একটি গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ নির্বাচিত স্বাধীন পার্লামেন্টে জনমতের ভিত্তিতে পাস হয়েছিল। পার্লামেন্টই এ সমাজে যে-কোনো ধরনের আইন পাস করার অধিকারী। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিচারেও একথা প্রমাণিত যে,

মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চরিত্রকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও বিনষ্ট করে দেয় এবং তা মানব সভ্যতারও পরিপন্থী। এসব কথাই সকলের জানা। তদুপরি সরকার আইন রচনা করে প্রচারাভিযান চালায়। তাতে ৬০ মিলিয়ন ডলারেরও (৬০,০০০,০০০) অধিক ব্যয় করা হয়। প্রচার পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ মিলিয়নকেও ছাড়িয়ে যায়। আর আইন কার্যকরণে ব্যয় করা হয় ২ শত ৫০ মিলিয়নেরও অধিক। মদ্য পানের অপরাধে ৩০০ শত জনকে ফাঁসী দেয়া হয়। ৫,৩২,৩৩৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। আর জরিমানা স্বরূপ আদায় করা হয় ১৬ মিলিয়ন মুদ্রা, এবং ৪ শত মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু এসব ব্যয়ও আমেরিকা জাতিকে মদ্যাসক্তি ও মদ্যপানের নিকৃষ্টতম অভ্যাস শৃংখল থেকে মুক্ত করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ১৪টি বছর পর (১৯১৯-১৯৩৩ সন পর্যন্ত) মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ আইনটিকে প্রত্যাহার করতে সরকার বাধ্য হয়। অতঃপর সমগ্র আমেরিকায় মদ্যপান সম্পূর্ণ আইনসম্মত হয়ে যায়।

মানব রচিত আইনের এই ব্যর্থতা দুনিয়ার মানুষের জন্য চিরকালের তরে শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকল। আইন অচল হয়ে গেল, রাষ্ট্র সরকার তার রচিত আইন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু আমেরিকার জনগণকে মদ্যপানের ন্যায় নিকৃষ্টতম অভ্যাস থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর হলো না। মানুষের সাধারণ যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি যে জিনিসটির মারাত্মকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ, সেই মানুষের আদত-অভ্যাস তা জেনে নিতে ও অনুরূপ কাজ করার ইচ্ছা জাগাতে সম্পূর্ণ অপারগ প্রমাণিত হলো। বস্তুত উচ্চ আদর্শ ও মহান লক্ষ্যের কথা কেবল জেনে নেয়াই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা গ্রহণ করার দৃঢ় ইচ্ছা ও অটুট সংকল্প এবং সেই অনুযায়ী নিজের মন-মগজকে পুরোপুরি প্রস্তুত করা একান্তই আবশ্যক। নতুবা সে লক্ষ্য আদর্শ কোনো দিন-ই মানব জীবনে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত হবে না।

এ হলো একটি দৃষ্টান্ত

এ পর্যায়ের আর একটি দৃষ্টান্ত ইসলামী ইতিহাসে বিধৃত। হযরত মুহাম্মদ (স) যখন শেষ রাসূল হিসাবে মনোনীত হলেন, তখন আরব সমাজ মদ্যপানে ভয়ানকভাবে অভ্যস্ত ছিল। তাদের দেহের শিরায় শিরায় রক্ত নয়— রঙ্গীন সুরা প্রবহমান ছিল। তারা ছিল সেজন্য প্রায় পাগল। রঙ্গীন পানীয়ের প্রশংসায় তারা ছিল পঞ্চমুখ। তাদের কাব্য ঝংকৃত হতো তার গুণপনা বর্ণনায়। তা ছিল যে তাদের রূপসী প্রেয়সী, সর্বাধিক প্রিয়তমা বস্তু। তাদের গড়া সমাজ ও বৈঠক-মহফিলে চলত রঙ্গিন সুরার প্রবাহ, বার বারের আবর্তন। এ মদ্যপায়ী সমাজের একজন মদ্যপাগল কবির একটি কবিতা ছিল এই ঃ

اِذَا مِتُّ فَادْفِنِّيْ اِلٰى جَنْبِ كَرْمَةٍ تُرَوِّيْ عِظَامِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ عُرُوْقُهَا -

আমি যখন মরে যাব, তোমরা আমাকে দাফন করবে মদ্যপাত্রের নিকটে। যেন তা আমার মৃত্যুর পর আমার বিশুষ্ক ধমনীসমূহ সিক্ত করে রাখতে পারে।

বিখ্যাত কবি ইমরাউল কাইস যখন তার পিতার নিহত হওয়ার খবর পেল, তখন তার হাতে ধরা ছিল রঙ্গিন সুরা ভরা পাত্র। কিন্তু এ সংবাদও তার হাত থেকে পান পাত্রটি বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। সে ছিল তার পানসঙ্গীদের মজলিসে মাতোয়ারা। তখন তার মুখে একটি কথাই শুধু উচ্চারিত হলো ঃ

اَلْيَوْمَ خَمْرٌ وَغَدًا اَمْرٌ -

আজকের দিন হচ্ছে কলিজা ভিজিয়ে মদ্যপান করার দিন।

আর আগামীকাল দেখা যাবে, এজন্য কি করা যায়।

আরব কবি-সাহিত্যিকরা সুরা পানে যে কথটা আসক্ত ছিল তা বোঝা যায় এ থেকে যে, তারা জিনিসটির একশ'রও বেশি নামকরণ করেছে।

তাদের মদ্যাসক্তির এটাও একটা প্রমাণ যে, বহু সংখ্যক সাহাবী কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত দুটি আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মদ্যপান ত্যাগ করতে পারেন নি।

একটি আয়াত ঃ

قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

বলো, মদ্যপান ও জুয়া খেলায় অতিবড় গুনাহ, অবশ্য লোকদের জন্য কিছুটা ফায়দাও আছে।

এ হলো এ পর্যায়ের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পর দ্বিতীয় অবতীর্ণ আয়াতটি হলো ঃ

لَاتَقْرَبُوْا لصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى -

তোমরা মদ্যপানে মাতাল হয়ে নামাযের নিকটেও যেও না।

কিন্তু এ দুটো আয়াতও মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায় নি। এরপরও বহু লোক মদ্যপানে লিপ্ত ছিল। মুমিন-মুসলমানগণ নামাযের সময় এড়িয়ে মদ্যপানের মজলিস বসাতে শুরু করল এবং কুরআনের আয়াতে নিষেধ-আওতা লংঘন থেকে নিজেদের বিরত রাখতে থাকল। হ্যাঁ, কুরআনের আয়াত এ পর্যন্ত

তাদের এ সুযোগ দিয়েছিল। কেননা কুরআনের মদ্যপান নিষেধ আইন প্রবর্তন গ্রহণ করা হয়েছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। আর তা হলো ক্রমিক নিয়ম। হঠাৎ করে একটা আইন নাযিল করে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার মতো অবৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করা হয়নি। ইসলামে আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তনে যে জনগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি পোষণ ও সহজতা বিধান করা হয়, এটা তারই অকাট্য প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত নিষেধ আইন প্রবর্তন করা হয় এ আয়াত দ্বারাঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

মদ্য-মাদকতা, জুয়া, উৎসর্গ স্থান ও ফাল লওয়ার নিয়ম শয়তানী কাজের অত্যন্ত নিকৃষ্ট মালিন্য, অতএব তোমরা এর প্রত্যেকটি কাজ পরিহার করো। তাহলে আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে।

এরই পরবর্তী আয়াতে এই নিষেধের কারণ বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ -

মদ্যপান ও জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতো এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক স্মরণ ও নিয়মিত নামায পড়া থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট। কাজেই তোমরা কি এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে ?

মদ্যপান চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার এ সুস্পষ্ট ঘোষণা অবতীর্ণ হওয়ার পর ঈমানদার মুসলিম সমাজে কি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ? সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। কেউ তার হাতে ধরা উচ্ছ্বসিত পান পাত্র দূরে নিক্ষেপ করে দিচ্ছে, কেউ বড় পাত্র থেকে ছোট পাত্রে তুলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে, কেউ মুখের কাছে ধরা ও চুমুক দিতে উদ্যত হয়েও পানপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে দিচ্ছে, কেউ মদ্য ভর্তি মটকা ভেঙ্গে অলিতে-গলিতে মদ্যের স্রোত প্রবাহিত করে দিচ্ছে, আর যারা মদ্যপান করে পেট ভর্তি করে নিয়েছিল, তারা গলায় আংগুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে দিচ্ছে। সে এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূলে করীম (স) একটা ভাষণ দিলেন। বললেন, হে জনগণ! আল্লাহ তা'আলা মদ্যপান ঘৃণা ও অপছন্দ

করেন। সম্ভবত খুব শিগগিরই এ পর্যায়ে নিষেধ বাণী অবতীর্ণ হবে, কাজেই এখানো সময় আছে। যার নিকট যতটা আছে সব বিক্রয় করে ফেল এবং অন্য কোনো কাজে লাগাও। আবু সাঈদ (রা) বলেন ঃ অতঃপর অল্প কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একদিন বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা চূড়ান্তভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন কারো কাছে মদ্য থাকলে তা পানও করতে পারবে না, বিক্রয়ও করতে পারবে না। একথা শোনা মাত্রই লোকেরা চলে গিয়ে নিজের নিজের সুরাপাত্র ও ভাণ্ডারসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। (মুসলিম)

হযরত আনাস বলেন, একটা মসলিসে বসে আমি আবূ উবায়দাহ্ ও উবাই ইবনে কাবকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। এমনি সময় সেখানে একজন লোক এসে জানাল, মদ্যপান চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তক্ষুনি মজলিসে উপবিষ্ট আবু তালাহ্ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাও আনাস! এখনি এই সব বাইরে ফেলে দাও। আমি উঠে সমস্ত মদ্য বাইরে ফেলে দিলাম।

(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারী বলেন, আমরা বসে বসে কয়েকজন মিলে মদ্যপান করছিলাম। তখনো তা হারাম হয়নি বলে আমরা হালাল মনে করেই তা নিয়ে জমে বসেছিলাম। পরে আমি উঠে নবী করীমের সমীপে উপস্থিত হলাম। ইতিমধ্যেই মদ্যপান হারামের আয়াত নাযিল হয়েছিল। আমি তা শুনেই ফিরে এলাম সেই মজলিসে এবং তাদের আয়াতটি পড়ে শুনিয়ে দিলাম। তখন অবস্থা এই ছিল যে, কিছু লোক মদ্যপানে রত ছিল, কিছু পান করেছিল, কিন্তু এখনো পাত্রে অবশিষ্ট ছিল। তখন এই আয়াত শুনেই তারা সকলে সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করে দিল এবং সকলেই বলে উঠলঃ হে আল্লাহ! আমরা বিরত হলাম, আমরা বিরত হলাম।

মন ও মানসিকতার উপর কতটা প্রবল আধিপত্য থাকলে আবহমান কালের এমন একটি আসক্তি ও অভ্যাসকে এমনিভাবে নিমেষের মধ্যে পরিত্যাগ করা যায়, তা কি বাস্তবিকই বিবেচনার বিষয় নয় ? এমনতর ঘটনা দুনিয়ার কোনো সমাজেই আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে কেউ দাবি করতে পারে কি ?

মন-মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্র

মানব-মনের গভীরতম কন্দরে একটা গোপন ও প্রবলতর শক্তি নিহিত রয়েছে। সে শক্তিটি বাহ্যিকভাবে কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না। দেহ-বিজ্ঞানের আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেও তা ধরা পড়েনি। সে একটা অন্তর্নিহিত শক্তি।

মানুষ তা নিজে নিজেই অনুভব করতে পারে এবং মানব জীবনে তা এমন আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করে, যার ফলে সমস্ত জীবন-পথ উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তা মানুষকে কল্যাণময় কাজের দিকে এমন তীব্রভাবে টেনে নিয়ে যায়, যেমন চুম্বক টানে সাধারণ ধাতুকে এবং দিগদর্শন কাঁটা সব সময়ই ছুটে যায় উত্তর মুখে। তাই মানুষকে বিরত করে ও ফিরিয়ে রাখে সমস্ত অন্যায় পাপ ও নাফরমানীর কাজ থেকে, যেমন করে বাড়ির মালিকের হাঁকডাক চোরকে বিরত রাখে চুরিকার্য থেকে। অন্য দৃষ্টিতে তা হচ্ছে মানুষের শিক্ষা গুরু। শিক্ষক যেমন ছাত্রকে যাবতীয় শুভ ও কল্যাণময় পথে চালাবার জন্যই ছাত্রদের উপদেশ দেয়, এও ঠিক তাই করে। কেউ যদি এ শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে, কিংবা এ শক্তি যে কাজকে ভয় করে তা-ই যদি কেউ অবলম্বন করে, তাহলে এই শক্তি সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয় পক্ষে কিংবা বিপক্ষে। ফয়সালা করে মানুষের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততাকে সামনে রেখে তার পক্ষে। কিন্তু অনুতাপ-অনুশোচনা, দুঃখ-কষ্ঠ ও আযাব যে পথে, তার বিপরীত দিকেই তার ফয়সালা প্রকাশ পায়।

এ শক্তি যেমন সৎপথ প্রদর্শনকারী, বিপদ মুক্তিদাতা, তেমনি ন্যায়ের আদেশদাতা ও অন্যায়ের নিষেধকর্তা। এ শক্তি যেমন খারাপ পরিণতির জন্য মানুষকে সতর্ক করে, তেমনি ভালো পরিণতিপূর্ণ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এ শক্তি যেমন হুকুমদাতা, তেমনি কার্যনির্বাহী। নীতি বিজ্ঞানীরা এ শক্তির নাম দিয়েছে বিবেক। কেউ কেউ বলেছেন, নীতিবোধ বা চৈতন্য আর ইসলাম এর নাম দিয়েছে الْقَلْبِ। —মন, হৃদয়, অন্তর।

একজন লোক রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ পুণ্য ও সুনীতি কি ? পাপ ও দুর্নীতি কি ? জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اَلْبِرُّ مَاسَكَنَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَانَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْاِثْمَ مَالَمْ تَسْكُنْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاِنْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ -

যে কাজে তোমার মন বা অন্তর স্থিতি লাভ করে এবং যে কাজে হৃদয় ও বিবেক আস্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা পায়, তা-ই পুণ্য ও সুনীতি। পক্ষান্তরে যে কাজে মন স্থিরতা পায় না এবং বিবেক পায় না নিশ্চিন্ততা, তা-ই হচ্ছে পাপ ও দুর্নীতি। ফতোয়াদাতারা এর বিপরীত ফতোয়া যতই দিক না কেন।

এ শক্তিই কর্মের উৎস। কাজের সাথে এর নিকটতম সম্পর্ক। তা মানুষকে প্রতি মুহূর্ত পথ দেখায় কর্তব্য পালনের দিকে এবং পাপের পথ থেকে বিরত

থাকতে নির্দেশ দেয়। ভালো কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য মানুষকে উদ্বোধিত করে এবং মন্দ ও খারাপ বা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রস্তুত করে। আল্লানুগত্যমূলক কাজে মানব মনে জাগায় তৃপ্তির সুখানুভূতি। আর নাফরমানীর কাজ করা হলে তা জাগিয়ে দেয় তীব্র অনুতাপ ও অনুশোচনা, যাকে বলা হয় বিবেকের দংশন।

বস্তুত এই বিবেক-ই হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। নৈতিক জীবনের প্রথম স্তম্ভ বা খুঁটি হচ্ছে এই বিবেক। যে কাজ বিবেকসম্মত, তা মানুষকে সেই কাজে অনুপ্রাণিত করেও তার খারাপ দিক সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। বিবেকই হচ্ছে মানুষের অতন্দ্র প্রহরী।

মানব সমাজ— তা যে সমাজই হোক না— কেবলমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ, আইন প্রণয়ন ও শাসকবর্গের সদা সচেতনতা দ্বারাই উন্নতি লাভ করতে, সুসংগঠিত ও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠতে পারে না। যদিও এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বরঞ্চ এক-একটি সমাজের সঠিক উন্নতি লাভ, সুসংগঠিত ও উন্নত হওয়ার জন্য একান্তই জরুরী হচ্ছে, সে সমাজের জনগণের জাগ্রত বিবেক। এই জন্য বলা হয়, সুবিচার ও ন্যায়পরতা আইনের ধারায় নিহিত নেই, তা থাকে বিচারকের বিবেকে।

সদাজাগ্রত বিবেকের এই গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। বিশেষ করে যারা দেশ শাসন করে, আইন প্রয়োগ করে ও আইনের ভিত্তিতে বিচার কার্যের দায়িত্ব পালন করে তাদের বেলায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। আইনের শাসনে শাসিত জনতা সম্পর্কে একটি প্রবাদ হচ্ছে ঃ আইন আমাদেরকে সংশোধন করতে পারে না, পারে না ফেরাতে বে-আইনী কাজ থেকে, যদি না আমাদের বিবেকই আমাদের ফিরায় অন্যায় কাজ থেকে।

বিবেক গঠনে ঈমানের প্রভাব

ঈমান বিবেক জন্য একটা বিরাট সাহায্য শক্তি। একটি শক্তিমান উৎস। ঈমান বিবেককে খোরাক দেয়, নিয়ন্ত্রিত করে দেয় আলো, উত্তাপ, শক্তি ও গতিশীলতা।

ঈমানদার লোকের প্রথম আকীদা হচ্ছে আল্লাহ্ সম্পর্কে, দ্বিতীয় পরকালের হিসাবে ও প্রতিফল সম্পর্কে এবং তৃতীয় নবুয়ত ও রিসালাত তথা হযরত মুহাম্মাদের সর্বশেষ নবী হওয়া সম্পর্কে। আর এই বিশ্বাস তার সমগ্র জীবনে তার বিবেককে সদাজাগ্রত ও তীব্র সচেতন করে রাখে।

তার হৃদয় ভরা এই অনুভূতি যে, সে যেখানেই থাক, আল্লাহ্ তার সঙ্গে রয়েছেন। নিজের ঘর বাড়িতেও, বাইরে বিদেশেও, গোপনে প্রকাশ্যেও। তার কোনো কিছুই আল্লাহ্র অজানা নয়। তার কাছে প্রচ্ছন্ন বা গোপন নয়। কোনো গোপন রহস্যও তার অগোচরে থাকতে পারে না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

(المجادلة : ٧)

তোমরা কি বুঝ না, আল্লাহ্ তা'আলা আকশমণ্ডল ও পৃথিবীর সব কিছুই জানেন। তিনজন লোকের কোনো গোপন পরামর্শ হলেও তিনি সেখানে চতুর্থ জন, পাঁচ জনের গোপন কথা হলে তিনি সেখানে থাকেন ষষ্ঠ। এর চাইতে কম হোক, কি বেশি, তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন— যেখানেই তারা থাকুক। অতঃপর কেয়ামতের দিন তাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ তো সর্ব বিষয়ে অবহিত।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ - (يونس : ٦١)

তোমরা যে অবস্থায় বা কর্ম ব্যস্ততায়ই থাকো না কেন, কুরআন থেকে যাই তিলাওয়াত করো না কেন, যে কোনো কাজ তোরা করো না কেন, আমরা তার প্রত্যক্ষদর্শী ও পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি, যখন তোমরা কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলতে থাকো, তখনও। পৃথিবীর ও আকাশ মণ্ডলের এক বিন্দু বা অণু পরিমাণ জিনিস এবং তার চাইতেও ছোট বা বড় কোনো জিনিসই তোমার আল্লাহ্র কাছে গোপন থাকে না। বরং এসব জিনিসই লওহে মাহ্ফুযে লিপিবদ্ধ ও আল্লাহ্র জানা রয়েছে।

কাফের-মুশরিকরা রাসূলে করীমের প্রতি নানা প্রকার বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি নিজেদের মধ্যে করত। আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করে তাদের সব গোপন কার্যকলাপ প্রকাশ করে দিতেন। তখন তারা পরস্পরে বলতঃ এই আস্তে বল।

মুহাম্মাদের আল্লাহ যেন তোমাদের কথাবার্তা শুনতে না পায়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন এ আয়াত ঃ

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِا جْهَرُوْابِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ - اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ - (الملك :١٣-١٤)

তোমরা চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে (দুটি অবস্থাই আল্লাহ্র জন্য সমান) তিনি তো লোকদের অন্তরের অবস্থা পর্যন্ত জানেন। তোমরা জেনে রাখো, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরি অবহিত। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে অবহিত।

ঈমানদার লোকদের বিশ্বাস, কেয়ামতের দিন তার এ দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব আল্লাহ্ কাছে দিতে হবে। তাদের কাজ ভালো হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে, আর কাজ মন্দ হলে তার সেই মন্দ ফলই তাকে ভোগ করতে হবে। সে যে সব কাজ এ দুনিয়ায় করেছে, কালস্রোত অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সে কাজগুলো মিটে যায় নি। বরং আল্লাহ্র নিয়োজিত লেখকদের হাতে তা সবই সুষ্ঠুভাবে লিখিত ও সুরক্ষিত হয়ে আছে। আর এ লেখকরা ছোট কিংবা বড় সব কিছুই লিখে রেখেছেন, কিছু বাদ দেন নি। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ - (ق : ١٧-١٨)

তার ডান ও বাম পাশে দুজন লেখক স্থায়ীভাবে বসা থেকে প্রত্যেকটি জিনিসকে লিপিবদ্ধ করছে। তার মুখ থেকে যে কোনো শব্দ বের হোক, তার সংরক্ষণের জন্য একজন চির-উপস্থিত পর্যবেক্ষণ বর্তমান রয়েছে।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ - كِرَامًا كَاتِبِيْنَ - يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ -

এবং নিশ্চিতই তোমাদের উপর সংরক্ষক নিযুক্ত রয়েছে, তারা মহান লেখক। তোমরা যাই করো তারা জানে।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰى هُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ -

ওরা কি মনে করেছে, আমরা তাদের গোপন তত্ত্ব ও তাদের গোপন কোনো পরামর্শ শুনতে পাই না ? ভুল কথা, আমরা তো শুনতে পাই-ই। উপরন্তু আমাদের প্রতিনিধি তাদের কাছে উপস্থিত থেকে লিখে রাখছে।

ফেরেশতাদের লিখিত এ সব দলিল-দস্তাবেজ এতই পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক যে, তার প্রতি উপেক্ষা তাকে বিনষ্ট করতে পারে না, কাল-স্রোতের প্রবাহে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। এসব জিনিসই আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত থাকে। কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হয়ে সব-ই দেখতে পাবে।

وَكُلَّ اِنسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا -

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا - (بنى اسرآءيل : ١٣-١٤)

প্রত্যেকটি মানুষের ভালো-মন্দ সব আমল লিখে তার গলদেশে অবিচ্ছিন্নভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তার জন্য একটি লিখিত দস্তাবেজ বের করে দেব, সে তা খুলে দেখবে। তখন তাকে বলা হবে, তোমার আমলনামা তুমি নিজেই পড়ে দেখ। আজকের দিনে তোমার নিজের হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

মুজাহিদ বলেছেন, যে সন্তানই জন্মগ্রহণ করে তার গলদেশে একটি লিপিকা বেঁধে দেয়া হয়। তাতে লেখা থাকে সে সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগ্যবান।

অতঃপর তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়, সে নিজের দুর্ভাগ্যকে ভেঙে সৌভাগ্য এবং সৌভাগ্যকে ভেঙে দুর্ভাগ্যে পরিণত করতে পারে। আর তা সম্ভব হয় যদি সে নিজস্ব উদ্যোগ ও চেষ্টায় আল্লাহ্র আদেশগুলো পালন করে ও নিষেধগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখে। যে সব ব্যাপারকে সে দুনিয়ায় খুবই সামান্য ও নগণ্য মনে করেছিল, সে দেখতে পাবে, আল্লাহ্র কাছে সে সব বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। যে সব কাজ করা সে বেমালুম ভুলে বসেছিল, তা এখানে সে স্মরণ করতে পারবে।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا

الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا - وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا

يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا -

আমলনামা পেশ করে দেয়া হবে। তাতে যা লেখা আছে সে বিষয়ে তুমি অপরাধীকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পাবে। তারা বলবে, কি আমাদের দুর্ভাগ্য। এ আমলনামার কি হয়েছে, তা তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, সবই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। ফলে তারা এ দুনিয়ায় যে আমলই করেছে তা উপস্থিত দেখতে পাবে। জেনে রাখো, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু কারো উপরই জুলুম করবেন না।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ - (المجادلة : ٦)

যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই পুনরুজ্জীবিত করবেন, অতঃপর তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি তাদের অবহিত করবেন। আল্লাহ তাদের সব কাজ আয়ত্তাধীন ও সংরক্ষিত করে রেখেছেন যদিও তারা নিজেরা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পুরোপুরি প্রত্যক্ষদর্শী।

হাশরের ময়দানে প্রত্যেকের সমস্ত কাজ তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে, তা ভালো কাজ হোক, কি মন্দ কাজ। সে তুলাদণ্ড হবে আল্লাহ্র কায়েম করা দাঁড়িপাল্লা। খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওজনকারী। আল্লাহ্র এ ওজন করার কাজটি হবে পুরোপুরি সুবিচারপূর্ণ।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ - (الانبياء : ٤٧)

আমরা সুবিচারের মানদণ্ড দাঁড় করব কেয়ামতের দিন। তার ফলে কোনো ব্যক্তিই একবিন্দু পরিমাণ জুলুম পাবে না— যদিও তা এক অতি সামান্য ও সূক্ষ্ম পরিমাণও হয়। আমরা তা নিয়ে আসব এবং হিসাবকারী হিসাবে আমরাই যথেষ্ট।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ اِلْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ -(الاعراف : ٨-٩)

আজকের দিনে ওজন করা কাজটি হবে পুরোপুরি সত্যতাপূর্ণ। ফলে যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে, তারা হবে সফলকাম। যাদের (নেক আমলের) পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই লোক, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর তার কারণ হলো, তারা নিজেরা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি জুলুমমূলক আচরণ গ্রহণ করেছিল।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا - (النساء : ١٧٥)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَا بًا اَلِيْمًا - وَّلَايَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا -

যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁকে শক্ত করে ধারণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের শিগগিরই তাঁর রহমতের ও দয়া-অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করে দেবেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার সত্য সঠিক ঋজু-দৃঢ় পথে তিনি পরিচালিত করবেন।

আর যারা উন্নাসিকতা গ্রহণ ও অহংকার করবে, আল্লাহ তাদের আযাব দেবেন তীব্র উৎপীড়ক আযাব এবং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীরূপে পাবে না।

আল্লাহ ও পরকালের হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিফল পাওয়া সম্পর্কিত এই বিশ্বাসের বলে মুমিন ব্যক্তি নিজেরাই নিজেদের পর্যবেক্ষক রূপে গড়ে ওঠে। সে থাকে সদা জাগ্রত। পরিণতির ব্যাপারে সদা সচেতন। সে কারো উপর জুলুম করবে না, কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কারো প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ বা কারো সাথে ঝগড়া-ঝাটি করবে না। অহংকার ও অহমিকতা করবে না, তার প্রতি অন্য লোকের যে অধিকার আছে তা সে অস্বীকার করবেনা। যে জিনিস তার নয়, তা পাওয়ার জন্য সে মিথ্যামিথ্য দাবি করবে না, তা পেতে চেষ্টা করবে না। যে কাজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে কাল কেয়ামতের দিনে, আজকের দিনে সে কাজ সে কখনোই করতে প্রস্তুত হবে না। গোপনে এমন কাজ করবে না, যা প্রকাশ্যভাবে করতে সে লজ্জা পায়।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ -

আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি রাজি। এই মর্যাদা কেবল তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করেছে।

এর সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে ঃ

لِمَنْ رَاقَبَ رَبَّهٗ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَاسَبَ نَفْسَهٗ وَ تَزَوَّدَ لِمَعَادِهٖ -

এ মর্যাদা তাদের জন্য, যারা মহান আল্লাহ্‌কে সব সময়ই সম্মুখে হাজির-নাজির মনে করে জীবন কাটিয়েছে, নিজের হিসাব-নিকাশ নিজেই গ্রহণ করেছে এবং তাদের পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করেছে।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী তিরমিযী বলেছেন ঃ

যার দৃষ্টি তোমার উপর সদা নিবদ্ধ, তুমি তার ব্যাপারে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকবে। যার নেয়ামত তোমার প্রতি সদা বর্ষমান— কখনোই শেষ হয় না, শোকর কেবলমাত্র তাঁরই করবে।

যার আনুগত্য না করে তোমার কোনো উপায় নেই, তুমি কেবল তারই আনুগত্য করবে।

তুমি বিনীত অবনত হয়ে থাকবে কেবল তাঁরই সমীপে, যার মালিকানা ও আধিপত্য-কর্তৃত্ব থেকে তুমি কখনো-ই নিষ্কৃতি পেতে পার না।

যুন্নুন মিসরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বান্দা কেমন করে জান্নাত লাভ করতে পারে ? তিনি বললেন ঃ পাঁচটি জিনিসের দৌলতে মানুষ জান্নাত পেতে পারে ঃ

اِسْتِقَامَةٌ لَيْسَ فِيْهَا رَوْغَانٌ - وَاجْتِهَادٌ لَيْسَ مَعَهُ سَهْوٌ وَمُرَاقَبَةٌ لِلّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَانْتِظَارُ الْمَوْتِ بِالتَّاَهُّبِ لَهُ وَمُحَاسَبَةُ نَفْسِكَ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبَ -

১. এমন দৃঢ় আদর্শবাদিতা, যাতে এক বিন্দু টাল-বাহানা বা ডিগবাজি খাওয়া হবে না।
২. এমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা, যাতে ভুল-ভ্রান্তি ও অবজ্ঞা-উপেক্ষা স্থান পায় নি।
৩. আল্লাহ্র জন্য সদা-জাগ্রত থাকা— গোপনে ও প্রকাশ্যে।
৪. মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা— তার ব্যাপারে আতংকবোধ সহকারে। এবং
৫. আত্মসমালোচনা (নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ) করতে থাকা আল্লাহ্র হিসাব গ্রহণের পূর্বে।

ঈমান মানুষের বিবেককে আল্লাহ ও পরকালের হিসাব-নিকাশ ও সওয়াব-আযাবের ব্যাপারে সদা সচেতন ও অতন্দ্র প্রহরী বানিয়ে দেয়। এ বিবেক হয় চিরজাগ্রত, আত্ম-সমালোচক। কাজ করার পূর্বেই মুমিন কাজের পরিণতি সম্পর্কে হিসাবে ও যাচাই করে নেয়। সে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে কাজটা কি, কেন সে কাজ করবে, কাকে খুশি করার জন্য করবে, তা সে অবশ্যই ভেবে নেবে। অনুরূপ ভাবে কাজ সম্পন্ন করার পর সে আত্ম-সমালোচনা করতে বসে সে কি করেছে, কেন করেছে, কি ভাবে করেছে— ন্যায় না অন্যায় ভাবে ? সে নিজেই নিজের সম্পর্কে ফয়সালাকারী। তার এ ফয়সালা হয় খুব দ্রুত, অনতিবিলম্ব যে, এ কাজের দরুন সে সওয়াব পাবে, কি আযাব। এ আযাব কেবল মানসিক কিংবা অনুতাপ অনুশোচনাতেই সম্পন্ন হয় না, অনেক সময় সে বাস্তব ও দৈহিক বা বস্তুগত দিক দিয়েও আযাব পেয়ে যায়।

ইমাম হাসান বসরী বলেছেন ঃ

অনুশোচনাকারী মানসিকতার সাক্ষ্য

মুমিন সব সময়ই নিজেকে তিরস্কৃত করতে থাকে। সে যা করে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কেই সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে ঃ এ কথাটি আমি বললাম কেন, আমি এটা খেলাম কেন, এটা পান করে আমার কি লাভ ? এ কাজটার কি ফল আমি পেলাম ইত্যাদি। কিন্তু পাপী লোক তা কখনো করে না।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

মুমিন নিজেই নিজের প্রহরী। সে আল্লাহ্কে সামনে রেখেই নিজের এই প্রহরাকার্য সমাধা করে। আর যে জাতি নিজেই নিজের সমালোচনা করে দুনিয়ায়, পরকালে তাদের হিসাব-নিকাশের কাজ খুব সহজ হবে। যারা দুনিয়ায় নিজেদের হিসাব লয় না, কেয়ামতের দিন তাদের কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

বস্তুত এ ধরনের সদা সচেতন ও সদা জাগ্রত প্রহরীই হয় ঈমানদার লোকের বিবেক এবং এ বিবেকই মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি অবিচল বিশ্বাসী হয়ে থাকতে সক্ষম করে। লোভ ও লালসা-পংকিল জীবন পথে তার পদস্খলন হতে দেয় না। আর যদি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে শয়তানের ওয়াস ওয়াসায় পড়ে পদস্খলন আসেও, আছাড় খেয়ে পড়েও যায়, তবু সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় না, ভ্রষ্ট পথে এক কদম বাড়াতেও সে প্রস্তুত হয় না। কেননা আল্লাহ্র ভয় এ বিবেককে সব সময়ই আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ বিবেক মহান নৈতিক চরিত্রের প্রথম ভিত্তি এবং উন্নত সমাজ জীবনের জন্য এই বিবেক একান্তই জরুরী। যে সমাজের লোকদের এরূপ বিবেক রয়েছে সে সমাজের জনগণের জীবনে ঈমানকে সদা চলমান ও জাজ্জ্বল্যমান বাস্তব রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। এরূপ বিবেক যার আছে, সে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব আপনা থেকেই যথাযথভাবে পালন করে। কোনো অপরাধ করে বসলে তখন সে আইনের শাসন ও দণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টিত হয় না। সে অগ্রসর হয়ে— সে দণ্ড তা যত কঠিন ও মর্মান্তিক হোক না কেন— গ্রহণ করে। এরূপ বিবেক যার আছে, সে সুযোগ পেয়েও পরের ধন হরণ করে না, আমানতের খেয়ানত করে না, দুধে পানি মেশায় না, খাদ্যে ভেজাল করে না, খরিদ্দারকে ঠকায় না, ওজনে কম দেয় না, কোনো রকম দুর্নীতিতেই সে লিপ্ত হয় না। রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেও অহংকারী হয় না, জালিম হয় না, মানুষের অধিকার হরণ করে না, অত্যাচার-নিপীড়ন চালায় না। পক্ষপাতিত্ব করে না, ঘুষ খায় না।

ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র

বস্তুত মানুষকে হেদায়েত করায় ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচ্ছন্নতা বিধানে ধর্মের যে প্রভাব রয়েছে, তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে, ইতিহাসে মানুষের বর্বরতা বিদূরণে ধর্মের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দুনিয়ার প্রায় সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে ধর্মবিশ্বাসের ও পরকালীন শাস্তি বা পুরস্কার লাভের ভিত্তির উপর। আর ধর্ম নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি হিসাবে এ জিনিকেই গ্রহণ করেছে।

ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্রের সম্পর্ক কি, ধর্ম ছাড়া কি মানুষের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে না। এ নিয়ে দুনিয়ায় চিন্তাবিদদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ধর্মবিশ্বাস ছাড়াও মানুষ নৈতিক চরিত্রবান হতে পারে। কিন্তু এ কথাটি যুক্তির কষ্টিপাথরে কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারে না যেমন, বাস্তবেও তার কোনো প্রমাণ দেয়া সম্ভবপর নয়। নৈতিক চরিত্রের জন্য বিশ্বাস অপরিহার্য। বিশ্বাসই মানুষকে চরিত্রবান বানায়— সে যে বিশ্বাস ও যে ধরনের বিশ্বাসই হোক-না কেন। যারা বিশ্বাসের গুরুত্ব স্বীকার করে না, তাদের জীবনে কোনোই চরিত্র থাকতে পারে না। থাকতে পারে বলে যারা মনে করে, তারা মারাত্মক বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণায় নিমজ্জিত। এ জন্যই কেউ কেউ এতদূর বলতেও দ্বিধা করেনি যে, আমাদের জীবনের জন্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস অপরিহার্য। যদি আল্লাহ্ বাস্তবিক পক্ষে নাও থাকেন তবু আমাদেরই প্রয়োজনে তাকে আমাদের সৃষ্টি করতে হতো। আবার কেউ বলেছেন, আমি জাহান্নাম বিশ্বাস করি না; কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছি যে, বহু কোটি মানুষ এই জাহান্নামের ভয়ে অনেক পাপ ও অন্যায়ের কাছ থেকে দূরে সরে থাকছে।

বর্তমান যুগকে ধর্ম-অবিশ্বাস বা ধর্ম-উৎখাতের যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ যুগের কারো কারো মত হলো, ধর্ম— তথা আল্লাহ্র ও পরকালের ভয় ক্রমবিকাশমান ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির পথে বিরাট বাঁধা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ব্যক্তির মন-মানসিকতায় যদি কোনো ভয়কেই প্রশ্রয় দেয়া না হয়, তাহলে সে অরণ্যের হিংস্র জন্তুর চাইতেও ভয়ংকর হয়ে পড়বে না কি ? যে বন্য বাঘ ও বিষধর অজগরকে সকলে ভয় করে সেই ওরা নিজেরাও তো ভয় মুক্ত নয়। জন্মগত ও দৈহিকভাবে সশস্ত্র হয়েও ওরা মানুষকে ভয় পায়। এমতাবস্থায় মানুষ যদি প্রকৃতই সমস্ত ভয় ও শাস্তি-আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এ দুনিয়ার এবং এই দুনিয়ায় মানুষের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ? মানুষ তো দূরের কথা, কোনো জীবের পক্ষেই কি এখানে বসবাস করা সম্ভব হবে ? তাই জনৈক খ্রিস্টান চিন্তাবিদ প্রশ্ন তুলেছেন ঃ আমরা তো ছায়ার ছায়ায় (অর্থাৎ ধর্মের ছায়ায়)

বাস করছি। আমাদের পরে দুনিয়ার মানুষ (ধর্মশূন্য হয়ে) কোন জিনিস নিয়ে জবিন-যাপন করবে ? তাদের যৌন-লালসার অনাচার-উচ্ছৃংখলতা, মিথ্যাচার, চুরি-ডাকাতি-অপহরণ, নরহত্যা ও জোর-জবরদস্তি রোধ করার কি উপায় লোকদের হাতে থাকবে যদি তা গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং দেশের আইনকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখানো হয় ?

এসব উক্তি যদিও ধর্মের প্রয়োজন বোধের বৈষয়িক ও বস্তুবাদি অভিব্যক্তি, ধর্ম বা দ্বীনের ব্যাপারে এসব উক্তি চূড়ান্ত বা একমাত্র নয়। এসব উক্তির উল্লেখ করা হচ্ছে শুধু এ কথা বোঝাবার জন্য যে, ধর্মের অপরিহার্যতা ও কল্যাণকামিতার কথা সব সুস্থ চিন্তাশীল লোকই স্বীকার করেন, তাঁরা নিজেরা ধর্মকে মানেন আর নাই মানেন। একটি জিনিসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার সাধারণ মূল্যায়ন এসব কথার মাধ্যমেই হতে পারে।

ব্যক্তি চরিত্র গঠনে আল্লাহ ও পরকালের ভয়ের প্রভাব

মানুষের ব্যক্তি জীবন তথা সামাজিক-তামাদ্দুনিক জীবনের সুষ্ঠুতার জন্য ভয় এর প্রয়োজনীয়তা যখন সাধারণভাবে স্বীকৃত এবং তার বিশেষ ভূমিকা সর্বজনসমর্থিত, তখন সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে, ভয় কাকে করা হবে ? কার ভয় এতটা প্রভাবশালী হতে পারে যে, তাতে মানুষের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ চরিত্র পরিচ্ছন্ন-পরিশুদ্ধ ও নির্মল হয়ে গড়ে উঠতে পারে ? আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই মানুষ স্বভাবতই যেমন আশাবাদী, তেমনি ভয় প্রবণ। যেমন তারা শুভ আশায় উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত হয়, তেমনি আশঙ্কা বোধে সংকুচিত ও শুরু করা কাজ থেকে বিরত থাকে। কাজেই ভয় ও আশা দুটোই সমানভাবে মানুষের প্রকৃতি নিহিত ভাবধারা। তাই এই ভয়টাকে বিস্তৃত ও নানা ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে একটি মাত্র নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। একটা সাপ ও শৃগাল, একটা অস্ত্রধারী মানুষ, মারাত্মক ব্যাধি অথবা ক্ষমতাবান শাসককে ভয় না করে ভয় করা উচিত সমগ্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ তা'আলাকে। অতঃপর ভয়ের অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্র ও উৎসকে চিরতকে বন্ধ করে দিতে হবে। কোনো সৃষ্টিকে ভয় করা চলবে না, সে ছোট হোক বা বড়। কতগুলো স্বভাবগত ভয়ের কথা স্বতন্ত্র। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কাউকে— কোনো কিছুকে— ভয় না করাই হলো বীরত্বের মর্মকথা, শক্তির মৌল উৎস। আর এই হচ্ছে মুমিনের সঠিক পরিচয়।

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ – (الاحزاب : ٣٩)

যারা আল্লাহ্‌র অর্পিত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি পালন করে এবং ভয় করে তাঁকে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করে না। তারাই মুমিন, মুত্তাকী।

اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ - (الانبياء : ٤٩)

যারা না দেখা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তারাই পরকালের ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত।

يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (المائدة : ٥٤)

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং কোনোরূপ উৎপীড়নকে একবিন্দু ভয় করে না।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

এ তো শয়তান, সে তার সাথী-বন্ধুদের ব্যাপারে মানুষকে ভয় দেখায়— ভীত করে। কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো না, ভয় করো কেবলমাত্র আমাকে যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৭৫)

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا -

অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না, ভয় করো কেবল আমাকে এবং আমার আয়াতসমূহকে সামান্য নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করো না।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ خَافَ اللّٰهَ خَوَّفَ اللّٰهُ مِنْهُ كُلَّ شَىْءٍ وَمَنْ لَمْ يَخْفِ اللّٰهَ خَوَّفَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ-

যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ সকলকে তার প্রতি ভীত করে দেন। আর যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, আল্লাহ্ তাকে সর্বজিনিসের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত বানিয়ে দেন।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার লোকের যে ভয়, এ ভয় সুবিচারক ও নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারকারীর প্রতি ভয় বোধ। সে ভয় এজন্য যে, সে যদি অপরাধ করে, তা হলে আল্লাহ তাকে মোটেই ছেড়ে দেবেন না। তিনি কঠোর কঠিন শাস্তি দেবেন। সে ভয় অত্যাচারী শাসকের প্রতি যেমন হয় তেমনটা নয়। অত্যাচারী শাসক সম্পর্কে এই ভয়টাই হয় প্রধান ও মারাত্মক যে, তার কাছে অপরাধী-নিরপরাধীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নিরপরাধীকে অপরাধীর অপরাধের (দরুন) পাকড়াও করে, শাস্তি দেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌কে বান্দাহর ভয় করাটা পিতাকে সন্তানের ভয় করার মতোই। পিতা সন্তানকে স্বাভাবিক ও সাধারণভাবেই স্নেহ করে, ভালোবাসে।

কোনোরূপ শাস্তি বা কষ্ট দেয় না। কিন্তু সন্তান যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে পিতা সেজন্য শাস্তি দেয়। আল্লাহ্র প্রতি বান্দাহর ভয় পোষণ পুরোপুরি এ রকমও নয়। সে ভয়ের সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে ক্ষমা পাওয়ার আশা। আল্লাহ্র বিশাল অসীম রহমত পাওয়ার সম্ভাবনা। এ ভয়টা তাদের মতোই; যাদের কথা কুরআন মজীদে বলা হয়েছে এ ভাষায় ঃ

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ – (بنى السرائيل :٥٧)

তারা সেই লোক, যারা ডাকে— দো'আ করে, তাদের আল্লাহ্র কাছে পৌছার নিকটতম উপায়টার সন্ধান করে, তার রহমত পাওয়ার আশা পোষণ করে এবং আযাবকে ভয় করে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ- (الزمر : ٩)

যে লোক রাত্রিকালে সিজদায় কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় অবনত ভীত সন্ত্রস্ত হয়, পরকালকে ভয় করে এবং তার আল্লাহ্র কাছে রহমত পাওয়ার আশা পোষণ করে।

কুরআন মজীদে সব সময় আশা ও ভয়-ভয় ও আশার মধ্যবর্তী অবস্থার কথাই বলে এবং সে দিকেই মানুষকে আহবান জানায়। অতএব মুমিনকে ভয় ও আশার মাঝে অবশ্যই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। এতটা চরম সীমার ভয় সে পোষণ করবে না, যার ফলে তাকে আল্লাহ্র রহমতের আশা থেকেই নিরাশ হয়ে যেতে হয়। অনুরূপভাবে এতটা আশাও সে পোষণ করবে না, যাতে আল্লাহ্ আযাবের ভয় থেকে সে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করে বসতে পারে। কেননা আশা ও ভয় এ দুটোই আল্লাহ্র ফাঁদ। যে লোক দুটোর মাঝে পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না, সে সেই ফাঁদে পড়ে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়তে পারে। কুরআন তাই সমাধান করে দিয়েছে এই বলে ঃ

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُونَ – (الاعراف : ٩٩)

আল্লাহ্র ফাঁদ সম্পর্কে নির্ভীক হতে পারে কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরাই।

তেমনি এও বলে দিয়েছে ঃ

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ – (يوسف : ٨٧)

আল্লাহ্র দয়া—অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় কেবলমাত্র কাফের লোকেরা।

এ দুটো আয়াতই আশা ও নৈরাশ্য— আশা ও ভয়— এই দুটির মাঝে পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষার কথা বলছে। আল্লাহ ব্যাপারে যেমন একেবারে নির্ভীক হয়ে— তাঁর রহমত ও মাগফেরাত পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে পূর্ণোদ্যমে পাপ ও নাফরমানীর পথে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন মারাত্মক, তেমিন ধ্বংসাত্মক হচ্ছে আল্লাহ্‌র দয়া-অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ-হতাশ হয়ে একেবারে ভেঙে পড়া। এজন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, তাতেও এই ভারসাম্যকে পুরোপুরি রক্ষা করা হয়েছে এবং এই ভারসাম্যপূর্ণ ভাবধারা মুমিনের হৃদয়ে দৃঢ়মূল করাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নীতি ঃ

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

তিনি গুনাহ্ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী এবং কঠোর আযাবদাতা।

اِعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা কঠিন-কঠোর আযাবদানকারী এবং এ-ও জেনে রাখো যে, আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَالْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -
(الحجر : ٤٩-٥٠)

আমার বান্দাগণকে সতর্ক করে দাও একথা জানিয়ে যে, আমি অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়াবান এবং আমার আযাব অতীব পীড়াদাক শক্তি।

ইসলাম নীতিগতভাবে ভয়কে যতটা প্রশ্রয় দিয়েছে এবং মানুষের চরিত্র গঠনে যতটা ভয়ের প্রয়োজন মনে করেছে তা পূর্বোদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ 'ভয়' সম্পর্কে নিশ্চিয়ই একথা বলা চলে না যে, তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করে, তার বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বাধাগ্রস্ত করে। তা যদি বলতে হয়, তবে তা দুনিয়ার আধুনিক— বিশেষ করে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা ভয়-ভীতি সম্পর্কেই বলা যেতে পারে। কেননা সেখানে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উপর একটা ভীতি ও ত্রাসের রাজত্ব চাপানো হয়। এ ধরনের ভয় ও ত্রাসে নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না এবং ব্যক্তি প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ হওয়ার সম্ভব হয় না, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইসলাম যে 'ভয়'কে সমর্থন ও প্রয়োগ করে ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের জন্য সে সম্পর্কে এরূপ কথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাছাড়া ইসলাম ভয় ও ভীতিকেই একমাত্র হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করেনি, সেই সঙ্গে মুক্তির আশা ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষাকেও সমানভাবে প্রয়োগ করেছে।

শিশু চরিত্র গঠনে ভয়

শিশু চরিত্র গঠন এবং শিশুদের ভবিষ্যত সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজটা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি অত্যন্ত বিপজ্জনকও। এজন্য পিতাকে সর্বপ্রথম ব্যবহার করতে হয় শিশুর প্রকৃতিগত বিভিন্ন শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে। কিন্তু তা-ই উপযুক্ত নাগরিক গড়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে বাহ্যিক কোনো শক্তির সাহায্য গ্রহণও একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু সে বাহ্যিক শক্তিটি কি হতে পারে— এ নিয়ে দুনিয়ায় প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু পর্যায়ে বহু চিন্তা ও গবেষণা চালানো হয়েছে। আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত ধর্ম-অবিশ্বাসীরা ধর্মকে যে বাহ্যিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তার সমর্থনে যত অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ছিল, তা সবই তারা উপেক্ষা ভরে প্রাচীরের উপর নিক্ষেপ করেছে। অতঃপর তারা এক নবতর শক্তি উৎসের সন্ধানে প্রাণপণের চেষ্টা চালাতে থাকে। চেষ্টা চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত সামনে পেল তারা 'শিশু মনস্তত্ত্ব।' বিশেষ ধরনের ও পদ্ধতিতে রচিত বা উদ্ভাবিত এ শিশু মনস্তত্ত্বকেই তারা শিশু চরিত্র ও শিশু ব্যক্তিত্ব গঠনের একমাত্র হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন পর্যন্ত শিশুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ততটা উন্নত বা বিকশিত হয়নি এবং শিশু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র সাহায্য করার যোগ্যতাও তার তেমন হয়নি। ফলে উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রে তেমন সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি তা দিয়ে। তখন পর্যন্ত আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞানই ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু মাত্র। উপরন্তু তাতে ছিল নানা মত, নানা দৃষ্টিকোণ।

এ সময় থেকেই শিশুদের পিতা-মাতা এই মত গ্রহণ করে বসল যে, দৈহিক শাস্তি এবং তার ভয় শিশু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক। কাজেই শিশু ও শিশু প্রশিক্ষণে শক্তি প্রয়োগ ও তীব্র ভর্ৎসনা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু শিশুদের কোনো বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলায় বেঁধে না রেখে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে যথেচ্ছভাবে বড় হবার সুযোগ দিতে হবে, যেন তাদের স্বাভাবিক ও জন্মগত প্রতিভা, ঝোঁক প্রবণতা— গাছের ফুলকলির মতোই স্বতঃবিকশিত ও প্রস্ফুটিত হতে পারে। তাছাড়া শিশুদের ব্যবস্থাপনাও তাদের হাতেই ছেড়ে দেয়া কর্তব্য, যেমন তারা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের মূল্য অনুধাবন করতে অভ্যস্ত হয়। কেননা কোনো কোনো শিশু স্বভাবতই বিদ্বেষ প্রবণ হয় কিংবা হয় তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন। কাজেই এটা করো, ওটা করো না প্রভৃতি কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা তাদের উপর আরোপ করা উচিত নয়। বরং তারা যা করতে চায় তাই তাদের করতে দেয়া কর্তব্য।

এই হচ্ছে শিশু মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক চিন্তাধারা। অথচ এসব চিন্তাধারার স্বপক্ষে এ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা প্রকাশিত হয়নি। এবং এ ধরনের দৃষ্টিকোণ যে ক্ষতিকর, তা-ই প্রমাণিত হয়েছে এ পর্যন্ত। এবং এসব কথার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নামে প্রচার করে বর্তমানে মানবতার বিরাট ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। আধুনিক যুগের বহু শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা লাভ করেছেন এবং তাঁরা অকপটে মত দিয়েছেন যে, এসব ভিত্তিহীন চিন্তা ও মতাদর্শ পরিহার করে ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই বাঞ্ছনীয়। শিশু শিক্ষা প্রশিক্ষণে এবং তাদের আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র গঠনে ধর্মের মৌল ভাবধারা ও রীতিনীতি অনুসরণ করা ছাড়া উন্নত চরিত্রের নাগরিক গড়ে তোলা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। অতএব শিশুদের বলতে হবে, এটা ভালো; কেননা এ কাজ করতে আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাই নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ই এ কাজটি পছন্দ করেন, এ কাজ করলে তিনি খুশি হবেন, তিনি এজন্য জান্নাত দান করবেন। পক্ষান্তরে বলতে হবে, এ কাজটা অন্যায়, পাপ বা মন্দ। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ কাজ যে করে তার প্রতি আল্লাহ্র রোষ ও ক্রোধ অনিবার্য। আর এজন্য তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। বস্তুত শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে লোক চরিত্র গঠনে এর চাইতে উত্তম ও কার্যকর পন্থা আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু এ যুগে এমন অনেক সমাজ ও রাষ্ট্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যারা ধর্ম ভিত্তিক এ সব শিক্ষা পদ্ধতিকে মোটেই পছন্দ করতে পারছে না। সে কারণে তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের ধর্ম শিক্ষা তথা ধর্মের স্পর্শ থেকেও অনেক দূরে সরিয়ে রাখে এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ধর্মকেন্দ্রসমূহে তাদের পাঠাতে পর্যন্ত তারা রাজি নয়। তাদের মত হচ্ছে, এমনি ভাবে তাদের ছেড়ে দাও, মুক্ত রাখ তাদের মন-মগজ। যেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এ প্রশ্ন তাদের মনে নিজেদের থেকেই জেগে ওঠে। তারা বয়সের পরিপক্কতা লাভ করে নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেরাই চূড়ান্ত ভাবে এ প্রশ্নের জবাব জেনে নিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, শিশুরা কি কোনো সময়ই ভালো-মন্দ, ভুল-নির্ভুল ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী ও বোধ ও বিবেক শক্তি আপনা-আপনিই লাভ করতে পারে? না, পারেনা আর পারে না বলেই শিশু বয়স থেকেই শিশুদের মনে আল্লাহ রাসূল ও পরকালের প্রতি দৃঢ় ঈমান দৃঢ়মূল করে বসিয়ে দেয়ার পন্থা ও পদ্ধতি অধিক কার্যকর এবং সুদৃঢ় চারিত্রিক বুনিয়াদ রচনার জন্য অধিকতর উপযোগী।

আমরা পূর্বে বলেছি— কতগুলো কাজ মন্দ ও ভুল এবং কতগুলো কাজ ভালো ও সঠিক। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তা বলে দিয়েছেন। এ কথা বলা এবং প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিক্ষার এরূপ সূচনা করা খুব স্বভাবসম্মত এবং উত্তম প্রভাবশালী। কিন্তু এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আমাদের সমাজের পিতামাতারা ও শিক্ষা গুরুরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, তারা বলেন—এটা ভালো কাজ, কেননা আমরা তাই মনে করি। আর এটা মন্দ কাজ, কেননা তাই আমাদের ধারণা। অথবা বলা হয়, সমাজের বা রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এটা ভালো, অতএব এটা করো। আর সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এটা মন্দ, অতএব তা করো না। কিন্তু চিন্তা ও বিবেচনার বিষয়, শিশু ব্যক্তিত্ব ও লোক চরিত্র গঠনে প্রথমোক্ত পদ্ধতি অধিক সুফলপ্রদ, না এই শেষোক্ত পদ্ধতি? প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্ম-বিশ্বাসকে বাদ দিলে আমাদের শিশু ও জনগণের জন্য কোনো সুদৃঢ় নৈতিক বুনিয়াদ সংগ্রহ বা রচনা করা কি আদৌ সম্ভব?

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং মনস্তত্ত্ব— এ দুটো দিক দিয়েই আমরা যদি এসব প্রশ্ন পর্যালোচনা করি ও তার সঠিক জবাব পেতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অবশ্যই সক্ষম হব যে, ধর্মই হচ্ছে মানুষের মৌল প্রেরণা, শিশু বয়স্ক নির্বিশেষে সকলের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের জন্য সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান উৎস হচ্ছে ধর্ম— ধর্মীয় ভাবধারা ও ভালো-মন্দের মাপকাঠি। বস্তুত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, নবী-রাসূল তথা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ, আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআন মজীদ এবং পরকালের প্রতি ঈমানই হচ্ছে পিতামাতা সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতিদের জন্য একটা অতীব কার্যকর ও কল্যাণকর হাতিয়ার। এ হাতিয়ার গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হলে অন্য কোনো পন্থা ও পদ্ধতির প্রতি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষিতা থাকতে পারে না। এমন কি তারা নিজেরা এসব বিশ্বাস না করলেও শুভ ফল লাভ করার জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অসুবিধা নেই। ধর্মীয় বিদ্যালয় ও এবাদত-বন্দেগীর স্থানে— মসজিদে— বার বার গমনাগমন শিশুর মনস্তত্ত্বের শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর জীবন চরিত্রে এর সুদূরপ্রসারী ফল লাভ অবধারিত। মসজিদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং ধর্মীয় বিদ্যালয়ের নৈতিক উপদেশমূলক শিক্ষা মানুষকে অতিশয় নীতিবাদী ও চরিত্রবান বানাতে সক্ষম। মানুষের মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং আল্লাহ্‌র নৈতিক শিক্ষাসমূহ আয়ত্ত করা, তদনুযায়ী নিজের মন-মগজ ও চরিত্র গঠন করা এবং সমগ্র কর্ম জীবনে একজন আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্বসমূহ পালন করার যোগ্যতা অর্জিত হওয়া খুবই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা শিশু বয়সেই সে যে শিক্ষা লাভ করবে তাই তার সারা জীবনের পাথের হয়ে থাকবে।

ঈমানহীন বিবেকের বিকৃতি

পাশ্চাত্যের আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত কিছু লোক মনে করে ঈমান ও ধর্ম ছাড়াও মানুষ চলতে পারে কেবলমাত্র বিবেকের সাহায্যে। এরা তাই বিবেককে দ্বীন ও ধর্মের পরিবর্তে সমস্ত কর্মতৎপরতা ও নৈতিকতার ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন।

এ ব্যাপারটি প্রথমে ঘটেছিল ইউরোপে। যখন ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদীরা গির্জা ও ধর্মনেতাদের আধিপত্য থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছিল এবং ধর্মীয় সমস্ত বিষয় থেকে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। তখন এই বিবেকই হয়েছিল তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, একমাত্র দীক্ষাগুরু ও পথ-প্রদর্শক। তাদের ধারণা হয়েছিল, মানুষ কেবলমাত্র বিবেকের দ্বারাই চালিত হতে পারে, আল্লাহ্‌র ওহীর পরিবর্তে তাদের বিবেকের ওহীই গোপন নিঃশব্দ নির্দেশই তাদের জীবনের দীর্ঘ বন্ধুর, জটিলতাপূর্ণ ও সমস্যা জর্জরিত জীবনের জন্য অতি বড় পাথেয় হতে পারে। তাদের বিশ্বাস, বিবেক ভুল করে না। এটা এমন একটা মানদণ্ড, যার নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনায় কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করা যায় না। বিশেষত নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে বিবেকই হচ্ছে প্রধান আলোকবর্তিকা।

কিন্তু উত্তর কালে এ ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সমস্ত মানুষ যখন নিজ নিজ বিবেক দ্বারা চালিত হতে শুরু করল, তখন দেখা গেল, তাদের মধ্যে কঠিন ও প্রবল মতবিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো একটি বিষয়েও তারা সম্পূর্ণ একমত হতে পারছে না। কেননা সকলের বিবেক এক কথা বলে না। এক-একজনের বিবেক এক-এক কথা বলে। ফলে বিবেক দ্বারা চালিত সব মানুষই পারস্পরিক কঠিন মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। বিবেকের এ পার্থক্য তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য সংস্থাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে শুরু করে। পরস্পরের হাতাহাতি, মারামারি ও মাথা ফাটানো শুরু হয়ে যায়। কেননা কিছু লোকের বিবেক যখন একটি জিনিসকে ভালো ও মঙ্গলময় বলে, তখন অন্য কিছু লোকের বিবেক সে জিনিসকেই চিহ্নিত করে অত্যন্ত মন্দ, খারাপ ও ক্ষতিকর বলে। এ দুই মতের লোকদের মতকেই অগ্রাহ্য করা চলে না। কেননা প্রত্যেকেই বিবেকের দোহাই দিচ্ছে, নিজের নিজের বিবেকের কথা বলছে। এ কেবল এ কালের লোকদের বিবেকের কথা নয়, কালের পার্থক্যের কারণে এক কালের লোকদের বিবেক ও অন্য এক দেশ ও পরিবেশের লোকদের বিবেকের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে দাসপ্রথা ছিল আইনসম্মত, সেখানেই হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের মতো মানুষ— পুরুষ স্ত্রী-শিশু প্রকাশ্যভাবে ক্রয়-বিক্রয় হতো এবং এতে কোনোরূপ দোষ বা অন্যায় থাকতে পারে, তা সে সময়কার লোকদের বিবেকে আসত না।

প্রাচীন রোমান আইন বিধানে স্ত্রী ও শিশু স্বামীর মালিকানা সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হতো। সদ্যজাত শিশু-কন্যা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় করে দেয়ার অধিকার পিতার থাকত, যদি তার দ্বিতীয় একটি কন্যা বর্তমান থাকত। খুব বেশি দিনের কথা নয়, আমাদের পূর্ব পুরুষেরাই অপরাধের সন্দেহের ভিত্তিতেই মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোকে ন্যায়সঙ্গত মনে করত অথচ আজকের বিশ্ববিবেক এটাকে নিতান্তই অবিচার ও উৎপীড়ন মনে করে। এভাবেই একই কারণের একই দেশ ও সমাজের বহু মানুষের বিবেক যেমন এক কথা বলে না, তেমনি যুগ ও দেশ বা সমাজের বিভিন্নতার দরুনও বিবেকের বিচার ও সিদ্ধান্ত বহু প্রচণ্ড পার্থক্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এবং এটাই স্বাভাবিক। এর অন্যথা হওয়ার সম্ভব নয়। কাজেই বিবেককে জীবন ও নৈতিকতার দিগ্দর্শনরূপে গ্রহণ করার মতো নির্বুদ্ধিতা— বরং মারাত্মক নীতি আর কিছু হতে পারে না। বিবেককে একটা ভুল-ভ্রান্তি বিমুক্ত স্বাভাবিক শক্তি মনে করাই ভুল। বিবেক একটা স্বাভাবিক শক্তি একথা ঠিক হলেও বিবেক যে ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত নয়, এ কথায়ও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা বিবেককে বিভিন্ন ভাধারায় গড়ে তুলতে হয়। আর যে ভাবধারায়ই বিবেককে গড়ে তোলা হবে, তা সেই বর্ণই ধারণ করবে। বস্তুত বিবেক পানির মতো। যে পাত্রে রাখা হবে, সেই পাত্রের বর্ণই তাতে প্রতিফলিত হবে।

বিবেক স্বাভাবিক শক্তি। আদর্শবাদ, চিন্তা ও মনন এবং সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার— এসব থেকেই তা সমৃদ্ধ হয়। অনেক সময় এক ব্যক্তির বিবেকও বিভিন্ন কথা বলে, একই বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, তাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বয়স ও পরিবেশের পার্থক্য কিংবা জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণের পার্থক্যের দরুন এটা প্রায়ই প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। ফলে বিবেকের স্থিতি সম্ভব নয়। তা নিত্য পরিবর্তনশীল। অবস্থার পার্থক্যের কারণে তা কখনো শক্তিশালী আবার কখনো দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়তেও দেখা যায়। তাই এ পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, কেবলমাত্র বিবেক তার নিজস্ব শক্তি বলে মানুষের জন্য কখনোই দিগ্দর্শন হয়নি ও পথ-নির্দেশক হতে পারে না, হতে পারে না ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ও হক না-হক সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করার একমাত্র মানদণ্ড। তাই এই দিক দিয়েও ধর্মই হচ্ছে মানুষের জন্য একমাত্র নেয়ামক। নির্ভুল ও কল্যাণকর পথের দিশারী হতে পারে একমাত্র দ্বীন। কেননা তা মূলতই যেমন নির্ভুল— সর্বদোষ মুক্ত, তেমনি তার পথ নির্দেশনাও সর্বতোভাবে নির্ভুল। দ্বীন-ইসলাম মানব জীবনের জন্য বিশেষ করে মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য এমন বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, যা সর্ববিচারে বিবেকসম্মত, তা মানুষের পাকা-পোখ্ত মন অকুণ্ঠিতভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত এবং তার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। কোনো একটি দিক দিয়েও তাতে সামান্য

মাত্র ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করা যেতে পারে না। মানুষের পিপাসার্ত হৃদয় তাতেই পায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি। দ্বীন-ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য অতীব উত্তম নৈতিক বিধান প্রবর্তন করেছে। তাতে ব্যক্তিরও যেমন সার্বিক কল্যাণ নিহিত, তেমনি সমষ্টিরও এবং এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক যাবতীয় দ্বন্দ্বের চির অবসান ঘটাতে সক্ষম— দ্বীন-ইসলাম প্রবর্তিত নৈতিক বিধান।

দ্বীনের দৃষ্টিতে বিবেকের গুরুত্ব কতখানি ? বিবেকের কি সম্পর্ক দ্বীনের সাথে? মানুষের বিবেক যখন দ্বীন-ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে, তখন তা সেই কাজ করে, যা করে দ্বীন-ইসলামের মৌল আদর্শ। তখন বিবেক দ্বীনের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়। এই বিবেক মানুষকে সর্বাবস্থায়ই দ্বীনের পথ-নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেয়, দ্বীনের নির্দেশিত পথে চালিত করে এবং দ্বীন-বিরোধী কিছু সম্মুখে এসে গেলে তখন তার গতি স্তব্ধ করে দেয়, সামনে অগ্রসর হতে দেয় না। এ বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করবার জন্যই নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত মানুষ এই সংগ্রাম মুখর ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জীবন ক্ষেত্রে দিগদর্শনের নেয়ামতেরও মুখাপেক্ষী। আর দ্বীন ছাড়া মানুষের দিগদর্শনের নেয়ামক আর কিছু হতে পারে না। দ্বীন-ইসলামই হচ্ছে বিশ্বমানবের সত্যিকার বন্ধু।

ত্যাগ স্বীকার ও বদান্যতা

মানুষের মধ্যে দুটি ভাবধারা স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আর অপরটি সমাজ-সমষ্টিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবধারায় ব্যক্তি নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। ব্যক্তি নিজের জন্যই চায় সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গল। সব সুযোগ-সুবিধা লাভ ও মুনাফা নিজের জন্য— নিজের মুঠোর মধ্যে গ্রহণ করতে সচেষ্ট। এ ভাবধারাকে আত্মসংরক্ষণ এবং আত্মস্বার্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব-সুবিধাজনক ব্যাপারে নিজেকে সর্বাগ্রগণ্য রাখা ও অগ্রাধিকার দেয়াই ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব ও প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই এই ভাবধারা রেখে দিয়েছেন। কেননা তাঁর লক্ষ্য হলো পৃথিবীর আবাদকরণ ও উন্নয়ন সাধন, জীবনের ধারাপ্রবাহ অব্যাহত রাখা, তাকে বিকাশ ও সম্প্রসারণ দান। সুতরাং তার জন্যে এ ভাবধারা অপরিহার্য। তাছাড়া মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়েছেন, দুনিয়ার খিলাফতের দায়িত্ব ও মর্যাদায় তাকে অভিসিক্ত করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করার জন্যও এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবধারা একান্তই জরুরী।

সেই সঙ্গে মানুষের সমাজকেন্দ্রিক ভাবধারাও একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু দুটির মাঝে প্রথমটি অর্থাৎ ব্যক্তিকেকিন্দ্রক ভাবধারাই মানুষের মধ্যে অধিক প্রবল ও বেশি শক্তিশালী। তা-ই সমাজকেন্দ্রিক ভাবধারাকে বার বার পরাজিত করে। তাই দেখা যায়, মানুষ এতটা লোভী হয়ে দাঁড়ায় যে, সে যাবতীয় সুখ-সম্পদ কেবলমাত্র নিজের জন্যই পেতে চায়। নিজেকেই এসব ক্ষেত্রে অগ্রণী বানাতে চায় অন্যদের পিছনে হটিয়ে দিয়ে। স্বার্থপরতার এই প্রবণতা কখনো হ্রাস পায় না। ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাও বৃদ্ধি পায়, প্রবল হয়—রূপ ও ক্ষেত্র তার বদলে যেতে পারে অবশ্য : 'লোভী মানুষের বয়স বাড়লে লোভও বেড়ে যায়'— এটা চলিত কথাই নয়, বাস্তব সত্য। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রকৃতি সৃষ্টি করে তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا - (الاسراء : ١٠٠)

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত কৃপণ ও সংকীর্ণমনা।

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ -

মানব-মন কার্পণ্যে সদা-উপস্থিত— কার্পণ্য মানব মনের প্রকৃতিগত প্রবণতা।

রাসূলে করীম (স) তাঁর নিজের ভাষায় মানব-মনের এ প্রকৃতিগত লোভ ও স্বার্থপরতার চিত্র অংকন করেছেন এ কথার মাধ্যমে ঃ আদম-সন্তান যদি একটি স্বর্ণ ভরা প্রান্তর পায়, তাহলে সে অনুরূপ আরও একটা প্রান্তর পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে।

মানুষ যদি কখনো এই স্বার্থপরতার প্রবণতা পরিত্যাগ করে, তাহলে সে নিজের উপর বিজয়ী হতে পারে। তখন তার আচার-আচারণ ও মনের ঝোঁক-প্রবণতা হবে সমাজ-সমষ্টির দিকে। অন্যথায় তখনো সমাজে কেবল স্বার্থপর লোকদেরই প্রাবল্য দেখা যাবে। ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেকের চিন্তা-ভাবনা হবে একমাত্র নিজের স্বার্থ নিয়ে। সে কেবল নিজেই পেতে চাইবে, অন্যকে তার সুযোগ দিতে রাজি হবে না। সে নিজে অন্যদের কাছ থেকে কেবল গ্রহণ করবে, কাউকে কিছু দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে চাইবে কাজ না করেই কাজের পুরো ফায়দা লাভ করতে। তখন তারা কেবলই বলবে, আমি কি পেলাম, আমি কি করে পেতে পারি! কিন্তু কখনোই স্বীকার করবে না যে, আমার কাছেও কারো কিছু পাওয়ার আছে, কারো প্রতি আমারও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তার নিজের কাছে যা আছে তা থেকে একটি কণাও খসাতে প্রস্তুত নয়; কিন্তু অন্য লোকদের কাছে একটা কণা থাকলে তা হাত করার জন্য পাগলের মতো উদগ্রীব হয়ে উঠবে। কিন্তু এই সময় বিপদের বড় কারণ হলো, এই মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি সমগ্র সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়ে তাকে ভয়ানকভাবে বিষাক্ত করে তুলবে। তখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই কেবল 'নফ্সী' 'নফ্সী' করতে থাকবে। কেউই 'উম্মতী' 'উম্মতী' বলে কাঁদবে না। ব্যক্তি তার ব্যক্তি-স্বার্থ নিয়ে সমাজে চরম অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে, ফলে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এসব স্বার্থপর ব্যক্তি নিজেকে কোনোরূপ অসুবিধায় ফেলতে রাজি হবে না। সামাজিক কল্যাণ ও দায়িত্ব পালনে কেউ অগ্রসর হয়ে আসবে না। সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি ব্যাহত হবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূর্য তখন অস্তমিত হবে। সত্যের নিদর্শন মুছে মিটে যাবে। কল্যাণের সমস্ত উৎসের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আর এ অবস্থা যে মানবতার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই। এ কারণে নবী, রাসূল ও মানব কল্যাণকামী লোকেরা চিরকালই এরূপ অবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়েছেন এরূপ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য। তাঁরা জনগণকে সব সময় উপদেশ দিয়েছেন আত্মত্যাগ, স্বার্থ পরিহার ও সমষ্টির জন্য অর্থ ব্যয় করার নীতি ও আদর্শ গ্রহণের। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করাই যে প্রত্যেকের কর্তব্য, একথা তাঁরা মুখে যেমন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন, তেমনি জীবনের বাস্তবতা দিয়ে তার সত্যতার নিদর্শনও উজ্জ্বল করে তুলে

ধরেছেন বিশ্ব-মানবের সামনে। তাঁদের এ উপদেশ ও বাস্তব পথ-নির্দেশেই অসংখ্য মানুষ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে স্বার্থপর ব্যক্তিদের সমাজে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন। ফলে যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন সমাজ গঠিত হয়েছে, গড়ে উঠেছে নবতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুউচ্চ প্রাসাদ।

বস্তুত যে সমাজ প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ চায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুদৃঢ় বুনিয়াদ সংস্থাপিত করতে ইচ্ছুক, সে সমাজে এমন বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিদের বর্তমান ও সদা-সক্রিয় থাকা আবশ্যক, যারা লওয়ার আগে দিতে প্রস্তুত হবে, অধিকার চাওয়ার আগে কর্তব্য পালন করবে। এমন লোকের প্রয়োজন— যারা সমাজ ও সমষ্টির কল্যাণ উদ্দেশ্যে পরিবারের সাথে বিচ্ছেদকে হাসিমুখে সহ্য করবে, দেশের কল্যাণ-ব্রতে রাজি হবে নিজের ঘর-বাড়ি থেকে চলে যেতে এবং মানুষের অভাব-দারিদ্র দূরীভূত করার মানসে প্রস্তুত হবে নিজের সবকিছু অকাতরে দান করতে। আর প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণ ও জীবনটা উৎসর্গ করে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি-স্বার্থ কুরবান করতে প্রস্তুত যে-সমাজের লোকেরা, নিজেকে বঞ্চিত রেখে যারা অন্যেকে সমৃদ্ধ করতে উৎসাহি, নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যকে সুখী বানাতে যারা প্রেরণা পায় এবং নিজেদের জীবন-আদর্শ ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জন সংগ্রামে মৃত্যুকে সম্বর্ধনা জানাতে প্রস্তুত যে সমাজের ও জাতির লোকেরা, দুনিয়ার সমাজ ও জাতির তালিকায় সেটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত সমাজ ও জাতি।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের লোক কোথায় পাওয়া যাবে ? কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হয়ে আসে এসব গুণে গুণান্বিত মানুষ ?

এর জবাবে একটিমাত্র কথাই বলা সম্ভব। আর তা হচ্ছে, এই ধরনের ও এই গুণান্বিত মানুষ কেবলমাত্র ঈমানের প্রাণ-চাঞ্চল্যেই তৈরী হতে পারে এবং এই ধরনের মানুষ ডিগ্রী নিয়ে বের হয়ে আসে কেবলমাত্র ঈমানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ঈমানই তাকে সক্ষম করে তার অবৈধ লালসা-বাসনা ও স্বার্থবাদ দমন করতে। ঈমানদার মানুষ হয় স্বল্পে তুষ্ঠ। আধপেটা খাবার, লজ্জাস্থান ঢাকবার মতো পোশাক এবং বসবাস করার জন্য একখানি যেমন তেমন ঘরই হয় তার জন্য যথেষ্ট। তার চাইতে বেশি পাওয়ার জন্য সে এমন উপায় কখনোই অবলম্বন করতে প্রস্তুত হবে না, যা আল্লাহ্ কর্তৃক সমর্থিত ও অনুমোদিত নয়। ঈমানদার মানুষের পক্ষেই সম্ভব তার শ্রমার্জিত ধন-সম্পদ অন্য মানুষের অভাব মোচনের জন্য অকাতরে ব্যয় করা। সে তার ধন-মাল ও জীবন দান করেও সন্তুষ্টচিত্ত থাকতে পারে। জিহাদের ময়দানে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারে আনন্দিত চিত্তে। কেননা তার দৃঢ় বিশ্বাস, এ মৃত্যুর পরই তার জন্য জান্নাত অপেক্ষমান রয়েছে। আর রয়েছে আল্লাহ্র সন্তোষ। এবং —

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

আল্লাহ্‌র সন্তোষই হচ্ছে অতীব বড় ও মহামূল্য সম্পদ।

মানুষ সাধারণত কোনো কিছু মুঠোর মধ্যে না পেয়ে কোনো কিছু দিতে রাজি হয় না। ফলে মানুষ নগদ প্রতিফল লাভের জন্য লালায়িত। বস্তুবাদী দার্শনিকদের ধারণা, মানুষ ভালো কাজ করে যে আনন্দ পায় এবং মন্দ কাজ করে যে অনুতাপের দহনে জ্বলে, এটাই তার জন্য নৈতিক প্রতিফল এবং এই প্রতিফলটুকুই মানুষকে ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে লোক সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে করতে অকুস্থলেই প্রাণ দিল, সে কি প্রতিফল পেল ? সত্যের জন্য সংগ্রাম নিঃসন্দেহে অতীব ভালো ও উত্তম কাজ। এজন্য প্রতিফল অবশ্যই তার প্রিয় ও কাম্য। কিন্তু যে লোক কাজ করতে করতে মরে গেল, সে তো মানসিক তৃপ্তি ও সন্তোষ বা আনন্দনুভব করার অবকাশটুকুও পেল না। বস্তুবাদিদের ব্যাখ্যানুযায়ীও সে তার এ কাজের প্রতিফল পাওয়া থেকে বঞ্চিতই থেকে গেল। কেননা তাদের কাছে মৃত্যু তো চূড়ান্ত ধ্বংস, চিরকালের তরে বিনাশ ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। তা হলে ? এ প্রশ্নের কোনো জবাব বস্তুবাদিদের কাছে নেই।

কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি— আল্লাহ দ্বীনের প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমানই এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে, দিতে পারে এই প্রশ্নের সঠিক জবাব। দ্বীনের জন্য আত্মদান-জীবনদান ও অর্থদানের বিনিময়ে তার প্রাপ্য সুনিশ্চিত। ঈমানদার যা দিয়েছে তার বহুগুণ বৃদ্ধিসহ তার কাছে ফিরে আসবে। সে যা কিছু ব্যয় করেছে, আল্লাহ তার পরিবর্তে অনেক কিছুই তাকে দেবেন, যে কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেছে তা মানসিক বা দৈহিক যাই হোক আল্লাহ তার যথাযথ প্রতিফল দেবেন। কিন্তু এই প্রতিফল এ দুনিয়ায় হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইহকালের পর পরকাল রেখেছেন, ইহজীবনের পর অনিবার্য করে রেখেছেন পরবর্তী জীবন— পরকালীন জীবন। ঈমানদার যখন এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য প্রাণ দেয়, তখন প্রকৃতপক্ষেই সে মরে যায় না— নিঃশেষ হয়ে যায় না। সে তো জীবন্ত-চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র কাছে এবং সেখানে সে অমৃতের রিযিক লাভ করতে থাকবে। কুরআন মজীদে এই কথাই ঘোষিত হয়েছে নানা ভাষায় ঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ -

তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তাই তোমাদের প্রতি পুরোপুরি ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না।

—২০

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ -

তোমরা যে জিনিসই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দেবেন এবং তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম রিযিকদাতা।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ -

তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহলে জানবে, লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে থেকে পাওয়া ক্ষমা ও রহমত অতীব উত্তম।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ -

যে সব লোক আল্লাহ্ পথে নিহত হয়, তাদের আমল কস্মিনকালেও ভ্রষ্ট ও নিষ্ফল হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন ও তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার সাথে তিনি তাদের আগেই পরিচিত করিয়েছেন।

ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে যে কষ্টই স্বীকার করে, তা বস্তুগত বা সাংস্কৃতিক হোক, মানসিক হোক কি দৈহিক, তা তার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেলেও আল্লাহ্‌র কাছে রক্ষিত এমন একটি রেকর্ড বহিতে সুরক্ষিত থাকে, যা একবিন্দু পরিমাণও হারাতে বা বিনষ্ট হতে দেয় না কখনো। এমন কি তার দুপা যদি এ পথে কিছুটাও অগ্রসর হয়, তাও লিখিত হয়। এক পয়সা ব্যয় করলেও তা উপেক্ষা করা হয় না। এমন কি ক্ষুধা-পিপাসা বা কষ্টের অনুভূতিও রেকর্ড হওয়া থেকে বাদ থাকে না। আল্লাহ্‌র পথে তাদের পিপাসা, ক্ষুধা ও কষ্ট ও পদচারণা, কাফেরদের থেকে পাওয়া আঘাত— সবকিছুর বিনিময়ে নেকী লেখা হয় তাদের জন্য। কেননা এর প্রত্যেকটিই নেক আমলরূপে গণ্য। আর আল্লাহ তা'আলা নেক আমলকারীর নেকী বরবাদ হতে দেন না।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

তারা অল্প বা বেশি যাই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে ও যে-কোনো পথ বা প্রান্তর অতিক্রম করে তারই অতীব উত্তম প্রতিফল আল্লাহ তা'আলা তাদের দান করবেন।

এ কারণেই দেখতে পাই, ইসলাম তার শক্তি ও বিকাশের পর্যায়ে এ আত্মদান অর্থাৎ কুরবানী করার এমন সব দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, ইতিহাসে যার তুলনা খুবই বিরল। দুনিয়ায় কত মানুষ যে ইসলামের আহবানে দেশে দেশে, যুগে যুগে জিহাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদের ধন-মাল অকাতরে উৎসর্গ করেছে দ্বীন-ইসলামের বিজয় ও বস্তাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সে কাহিনী যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি হৃদয় বিদারক।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের একটি আয়াত পাঠ করাই যথেষ্ট, যাতে মুমিনগণকে আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল ব্যয় করার ও জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতটি শোনামাত্রই লোকেরা তা পালন ও বাস্তবায়নের অতি দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয়ে যায় এবং নিজেদের যাবতীয় ধন-মাল ও জীবন আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে পেশ করে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

হযরত আবু তালহা আনসারী সূরা 'বরায়াত' পাঠ করতে করতে এ আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

তোমরা একাকী বা দলবদ্ধভাবে বের হয়ে পড়ে এবং তোমাদের ধন-মাল ও প্রাণ নিয়োগ করে আল্লাহ পথে জিহাদ করো।

এ আয়াতটি পাঠ করেই তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ একাকী বা দলবদ্ধভাবে— যৌবনকালে কিংবা বার্ধক্যে-বৃদ্ধাবস্থায়— আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কারোরই কোনো আপত্তি শুনতে প্রস্তুত নন, এ আদেশ অকাট্য। তিনি তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন ঃ "হে ছেলেরা! আমাকে এখনি জিহাদের জন্য সজ্জিত করে তৈরী করে দাও, আমি জিহাদে যাব।" তাঁর ছেলেরা বলল ঃ "আব্বা! আপনি আজ এ কি বলছেন ? আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত করুন। আপনি তো নবী করীমের সাথে জিহাদ করেছেন হযরত আবুবকর ও হযরত উমর ফারুকের সঙ্গে একত্রিত হয়ে। তাঁরাও দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। এখন আমরা আপনার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় আপনার জিহাদে যাওয়ার প্রয়োজন কি ?"

আবু তাল্হা বললেন, "না, আমাকে জিহাদের জন্য তোমরা তৈরী করে দাও।" ফলে তারা পিতার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে জিহাদের সাজে সুসজ্জিত করে দেয়। অতঃপর তিনি সামুদ্রিক জিহাদে গমন করেন এবং এই পথেই প্রাণ ত্যাগ করেন। তখন সঙ্গীরা তাঁকে দাফন করার জন্য কোনো উপকূল বা দ্বীপের সন্ধান পায় না। সাত দিন পরই তাঁকে দাফন করা সম্ভব হয়।

হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব জিহাদ-যুদ্ধে বের হয়ে গেলেন। ফলে তাঁর একটি চক্ষু তিনি হারাতে বাধ্য হন। তখন তাঁকে বলা হলোঃ আপনি অসুস্থ, রোগাক্রান্ত। এ অবস্থায় আপনার যুদ্ধ করা চলে না। তিনি শুনে বললেন ঃ "আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাই। আল্লাহ্র নির্দেশ তো এই যে, সচ্ছল বা অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই জিহাদে যেতে হবে। আমি কি করে পশ্চাদপদ হতে পারি ?"

সিরীয় যুদ্ধক্ষেত্রে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল, বার্ধক্যের আতিশয্যে তার ভ্রুদ্বয় চক্ষুদ্বয়ের উপর ঝুলে পড়েছে। তখন তাঁকে বলা হলো, হে চাচা! আপনি তো এত বৃদ্ধ যে, আল্লাহ আপনার অক্ষমতা নিশ্চয়ই দেখছেন। বৃদ্ধ বললেন ঃ "হে ভাইপো! তুমি কি বলছ ? আল্লাহ তো বলেছেন, ভালো অবস্থা বা মন্দ অবস্থা— উভয় অবস্থায় জিহাদে যেতে হবে।"

একটি জিহাদে পিতা ও পুত্র দুজনই যোগদান করার জন্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। দুজনার মধ্যে কার যাওয়া উচিত, তা নিয়ে 'কোরয়া' ফেলা হয়। ফলে পুত্রের পক্ষে অনুমোদন প্রকাশ পেল। তখন পিতা আকুল কণ্ঠে বলে উঠল ঃ "ছেলে! আমাকে যাওয়ার সুযোগ দাও, তুমি পিছনে থেকে যাও। আমি তো তোমার পিতা! তখন পুত্র বলে উঠল, হে পিতা! এ জিহাদের ফলে জান্নাত রয়েছে। অন্য কিছু হলে নিশ্চয়ই আমার পরিবর্তে আপনাকে যাওয়ার সুযোগ দিতাম।"

হযরত আমর ইবনুল জুমুহ্ আল-আনসারী ছিলেন পংগু। তাঁর চারটি যুবক বয়সের ছেলে রাসূলে করীমের কাফেলায় শরীক হয়ে জিহাদে যোগদান করেছিল। একদিন পিতা এক পুত্রকে ডেকে বললেন, আমাকেও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরী করে দাও। পুত্ররা বলল ঃ পিতা! আল্লাহ তো আপনাকে যুদ্ধে যাওয়ার কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। আপনি যদি ঘরে থাকেন, তাহলে আমরা আপনার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করছি এইতো যথেষ্ট। জিহাদের দায়িত্ব আল্লাহ আপনার উপর থেকে তুলে নিয়েছেন। এই কথা শুনে তিনি রাসূলে করীমের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন ইয়া রাসূল! আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যেতে নিষেধ করছে— বাধা দিচ্ছে! আল্লাহ শপথ! আমি তো জিহাদে গিয়ে শহীদ হতে এবং আমার এই পংগু দেহ নিয়ে জান্নাতে উড়ে যেতে চাই।

জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ একথা ঠিক যে, তোমার উপর থেকে জিহাদে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা আল্লাহ তা'আলা তুলে নিয়েছেন। অতঃপর পুত্রদের বললেন, "তোমরা তোমার পিতাকে জিহাদে যেতে দিচ্ছ না কেন ? গেলে হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করতে পারেন। তখন আমর রাসূলে করীমের অনুমতিক্রমে ওহুদ যুদ্ধে শরীক হয়ে শাহাদত লাভ করেন। তখন নবী করীম (স) আনসারদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

إِنَّ مِنْكُمْ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ عَمْرُبْنُ الْجَمُوْحِ -

হে আনসার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, সে যদি আল্লাহ নামে কসম খায়, তা হলে আল্লাহ তাকে ভালো করে দেয়। আমর ইবনুল জুমূহ্ তাদের একজন।

আত্মদান করে আনন্দ লাভ, ধন-সম্পদ দান করে তৃপ্তি পাওয়া ও আল্লাহ্র সন্তোষপূর্ণ সুসমৃদ্ধ জীবন লাভের ধন্য হওয়া এবং নিজেকে বঞ্চিত করা, কষ্ট-দুঃখ ও উৎপীড়ন ভোগ করতে রাজি হওয়ার এসব ইতিহাস কেবলমাত্র ঈমানেরই অবদান। ঈমান ছাড়া এ ধরনের দৃষ্টান্ত অন্য কোনো কিছু পেশ করতে পারে কি?

হযরত মুসায়্যিব ইবনে উমাইর একজন যুবক। প্রাচুর্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অফুরন্ত সামগ্রীর মাঝে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। তাঁর বাপ-মা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এ পুত্রকে, সবচাইতে বেশি দৃষ্টি, বেশি বেশি স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্ন এই ছেলের জন্য। অতিশয় মূল্যবান খাদ্য তাঁর ভোগের জন্য প্রস্তুত, অতীব জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁর নিত্যকার ভূষণ। এই ধরনের এক যুবক কোনো কারণে এ হেনে ভোগ-সম্ভোগ ও আয়েশ-আরামের জীবন প্রত্যাখ্যান করে কষ্ট দুঃখ নির্যাতন ও যুদ্ধ-সংগ্রাম, দারিদ্র ও দেশত্যাগের নিরতিশয় বন্ধুর জীবনপথ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হলেন? দেশ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে প্রথমে হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরত করার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন কিসের জন্য? কোন কারণে তিনি এই বিদেশ-বিভঁইয়ে এসে ওহুদ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন? শাহাদত বরণের পর তাঁর লাশ ঢাকবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাপড় মুসলমানরা খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত এক টুকরা কাপড় পাওয়া গেল। তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পায়ের দিক অনাবৃত থেকে যায়, আর পা ঢেকে দিলে মাথা খোলা থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিলেন যে, কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দাও এবং পাও ঢেকে দাও ঘাস দিয়ে। এরূপ অবস্থা হলো কার? সেই যুবক মুসায়্যিব ইবনে উমাইর (রা) এর, যার জীবনের সুখ-সম্ভোগ ও প্রাচুর্যের কথা একটু পূর্বেই বলা হলো। কি কারণ ছিল এর মূলে? ... একমাত্র ঈমান। এর কথা বলতে গিয়েই রাসূলে করীম (স) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেছিলেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا -

মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্র সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক তাদের অংশ পূর্ণ করে দিয়েছে, আর

তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এখনো অপেক্ষা করছে। তারা তাদের প্রতিশ্রুতিতে এক বিন্দু পরিবর্তন বা হেরফের আসতে দেয়নি।

দ্বীনের জন্য প্রাণ দানের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাশেই রয়েছে অকাতরে অর্থ দানের অত্যুজ্জ্বল ঘটনাবলী। হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, কুরআন মজীদের আয়াত ঃ

مَنْ ذَاالَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا –

আল্লাহ্র জন্য উত্তমভাবে 'ঋণ' দান করতে কে প্রস্তুত আছে ?

যখন নাযিল হয়, তখন হযরত আবুদ-দাহ্দাহ্ (রা) নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন ঃ আপনার জন্য আমার বাপ-মা উৎসর্গ হোক হে রাসূল! আল্লাহ্র তো সর্ব অভাবমুক্ত, সবকিছুর মালিক, তিনি আবার আমাদের কাছে 'ঋণ' চাইছেন কেন ? জবাবে নবী করীম (স) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তো তাই। তবে তিনি তোমাদের জান্নাতে পৌঁছাবেন বলেই তোমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন। তখন আবুদ দাহ্দাহ বললেন, আমি যদি আমার আল্লাহকে 'ঋণ' দেই, তাহলে তার বিনিময়ে আমি ও আমার সঙ্গে আমার কন্যা দাহ্দাহ্র জান্নাতে যাওয়া কি নিশ্চিত হবে ? রাসূলে করীম (স) বললেন, 'হ্যাঁ, তা অবশ্যই নিশ্চিত। তখন আবদ্ দাহ্দাহ্ বললেন ঃ আপনার হাতখানা আমার হাতে দিন। রাসূল করীম (স) তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন সাহাবী বললেন ঃ 'আমার দুটি বাগান আছে। একটি নিম্নস্থানে, আর অপরটি উচ্চস্থানে। আল্লাহ্র নামে শপথ, এই দুটি বাগান ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদ-সম্পত্তি নেই। আমি এই দুটি বাগানই আল্লাহ্র জন্য 'ঋণ' হিসাবে দান করে দিলাম। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ না, দুটি বাগানই নয়। এর একটা বাগান তুমি আল্লাহ্র জন্য দান করো। আর অন্যটি তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। এ কথা শুনে সাহাবী বললেন ঃ

فَاُشْهِدُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّیْ قَدْجَعَلْتُ خَيْرَ هُمَا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ حَائِطٌ فِيْهِ سِتّمَائَةِ نَخْلَةٍ –

আপনি সাক্ষী থাকুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অপেক্ষাকৃত উত্তম বাগানটি আল্লাহ্র জন্য দান করে দিলাম। আর এ বাগানটি প্রাচীর বেষ্টিত, তাতে ছয়শতটি খেজুর গাছ রয়েছে।

মনে রাখা আবশ্যক, খেজুর গাছই ছিল তদানীন্তন আরব সমাজের প্রধান সম্পদ ও সম্পদের উৎস এবং খেজুরই ছিল প্রায় একমাত্র খাদ্য।

নবী করীম (স) সাহাবীর এ দান গ্রহণ করে বললেন ঃ

اِذًا يُجْزِئُكَ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ -

আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমাকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।

অতঃপর আবুদ্ দাহ্দাহ্ সেখান থেকে উঠে গেলেন। বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পান, তার স্ত্রী— দাহ্দাহ্র মা— ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ্কে 'ঋণ' হিসেবে দেয়া বাগানটিতে রয়েছে। তাঁরা খেজুর গাছের চারদিকে ঘোরা-ফেরা করছে ও খেজুর আহরণ করছে, খাচ্ছে।। আবুদ দাহ্দাহ্ তাদের দেখে কবিতার ভাষায় বললেন ঃ

আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণ, মঙ্গল ও হেদায়েতের পথ প্রদর্শ করুন,

এ বাগানটি ছিল আমার কাছে অতিশয় প্রিয়,

কিন্তু তা সত্ত্বেও ঋণ দিতে বাঁধে নি,

আমি এ বাগানটি 'ঋণ' দিয়েছি আল্লাহ্কে

বড় বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে।

নিজের ইচ্ছায়, কোনোরূপ স্বার্থপরতা বা বিভ্রান্ত হওয়া ব্যতিরেকেই— পরকালে এর বহুগুণ বেশি ফিরে পাওয়ার আশায়।

অতএব তোমরা সকলে নিজে ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এ বাগান ছেড়ে চলে যাও।

ঋণদান অতীব পূণ্যময় কাজ, উত্তম পাথেয়— কোনো সন্দেহ নেই তাতে। এর গতি পরকালের দিকে অবশ্যই।

তাঁর স্ত্রী— দাহ্দাহ্র মা— তা শুনে উৎফুল্ল মনে বলে উঠলেন ঃ

رَبِّعَ بَيْعُكَ - بَارَكَ اللّٰهُ فِيْمَا اشْتَرَيْتَ -

তোমার এ বিক্রয়-ব্যবসা খুবই লাভজনক হবে। বিনিময়ে তুমি যা ক্রয় করেছ তাতে তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা অশেষ বরকত দান করবেন।

এরপর দাহ্দাহ্র মা শিশু-সন্তানদের প্রতি নযর দিলেন এবং তাদের মুখ ও হাত থেকে খেজুরসমূহ বের করে নিলেন। কেননা এ বাগানের খেজুরে এখন তাদের কোনো অধিকার নেই। এ বাগানটি তখন আল্লাহ্র মালিকানায়। পরে তারা এ বাগান ছেড়ে তাদের অন্য বাগানটিতে চলে গেলেন। এই ঘটনার কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন ঃ

كَمْ مِّنْ عَذْقٍ رِدَاحٌ وَدَارٌ فَيَاحٍ لِأَبِيْ الدَّحْدَاحِ -

কত শত ফলের গাছ এবং সুগন্ধিপূর্ণ ঘরবাড়ি সুনির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে আবুদ্ দাহ্দাহর জন্য।

বস্তুত নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রত্যেক যুগের অনুসারীদের ইতিহাসে এ ধরনের আত্মদান ও সম্পদ দানের কাহিনীর কোনো সীমা-সংখ্যা নেই। তাঁরা বাস্তবিকই আল্লাহ্র পথে ত্যাগ ও তিতিক্ষার এবং কুরবানীর এ অভূতপূর্ব নিদর্শন কায়েম করেছেন। এবং তার মূলে ঈমান ভিন্ন অন্য কোনো গুণ বা ভাবধারাই ছিল না। এসব একমাত্র ঈমানেরই অবদান। ঈমানই মানুষকে এত অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকারের জন্য তৈরী করতে পারে। অতীতেও তাই করেছে, বর্তমান কালেও এরূপ অকাতরে দান ও তিতিক্ষার দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নেই। ঈমান আজও এরূপ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে দুনিয়ার যে কোনো সমাজে।

শক্তি-সামর্থ্য ও তেজ-বীর্য

মানুষের মনেআশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই। আছে বহু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তার অনেকগুলো অতি নিকটবর্তী। কিন্তু সে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের পথ দীর্ঘ, কন্টকার্কীণ ও বন্ধুর। আর সে সবের পরিণাম-পরিণতি বিভিন্ন, বিচিত্র। এর কতগুলো উৎসারিত মানব প্রকৃতি ও স্বভাব থেকে। আর তা-ই আল্লাহ্‌র স্থায়ী নিয়ম। আর কতগুলো মানুষের মন ও মানস নিঃসৃত। সে যাই হোক। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষকে কষ্টকর জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয়। চালাতে হয় ক্রমাগত চেষ্টা ও সাধনা। তাদের একদিকে লক্ষ্য থাকে দুঃখ-কষ্ট এড়ানো। আর সেই সঙ্গে থাকে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের ঐকান্তিক বাসনা ও ইচ্ছা।

এই ক্ষেত্রে মানুষের অতিশয় প্রয়োজন হচ্ছে শক্তির, যার উপর সে নির্ভর করতে পারে। যা তার চেষ্টাকে ফলবতী করবে। শক্তি তার নিজ গুণেই মানুষকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেবে, দুঃখ-কষ্টকে অনেকখানি লাঘব করবে, বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ পথ-লোকে তার জন্য মসৃণ ও সুগম বানিয়ে দেবে, তার চলার ও চেষ্টার পথকে করে তুলবে আলোকমণ্ডিত।

কিন্তু এ শক্তি কোথায় পাওয়া যাবে ? এ শক্তির একমাত্র উৎস হচ্ছে ঈমান ও আকীদা। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানই মানুষকে এই শক্তি সম্ভার পরিবেশন করতে পারে। এই ঈমানই মানুষকে সাহায্য করতে পারে শক্তির মৌল ভাবধারা দিয়ে, আত্মার অমিত তেজ ও বীর্যবত্তা দিয়ে। অতএব মুমিন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ— আল্লাহ্‌র সাহায্য চায়। আল্লাহ্‌র আযাব ছাড়া আর কোনো কিছুকে ঈমানদার লোকেরা ভয় পায় না। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলার জন্য তারা আর কারোরই পরোয়া করে না। এ কারণে তারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়েও হয় অতিমাত্রায় শক্তিশালী। তাদের ভাণ্ডার লৌহ সিন্দুক বা ব্যাংকের খাতা স্বর্ণ-রৌপ্য পরিপূর্ণ না থাকলেও তারা হয় বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক। তারা দুর্জয়, অমিত শক্তির অধিকারী, যদিও তাদের সঙ্গে নেই তাদের বংশ, পরিবার ও অনুসারীদের অন্ধ আনুকূল্য। তাদের জীবন তরী কম্পমান ও ঝঞ্ঝাহত হলেও তারা সুদৃঢ় মনোবলে বলীয়ান। তারা ঈমানী শক্তিতে নদী-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ও প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝায় শক্তি ও সাহসের পতাকা চির উন্নত করে রাখে।

হাদীসে তাই বলা হয়েছে ঃ

لَوْعَرَفْتُمُ اللّٰهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهٖ لَزَالَتْ بِدُعَائِكُمُ الْجِبَالُ -

তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে চিনতে পেরে থাকো, তাহলে তোমাদের দো'আয় পর্বতও টলে যেতে পারে।

ব্যক্তি-হৃদয়ের এই শক্তিই গোটা সমাজ সংস্থার শক্তির উৎস। যে সমাজ এ ধরনের শক্তিমান ও বীর্যবত্তাশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত, সে সমাজ নিঃসন্দেহে অতীব সৌভাগ্যের অধিকারী। পক্ষান্তরে যে সমাজে এ ধরনের ব্যক্তিদের অনুপস্থিতি, তার মতো হতভাগ্য ও ধ্বংসোন্মুখ সমাজ আর একটিও হতে পারে না। কেননা তারা না পারে বন্ধুদের কোনোরূপ সাহায্য করতে, না তাদের দেখে একবিন্দু ভয় পায় শত্রুপক্ষ। এদের দ্বারা সমাজের কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না, কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে ও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না এই ধরনের লোকদের নিয়ে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানই মুমিনের শক্তি-উৎস

মুমিন ব্যক্তি শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী। কেননা সে শক্তি লাভ করে মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। তাঁরই প্রতি তার ঈমান। তার নির্ভরতা একমাত্র তাঁরই উপর। তার বিশ্বাস, সে যেখানেই থাকুক, আল্লাহ্‌র তার সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ্‌ই ঈমানদার লোকদের একমাত্র সাহায্যকারী এবং বাতিল পন্থীদের ব্যর্থ মনোরথ করে দেন তিনিই। বস্তুত ঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

যে লোক আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরতা গ্রহণ করে (তার জানা আছে) আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন মহাশক্তিশালী ও সুবিজ্ঞানী।

তিনি শক্তিশালী। অতএব যে লোক কেবলমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করে, আল্লাহ তাকে কখনো ব্যর্থ, আশাহত ও লাঞ্ছিত করেন না। তিনি এমন সুবিজ্ঞানী যে, যে লোক তাঁর বিজ্ঞানমূলক কাজকর্ম ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে তিনি ধ্বংস করেন না— ধ্বংস হতে দেন না।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ -

যে লোক আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

আল্লাহ্ই যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারে না, আর তিনিই যদি তোমাদের অপমানিত-লাঞ্ছিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তোমাদের আর কে সাহায্য দেবে ? কাজেই মুমিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহ্র উপরই নির্ভরতা গ্রহণ করা।

আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ঈমানের ফসল। তা অক্ষমতার প্রকাশও নয়, নয় বাতিল পন্থাও। তা আলস্য বা কর্ম বিমুখতাও নয়। তাওয়াক্কুল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, তা গভীর মন ও মানসের বিপুল ঐশ্বর্য, বীর্যবত্তায় সমৃদ্ধ। তাওয়াক্কুল করেই মুমিন প্রতিরোধ শক্তিতে বলীয়ান হয়। আত্ম-চেতনায় দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ হয়, বারবার ব্যর্থতার পরও বারবার সমধিক বিক্রম ও সাহসিকতার সাথে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার দূরন্ত প্রেরণায় হয় উদ্বুদ্ধ। দুর্জয় সংকল্প ও অসীম ইচ্ছাশক্তি তার হৃদয়মনকে সব সময় কানায় কানায় ভরে রাখে। আল্লাহ নবী-রাসূলগণের এরূপ তুলনাহীন তাওয়াক্কুল এবং শত্রুর মুকাবিলায় অতুলনীয় দৃঢ়তার কাহিনী কুরআন মজীদে বহু স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত হুদ আদ জাতির নবী। তিনি তাঁর জাতির লোকজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে এই তাওয়াক্কুলকেই গ্রহণ করেছিলেন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে, সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নির্লিপ্ত-নির্বিঘ্ন আশ্রয় রূপে। জাতির লোকেরা বলল ঃ

يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ - اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ (هود : ٥٣-٥٤)

হে হুদ! তুমি আমাদের সামনে তোমার আহবানের সত্যতার যত যুক্তি-প্রমাণই পেশ করো না কেন, আমরা কিন্তু তোমার কথায় পড়ে আমাদের আবহমানকালের উপাস্য দেবতাদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আর আমরা তোমাদের প্রতিও ঈমান আনছি না। আমরা শুধু বলছি, আমাদের কোনো দেবতাই তোমাকে খারাপ ভাবে যাদু করেছে (অথবা যাদু করে খারাপ করে দিয়েছে)।

হযরত হুদ বললেন ঃ

قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ - اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (هود : ٥٤-٥٦)

আমি আল্লাহ্‌কেই সাক্ষী বানাচ্ছি, তোমরাও সাক্ষী থেকো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে তাঁকে ছাড়া যে শিরক করছ তা থেকে আমি দায়িত্বমুক্ত। কাজেই তোমরা সকলে মিলেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক। কিন্তু জেনে রাখো, তোমরা (বেশিদিন) সুযোগ পাবে না। আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই তাওয়াক্কুল করেছি— তিনি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু, তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তিনিই। দুনিয়ায় যত বিচরণশীল জীবই রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই ললাটদেশ তিনি ধারণ করে আছেন। আমার আল্লাহ্‌ তো সদা সত্য, সঠিক, নির্ভুল, ঋজু পথে রয়েছেন।

হযরত শুয়াইবের কাহিনী স্মরণ করো। তাঁর জাতির লোকেরা উন্নাসিকতায় উচ্চু মাথা। নবীকে নানাভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাইছে।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا -

তার জাতির অহংকারী দাম্ভিক লোকেরা বলল, হে শুয়াইব। তোমরা এবং তোমার সাথে যারা যারা ঈমান এনেছে তাদের সবাইকে আমাদের দেশ ও নগর থেকে বহিষ্কৃত করব। (আর তা থেকে রক্ষা পেতে হলে) তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের জাতীয় আদর্শের দিকে।

তখন হযরত শুয়াইব বললেন ঃ

اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّآ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط ... عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا -

আমরা যদি তোমাদের আকীদা-আদর্শ ঘৃণা ও অপছন্দ করি, তবুও ..? আমরা যদি তোমাদের জাতীয় আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন গ্রহণ করি— তা থেকে আল্লাহ আমাদের মুক্তি দিয়েছেন এ সত্ত্বেও— তাহলে তো আমরা আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা কথা রচনা করার অপরাধে অপরাধী হব। আমরা সেদিকে প্রত্যাবর্তন করব কি কারণে ? আমাদের আল্লাহ না চাইলে তা হতে পারে না— আর আমরা তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে বসে আছি ...।

হযরত মূসা (আ) তার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ফিরাউনের সৈন্যবাহিনী থেকে মুক্তি পেয়ে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ –

হে জনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁরই উপর পুরোপুরি নির্ভরতা গ্রহণ করো যদি তোমরা মুসলিম হও।

আয়াতটির ভাষা থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে থাকলে ভরসা তাঁরই উপর করতে হবে এবং ঈমানের বাস্তব পরিণতি যেমন ইসলাম, তেমনি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলও এ ঈমানেরই অনিবার্য দাবি। হযরত মূসার কথা শুনে সঙ্গের লোকেরা বলে উঠল ঃ

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ – وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ –

আমরা আল্লাহ্‌র উপরই পুরোপুরি নির্ভরতা গ্রহণ করেছি। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা! তুমি আমাদের জালিম জনগণের জন্য পরীক্ষার লীলাকেন্দ্র বানিও না। তুমি আমাদের কাফের জাতির অক্টোপাস থেকে তোমারই রহমতের সাহায্যে মুক্তি দাও।

কয়েকজন নবী-রাসূলের কাহিনী সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হলো। কিন্তু এ কাহিনী এই কয়জন নবী পর্যন্তই সীমাবদ্ধা নয়। সব নবী-রাসূলের কাহিনী এমনি ঐকান্তিক আল্লাহ নির্ভরতায় ভরপুর। শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষে অন্ধ জনগণ এবং তাদের লোমহর্ষক অত্যাচার-উৎপীড়নের মুকাবিলায় এই তাওয়াক্কুলকেই তারা একমাত্র অস্ত্ররূপে গ্রহন করেছিলেন এবং এই তাওয়াক্কুলেই তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন সমস্ত সংগ্রাম-মুকাবিলায়। তাঁদের আকীদা ও ঘোষণা ছিল শুধু এই ঃ

وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۞

আমরা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল না করে কি করে থাকতে পারি! তিনিই তো আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের নির্ভুল পথ। আর তোমরা আমাদের উপর যে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়েছ সেজন্য আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব। আর তাওয়াক্কুলকারী লোকদের উচিত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করা।

বস্তুত আল্লাহ্‌ই মানুষকে নির্ভুল পথ দেখিয়েছেন। এজন্য সে পথে চলার ব্যাপারে তাঁর-ই উপর নির্ভরতা গ্রহণ করা কর্তব্য। আর এ পথে যদি

অত্যাচার-উৎপীড়নে নিমজ্জিত হতে হয়, তাহলে তার জন্য অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বিপদে ধৈর্য তাওয়াক্কুলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অনিবার্য পরিণতি। মানুষমাত্রই পর-নির্ভরতার মুখাপেক্ষী। অতএব সে পর-নির্ভরতা হওয়া উচিত একমাত্র আল্লাহ্র উপর। অন্য কারোর উপর নয়।

মহাসত্যে ঈমান

মুমিন যে মহাসত্যকে সমগ্র জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, সেই মহাসত্য থেকেই সে শক্তি আহরণ করে। সে উপস্থিত স্বার্থ বা ক্ষণস্থায়ী সুখ-সুবিধা লাভের জন্য লোভ ও লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উড়ন্ত হুজুগে পড়েও সে হাত দেয় না কোনো কাজে। অনৈসলামিক হিংসা-বিদ্বেষে অনুপ্রাণিত হয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ে না কোনো দক্ষযজ্ঞে। অপর কারো স্বার্থহানিকর কাজ তাকে বিন্দুমাত্র আসক্ত বা প্রলোভিত করতে পারে না। সে কাজ করে সত্যের জন্য। মহসত্যই তার কাজের প্রেরণা, উৎস। কোন মহাসত্য ? যে মহাসত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী। আর যা সত্য, তারই অধিকার রয়েছে সুসম্পন্ন হওয়া এবং যা বাতিল, তা অ-কৃত থাকারই যোগ্য।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ - (الانبياء : ١٨)

বরং আমরা মহাসত্যকে বাতিলের উপর নিক্ষেপ করি। সে মহাসত্য তখন বাতিলের মগজ-মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে ধ্বংস করে। অতঃপর তা বিলীন ও বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় মহাশূন্যতায়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

ঘোষণা করে দাও মহাসত্য সমুপস্থিত, বাতিল বিলীন হয়ে গেছে। আর বাতিল তো নিশ্চিতরূপে ধ্বংসশীল।

কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি হযরত সায়াদ ইবনে আবু ওআক্কাস কর্তৃক প্রেরিত রব্য়ী ইবনে আমের পারস্য সেনাধ্যক্ষ রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হলেন। রুস্তম তখন বিপুল সংখ্যক সভাসদ, অনুচর ও সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছে স্বর্ণ-রৌপ্যে সুসজ্জিত দরবারে। কিন্তু রবয়ী বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। তিনি তাঁর অনুচ্চ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী হয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। অশ্বের লাগাম মোটা-মোটা ও অমসৃণ। তাঁর নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ 'অসভ্য' পর্যায়ের। রুস্তম তাঁকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করল ঃ

কে তুমি ? আর তোমরা কারা ?

রবয়ী জবাবে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন ঃ

نَحْنُ قَوْمٌ اِبْتَعَثَنَا اللّٰهُ لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهٗ وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا اِلٰى سِعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلٰى عَدْلِ الْاِسْلَامِ -

আমরা এমন এক জাতি যাদের আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন, তিনি যাদের চান তাদেরকে মানুষের দাসত্ব শংখল থেকে মুক্তি দিয়ে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র বন্দেগী ও দাসত্বে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার বিশাল-বিপুল উদারতার দিকে এবং বহু ধর্মের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে ইসলামের নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণতাপূর্ণ সুবিচারের দিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ ও মহাসত্যের প্রতি ঈমানের কারণে মুমিন দাঁড়ায় শক্ত মাটিতে। সে মাটি ধ্বসেও যায় না, কাঁপেও না। সে ধারণ করে এমন একটা শক্ত রশি, যা কখনোই ছিন্ন হয় না— হতে পারে না। এক সুদৃঢ় স্তম্ভই হচ্ছে তার পৃষ্ঠপোষক।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا-

যে লোক আল্লাহ্দ্রোহী শক্তিসমূহকে অমান্য-অস্বীকার করল এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনল, সে ধারণ করল এমন এক সুদৃঢ় রশি, যা কখনো কেটে ছিন্ন হয়ে যায় না। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৬)

কাজেই মুমিন নির্মূল ধ্বংসশীল কোনো সৃষ্টি নয়, নয় এমন কলি যা প্রষ্ফুটিত হয়ে পরিপূর্ণ কুসুমে পরিণত হয় না। সে-ই হচ্ছে আল্লাহ্র জমিনের আল্লাহ্র খলীফা। বাতিলপন্থীরা যদি তাদের উপর হামলা করে দেয়—

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرًا ۝

তাহলে আল্লাহ্ই হচ্ছে তাদের মুনিব এবং জিবরাঈল ও নেক্কার মুমিনগণও। আর তাদের পরে ফেরেশতারা হচ্ছেন তাদের পৃষ্ঠপোষক।

তাহলে মুমিন কি করে অন্য মানুষের সামনে তাদের দাপটে বিন্দুমাত্র ভয় পেতে পারে ? ফেরেশতারাই তো তাদের সাহায্যে নিয়োজিত। মুমিন কি করে সৃষ্টি সম্মুখে মস্তক অবনমিত করতে পারে, যখন স্বয়ং স্রষ্টা তার সঙ্গে সহায় ও সাহায্যকারী হয়ে আছে ?

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ -

ঈমানদার লোকেরা তো সেই ধরনের মানুষ যাদের লোকেরা বলল, তোমাদের জন্য বহু সংখ্যক শত্রুসেনা সমবেত হয়ে আছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো, তখন এ কথায় তাদের ঈমানের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তারা তখন বলে, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম পৃষ্ঠপোষক। ফলে তারা আল্লাহ্র নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হলো, কোনো প্রকার দুঃখ-বিপদই তাদের স্পর্শও করতে পারে নি।

এ ঈমানের অনমনীয়তাই আসহাবে কাহাফের ঐতিহাসিক কিস্সা রচনা করেছে। তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হয়েও মহা পরাক্রমশালী অত্যাচারী ও ভিন্নধর্মীয় বাদশাহের মুকাবিলায় দুঃসাহস করে। বাদশাহ যেমন ছিল, জাতির জনতা ছিল তদধিক হিংসুক ও বিদ্বেষী, নির্মম, নির্দয়। আর তাদের মুকাবিলায় এ যুবকদের ছিল না কোনো সহায়-সম্বল-সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র ঈমানী শক্তির অধিকারী এই স্বল্প সংখ্যক লোকদের অতুলনীয় দুঃসাহসিকতার কিস্সার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى - وَّ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا - هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ط لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ط فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا- (الكهف : ١٣-١٥)

ওরা ছিল কয়জন যুবক। ওরা তাদের আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল। আমরা হেদায়েতের দিক দিয়ে তাদের খুব দৃঢ় ও মজবুত বানিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরসমূহ (ধৈর্য ও দৃতার বাঁধনে) শক্ত করে বেঁধে দিলাম। তারা যখন (সত্যের পথে) শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তখন তারা (স্পষ্ট ভাষায়) বলে দিল ঃ আমাদের আল্লাহ্ তো তিনি, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু; তাঁকে ছাড়া আমরা অন্য কোনো মাবুদকে ডাকতে বা পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করতে প্রস্তুত নই। আমাদের জাতির এই লোকেরা— যারা আল্লাহ্রকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যাদেরকে মাবুদ ও উপাস্য রূপে মেনে নিয়েছে তারা যদি মাবুদ হবে তাহলে তার পক্ষে উজ্জ্বল প্রমাণাদি পেশ করে না কে ?

(আসলে তাদের মতের কোনো যুক্তি বা প্রমাণ নেই) তাহলে মিথ্যা কথা বলে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে ভিত্তিহীন দোষারোপ করে তাদের চাইতে অধিক জালিম আর কে হতে পারে ?

চিরন্তনতার প্রতি ঈমান

মুমিন শক্তি লাভ করে চিরন্তনতার প্রতি ঐকান্তিক ও দৃঢ় প্রত্যয় থেকে। কেননা তাদের ঈমান হলো দুনিয়ার এই সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ জগতের নির্দিষ্ট ও গণনাযোগ্য কয়েকটি দিনের মধ্যেই তাদের জীবন ও স্থিতি সীমিত নয়। তাদের জীবন হলো চিরন্তন অবিনশ্বর জীবন এবং সে জীবন দুটি স্তরে বিভক্ত। বর্তমান স্তর তো চলছে। এখান থেকে মহাযাত্রা হবে পরবর্তী স্তরে। বস্তুত মৃত্যু এক মহাযাত্রা বৈ কিছু নয়। তবে সে যাত্রা হচ্ছে নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে।

বদর যুদ্ধ চলাকালে উমাইর ইবনুল হামাম আল-আনসারী শুনতে পেলেন, নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَامِنْ رَجُلٍ يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ - الْمُشْرِكِيْنَ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ -

যার হাতে আমার জান-প্রাণ, সেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আজকের দিন যে ব্যক্তিই মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হবে ধৈর্যধারণকারী ও আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াব পাওয়ার সচেতন আশাবাদী সামনের দিকে অগ্রসরমান রূপে, পাশ্চাদপসরণকারী হিসেবে নয়— তাকেই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে দাখিল করবেন।

হযরত উমাইর একথা শুনে মুখে বিস্ময় প্রকাশকারী শব্দ উচ্চারণ করলেন। রাসূলে করীম (স) সে শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে উমাইর! তুমি কিসে বিস্ময় প্রকাশ করছ ? তিনি বললেন ঃ

আমার জান্নাতে প্রবেশ করার শুধু এতটুকুই বিলম্ব যে আমি অগ্রসর হয়ে কাফের-মুশরিকদের উপর হামলা করব এবং তাতে আমি নিহত হব।

নবী করীম (স) বলছেন ঃ হ্যাঁ। তখন উমাইরের হাতে খেজুরের একটি ছড়া ছিল। তিনি তা থেকে ছিড়ে ছিড়ে খেজুর খাচ্ছিলেন। রাসূলে করীমের মুখে 'হ্যাঁ' শুনে তিনি আত্মগতভাবে বললেন ঃ 'এই খেজুরগুলো খাওয়া শেষ করা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব ? সে তো অনেক দীর্ঘ জীবন! এই বলে তিনি খেজুর ছড়া দূরে

নিক্ষেপ করলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপরই শত্রুর আঘাতে শাহাদত বরণ করলেন।

হযরত আনাস ইবনে নজর (রা) ওহুদের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধকালে হযরত সায়াদ ইবনে মুয়াযের সাথে সাক্ষাত হলো। বললেন ঃ হে সায়াদ! আমি তো ওহুদ পর্বতের ওপাশ থেকে আসা জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি।

তক্‌দীরে প্রতি ঈমান

মুমিনের শক্তি উৎস তকদীর বিশ্বাস। সে নিঃসন্দেহে জানে, যে বিপদই আসুক, তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই আসবে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই হতে পারে না। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একত্রিত হয়েও যদি তার উপকার করতে চায় তবে তা পারবে শুধু ততটুকুই, যতটুকু আল্লাহ তার জন্য আগেই লিখে রেখেছেন। অনুরূপভাবে তারা সকলে মিলে যদি তার একবিন্দু ক্ষতি করতে চায় তবে তা পারবে না। পারবে শুধু ততটুকু, যতটুকু আল্লাহ্‌র তার জন্য পূর্বে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।ঃ

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

বলে দাও, কোনো বিপদ কখনোই আমাদের উপর আসবে না। আসবে শুধু ততটুকু, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মনিব আর ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করা।

মুমিনের ঈমান হলো, তার রিযিক ইতিপূর্বেই ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তার বয়ঃসীমা ও মৃত্যুকালও রয়েছে সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ তার জন্য যতটা রিযিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা পুরোপুরি পাওয়ার পথে এক বিন্দু বাধার সৃষ্টি করতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। তার আয়ুষ্কালও কেউ বাড়াতেও পারে না, কমও করতে পারে না— আল্লাহ যা নিদিষ্ট করেছেন তা থেকে। বস্তুত এই আকীদা ঈমানদারকে এমন এক দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস দেয়, যার কোনো সীমা নেই। এমন শক্তি ও বীর্যবত্তা দেয়, যা কোনো মানবীয় শক্তি পরাজিত করতে পারে না। একজন মুজাহিদ আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য জিহাদে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। পথিমধ্যে কিছু লোক তাকে বাঁধা দিল। বলল, তোমার পরিবারবর্গকে অসহায় করে রেখে তুমি কেমন করে মৃত্যুর মুখে চলে যাবে ? মুজাহিদ জবাবে বলল ঃ আমাদের কাজ হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, যা আল্লাহ্ করতে বলেছেন, নিশ্চিন্ততায়

তা-ই করা, আর তাঁর দায়িত্ব হলো যেমন তিনি আমাদের প্রতি ওয়াদা করেছেন তেমন রিযিক দেয়া। লোকেরা তার জবাবে লা-জবাব হয়ে গিয়ে তার স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হলো। তাকে ভয় দেখাল এই বলে যে, তোমার স্বামী জিহাদে চলে গেলে তোমার ও তোমার সন্তানাদির অবস্থা কি হবে ? স্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ততার সঙ্গে জবাব দিল ঃ আমি আমার স্বামীকে একজন খাদ্য গ্রহণকারী মাত্র বলেই জানি। রিযিকদাতা রূপে নয়। তাই খাদ্যগ্রহণকারী যদি চলে যায়, তাহলে রিযিকদানকারী তো রইলেনেই।

বস্তুত তক্দীর বিশ্বাসে যদি অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের ভাবধারা না থাকে, তা হলে তা মানুষের মধ্যে বীরত্ব ও দূরন্ত সাহসিকতার সৃষ্টি করে। তা মানুষকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়, পিছু হটার বা পশ্চাদপদ হয়ে থাকার নয়। কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে, কর্মবিমুখ হয়ে থাকতে দেয় না। এ তক্দীর বিশ্বাসই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরতে, কোলাকুলি করতে প্রস্তুত করে। মানব মনকে দেয় ধীরতা, স্থিরতা ও দুর্জয় নিশ্চিন্তার অনন্য সাধারণ ভাবধারা। তা সর্বপ্রকার জুলুম নির্যাতন অকাতরে সহ্য করার শক্তি দেয় এবং দানশীলতা ও বদান্যতার ভূষণে করে ভূষিত। মানুষের পক্ষে যাই অপমানকর, লাঞ্ছনাদায়ক, তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার বিক্রমে পরাক্রান্ত করে। ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত করে। জীবনের জাঁকজমক ও বিলাসিতা পরিহার করে চলতে অভ্যস্ত করে। আর এসবই হচ্ছে মহাসত্যের পথে। যা এই বিশ্বাস গ্রহণের জন্য আহবান জানায়।

যে লোক বিশ্বাস করে, জীবন সীমিত, রিযিক পরিমিত, আর সব কিছুই আল্লাহ্ হাতে— তিনি যেমন ইচ্ছা তার বিলি-বণ্টন করেন, সে লোক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে মৃত্যুকে ভয় করবে কেন ? আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের অভিযানে সে কেন হবে ভীত-সন্ত্রস্ত ? আল্লাহ দেয়া দায়িত্ব পালনে সে কেন হবে পশ্চাদপদ ?

মুসলমানরা প্রথম উন্মেষকালের পরই সারা দুনিয়ায় ইসলামের বিজয় নিশান উড়াবার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দেশের পর দেশ, রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র তাদের বীরবিক্রমের সম্মুখে নতি স্বীকার করেছে। তা দেখে বিশ্ববাসী হয়েছে স্তম্ভিত। তারা বৈষয়িক শক্তি সামর্থে, সাজ-সরঞ্জামে, অস্ত্রে-শস্ত্রে ও লোকসংখ্যায় প্রায় নিঃস্ব হয়েও পশ্চিমে ফ্রান্স ও স্পেন এবং পূর্বে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিজয় ডংকা বাজিয়েছেন। তারা চলমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। সেখানে তারা সৃষ্টি করেছে নবতর সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা। কিন্তু এই দুঃসাহসিক সংগ্রাম অভিযানে কেবলমাত্র ঈমান ছাড়া আর কোনো সম্বল ছিল না তাদের, ছিল না অন্য কোনো চালিকা শক্তি, আর সে ঈমান হলো তকদীরের প্রতি ঈমান।

ভ্রাতৃ সম্পর্কে ঈমান

মুমিনের শক্তি আসে তাদেরই মতো ঈমানদার ভাইদের কাছ থেকে। এই ঈমানী ভ্রাতৃত্বই তাদের মনে এই বিশ্বাস ও চেতনা জাগিয়ে দেয় যে, তারা তাদের ভাইদের জন্য এবং তাদের ভাইরা তাদের জন্য। তারা উপস্থিত থাকলে তাদের সাহায্য করবে। আর অনুপস্থিত হলে তারাই সংরক্ষণ করবে। দুঃখ ও বিপদে তারাই সহযোগিতা করবে, সহানুভূতি জানাবে। কেউ তাদের উপর আক্রমণ করে বসলে তারাই অগ্রসর হয়ে তাদের হাত ধরে ফেলবে। তাদের দেহ যখন অবসন্ন হয়ে ভেঙ্গে পড়তে চাইবে, তারাই দৌড়ে এসে তাদের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি যোগাবে। ফলে তারা যখন কোনো কাজ করে, তখন তারা অনুভব করে, এ কাজে তারা একক নয়। তাদের মতো আরও মানুষ এই কাজে নিরন্তর লেগে আছে। আর তারা জিহাদ করবে, তো আঘাত হানবে প্রবল বিক্রমে। এক হাজার মুমিন যখন জিহাদ করবে, তখন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবে যে, সে একাই যুদ্ধ করছে এক হাজার ব্যক্তির শক্তি নিয়ে। আর সে হাজার ব্যক্তিও বাইরে কোথাও নয়, তার নিজের সত্তায়ই নিহিত। এভাবে হাজার দিয়ে হাজারকে পূরণ দিলে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা দাঁড়াবে এক লক্ষ্য, যদিও দুনিয়ার হিসাবে তাদের সর্বমোট সংখ্যা মাত্র এক হাজার। রাসূলে করীম (স) এই তত্ত্বটি তাঁর নিজের ভঙ্গিতে বলেছেন এ ভাষায় ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

একজন মুমিনের সাথে অপর মুমিনের সম্পর্ক প্রাচীরের ন্যায়। একজন অপর জনকে শক্ত করে শক্তিশালী করে।

মুসলমানদের একটা অগ্রবর্তী বাহিনী ও তাদের শত্রুদের মাঝে একটা খালের ব্যবধান ছিল। সেনাধ্যক্ষ নির্দেশ দিলেন, খালটি পার হয়ে গিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হও। তারা সকলে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত্রুবাহিনী দূরে দাঁড়িয়ে এই লোমহর্ষক দৃশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে দেখছিল। মুসলিম বাহিনী যখন খালের মাঝখানে উপনীত হলো, শত্রু বাহিনী দেখতে পেল, তারা সকলের মিলে একসঙ্গে পানির তলায় ডুব দিয়েছে। মনে হচ্ছিল, তারা বুঝি সকলে ডুবে গেছে। একটু পর সহসাই তারা উপরে ভেসে উঠল। শত্রুরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, তাদের অবস্থা কি? তারা জানতে পারল, এদের একজনের পাগড়ী পানির তলায় ডুবে গেছে। তখন সে চিৎকার করে বলল ঃ আমার পাগড়ী! আমার পাগড়ী! ফলে তারা সকলে একসাথে সেই সঙ্গী ভাইয়ের পাগড়ীর সন্ধানে পানিতে ডুব দিয়েছিল। একথা শুনে শত্রুবাহিনীর মনে কম্পন শুরু হয়ে গেল। তারা পরস্পরে বলল, একজন সঙ্গির পড়ে যাওয়া মাথার

প্রাগড়ীর সন্ধানে যখন এরা একসঙ্গে এই কাজ করতে পারে, তখন যুদ্ধকালে একজনকে যদি আমরা হত্যা করি, তাহলে এরা সকলে মিলে আমাদের সাথে কি ব্যবহারটা করবে ? ... শেষ পর্যন্ত এ অভিযানে মুসলমানরা প্রায় বিনা যুদ্ধেই বিজয় লাভ করেন।

ঈমান অনুপাতেই শক্তি

মুমিনের শক্তি ঈমান থেকে আসে। কিন্তু তা আসে ঈমান অনুপাতে। যতটা ঈমান, শক্তিও ততটাই প্রাপ্য। তার বেশি নয়। মুমিনের ঈমান আল্লাহ্‌র প্রতি, আর আল্লাহ্ সর্বজয়ী। তাঁর পরাজয়ের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মুমিনের বিশ্বাস মহাসত্যের প্রতি, আর তা চিরবিজয়ী। তার অপমাণিত হওয়ার আশংকা নেই। তার বিশ্বাস শাশ্বত জীবনের উপর। তা কখনোই নিঃশেষ হবার নয়। তার ঈমান তকদীরে। আর সত্যিকার ঈমানী ভ্রাতৃত্ব প্রকৃত ঈমানদার লোকদের পরস্পরের মধ্যে চিরভাস্বর। আর এসব শক্তি উৎসব এমন, বস্তুগত শক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্র তার মুকাবিলা করতে সমর্থ হয় না।

অতএব ঈমানদার ব্যক্তি এ শক্তি লাভ করতে পারে ততটা, যতটা শক্তিশালী তার ঈমান। ঈমানদার লোকদের পরস্পরে ঈমানী শক্তির তারতম্য ঘটে। এটা অস্বাভাবিক নয়, নয় আপত্তিকর কিছু। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়। রাসূলে করীমের পরে মুসলিম জনগণের ঈমানের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে তার অর্জিত ঈমানী শক্তির মানদণ্ডে। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهِ لَوْ وُزِنَ اِيْمَانُ اَبِىْ بَكْرٍ بِاِيْمَانِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَرُجِّحَ ...

আল্লাহ্‌র শপথ! হযরত আবু বকরের ঈমান যদি সমগ্র মুসলিম উম্মতের ঈমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে তাঁর ঈমান বেশি প্রমাণিত হবে।

রাসূলে করীম (স) যেদিন ইনতেকাল করলেন, মুসলিম জনতা সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনকি হযরত উমর ফারুকের ন্যায় লৌহমানবও দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বলতে শুরু করেন ঃ যে বলবে মুহাম্মাদ (স) মারা গেছেন, আমার এই তরবারির দ্বারা আমি তার গর্দান নেব। এই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ যারা হযরত মুহাম্মাদের উপাসনা-বন্দেগী করত, তাদের জানা উচিত, মুহাম্মাদ (স) ইনতেকাল করে গেছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করত তারা জেনে রাখুন, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরেন না। এই বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠক করে শোনালেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا - (ال عمرن : ١٤٤)

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু নবী-রাসূল চলে গেছে। এখন তিনি যদি মরে যান কিংবা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি পিছন দিকে ফিরে যাবে ? ... আর যে লোক পিছন দিকে ফিরে যায়, সে আল্লাহ্‌র একবিন্দুও ক্ষতি করতে পারে না।

নবী করীম (স) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী গঠন করেছিলেন সিরিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্যে। রাসূলে করীম (স)-এর আকস্মিক ইন্তেকালের পর মুসলিম জনতা খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে দাবি জানালেন— এই বাহিনী পাঠানো মওকুফ করার জন্য। কেননা লোকেরা ভীত-আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে, এই বাহিনী বাইরে চলে গেলেও বাইরের লোকেরা নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের খবর পেয়ে গেলে দূর-দূর গ্রাম-শহরাঞ্চলের আরবরা কি ভূমিকা গ্রহণ করবে তা বলা যায় না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, শক্ত সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথ, হিংস্র শ্বাপদ আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়ে ফেলবে এই আশঙ্কাও যদি আমার হয়, তবুও আমি উসামা বাহিনী অবশ্যই পাঠাবো, যা পাঠাবার জন্য রাসূলে করীম (স) নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র দেশে আমাকে ছাড়া যদি আর একজনও এই মতে না থাকে, তবুও।

ইসলাম ত্যাগকারী ও যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় যখন, তখন সমগ্র দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠি-গোত্রের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে। রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম জনতা বৃষ্টি ভেজা রাত্রির ছাগলের মতো অসহায় হয়ে পড়ল যেন। কেউ কেউ হযরত আবু বকর (রা)-কে বলল, হে খলীফা! আপনি তো আর সমগ্র আরব জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন না। তাই ঘরে বসে থাকুন, দ্বার রুদ্ধ করে দিন, আল্লাহ্‌র এবাদতে আত্মনিয়োগ করুন— যতক্ষণ না মৃত্যু আসে। কিন্তু এই ব্যক্তি— স্বভাবতই যিনি ভীত-সন্ত্রস্ত, কান্নাকাতর, মৃদু মলয়ের মত নম্র, রেশমের মত মসৃণ, মাতৃ হৃদয়ের ন্যায় স্নেহ প্রবণ— সমুদ্রের মতো গর্জন ও ব্যাঘ্রের মতো হুংকার ছেড়ে হযরত উমর ফারুকের ন্যায় চির সহচরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

اَجْبَارٌ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ خَوَّارٌ فِي الْاِسْلَامِ يَاابْنَ الْخَطَّابِ - لَقَدْ تَمَّ الْوَحِىُ وَاكْتَمَلَ - اَفَيَنْقَصُ وَاَنَا حَيٌّ وَاللّٰهِ لَوْمَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْ يُودُّوْنَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ - مَا اَسْتَمْسَكُ السَّيْفَ بِيَدِىْ -

হে খাত্তাব পুত্র! জাহিলী যুগের বীর দুঃসাহসী লোকেরা ইসলামের যুগে এসে বেড়ার পালের ন্যায় ভীরু-কাপুরুষ হয়ে গেছে ? 'ওহী' তো সম্পূর্ণ সমাপ্ত ও পরিণত। আমি জীবিত থাকতেই কি তা এমনি ভাবে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হবে ? আল্লাহ্‌র শপথ। লোকেরা যদি এমন একগাছি রশি দিতেও অস্বীকৃত হয়, যা তারা রাসূলে করীম (স)-কে (যাকাত হিসেবে) দিত, তাহলে আমি সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব— যতক্ষণ আমার হস্ত তরবারী ধরে থাকবে।

মুমিনের হৃদয়-মন ও নৈতিক চরিত্রের পরিণতি

ক. নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর সাথে সত্যতা ও ন্যায়পরতার আচরণ এবং সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা ও সর্বসময় ন্যায়পরতা ও সুবিচার নীতি অনুসরণ করা মুমিনের উপরোক্ত মানসিক শক্তির ফলশ্রুতি ও বাহ্য প্রকাশ। সে যখন কোনো ভুল করে বা অন্যায় করে বসে, ধরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তা স্বীকার করে নিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হয় না। এজন্য সে কোনো টাল-বাহান, অপকৌশল বা লজ্জা-কুণ্ঠারও প্রশয় দেয় না। না একটা ভুল বা ত্রুটিকে বাহানা বানিয়ে আরও শতটা ভুল ও ত্রুটি করার পথ পরিষ্কার করে। না নিজের দোষ বা ত্রুটিকে অন্যের উপর মিথ্যামিথ্যি আরোপ করার অপচেষ্টা সে চালায়। সে সর্বাবস্থায় সত্য বলে, তা যত তিক্তই হোক এবং সে তিক্ত বিষয় নিজেই পান করতে বাধ্য হোক না কেন। মুমিন সব সময় আল্লাহ্‌র জন্য সত্যের সাক্ষী, তা নিজের পিতা-মাতার বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হলেও। সে শত্রুর সাথেও ন্যায় বিচারমূলক আচরণ করে যেমন করে আপন বন্ধুর প্রতি। সে কোনো ক্ষেত্রেই অবিচার অনাচার করতে জানে না। জানে না পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করতে।

হযরত উমর ফারুক (রা) নিজেই নিজের এক পুত্রের উপর ব্যভিচারের শরীয়তী দণ্ড কার্যকর করেন। ফলে তাঁর হাতেই তার মৃত্যু ঘটে। নবী করীম (স) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাতা (রা)-কে খায়বার প্রেরণ করেন। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল খেজুর ফসলের ভাগ-বাটোয়ারা করার। সেখানে কৃষকদের ও সরকারের মধ্যে আধা-আধি ভাগে খেজুর ফসলের চাষ করা হয়েছে। ফসল ভাগ হয়ে যাওয়ার পর ইহুদী চাষীরা তাদের স্ত্রীদের গহনা-পত্র লয়ে হযরত

আবদুল্লাহ কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি এসব মূল্যবান অলংকার গ্রহণ করে আমাদের ভাগের ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিন। তখন হযরত আবদুল্লাহ বলে উঠলেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আমার কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য লোক। তোমরা কি করে ধারণা করলে যে, আমি তোমাদের দেয় ভাগের পরিমাণ কম করে দেব ? তোমরা যা আমাকে দিতে চাইছ, তা তো ঘুষ— হারাম। আমি তা কখনোই গ্রহণ করব না। একথা শুনে ইহুদীরা শুধু একটি কথাই বলতে পারল আর তা হলো ঃ

بِهٰذَ اقَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ –

এরূপ ন্যায়পরতা ও সুনীতির উপরই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ জানতে পারলেন, তাঁর ছেলে স্বর্ণের একটা আংটি ক্রয় করেছে এক হাজার মুদ্রা দিয়ে। তখন তিনি তাকে লিখে পাঠালেন ঃ আমি জানতে পেরেছি, তুমি এক হাজার মুদ্রা দিয়ে একটি স্বার্ণের আংটি ক্রয় করেছ। আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই তা বিক্রয় করে তার মূল্য দিয়ে এক হাজার ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে দেবে এবং একটি লোহার আংটি কিনে নেবে। তার উপর খোদাই করে লিখে দেবে ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاءً عَرَفَ قَدْرَنَفْسِهٖ –

যে লোক নিজের মূল্যটা বুঝতে পারে, আল্লাহ্র তার প্রতি দয়া বর্ষণ করেন।

খ. বস্তুগত শক্তির প্রতি উপেক্ষা ঃ ঈমানী শক্তির বহিঃপ্রকাশে মুমিনের ভয় ও শংকার ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং কঠোর-কঠিন সময়ে দৃঢ় স্থিতি প্রকাশ পায়। তার অন্তর কখনোই কেপে ওঠে না, পা টলে না। মানুষকে ভয় পায় না— তারা সংখ্যায় বেশি হোক বা কম হোক। শত্রুকে দেখে ভীত হয় না, তারা যতই শক্তিশালী ও অস্ত্রধারীই হোক। মুমিন তার হৃদয়ের ভয়ের দুয়ার চিরতরে বন্ধ করে দেয়। অতঃপর সে ভয় পায় তার নিজের গুনাহকে, ভয় করে তার আল্লাহ্র রোষ ও অসন্তোষকে।

তাদের যখন বলা হয়, তোমাদের শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি, তাদের সাথে তোমরা কুলিয়ে উঠতে পারবে না, তখন তারা জবাবে কুরআনের এই ছোট আয়াতটিই শুধু পড়ে শুনিয়ে দেয় ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً –

কত অল্প সংখ্যক লোকরাই না পরাজিত করে দিয়েছে বিরাট ও বহু সংখ্যক বাহিনীকে।

যখন বলা হয়, শত্রুপক্ষে ধন-সম্পদ বিপুল, তখন তারা পড়ে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ -

কাফের লোকেরা তাদের ধন-সম্পদ বিপুলভাবে ব্যয় করে আল্লাহ্ পথ থেকে লোকদের ফিরিয়ে নেয়ার ও সে পথে যেতে ও চলতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে। ওরা এমন ভাবেই ব্যয় করতে থাকবে। শেষে হতাশা ও হা-হুতাশ ওদের উপর চেপে বসবে এবং শেষে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে।

আর যখন শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও কুটিল কলা-কৌশলের ভয় দেখানো হবে, তখন তারা বলবে ঃ

وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ - وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ -

হ্যাঁ, ওরা তো ষড়যন্ত্র করবেই। তবে আল্লাহ্ ওদের ষড়যন্ত্র দমন করার কৌশল করেন। আর আল্লাহ হচ্ছে উত্তম ষড়যন্ত্র নিরোধকারী।

যখন বলা হবে শত্রুরা দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে বসেছে। ওদের পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তখন মুসলমানরা পড়বে ঃ

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا -

হ্যাঁ ওরা তো মনে করে বসেছে যে, ওদের দুর্গ আল্লাহ্ থেকে ওদের রক্ষা করবে। কিন্তু এ দুর্গেই আল্লাহ্ এমন পথে এসে যাবেন ওরা যার ধারণাও করতে পারবে না।

মুমিনরা তো আল্লাহ্র সাহায্যের অধীন-আল্লাহ্র আশ্রয়ে চলে। তারা দেখে আল্লাহ্র আলোয়। আল্লাহ্র তরবারি দিয়ে তারা আল্লাহ শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে। আল্লাহ্র শক্তিতেই মারণাস্ত্র (তীর বা বোমা) নিক্ষেপ করে।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ -

তোমরা ওদের হত্যা করনি, ওদের হত্যা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ আর তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নও আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।

বস্তুত বস্তুর ভাষা বা সংখ্যার ভাষা মুমিনকে কখনো দাসানুদাস বানাতে পারে না। এ কারণেই তারা সৃষ্টি করে নানা ধরনের আত্মত্যাগ, জীবন দান ও ধন-সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার বিস্ময়কর ইতিহাস। যা দেখে দুনিয়ার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির লোকেরা মনে করে, এটা মুসলমানদের পাগলামী।

ইসলামী ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। মুসলিম বাহিনী পারস্য বিজয়ের অভিযানে যাত্রা করেছে। মাদায়েন নগরের উপকণ্ঠে তারা দজলা নদীর বেলাভূমে উপস্থিত হলো। দজলা তখন খরস্রোতা স্রোতের চাপে দুটি কূল ফেনায়িত। সেনাপতি সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস গোটা বাহিনীকে একত্রি করে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পাঠ করে ঘোষণা করলেন ঃ আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি, আমরা এই নদী সাঁতরিয়ে ওপারে পৌঁছে যাব। সমবেত বাহিনী সমস্বরে বলে উঠল ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার ও আমাদের জন্য নির্ভুল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। অতএব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করুন।

অতঃপর লোকেরা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের বলা হলো, তোমরা সকলে একসঙ্গে এই দো'আ পড় ঃ

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَاللّٰهِ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ وَلِيَّهٗ لَيُظْهِرَنَّ دِيْنَهٗ وَلَيُهْزَ مَنَّ عَدُوَّهٗ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে-ই সাহায্য চাই, তারই উপর আমরা নির্ভর করি। আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি অতীব উত্তম পৃষ্ঠপোষক। আল্লাহ্‌র শপথ। আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তাঁর শত্রুদের তিনি পরাজিত করবেন। আর কোনো সামর্থ্য ও শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো— যিনি অতি উচ্চ মহান।

লোকেরা দজলা নদীতে পরস্পর পাশাপাশি চলতে লাগল এবং কথাবার্তা বলতে লাগল যেমন স্থলভাগে বসে পরস্পর কথাবার্তা বলে। দজলা নদীকে তারা এমনভাবে পার হয়ে গেল যে, বেলাভূমি কখন অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে গেছে, তা তারা টেরও পেলনা।

এদিকে কাফের ও মুনাফিকরা এই রোমাঞ্চকর ঘটনা তাকিয়ে দেখছিল। ওরা মনে করেছিল, মুসলমানদের সংখ্যা বুঝি অনেক ও বিপুল। কিন্তু আসলে তাদের সংখ্যা মোটেই বেশি নয়। তাদের সঙ্গে যে অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সামগ্রী ছিল, তা খুবই অকিঞ্চিতকর। প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারে নগণ্য। তা সত্ত্বেও এমন দুর্ধর্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ওরা মনে করেছে, এটা নিতান্তই অহংকার। অথচ এর মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। মূলত এ হচ্ছে ঈমানী শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতারই অচিন্তনীয় পরিণতি মাত্র।

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

(الانفال : ٤٩)

মুনাফিক ও দুষ্ট লোকেরা যখন বলছিল যে, তাদের (মুসলমানদের) দ্বীনই তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে। (অথচ এটা বিভ্রান্তি মাত্রই নয়) আল্লাহ্‌র উপর যারাই নির্ভরতা গ্রহণ করবে (তারাই এমন ঘটনা ঘটাতে সক্ষম) কেননা আল্লাহ তো সর্ব বিজয়ী ও অত্যন্ত পাকাপোক্ত কাজ সংগঠনকারী।

গ. কথা ও কাজে নিষ্ঠা, অকপটতা ঃ এ ঈমানী শক্তির বাস্তব প্রকাশ ঘটে কথা, কাজ ও নিয়ত বা মনোভাবের ঐকান্তিকতা, অকপটতা ও নিষ্ঠায়। সে করে কেবলমাত্র ভালো ও সংগলময় কাজ। অন্যায় ও মন্দ কাজ সে সব সময়ই পরিহার করে, সামনে এসে পড়লে এড়িয়ে পাশ কেটে চলে যায়। এর ফলে সে যদি বৈষয়কি ও বস্তুগত ফায়দা বা লাভ-মুনাফা থেকে বঞ্চিতও থেকে যায়, তবুও তাতে সে বিচলিত হয় না। ঈমানদার ব্যক্তি নিজস্ব খেয়াল-খুশি মতো ও লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে কাজ করে না। মানুষকে সন্তুষ্ট করা, জনগণের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া কিংবা স্বীয় ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতাও হয় না তার কোনো কাজের কারণ। কল্যাণকর কাজে সে গোপনীয়তা অবলম্বন করে, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন তার লক্ষ্য হয় না। বরং প্রকাশ্যভাবে কাজ করার তুলনায় লোকচক্ষুর অন্তরালে নেক আমল করাকেই সে সাধারণত অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। রিয়াকারী বা দেখানোপনাকে সে প্রশয় দেয় না। শিরকে খফী— অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন শিরককে সে তার ঈমানের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক মনে করে। কেননা তা এমন একটি পাপ যা বাহ্যত নজরে না আসলেও তার ঈমানকেই নষ্ট করে দেয় এবং জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় সব নেক আমল। সে সব সময়ই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়ে জীবন যাপন করতে থাকে। তার মনের কামনা ও বাসনা হলো, সে হবে নেক্‌কার, পরহেযগার। কিন্তু লোকেরা তাকে সে রূপ জানবে না। বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা জমির উপরিভাগে দৃশ্যমান। তার শিকড় থাকে মাটির গভীরে লুক্কায়িত, লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্যলোকে চতুর্দিকে বিস্তারিত, সম্প্রসারিত। ঈমান ও তাক্‌ওয়া-পরহেযগারীতে সেও হবে ঠিক এই বৃক্ষের ও বৃক্ষের শিকড়ের মতো। প্রাসাদের উপরিভাগটাই শুধু লোকদের চোখে পড়ে, লোকেরা তা দেখে বিস্মিত বা উৎফুল্ল হয়; কিন্তু যে ভিত্তির উপর দাঁড়ানো এই প্রাসাদ, তা চিরকাল জনগণের চোখে অদৃশ্যই থেকে যায়। অথচ এই ভিত না হলে— ইট ভিত হিসাবে গ্রথিত হতে প্রস্তুত না হলে— দুনিয়ায় একটি প্রাসাদও নির্মিত হতে পারত না।

বস্তুত এ একটি আত্মিক শক্তি। মানুষ যখন একান্তভাবে সত্যের জন্য সত্য দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গিত হয়, তখনি এ শক্তি উন্মেষিত হয়, বিকাশ লাভ করে। ফলে তাতে যে নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা ও ঐকান্তিকতা নিহিত থাকে, তা সত্যের মানদণ্ডে পৃথিবীর পর্বতমালা, লৌহ, আগুন, পানি— সবকিছুর তুলনায় অধিক

ভারী হয়ে দাঁড়ায়। একটি হাদীসে এই কথাই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। হাদীসটির মূল কথাগুলো এই ঃ

আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন নব সৃষ্ট এই পৃথিবী কাঁপতে ও নড়তে-চড়তে শুরু করল। তখন আল্লাহ তা'আলা পবর্তমালা সৃষ্টি করে তার উপর বসিয়ে দিলেন কীলকের মতো। ফলে পৃথিবী স্থির হয়ে গেল। ফেরেশতারা পর্বতের এই দৃঢ়তা স্থাপনের গুণ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহ! তুমি কি পর্বত অপেক্ষাও শক্ত ও ভারী জিনিস সৃষ্টি করেছ ? বললেন হ্যা, তা হচ্ছে লৌহ। জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ তুমি কি লৌহ অপেক্ষাও শক্ত কঠিন কোনো জিনিস বানিয়েছ ? বললেন হ্যাঁ, আর তা হচ্ছে আগুন। জিজ্ঞেস করল, আগুনের অপেক্ষাও শক্ত কোনো জিনিস ? বললেন হ্যাঁ, তা হচ্ছে বাতাস। জিজ্ঞেস করল, বাতাসের অপেক্ষাও শক্ত জিনিস সৃষ্টি করেছ ? বললেন হ্যাঁ, তা হচ্ছে মানুষ— মানুষ যখন তার কোনো কিছু দান করে ডান হাত দিয়ে; কিন্তু তার বাম হাতও তা টের পায় না।

তাই মানুষ যখন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে কেবলমাত্র তার আল্লাহ্‌র জন্য কোনো নেক কাজ করে তখন সে কাজ পৃথিবীর বুকে চাপিয়ে দেয়া পর্বতের অপেক্ষাও অধিক শক্ত ও ভারী হয়ে দাঁড়ায়, নৌকার কীলক যে কাজ করে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীতে, এই ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা সে কাজ করে মানুষের কর্মমুখর জীবনে। লোহা পাহাড়ের চাইতেও শক্ত, কেননা লোহা দিয়ে পাহাড় কাটা হয়, প্রস্তর চূর্ণ করা যায়। আগুন লোহার চেয়েও শক্ত, কেননা আগুন লোহাকে গালিয়ে তরল করে দেয়। আগুন পানির তুলনায় দুর্বল। কারণ পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। আর পানি বাতাসের অনুগত, কেননা বাতাস যখন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে, তখন তা পানিকে একদিক থেকে আর একদিকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

এ ঈমানী শক্তির কারণেই মুমিনের কর্মক্ষেত্র হয় আলোকোদ্ভাসিত। তার কর্মনীতি ও কর্মপন্থা হয় সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ়। সে তারই উপর অবিচল হয়ে থেকে কাজ করতে থাকে। ভিন্নতর কোনো আদর্শের কর্মক্ষেত্রের বা কর্মনীতি ও কর্মপথের আহবান তাকে প্রতারিত বা বিভ্রান্ত করতে পারে না। কারো তিরস্কার তাকে হটাতে পারে না তার কাজ থেকে। কোনো প্রলোভনে পড়ে সে ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে না। অবৈধ কামনা লালসা তাকে সত্য পথ পরিহারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। সে সত্য ও কল্যানের চিরন্তন আহবানকারী। অন্যায়কে সে করে প্রতিরোধ। ন্যায়ের আদেশদাতা, অন্যায় ও পাপের প্রতিরোধক, সত্য ও সুবিচারের পথ প্রদর্শক, বাতিল ও জুলুমের চিরন্তন শত্রু— এই তার সংক্ষিপ্ত

পরিচয়। সে নিজের শক্তি দ্বারা অন্যায়ের মূল উৎপাটিত করে দেয়। শক্তি না থাকলে কিংবা শক্তি প্রয়োগ সম্ভবপর না হলে মুখ ও ভাষা-সাহিত্য দিয়ে বাতিল ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে প্রচারণা চালায়। আর তাতেও সক্ষম না হলে সে তার মন ও অন্তর দিয়েই অন্যায়কে অন্যায় মনে করে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকে— যদিও এই শেষ অবস্থা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

ঘ. ভয়-নীতি ও লোভ-লালসা থেকে মুক্তি লাভ ঃ আলোচ্য ঈমানী দৌলতেই সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা থেকে ঈমানদারের মুক্তিলাভ সম্ভব।

সকলেই জানেন, মানব-মনকে সবচাইতে বেশি দুর্বল করে যে জিনিস, তা হচ্ছে বেঁচে থাকার লোভ। হোক না লাঞ্ছিত, অপদস্থ, অবমানিত, তাতেও ক্ষতি নেই; কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে অবশ্যই। বহু মানুষের মনস্তত্ত্ব এইরূপ বিকারগ্রস্ত। মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়, তা জানবার জন্য মানুষ পাগল-প্রায়, যদিও মৃত্যুটা খারাপ কিছু নয়। জীবনের আকর্ষণ বেঁচে থাকার ইচ্ছা তাদের মনে যথেষ্ট শক্তির সঞ্চার করে। কিন্তু ঈমানদার লোকেরা সত্যের পথে প্রাণ দিতে, মৃত্যুর সাথে কোলাকুলি করতে একটুও ভয় পায় না। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং চিরন্তন জীবন লাভের আশা তাদের মন থেকে মৃত্যুর বিভীষিকা দূর করে দেয়। দুনিয়ার অত্যাচারী, স্বৈরাচারী লোকদের পরোয়া করে চলার কোনো প্রয়োজন তারা মনে করে না। তারা স্বর্ণ খণ্ডের প্রতি তাকায় এমনভাবে যেন ওটা একটা পাথর টুকরা। আর তীক্ষ্ম, শাণিত তরবারিকে মনে করে বড়জোর একটা লাঠি।

আসলে ভয় ও লোভ মানুষের মনকে দুর্বল করে দেয়। উন্নত মাথাকে করে অবনমিত। দুর্বিনীত ঘাড়কে করে লাঞ্ছিত। আর যখন কোনো লোভ থাকে না, থাকে না কোনো ভয়, তখন মনের দুর্বল হয়ে পড়ার কোনো কারণ থাকে না। ফিরাউনের ভাড়া করে নিয়ে আসা যাদুকররাই সে দৃশ্য দেখিয়েছে চোখে আংগুল দিয়ে। তারা ময়দানে এল ফিরাউনের আহবানে, মজুরীর বিনিময়ে অথবা ফিরাউনের দাপটে ভীত হয়ে; কিন্তু তারাই যখন আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের প্রতি ঈমান আনল, তখন তারাই বৈষয়িক স্বার্থকে উপেক্ষা করতে লাগল, মৃত্যুভয়কে তারা অতিক্রম করে গেল। তখনি তারা ফিরাউনকে সম্বোধন করে দৃপ্ত কণ্ঠে বলল ঃ

فَاقْضِ مَآاَنْتَ قَاضٍ - اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا -

তুমি করো না, কি ফয়সালা তুমি করবে! তোমার বিচার-ফয়সালা যা হবে তা তো শুধু বর্তমান দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ (তার বাইরে কিছু করার তোমার ক্ষমতা নেই)।

এরা ফিরাউনের কাছে কোনো কিছুই পাওয়ার লোভ করে না। কোনো কারণে তারা তাকে ভয়ও করে না। তাহলে তারা দুর্বলতা দেখাবে কেন ? তারা উদাত্ত কণ্ঠ ঘোষণা করল ঃ

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى -

আমরা ঈমান এনেছি আমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি, যেন তিনি আমাদের সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। আর তুমি তো আমাদের যাদু করতে বাধ্য করেছ। অথচ আল্লাহ্‌ই উত্তম— চিরস্থায়ী।

ঙ. অত্যাচারী ও স্বৈরতন্ত্রীদের প্রতি উপেক্ষা ঃ দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্রী ও অত্যাচারী এবং বাইরের বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহী আক্রমণকারীদের সাথে যেখানে ঈমানদার লোকদের সংঘর্ষ ঘটে, সেখানে এই ঈমানী শক্তি প্রবল ও প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয়। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা দেশে নানা সমাজে অসংখ্যবার এ দৃশ্য প্রকট হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এই পর্যায়ের ঘটনাবলীর কোনো সীমাসংখ্যা নেই।

প্রখ্যাত উমাইয়া খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক তাউস ইয়ামানীকে একদিন তার পরিষদে ডেকে পাঠালেন। তিনি দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ‘হে হিশাম! আস-সালামু আলায়কা। এবং তাঁর পার্শ্বেই আসন গ্রহণ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘হিশাম! তুমি কেমন আছে ? এ কথায় খলীফা হিশাম ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করলেন। খলীফা বললেন, হে তাউস! তুমি এই যা করলে, তা কেন করলে এবং কোন জিনিস তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করল ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি করেছি ?’ এ কথা শুনে হিশামের ক্রোধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। বললেন ঃ তুমি আমার দরবারে এসে আমার কাছে আসনের পার্শ্বে এসে জুতা খুললে, আমার হাতকে চুম্বন করলে না। আর আমাকে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে তুমি সালাম করলে না— সম্মান প্রদর্শন করলে না। আমাকে ‘খলীফাতুল মুসলিমীন’ বলে সম্বোধন না করে আমার নাম ধরে ডাকলে। আর আমার অনুমতি ছাড়াই আমার পার্শ্বে এসে আসন গ্রহণ করলে। এর চাইতে বড় বেয়াদবী আর কি হতে পারে ? ... এরপরও তুমি বলছ, আমি কি করেছি ?

তাউস ইয়ামানী হিশামের প্রত্যেকটি অভিযোগের এক-একটি করে জবাব দিতে শুরু করলেন। বললেন, তোমার আসনের পার্শ্বে আমার জুতা খোলার বিষয়ে যা বলেছ, সেটা আর তেমন আপত্তি কি ? আমি তো দিন রাত পাঁচবার

করে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জাতের সম্মুখে জুতা খুলে থাকি। তোমার হাতে চুম্বন না করার বিষয়ে যে আপত্তি তুলেছ, সে বিষয়ে বক্তব্য— এই বিষয়ে হযরত (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُقَبِّلَ يَدَ اَحَدٍ اِلَّا امْرَاَتِهٖ مِنْ شَهْوَةٍ اَوْ وَلَدِهٖ مِنْ رَحْمَةٍ -

কোনো পুরুষের পক্ষে অপর কোনো পুরুষের হস্ত চুম্বন করা জায়েয নয়। তবে যৌন কামনায় তার স্ত্রীর বা স্নেহের দরুন তাহার সন্তানের হস্ত চুম্বন করা জায়েয।

আমীরুল মুমিনীন হিসেবে তোমাকে বিশেষ সালাম না দেয়া সংক্রান্ত আপত্তির বিষয়ে আমার বক্তব্য, তোমার এই আমীরীতে সব লোক রাজি নয়। তাই মিথ্যা বলা ও করাকে আমি ঘৃণা করছি। তোমার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করায়ও তুমি আপত্তি করেছ। আমি হযরত আলীর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ النَّارِ فَانْظُرْ اِلٰى رَجُلٍ جَالِسٍ وَحَوْلَهٗ قَوْمٌ قِيَامٌ -

যদি তুমি কোনো জাহান্নামী ব্যক্তিকে দেখতে চাও, তা হলে দেখো সেই ব্যক্তিকে, যে বসে আছে আর তার চারদিকে দণ্ডায়মান রয়েছে তার লোকজন।

এসব কথা শুনে খলীফা হিশাম লা-জওয়াব হয়ে গেলেন। পরে বললেন ঃ আমাকে নসীহত করুন। তখন তাউস বললেন ঃ আমি হযরত আলীর মুখে শুনেছি ঃ

اِنَّ فِىْ جَهَنَّمَ حَيَّاتٍ كَالْقِلَالِ وَعَقَارِبُ كَالْبِغَالِ فَلْدَغُ كُلَّ اَمِيْرٍ لَا يَعْدِلُ فِىْ رَعِيَّتِهٖ -

জাহান্নামে বড় বড় সাপ রয়েছে ও বৃশ্চিক রয়েছে বড় বড় ষাঁড়ের মতো। ওরা এমন সব শাসককে দংশন করে যারা প্রজা সাধারণের উপর সুবিচার করে না।

এ কথা বলে তিনি দরবার থেকে উঠে চলে গেলেন।

বস্তুত অত্যাচারী শাসকের মুখের উপর সত্য কথা বলা জিহাদরূপে গণ্য। তাই এই জিহাদও মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। মুসলমান জুলুমকে জুলুমই বলবে, জালিমকে স্পষ্ট ভাষায় বলবে জালিম। কেননা সত্যকে সত্য বলা— সত্যের

সত্যতা স্বীকার করা, প্রকাশ করা ও সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা ঈমানের ঐকান্তিক দাবি। তা হচ্ছে ইসলামী যিন্দেগীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে জীবনে সত্যকে সত্য বলা নেই, সে জীবন ইসলাম নয়। ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তিই হচ্ছে ঈমান। ইসলাম ও ঈমান মুসলমানকে সারা বিশ্বে সত্যের সাক্ষ্যদাতা করে সৃষ্টি করেছে। তাই মুসলমান কখনো সত্য প্রকাশে কুণ্ঠিত হতে বা তা থেকে বিরত থাকতে পারে না। এ কাজে যত বাধা বিপদের সম্মুখীন হতে হোক-না কেন, তাদের সেজন্য একবিন্দু পরোয়া করা চলে না। একে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়— 'আমর বিল মা'রুফ ও নেহী আনিল মুন্‌কার।' এ হচ্ছে সমস্ত ফরযের মধ্যে বড় ফরয।

তওহীদ— আল্লাহ্‌র একত্বকে স্বীকার করা— ইসলামের ভিত্তি, ইসলামের মর্মবানী, তার বিপরীত হচ্ছে শির্‌ক। এ শির্‌কের প্রতি মুসলিম মাত্রেরই আন্তরিক তীব্র ঘৃণা ও রোষ-আক্রোশ।

তওহীদ মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, ভয়-ভীতি ও নতি-আনুগত্য একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্যই নিয়োজিত ও উৎসর্গিত হবে, অন্য কারো জন্য নয়। অন্য কাউকে মানুষ না ভয় পাবে, না কারো কাছে নতি স্বীকার করবে। যদি করে তবে সে যে মুশরিক হয়ে যাবে তা নিঃসন্দেহ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা— কারো আনুগত্য করার সাথে তওহীদ বিশ্বাস কখনোই একত্রিত হতে পারে না।

ইসলাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা সাধারণ দাওয়াত, একটা আদর্শের প্রচার। তাই মানুষকে আহবান জানায় আত্মসম্মানবোধ, সাহসিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা গ্রহণ করার এবং আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করাকে খুবই সামান্য ব্যাপার মনে করার জন্য।

কুরআন বারবার বলছে ঃ

لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا -

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই একবিন্দু ভয় পাবে না। আর আল্লাহই হিসাবে গ্রহণকারী ও রক্ষাকারীরূপে যথেষ্ট।

اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ -

মুমিনের কাজ হলো তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না।

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ -

তারা ভয় করে না কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নকে।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَ يُخَوِّ فُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ -

আল্লাহ কি তার বান্দাহ্দের জন্য যথেষ্ট নয় ? লোকেরা তার পরিবর্তে অন্যদের ব্যাপারে তোমাকে ভীত করতে চায় ? আর যাকে আল্লাহ গুমরাহ করেছেন, তার হেদায়েতাকারী কেউ নেই।

রাসূলে করীম (স) বলেন ঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطٰنٍ دَائِرٍ - (ابوداؤد، ترمذى)

অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা বলাই উত্তম জিহাদ।

নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীদের কাছে থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন ঃ যেখানেই যে অবস্থায়ই তারা থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলবে। (বুখারী, মুসলিম)

কালের দৃষ্টি বার্ধক্য চাপে ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু সত্য দ্বীন ও সত্য বাণীর জন্য দেয়া কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কোনো তুলনা অন্য কোথাও আজ পর্যন্ত দেখতে পায়নি। আর এ কাজে মুসলিম উম্মতের ভূমিকা সর্বকালের ইতিহাসে অগ্রণী হয়ে রয়েছে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

ঈমান যখন মানব হৃদয়-জমিনের গভীর দেশে শিকড় গেড়ে বসে, তখন ঈমানের প্রতিফলন এমনিরূপেই দেখতে পাওয়া যায়। এ ঈমান ব্যক্তির হৃদয়-মনে জন্মায় দৃঢ় প্রত্যয় ও অকৃত্রিম প্রতীতি, এক অবিচল সংকল্প। সে দুনিয়ার মালিক হয়ে বসে; কিন্তু দুনিয়া তার মালিক হয় না কখনো। সে ধন-সম্পদ-সম্পত্তির অধিকারীও হয়; কিন্তু সে তার দাসানুদাস হয় না। সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যে পরিবেষ্টিত হয়; কিন্তু সে অহংকারী হয় না একবিন্দু। তার উপর কঠিন বিপদ আসে, আসে দুঃসহ অগ্নি পরীক্ষা, কিন্তু সে তাতে দমে যায় না বিন্দুমাত্রও। দুঃখ-কষ্ট যতই আসুক, তার দরুন তার ঈমানী দৃঢ়তা ও সংকল্পের অবিচলতাই বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পায় না একটুও। শক্তির সাথে যোগ হয় শক্তির। আগুন যতই জ্বলে, স্বর্ণের স্বর্ণত্ব এক বিন্দু নষ্ট করতে পারে না, তার পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। ঈমানী আগুন যখন কারো হৃদয়ে একবার ধরতে পারে, তখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া তা নেভাতে তো পারেই না, বরং তখন বাতাস যত তেজস্বী হবে, আগুন ততই শক্তিশালী হয়ে জ্বলতে শুরু করবে।

আরবের মুষ্টিমেয় সহায়-সম্বলহীন লোক সারা দুনিয়াকে জয় করেছিল। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দ্বীন-ইসলামের বিরাট বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল, অথচ তারা গ্রীক দর্শন জানত না, রোমান সভ্যতার সংস্পর্শ তাদের গায়ে লাগেনি, ভারতীয় দর্শন ও চীনের শিল্প-সৌকর্যের সাথে ছিল না কোনো পরিচয়— এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে? এই অবস্থায় তাদের একমাত্র সম্বল ছিল দ্বীন-ইসলামের প্রতি ঐকান্তিক ঈমান। তারা দুনিয়ায় ইসলাম নিয়েই উঠেছিল, ইসলামই প্রচার করেছিল দুনিয়ার এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত। আর তাও করেছিল তারা এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী কালের মধ্যে— এ কথা অস্বীকার করার সাহস কার আছে?

এ রহস্যের মূলে ছিল ঈমান। এ ঈমানই ক্রীতদাস বিলাল হাবশীকে এতখানি সাহসী বানিয়েছিল যে, তিনি তাঁর মনিব উমাইয়া ইবনে খালফের মুকাবিলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, আবু জেহেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঈমানই স্বল্প সংখ্যক লোককে বিপুল সংখ্যক লোকের উপর বিজয়ী করে দেয়। উম্মীদের বিজয়ী বানায় সভ্যতার ধারক-বাহকদের উপর। দুর্ধর্ষ আরব বদ্দুদের উপর বিজয় পতাকা উড্ডীন করতেও তাদের সক্ষম করে দিয়েছিল। তাদের অন্তরে জাগিয়েছিল ইয়াকীন। তাদের এক হাতে ছিল তাদের কিতাব আল-কুরআন আর অন্য হাতে শানিত তরবারি। তাদের ঘরবাড়ি ছিল তাদের পৃষ্ঠের উপর। তাদের অশ্ব চালকও পারস্য সম্রাট ও রোমান-সাম্রাজ্যবাদীদের বলেছিল দৃপ্ত কণ্ঠে— 'আমরা এমন জাতি, যাদের আল্লাহ্ তা'আলা উত্থিত করেছেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব শংখল থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাস বানাবার জন্য।

দুর্বলতা ও কাপুরুষতার মূলীভূত কারণ

কিন্তু বর্তমানে কালের পরিবর্তন ঘটেছে, ঘটেছে অবস্থারও আমূল পরিবর্তন। দীর্ঘদিন পর মুসলিম জীবনে পতন সূচিত হয় এবং শক্তি-সামর্থ্য ও তেজ-বীর্য ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। কেননা এই সময় ঈমান তাদের মনে ও জীবনে অধিক প্রভাবশালী হয়ে ছিল না। তাদের নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ ছিল না ঈমান অনুযায়ী গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ সময় তাদের অনেকের জীবন হয়ে যায় নিতান্তই ভৌগোলিক, কেননা তারা মুসিলম দেশে জন্মগ্রহণ করেছিল। অনেকের ঈমান ছিল বংশানুক্রমিক। মুসলিম মা-বাবার ঔরসজাত সন্তান ছিল বলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে ঈমান লাভ করেছিল। ফলে ঈমান তার আসল প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং সে ঈমান তন্দ্রাচ্ছন্ন, ম্লান, তৈলহীন প্রদীপের মতো নিভু নিভু। সে ঈমানের জীবনে কোনো স্পন্দন ছিল না, ছিল না জীবন্ত মানুষের মতো

প্রাণ-চাঞ্চল্য। এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের ঈমান সম্পূর্ণ নিঃশক্তি হয়ে যাওয়া ছিল অনিবার্য পরিণতি।

ঈমানের দুর্বল হয়ে পড়ার প্রকৃত কারণ কি হতে পারে, কি কারণে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের সহজে পরাজিত হওয়ার যোগ্য বানিয়ে দেয়, তা রাসূলে করীম (স) নিজেই এবং বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন, বলে দিয়েছেন দুনিয়ার মুসলমানদের সে বিষয়ে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।

বলেছেন ঃ

يُوْشَكُ اَنْ تَتَدَاعِىَ عَلَيْكُمُ الْاُمَمُ كَمَا تَتَدَاعِىَ الْاَكْلَةُ اِلٰى قِصْعَتِهَا قَالُوْا اَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَبِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غِثَاءٌ كَغِثَاءِ السَّيْلِ - وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِعَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِ فَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ -

সম্ভবত দুনিয়ার জাতিগুলো তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে, যেমন করে খাদ্য গ্রহণকারী হামলা চালায় তার খাবার পাত্রের উপর। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূল! তা কি এজন্য হবে যে, আমরা তখন সংখ্যায় অল্প হয়ে যাব ? রাসূলে করীম (স) বললেন, না, তোমরা বরং তখন সংখ্যায় অনেক হবে। কিন্তু তোমরা সেদিন হবে স্রোতের ফেনার মতো শক্তিহীন। আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তোমাদের শত্রুদের মন থেকে ভয়-ভীতি খতম করে দেবেন এবং তোমাদের হৃদয়-মনে আসবে দুর্বলতা, কাপুরুষতা, ভীতি-বিহ্বলতা।

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, তা কি রকম ? জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

حُبُّ الدُّنْيَا وَكِرَهِيَةُ الْمَوْتِ -

দুনিয়া প্রেমে মগ্ন হওয়া এবং মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে চাওয়ার ভাবধারা।

বস্তুত এ দুটি কারণ এমন মারাত্মক যে, এ দুটি রোগ যে জাতির মধ্যে দেখা দেয়, তারা হারিয়ে ফেলে সব শক্তি-দাপট-প্রতাপ এবং হয়ে যায় ঘুণে ধরা বৃক্ষের মতোই অন্তসারশূন্য। এক-একটা জাতীর জাতিয় দুর্বলতার এটাই হচ্ছে মূলীভূত কারণ। মানুষ দুনিয়ার দাসানুদাসে পরিণত হয়, দুনিয়ার সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দের জন্য লোভী হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার শক্ত বাঁধন তার গলদেশকে বেঁধে ফেলে।

লোভ-লালসাই তাকে চালিত করে, বৈষয়িক স্বার্থ তাকে ঘানিতে বাঁধা বলদের মতো চারদিকে ঘুরাতে থাকে। স্বার্থবিন্দুকে কেন্দ্র করেই তখন চলে তার সব কর্মতৎপরতা। জাতীয় আদর্শ বলতে যখন কিছু থাকে না, তখন থাকে না জাতীয় লক্ষ্যও। দুই চোখ বাঁধা উষ্ট্রের মতোই তারা চলতে থাকে নিরুদ্দেশের পানে।

দুনিয়ার অন্ধ প্রেম রাজা-বাদশাকেও ভিখারী বানিয়ে দেয়। কোনো নারীর প্রেমে পড়লে পুরুষটির যে দশা ঘটে, দুনিয়া প্রেমে পাগলের অবস্থাও অনুরূপ হয়। মরতে রাজি না হওয়া, মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার প্রবৃত্তি ব্যক্তি ও জাতিকে নিকৃষ্টতম জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। তারা এমন জীবন যাপন করতে রাজি হয়— যে জীবনে তারা মরে প্রতিদিন শত শত বার। তারা সে ধরনের মৃত্যুকে কবুল করতে রাজি নয়, যার পর হবে চিরন্তন জীবন।

দুর্বলতা ও কাপুরুষতা ঈমানের পরিপন্থী

দুনিয়ায় এ রকম লোকের অভাব নেই, যারা দ্বীন অথবা ধর্মকে একটা বাহ্যিক খোলসরূপে গ্রহণ করে, তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত সত্যকে, মৌল প্রাণ শক্তিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। তখন তারা দুর্বল হবে না তো কি শক্তিশালী হবে ? কিন্তু ওরা তাদের এই দুর্বলতাকেই মুমিনের আদর্শ ও উপযুক্ত জীবন বলে মনে করে নেয়। কিন্তু আসলে প্রকৃত ঈমানের সঙ্গে এই জীবন অবস্থার কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। আসলে ঈমান হলো একটা শক্তি— বাহ্যিক ভাবেও, আভ্যন্তরীণ দিক দিয়েও। কাজে-কর্মেও, চরিত্রেও, আচার-আচরণেও।

হযরত উমর (রা) একটি লোককে দেখলেন, যে নামাযে দাঁড়িয়েছে যেন একটা মরা মানুষ। মাথাটা নুইয়ে ঘাড়টা ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছে, যেন দেখাতে চাইছে, সে বড় আল্লাহ ভীরু, আল্লাহ্‌র আতংকে কম্পমান। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি আমাদের সামনে আমাদের দ্বীনকে মেরে ফেল না। আল্লাহ তোমাকে মারুন! উপরে তোল মাথা।

فَانَّ الْخُشُوْعَ فِى الْقُلُوْبِ لَيْسَ الْخُشُوْعُ فِى الرِّقَابِ -

আরে! আল্লাহ্-ভীরুতার আসল স্থান হলো অন্তর, ঘাড়-গর্দানের ভাঁজ দিয়ে খুশু-খুযু হয় না।

হযরত উমার আল্লাহ্‌র কাছে যে-সব দো'আ করতেন তার মধ্যে একটি দো'আ হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ -

হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে মুনাফিকীর 'খুশু-খুযু' থেকে পানাহ্ চাই।

লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'মুনাফিকীর খুশু' বলতে কি বোঝায়। জবাবে তিনি বললেন ঃ বাহ্যিক অবয়বটা দেখা যাবে খুশুতে ভারাক্রান্ত কিন্তু আসলে অন্তরে তার ভাবধারা আদৌ নেই, তাই হচ্ছে মুনাফিকীর খুশু।

কতিপয় লোক এমন দেখা গেল, যারা চলাফেরা করছে যেন প্রাণহীন লাশ। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ্ এদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? তাঁকে বলা হয়, এরা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী লোক, এরা আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে নিরন্তর মশগুল। তখন তিনি বললেন ঃ এরা কেমনতর আবিদ জাহিদ ? হযরত উমর (রা) ছিলেন এমন পুরুষ যে, তিনি দ্রুতগতিতে চলাফেরা করতেন, কথা বললে তা সকলে শুনতে পেত। কাউকে মারলে ব্যথা পাইয়ে দিতেন। তিনিই ছিলেন আল্লাহ্‌র সত্যিকার আবিদ-জাহিদ লোক।

আর এই হচ্ছে রাসূলে করীমের প্রকৃতি। তিনিও দ্রুত পদক্ষেপ নিতেন। চলার ভিতর দিয়েই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ

> আমি রাসূলে করীমের চাইতে উত্তম পুরুষ আর দেখিনি। তাঁর মুখ-মণ্ডলে সূর্য যেন ভাস্বর হয়েছিল। তাঁর চাইতে বেশি দ্রুত গতিবান লোক আর একজনও দেখতে পাইনি। তাঁর চলার সময় মনে হয়, পৃথিবী যেন তাঁর জন্য ভাঁজ হয়ে আসে।

দয়া-অনুকম্পা

হৃদয়হীন মানুষ যেন একটা বধির যন্ত্র। নির্মম পাষাণ। প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহাবয়বটারই নাম 'মানুষ' নয়। এ তো একটা খোলস মাত্র, বাহ্যিক আবরণ বিশেষ। আর তা মাংস, রক্ত, অস্থি ও নাড়ি-ভূড়ি ছাড়া আর কি! মানুষের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম রব্বানী-ভাবধারা, আত্মিক প্রাণশক্তি। এর সাহায্যেই মানুষ অনুভব করতে পারে। মানুষের চেতনা এখানেই নিহিত। কারো ভাবধারা গ্রহণ করে, কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়। দুঃখ-ব্যথা অনুভব করে, দয়া করে, অনুকম্পা দেখায় যে শক্তি, তা হচ্ছে তার অন্তর। আর এই জীবন্ত অন্তরই হচ্ছে মানব সত্তার মূল বস্তু। মনুষ্যত্ব এখান থেকেই উৎসারিত।

মুমিনের প্রধান গুণ হলো তার অন্তর-হৃদয়-মন জীবন্ত, নম্র, দয়াশীল, অনুকম্পায় ভরপুর। আর এই গুণের বলেই সে মানুষ। অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে সে বিশিষ্ট এই অন্তরের গৌরবে। দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনাবলীর প্রতি তার আচরণ কি হবে তা এই অন্ত বলে দেয়। ফলে দুর্বল অক্ষম ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তরটা নরম হয়ে পড়ে, দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও ভাগ্যাহতকে দেখলে সে দুঃখ অনুভব করে, তার আত্মাটা সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হয়। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সঞ্চারিত হয় দয়া-অনুকম্পা। পতিতের প্রতি সে হস্ত প্রসারিত করে দেয় তাকে তুলে নেয়ার জন্য। মানুষ এই জীবন্ত দয়ার্দ্র অন্তরের কারণেই নির্যাতন-নিপীড়নকে ঘৃণা করে, অপরাধ থেকে দূরে সরে থাকে। তার পরিবেশ ও চতুষ্পার্শস্থ লোকদের জন্য এই অন্তরই হয় কল্যাণ ও মংগলের উৎস। সর্বত্র প্রবাহিত হয় কল্যাণের প্রস্রবণ।

মুমিনের দয়া আল্লাহ্র দয়া থেকে পাওয়া

মুমিন দয়ার্দ্র হৃদয় মানুষ। কেননা আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান হওয়াই তার মহান আদর্শ। আল্লাহ্র মহাসম্মানার্হ নাম সমূহের ভাবধারা-প্রভাব মুমিনের উপর প্রতিফলিত হওয়া অনিবার্য, অবধারিত।

আল্লাহ্র চরিত্রের একটা প্রধান দিক হলো দয়া, অনুগ্রহ। তা সমগ্র সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। মুমিন-কাফের, নেক্কার-পাপী সকলেই তার মধ্যে শামিল এবং তা দুনিয়া থেকে পরকাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। নবী করীম (স) বিভিন্ন সময় নানা ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে রহমতের তাৎপর্য বিশদভাবে বুঝিয়ে

দিয়েছেন। একবার কিছু সংখ্যক বন্দী আসল। তাদের মধ্যে ছিল একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু। ইতিমধ্যে একটি মেয়েলোক দৌড়ে এল। তার স্তন ছিল দুধে ভরা। সে শিশুটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল এবং নিজের স্তন দিতে লাগল। এ থেকে মাতৃস্নেহের এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য সকলের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নবী করীম (স) এই দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করে সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি মনে করো, এই মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে ? সকলে বললেন, 'না' তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

فَاللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا - (بخارى)

এই মাতা সন্তানের প্রতি যতটা স্নেহভাজন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি তার চাইতেও অনেক বেশি দয়াবান ও করুণাময়।

আল্লাহ্র পবিত্র নামসমূহের মধ্যে দুটি নাম আল্লাহ নামের পরে সর্বাধিক প্রখ্যাত ও ব্যবহৃত। সে দুটি নাম হচ্ছে 'আর-রহমান', 'আর-রহীম'। ঈমানদার লোক যখনই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তখন প্রথমেই পড়েঃ বিস্মিল্লাহির রাহমান আর রাহীম। একশ তেরটি সূরার শুরুতেই এ নাম লেখা আছে এবং তা পড়তেও হয়। দিন রাতের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে অন্তত ৩৪ বার এই নাম দুটি পড়ার হয়। আর সুন্নত ও নফল নামায পড়লে তো তার সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

মুমিনের হৃদয়ের উপর এ দুটি নামের প্রভাব পড়া অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্র বান্দাহ হওয়ার জন্য এ দুটি নামের প্রভাবের প্রতিফলন মুমিনের মনের উপর গ্রহণ করা একান্তই জরুরী। আল্লাহ্র নাম 'আর-রহমান'-এর প্রভাব এভাবে পড়বে যে, মুমিন আল্লাহ্র অসতর্ক বান্দাহ্দের প্রতি সে অবশ্যই দয়া করবে। সে ওয়ায-নসীহতের সাহায্য আল্লাহ্র এসব বান্দাহদের নিয়ে আসবে আল্লাহ্র দিকে— আল্লাহ্র বন্দেগীর দিকে। সে তাদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা করবে না, রূঢ়তা ও দুর্ব্যবহার না করে ভালোবেসে তাদের সংশোধন করার চেষ্টা চালাবে। আল্লাহ্র নাফরমান লোকদের প্রতি সে তাকাবে দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে, তিরস্কার বা ঘৃণা-বিদ্বেষের চোখে নয়। দুনিয়ায় যত পাপ-নাফরমানীর কাজ হচ্ছে, তার জন্য সে নিজেকেই প্রকারান্তরে দায়ি মনে করবে। তা হলেই না সে তা দূর করার জন্য নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালাবে। সে নাফরমান ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে, ক্রোধ নয়।

আর 'আর-রহীম' নামের প্রভাবে মুমিন বান্দাহ্ কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অভুক্ত থাকতে দিতে রাজি হবে না, তার ক্ষুধা-মুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা

চালাবে। তার নিকটাত্মীয় বা পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কাউকে না-খেয়ে রাত কাটাতে বাধ্য-অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। তার নিজের থাকলে তাই দিয়ে তার অভাব মোচন করবে, না থাকলে অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে তার ব্যবস্থা করবে এবং গোট সমাজ ও দেশে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় এক পূর্ণাঙ্গ অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য চেষ্টা চালাবে। একা এবং আরও দশজনকে নিয়ে— সেখানে সরকার সমস্ত উৎপাদন উপায়ের মালিক না হলেও সকলের খাওয়া-পরা সহ সব মৌলিক অধিকার সরকারের কাছ থেকে আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ফলে সেখানে কেউ না-খেয়ে থাকবে না, থাকবার প্রয়োজনই হবে না। এসব কিছুই সে করবে দুঃখী মানবতার প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয় নিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা স্থায়ীভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে।

যে দয়া করে না সে দয়া পায় না

মুমিনের ঐকান্তিক বিশ্বাস এই যে, সে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র রহমতের মুখাপেক্ষী। এই রহমত পেয়েই সে দুনিয়ায় জীবন যাপন করে এবং পরকালের সাফল্য এর দরুনই সম্ভবপর হবে।

কিন্তু তার এ বিশ্বাসও থাকে যে, মানুষের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা না করলে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করা যায় না।

إِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ -

আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যারা দয়াবান ও করুণাশীল কেবল তাদের প্রতিই অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ -

যে নিজে অন্যদের প্রতি দয়া করে না, সে আল্লাহ্‌র দয়া পেতে পারে না।

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ -

তোমরা দুনিয়ার লোকদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করো, তাহলে আসমানের আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করবেন।

মুমিদের দয়া-দাক্ষিণ্য কেবলমাত্র তাদের ভাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, যদিও তারাই হয় এ দয়া পাওয়ার প্রধান অধিকারী। আসলে মুমিনের অন্তর দয়া-অনুকম্পায় কানায়-কানায় ভর্তি হয়ে থাকে এবং তা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই পেয়ে থাকে। রাসূলে করীম (স) সাহাবীদের লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন ঃ

لَنْ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَرْحَمُوْا -

তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দয়া-অনুকম্পা বিতরণ না করবে, ততক্ষণ সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার দাবি করতে পার না।

এ কথা শুনে সাহাবিগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূল, আমাদের প্রত্যেকেই দয়াশীল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِنَّهٗ لَيْسَ بِرَحْمَةِ اَحَدِكُمْ صَاحِبَهٗ وَلٰكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ - (الطبرانی)

না, একজন আর একজনের প্রতি দয়া করবে, এটাই যথেষ্ট নয়। আসলে দয়া হতে হবে সাধারণ ও নির্বিশেষ সমগ্র মানবতার প্রতি।

কুরআন মজীদে মুমিনদের গুণ বলা হয়েছে ঃ

وَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ -

তারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় দয়া-দাক্ষিণ্য করার।

এ দয়া মানুষকে ছাড়িয়ে জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত ব্যাপৃত। মুমিন জন্তু-জানোয়ারের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করে ওদের ব্যাপারেও, এবং ওদের প্রতি আচরণ গ্রহণেও তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। কেননা তারা জানে, এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের রীতিমত জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন, একজন নাফরমান লোক একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল বলে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, তার জন্য জান্নাত তার দুয়ারসমূহ খুলে দিয়েছিল এবং জাহান্নাম একজন স্ত্রীলোকের জন্য তার দুয়ার খুলে দিয়েছিল কেবল এ জন্য যে, সে একটি বিড়ালকে বন্দী করে রেখেছিল বলে সেটি মরে গিয়েছিল। সে সেটিকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি। একটি মূক-নিরপরাধ বিড়ালের প্রতি এরূপ আচরণের পরিণতি যদি এই হতে পারে, তাহলে লাখ লাখ বনি আদমকে অকারণ বন্দী করে রেখে যারা কষ্ট দেয়, তাদের পরিণাম কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। আর যে সব লোককে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে একমাত্র নিরংকুশ সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক মেনে নেয়ার অপরাধে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বন্দী করে রাখে যে সব অহংকারী আল্লাহদ্রোহী শাসক, তাদের পরিণামের কথা চিন্তা করাও লোমহর্ষক।

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে বলল ঃ ইয়া রাসূল! আমার অন্তরটা এতই দয়াশীল যে, আমি একটা ছাগলও যবাই করতে পারি না। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللّٰهُ - (حاكم)

হ্যাঁ, তুমি যদি ছাগলের প্রতি এতই দয়াশীল হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমার প্রতি অবশ্যই দয়া করবেন।

ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, হযরত আমর ইবনুল আস মিসর বিজয়-অভিযানে এক স্থানে তাঁবু গেঁড়ে ছাউনী নির্মাণ করলেন। তখন এক জোড়া কবুতর এসে কোনো তাবুতে বাসা নির্মাণ করল। কিছুকাল পর তিনি স্থানান্তরে গমন করার উদ্দেশ্যে যখন তাঁবু তুলতে গেলেন তখন এই দৃশ্য দেখতে পান। তখন তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হলো এবং তাঁবুটি সেই অবস্থায় রেখে দিয়ে চলে গেলেন। উত্তরকালে এই তাঁবুকে কেন্দ্র করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রস্থল তৈরী হয়। এই শহরটিরই নাম 'ফুসতাত'— (তাঁবু)

ইসলামের দয়ানীতির কারণেই কোনো ভারবাহী জন্তুর পিঠে তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপানো ও বিনা বিশ্রামে দীর্ঘপথ অতিক্রমে বাধ্য করানো সম্পূর্ণ নিষেধ। হযরত উমর ইবনে আবদুর আজীজ (রহ) তাঁর খিলাফত আমলে এজন্য রীতিমত অর্ডিন্যান্স জারী করেছিলেন। মুসলিম সমাজে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয়-জীবনের সকল দিকে ও বিভাগে এই দয়া, সহানুভূতি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে রয়েছে। আর তার মূলে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান। এ ঈমানের সংস্পর্শে পাষাণ হৃদয়ও গলে মোম হয়ে যায়। দয়া-অনুগ্রহের প্রস্রবণ প্রবাহিত হতে শুরু করে। হযরত উমর (রা) জাহিলিয়াতের যুগে নির্দয় ও শক্ত আত্মার মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। সেকালের সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী তিনি তাঁর একটি কন্যাকে হত্যা করেছিলেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই লোক ঈমান গ্রহণের পর কতখানি বদলে গিয়েছিলেন, তা কারো অজানা নয়। আর খলীফা হওয়ার পর খিলাফতের দূরতম কোনো স্থানে একটি উষ্ট্র না খেয়ে মরলে সেজন্য খলীফা হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে বলে কঠিন দায়িত্ব অনুভব করে কেঁদে উঠতেন। প্রাথমিক কালের মুসলমানদের হৃদয়-মনে ঈমান-নিঃসৃত এ দয়া ও অনুকম্পা ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এমন কি জানের শত্রুর প্রতিও তারা পুরোপুরিভাবে দয়াশীল হয়ে থাকতেন ও অনুরূপ দয়াপূর্ণ আচরণ গ্রহণ করতেন। রাসূলে করীম (স) কোনো যুদ্ধে একটি স্ত্রীলোককে নিহত হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তখন তিনি ভয়ানকভাবে ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, 'মেয়ে লোককে কেন হত্যা করা হবে? অতঃপর তিনি কড়া নির্দেশ দিলেন, 'যুদ্ধকালে কেউ যেন স্ত্রী লোক, বৃদ্ধ, বালক শিশু এবং বেসামরিক জনতাকে হত্যা না করে।' রাসূলে করীম (স) তাঁর সাহাবীদের নেককার দয়াশীল হতে বলেছেন, পাপী ও নির্মম পাষাণ হৃদয় হতে

নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজেদের মধ্যে এ ভাবধারাই পুরোমাত্রায় সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন। প্রথম খলীফা হযরত আবুকবর সিদ্দিক (রা) যখন উসামা বাহিনী প্রেরণ করছিলেন, তখন তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ

> তোমরা কোনো মেয়েলোক, বয়োবৃদ্ধ, বালক ও শিশু হত্যা করবে না। কোনো ফলের গাছ কাটবে না, খেজুরে গাছ কাটবে না। এমন অনেক লোক দেখতে পাবে, যারা গির্জা ও উপাসনাগারে উপাসনায় নির্লিপ্ত হয়ে রয়েছে, তাদের সে অবস্থায়ই থাকতে দেবে— তাদের উপর হস্তক্ষেপ করবে না।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর হেদায়েত দিতেন ঃ সাবধান, বেসামরিক কৃষকদের গায়ে হাত দেবে না।

হযরত আবূ বকরের সামনে যুধ্যমান শত্রুপক্ষের এক প্রধান দুষ্কৃতিকারীর গলা কাটা মস্তক পেশ করা হলে তিনি যারপরনাই ক্রোধ প্রকাশ করেন এবং নির্দেশ দেন, এমন কাজ যেন আর কখনো করা না হয়। শত্রুর নিহত হওয়াটাই যথেষ্ট; তার গলা কেটে কল্লা ও ধড় বিচ্ছিন্ন করার কোনো প্রয়োজন হয় না।

বস্তুত ইসলামের যুদ্ধ নীতির প্রতি ছত্রে ছত্রে মানবতার প্রতি দয়া ও অনুকম্পাই প্রধান ও সোচ্চার হয়ে আছে। ইসলামী ঈমান নির্মমতা ও পাশবিকতাকে কোনো দিনই সহ্য করেনি। এ যুদ্ধে রক্তপাত হয় ঠিক ততটুকুই, যতটুকু অপরিহার্য। তার বেশি এক ফোঁটাও নয়। তাই ফরাসী দার্শনিক গস্তফ লুবোন স্বীকার করেছেন ঃ

> আরবদের অপেক্ষা অধিক ন্যায়বাদী ও দয়াশীল দেশ-বিজয়ীর কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই।

ইসলামী সমাজে দয়া-অনুকম্পার প্রতিফল

ইসলামী সমাজে ঈমানদার লোকদের ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরীণ জীবনক্ষেত্রে ঈমান নিঃসৃত দয়া-অনুকম্পার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছিল। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পারস্পরিক দয়া-সহানুভূতিই অধিকতর প্রকট হয়ে ফুটে উঠত। এ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দয়াশীল, অনুকম্পা ও সহানুভূতিসম্পন্ন। দয়া-অনুকম্পার এই মৌলিক ভাবধারা বাস্তবায়িত হয়েছে একটি কল্যাণময় বাস্তব সমাজ কাঠামো রূপে। মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ ব্যবস্থা তারই বাস্তব রূপ।

মুমিনদের অন্তরে যে দয়া ও জনকল্যাণের পবিত্র ভাবধারা জেগে ওঠে, সেজন্য জীবন বেঁচে থাকাকাল পর্যন্ত তো তারা ব্যক্তিগতভাবেও এবং

সমষ্টিগতভাবেও সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর কাজ করতে থাকেই; কিন্তু মৃত্যুর পর যেন এ কাজ বন্ধ হয়ে না যায়, মৃত্যুর পরও যেন এ কাজ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তারই জন্য প্রচলিত হয়েছে এই ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার আশু উদ্দেশ্য সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের কল্যাণ সাধন এবং চরম লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ ও পরকালে তার সওয়াবের অধিকারী হওয়া। এ জন্য ধন-সম্পত্তির অধিকারীরা তাদের ধন-সম্পত্তির একটা অংশ ওয়াক্‌ফ করে যায়। আর তা নিয়োজিত হয় ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, পিপাসার্তকে পানি দান, বস্ত্রহীনকে পোশাক দান, গরীব রোগীর চিকিৎসা, অশিক্ষিতদের শিক্ষাদান, অর্থাভাবে শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে এমন ছাত্রদের বৃত্তি দান, লা-ওয়ারিস লাশের দাফন কার্য সম্পাদন, ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ সংরক্ষণ, শিক্ষাদান, প্রয়োজন-পরিমাণ থেকে বঞ্চিতদের জীবন যাত্রা— সামগ্রী সংগ্রহ করে দেয়ার প্রভৃতি কাজে প্রধানত এবং সাধারণভাবে মানুষের যে-কোনো বিপদকালে সাহায্য দানের জন্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে পশুদের সেবা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। বস্তুত ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা বিশ্বমানবতার প্রতি ইসলামী সভ্যতার এক বিশেষ অবদান। এর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার অন্য কোনো সমাজ ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না।

ইসলামী ঈমানেরই অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নিঃস্বার্থ মানবতাবাদ। মানব কল্যাণ এর মর্মবাণী। এজন্য ঈমানদার লোকেরা যে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দেয়, তা সাধারণভাবে সমস্ত বিপন্ন মানবতার সেবায় নিয়োজিত এবং ব্যয়িত হয়। সে ওয়াক্‌ফ হয় ব্যাপক ভিত্তিক। জীবনের একটি দিক বাদ দিয়ে অপর দিকে তা নির্দিষ্ট হয় না। এজন্য ওয়াক্‌ফকে পরিভাষায়ই বলা হয়— 'ওয়াক্‌ফ লিল্ আম'— সাধারণ কল্যাণকর কাজের জন্য উৎসর্গিত। এ ওয়াক্‌ফের মূলে গভীর মানবতাবাদ চিরন্তনের প্রেরণা হয়ে থাকে। যে-কোনো কালে যে-কোনো স্থানেই মানুষের জন্য এর সহযোগিতা প্রয়োজন, সেখানেই তা সম্প্রসারিত হয়।

সত্যি কথা, মুমিনের অন্তর কখনোই দয়াশূন্য হয় না, হতে পারে না। পক্ষান্তরে কুফর— আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী মানব মনকে বানায় নির্মম, নির্দয়, পাষাণ। আর এই পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় মানুষেরা দুনিয়ার বুকে ঘটাতে পারে যত সব লোমহর্ষক অমানুষিক বর্বরতা, যার সামান্য বিবরণও মানব হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিতে পারে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে আমরা দেখতে পাব, দুনিয়ায় এ পর্যায়ে ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে কেবলমাত্র সে-সব মানুষের দ্বারা, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি একবিন্দু ঈমান রাখে না, পরকালের কঠিনতম শাস্তিকে যারা ভয় করে না। এই তালিকার

শিরোনামায় রয়েছে প্রাচীন ইতিহাসের ফিরাউন। সে ছিল আল্লাহ্দ্রোহী, অহংকারী, স্বৈরাচারী, অত্যাচারী। সে সন্তানদের যবাই করত, মেয়েগুলোকে রক্ষিতা বানাত। পরকালে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে— এ বিশ্বাস তার মনে স্থান পায় নি। ফলে সে যা ইচ্ছা তাই করেছে। কুরআন মজীদে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْآ اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَايُرْجَعُوْنَ

(القصص : ٣٩)

ফিরাউন তাকাব্বুরী করেছে, তার সৈন্য সামন্তরাও— দুনিয়ার বুকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে। আর তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, তারা আমার কাছে ফিরে আসবে না।

হযরত মূসা (আ) এরই মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ -

আমি পরকালের হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি অবিশ্বাসী প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তির থেকে পানাহ্ চাই আমার ও তোমাদের আল্লাহ্র কাছে।

'নীরু' রোম ভস্ম করে দিয়েছিল। লেনিন ম্যাকসিম গোর্কীর নামে লিখিত এক পত্রে লিখেছিল 'বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে হত্যা করেও যদি অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট বানানোর পথ সুগম হয়, তবে তাই কাম্য। এরাও এই তালিকারই লোক।

এই তালিকায় তাদের নামও লিখিত, যারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও সমাজে নানারূপ অমানুষিক ও নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে নির্দোষ মানুষের উপর, নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য, ক্ষমতার লোভে।

আধুনিক ইতিহাসের এক প্রখ্যাত ব্যক্তির কার্যকলাপ সব পুরাতন ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। সে ক্ষমতা লাভের পূর্বে যারা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিল, তাদেরও হত্যা করেছে। প্রথম সেক্রেটারী পর্যায়ের প্রায় ৮ হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ১৯৩৬ সনে গণ-পরিষদের ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জনকে হত্যা করেছে।

নিম্নস্তরের সেক্রেটারীদের মধ্যে ৪৩ জনকে হত্যা করেছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের ৮০ জন লোকের মধ্যে ৭৫ জনকে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীর ৫ জন মার্শালের মধ্যে ৩ জনকেই হত্যা করেছে। ১৯৩৬ সনে গঠিত মন্ত্রী পরিষদের ১১ সদস্যের ৯ জনকে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীর ৬ হাজার অফিসার পর্যায়ের এবং প্রশাসন

বিভাগে ৩০ হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। আর এই হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে। এ ব্যক্তির নির্মমতা বোধ হয় মানব ইতিহাসের সব নির্মমতাকেই ছাড়িয়ে গেছে। এ ব্যক্তি যে স্ট্যালিন ছাড়া আর কেউ নয়, তা ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন।

আধুনিক গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ হচ্ছে, সে দেশে গণতন্ত্র নেই। এই ব্যক্তির খেয়াল-খুশিমত সেখানে সবকিছু চলে, সমস্ত মানুষকে তারই কাছে নতি স্বীকার করতে হয় বলে সেখানে এরূপ হওয়ার সম্ভবপর হয়েছে। গণতন্ত্রের নাম গন্ধও থাকলে এরূপ লোমহর্ষক ঘটনাবলী সংঘটিত হতে পারত না।

এ বিশ্লেষণকে আমরা অমূলক বলে উড়িয়ে দেব না। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণে জনগণের স্বাধীনতা না থাকাই এর একমাত্র কারণ নয়, নয় মূলীভূত কারণও। দুনিয়ায় গণতন্ত্রহীন বহুদেশ এমনও রয়েছে যেখানকার শাসকরা নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তাদের জানের শত্রুদের সাথেও এমন নির্মম আচরণ করেনি, যা এই ব্যক্তি করেছে তার পরম বন্ধু ও বহুকালের সহকর্মীদের সাথে। আসলে এর মূলীভূত কারণ হচ্ছে ঈমানের অনুপস্থিতি। ঈমান না থাকার দরুনই এমন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করতে পারে না। আর তাদের হৃদয়-মন ঈমানশূন্য হওয়ার কারণেই হয়েছে দয়ামায়াশূন্য। কোনো মানুষকে সে আপনার মতো মানুষ ও ভাইরূপে গ্রহণ করতে পারে নি। বস্তুত যেখানেই ঈমান অনুপস্থিত, রাষ্ট্র শাসনের মূল ভিত্তি হিসাবে যেখানে ঈমান স্বীকৃত নয়, যে রাষ্ট্র শাসনের সর্বক্ষেত্রে ঈমান পূর্ণমাত্রায় কার্যকর নয়, সেখানেই এরূপ নির্মমতার নাটক অভিনীত হবে। এর ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যাবে না।

ঈমান নিঃসৃত দয়া-মায়ার দুটি দৃষ্টান্ত

উপরে যে কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে, তা হচ্ছে নির্মমতা ও অমানুষিকতার একালের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।এর মূল কারণ হৃদয়ে আল্লাহ ভয় না থাকা, পরকালে আল্লাহ্‌র সম্মুখে বাধ্যতামূলক উপস্থিতিকে বিশ্বাস না করা। কিন্তু যে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালের বিশ্বাস প্রকট ও চিরজাগ্রত, সে অন্তর কখনো নির্মম, নিষ্করুণ হতে পারে না। দুনিয়ায় চিরকালই এ দু'ধরনের অন্তরে মানুষ রয়েছে এবং তাদের জীবন-কাহিনী দুটি সরল রেখার মতো দুদিকে চলে গেছে। এ জন্য এ দুটির পরস্পরে কোনো তুলনাই হতে পারে না। ঈমানদার লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, পাপ করে সে যদি দুনিয়ার হিসাব থেকে রক্ষা পেয়েও যায়, তবু কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। এখানের প্রতিশোধের

হস্ত যদি তাকে স্পর্শও করতে না পারে, তবু পরকালের ন্যায়-বিচারের দণ্ড তার মস্তককে চূর্ণ করে দেবেই— সেখানে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে না। ঈমানদার অন্তর কেবল সুবিচারের মান রক্ষা করাকেই যথেষ্ট মনে করে না, অপরাধ অনুপাতে শাস্তি ভোগ করেই ক্ষান্ত হয় না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে উচ্চতর মর্যাদা ও আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রাপ্তির উপর। কুরআনের কথা হলো ঃ

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ -

তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে তা করবে ততটা, যতটা তোমরা দুঃখ ভোগ করেছ। আর যদি ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা অতীব উত্তম ও কল্যাণময় নীতি।

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ -

যতটা মন্দ করা হয়েছে, তার প্রতিবিধানে ততটা মন্দই করা যেতে পারে। কিন্তু যে লোক ক্ষমা করেছে ও সন্ধি-সংশোধনের পন্থা অবলম্বন করেছে, তার প্রতিফল আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দেবেন। কেননা তিনি জালিম লোকদের মোটেই পছন্দ করেন না।

এ কারণে ইসলামী ঈমানের নির্মল ইতিহাসে প্রতিশোধ গ্রহণের তুলনায় ক্ষমাদানের কাহিনী অত্যধিক উজ্জ্বল ও প্রকট। এ ঈমান মানুষের হৃদয়মন ও রুচি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে গড়ে তোলে, সাধারণত তার অনুরূপ হৃদয়-মনের সন্ধান পাওয়া ভার। খুলাফায়ে রাশেদুনের ইতিহাস থেকে আমরা এখানে দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই, যা বিশ্বমানবতার চোখে চির সমুজ্জ্বল।

প্রথম দৃষ্টান্ত

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের দারুল খিলাফত বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মূলত এই বিদ্রোহের পশ্চাতে ইসলামের চিরশত্রু ইহুদীদের কুটিল ষড়যন্ত্র ও প্রত্যক্ষ উস্কানি অধিক কার্যকর ছিল। বৃদ্ধ খলীফার উপর সশস্ত্র হামলা চালাবার জন্য তারাই সাদা হৃদয়ের মুসলমানদের প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু খলীফা ন্যায়-নীতিবাদী। তিনি শক্তির সাথে শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না, যদিও এই নীতি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের রক্তপাতের মর্মান্তিক পরিণতির সৃষ্টি করেছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিদ্রোহী হামলাকারীদের সাথে সশস্ত্র মুকাবিলা করার অনুমতি চাইবার জন্য হযরত উসমানের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু হযরত উসমান ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, অবিচল। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বের হয়ে

যাওয়ার ও যুদ্ধসাজ খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। বললেন ঃ 'প্রতিরোধ হস্ত বিরত রাখ'।

হযরত যায়দ ইবনে সাবেত উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ মদীনার আনসার বাহিনী খিলাফত-প্রাসাদের দ্বারদেশে সমুপস্থিত। তাদের বক্তব্য হলো, আপনি ইচ্ছা করলে আমরা আবার সেই আনসার হব, যা আমাদের আসল পরিচিতি। হযরত উসমান বলে পাঠালেন আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা বিরত হও।

হযরত আমের ইবনে রবীয়াতা বলেন, আমি ঘরের মধ্যে হযরত উসমানের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত উসমান (রা) ঘোষণা করলেন ঃ

اَعْزِمُ عَلٰى كُلِّ مَنْ رَاٰى اَنَّ لِىْ عَلَيْهِ سَمْعًا وَطَاعَةً اَنْ يَّكُفَّ يَدَهٗ وَيُلْقِىْ سَلَاحَهٗ –

যে লোকই আমার কথা শুনতে ও আনুগত্য করতে প্রস্তুত— তা করা জরুরী বলে বিশ্বাসী, তাদের সকলের প্রতি আমার কঠোর নির্দেশ, তারা যেন নিজেদের হাত বিরত রাখে এবং অস্ত্র সংবরণ করে।

এ কথা শুনে হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুত সমস্ত মানুষ অস্ত্র সংবরণ করল ও প্রতিআক্রমণ থেকে বিরত হলো। একজন আনসার বললেন ঃ হযরত আমাদের প্রতি-আক্রামণ চালাতে কড়া নিষেধ করলেন। তিনি যদি আমাদের অনুমতি দিতেন, তাহলে বিদ্রোহী আক্রমণকারীদের মেরে আমাদের এই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দিতাম।

তৃতীয় খলীফার শাহাদত লাভের ঘটনা মূলত এ কারণেই সংঘটিত হয়েছিল যে, তিনি প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অস্ত্র প্রয়োগের পরিবর্তে যুক্তি-তর্ক, উত্তম নসীহত ও বুঝ-সমঝ দানের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন। কখন ? .... যখন বিদ্রোহী সশস্ত্র ব্যক্তিরা হযরত উসমানের রক্তপাত না করে ছাড়বে না বলে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। একবার সমবেত বিদ্রোহীদের সম্বোধন করে তিনি একটি ভাষণ দিলেন। বললেন ঃ 'তোমরা জানো, একজন মুসলমানের রক্তপাত কেবলমাত্র তিনটি অপরাধের দণ্ডস্বরূপ হতে পারে। আর তা হলো, ঈমানের পর কুফরি গ্রহণ, বিবাহিত হয়েও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা। তোমরাই বলো, আমি কি এর মধ্যে কোনো একটি অপরাধও করেছি ?

জনতা তাঁর এ মর্মস্পর্শী ভাষণ নীরবে শুনল। কোনো জবাব দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। পরবর্তী আর একটি ভাষণে তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে তোমরা যদি মনে করো, আমাকে কারারুদ্ধ করলেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, তাহলে তোমরা না হয় তাই করো। কিন্তু এ কথারও কোনো জবাব তারা দিল না। তখন তিনি তাদের মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে বলে উঠলেন ঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنْ كُنْتُ ظَلَمْتُ - وَقَدْ غَفَرْتُ اِنْ كُنْتُ ظُلِمْتُ -

আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই। আমার উপর যদি জুলুম হয়, তাহলে আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।

বস্তুত খলীফা ধৈর্য এ আত্মসংবরণের উন্নততর আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সমর্থনে ও প্রতিরক্ষার খাতিরে রক্তপাত হবে, এ জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা তাহলে মদীনার অলি-গলি রক্তের বন্যায় ভেসে যেত। তার চাইতে যদি একজনের রক্তপাতের বিনিময়ে রক্ত বন্যার মুখে বাঁধ বাধা সম্ভবপর হয়, তাহলে তাই শ্রেয়। এই ছিল তাঁর মনোভাব।

মাবুদুল-খাজায়ী হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হলেন, তখন আপনি মদীনায় উপস্থিত থেকেও তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারলেন না। তার কারণ কি ? হযরত আলী (রা) বললেন ঃ

اِنَّ عُثْمَانَ كَانَ اِمَامًا وَ اِنَّهٗ نَهٰى عَنِ الْقِتَالِ وَقَالَ مَنْ سَلَّ سَيْفَهٗ فَلَيْسَ مِنِّىْ فَلَوْ قَاتَلْنَا دُوْنَهٗ عَصَيْنَا -

হযরত উসমান ছিলেন মুসলমানদের ইমাম, খলীফা। তিনি নিজেই প্রতিরক্ষা যুদ্ধ চালাতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "যে লোক তরবারী উত্তোলন করবে, সে আমার জামায়াতভুক্ত গণ্য হবে না।" এতদসত্ত্বেও যদি আমরা যুদ্ধ করতাম, তাহলে আমরাই হতাম খলীফার নাফরমান।

খাজায়ী প্রশ্ন করলেন, তাহলে হযরত উসমান শাহাদত বরণ করে কতটা মার্যাদ লাভ করেছেন ?

হযরত আলী বললেন ঃ যতটা মর্যাদা লাভ করেছিলেন হযরত আদমের পুত্র। কাবীল যখন বলেছিল, আমি তোমাকে হত্যা করব, তার জবাবে হাবীল বলেছিলেন ঃ

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ - اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰـهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার হস্ত আমার দিকে প্রসারিত করো, তাহলে জেনে রাখো, আমি আমার হস্ত তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে প্রসারিত করব না। কেননা আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ঘটনাটি হযরত আলী (রা) সংক্রান্ত। ইবনে মুলজিম ও আশ্‌জায়ী এই দুজন আততায়ী তাঁকে শহীদ করার জন্য মসজিদে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। হযরত আলী (রা) ফজরের নামাযের জন্য লোকদের ডাকবার উদ্দেশ্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পরে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেই দ্বারপথে তারা তাঁকে পেয়ে গেল। একের পর এক দুজনেই তাঁকে লক্ষ্য করে তরবারির আঘাত হানল। আশজায়ীর তরবারী লক্ষচ্যুত হলো। আর ইবনে মুলজিমের তরবারী লক্ষ্যবিদ্ধ হলো। হযরত আলী (রা) তরবারীর আঘাত পেয়েই বলে উঠলেন ঃ

فُزْتُ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

আমি আল্লাহর কাছে পৌঁছার সাধনায় সফলকাম হলাম।

তখনই অকুস্থলে জনতার ভিড় জমে গেল এবং আততায়ী দুজনকে ধরে ফেলল। কিন্তু আশজায়ী ভিড়ের মধ্য থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। আর মুগীরা ইবনে নওফল ইবনে মুলজিমকে ধরে মাটির উপরে ফেলে তার বুকের উপর উঠে বসলেন। অতঃপর তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে, এ বিষয়ে লোকেরা হযরত আলী কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বললেন ঃ

اِنْ اَعِشْ فَالْاَمْرُ اِلَىَّ وَاِنْ اُصِبْتُ فَالْاَمْرُ لَكُمْ فَاِنْ اٰثَرْتُمْ اَنْ تَقْتَصُّوْا فَضَرْبَةٌ بِضَرْبَةٍ وَاِنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

আমি যদি বেঁচে যাই, তাহলে যা করার আমি করব, আর আমি যদি চলে যাই, তাহলে সমস্ত ব্যাপার তোমাদের উপর অর্পিত। কিন্তু তোমরা যদি শরীয়ত অনুযায়ী জিহাদ করাকে অগ্রাধিকার দাও, তাহলে হত্যার বদলে হত্যা। তবে যদি ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা-ই তাকওয়ার অতীব নিকটবর্তী নীতি।

বলা বাহুল্য, হযরত আলী তখন একজন সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি আমীরুল মুমিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন। তা সত্ত্বেও ইসলামী ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটল তাঁর কণ্ঠে। যখন তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন, সেই সময়ও। কিন্তু বস্তুবাদি আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী লোকদের দ্বারা এরূপ আত্মত্যাগের সূর্য সমুজ্জল নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা কস্মিনকালেও কি সম্ভব ? মানব ইতিহাস থেকে তার অতি সামান্য দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে কি ? .... যারা স্রষ্টাকে ভয় করে না, তারা সৃষ্টির প্রতি একবিন্দু দয়া দেখাতে পারে না, এই কথাই শাশ্বত সত্য।

ঈমান ও উৎপাদন

উৎপাদন বলতে আমরা এখানে মনে করছি বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং সাধারণভাবে বস্তুগত ও তাৎপর্যগত উৎপাদন। এ কালের কিছু লোক মনে করছে, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন গতিকে হ্রাস করে, দ্রুত উৎপাদনকে বিলম্বিত ও মন্থর করে দেয়। তার গতিশীলতাকে স্তব্ধ বা স্থিমিত করে দেয়। কেননা ধর্মীয় ঈমান আকীদা জীবন প্রেমের বিলোপ সাধন করে এবং বস্তুগত কাজ-কর্মের প্রতি আকর্ষণ বা উৎসাহ-উদ্দীপনাকে একেবারে নির্মূল করে দেয়। উপরন্তু তা মানব মনে এই ভাব জাগিয়ে দেয় যে, মানুষ এখানে স্বাধীন নয়, বন্দী ও বৈষয়িক জীবনের জন্য কাজ ও কর্মতৎপরতা গ্রহণ করা অবাঞ্ছিত। তখন তারা কর্মবিমুখতার দ্বারা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং জীবনের গতিকে থামিয়ে দেয়— যখন ঈমান মানব মনে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব ধর্মকে মন ও জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। ধর্মকে সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করতে হবে। অন্তত ধর্মের ব্যাপারে হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, নির্বিকার। ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও ব্যাপকতা এই মনোভাবের কাছে অসহ্য। বলতে গেলে এই হচ্ছে এ কালের বস্তুবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু এটা চরম বোকামী এবং দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক, অথবা দ্বীন ও ঈমানের প্রতি চরম অন্ধ বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুত প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে দ্বীন ও ঈমানই হচ্ছে উৎপাদনের সবচাইতে বড় প্রতিরক্ষক। উৎপাদনের মূল প্রেরণা মানুষ দ্বীন ও ঈমান থেকেই পেয়ে থাকে। দ্বীন ও ঈমানই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বেশি বেশি উৎপাদনের জন্য। কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার, নিজের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পুরোমাত্রায় শ্রম বিনিয়োগ করে যথাযথ উৎপাদনে ব্রতী হওয়ার জন্য মানুষকে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করে এই দ্বীন ও ঈমান। লোকেরা যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করত সঠিক দৃষ্টিকোণে, তাহলে এ সত্য সকলের কাছেই উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠত এবং ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের প্রতি এরূপ নির্লজ্জ-নির্বুদ্ধিতার আচরণ করতে তাদের কুণ্ঠিত হতে হতো। কেননা উৎপাদন প্রবৃদ্ধির জন্য কঠোর শ্রম, চেষ্টা-সাধনা ও ব্যাপক কর্মতৎপরতা অপরিহার্য। তার সঙ্গে প্রয়োজন কর্মতৎপরতার গভীর স্থৈর্য ও দৃঢ়তা বিনিয়োগ। আর কাজশূন্য

হৃদয়ে তা হতে পারে না। কর্মের প্রতি ব্যক্তির গভীর বিশ্বস্ততা-আন্তরিকতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা না হলে কোনো কাজই সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হতে পারে না। আর এর জন্যও প্রয়োজন এক শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারীর। কিন্তু মানুষের জীবনে ঈমান অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক আর কিছু হতে পারে কি ?

ঈমান ও আমল

সত্যিকার ঈমান কেবলমাত্র একটা মানসিক অনুভূতি মাত্র নয়। হৃদয়মন দিয়ে একটা জিনিসকে সত্য ও নির্ভুল বলে স্বীকার করে নিলেই ঈমানের দাবি ও দায়িত্ব পরিপূরিত হয় না। সেই ঈমানের সঙ্গে জীবনব্যাপী কর্মের যোগ একান্তই জরুরী। এক কথায় বৈষয়িক জীবনের যে-কোনো কাজের তিনটি অবিচ্ছিন্ন অংশ রয়েছে। আর তা হচ্ছে— বিশ্বাস, কর্ম ও নিষ্ঠা। কর্মে নিশ্চিতরূপেই ফলোৎপন্ন হয়, এ বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়মূল হয়ে না থাকলে কেউই কর্মে অনুপ্রাণিত হয় না। সেই বিশ্বাস মনে দৃঢ়মূল থাকলে অবশ্যই কর্মে উদ্বুদ্ধ ও নিযুক্ত হতে হয়। আর কাজ করলেই তার ফল ও ফসল স্বতঃই সুষ্ঠু হতে পারে না, যদি না তার সাথে গভীরভাবে সংযোগ ঘটে আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার। নিতান্ত বৈষয়িক দৃষ্টিতেও উৎপাদন পর্যায়ে এ কথা সত্য ও চূড়ান্ত। ইসলামী ঈমানেরও বক্তব্য এটাই।

অবশ্য দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রবিদেরা ঈমান ও আমলের মধ্যে কি সম্পর্ক, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। ঈমান কি আমলের অংশ ? বিশ্বাস কি কর্মের অংশ ? না ঈমান কর্মের শর্ত ? অথবা কর্ম ঈমানের ফল ও ফসল ? এ সবই হলো দার্শনিক বিষয়ের নানা জিজ্ঞাসা, তর্কের নানা সূত্র। কিন্তু তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কর্ম ঈমানের অংশ, কিংবা ঈমানের পরিণতি কর্ম। একটি হাদীসের ভাষণ থেকে ঈমানের প্রকৃত রূপটা আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। তা হলো ঃ

لَيْسَ الْاِيْمَانُ بِالتَّمَنِّىْ وَلَابِالتَّحَلِّىْ وَلٰكِنْ مَّا وَقَّرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ -

(ابن النجار، ديلمى)

কেবল কামনা-বাসনা বা জাঁকজমকের নাম ঈমান নয়। যা হৃদয়ে উপর দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে এবং বাস্তব কর্ম যার সত্যতা প্রমাণ করেছে তাই হচ্ছে ঈমান।

তার অর্থ, ঈমান হলে কর্ম অনিবার্য। আর কোনো কর্মই বাস্তবায়িত হয় না, যদি না তার মূলে ঈমানের তীব্র চেতনা ও প্রেরণা বর্তমান থাকে। বস্তুত

সত্যিকার ঈমানের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ধর্ম বা আমল, এতে আর কোনো সংশয় নেই। কুরআন মজীদে ঈমান ও আমলকে সামন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সত্তরটিরও বেশি সংখ্যার আয়াতে ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে আমলের উল্লেখে এ কথা প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে স্মরণীয়, কুরআন ঈমানের পর অবিমিশ্র আমল-এর উল্লেখ করেনি— এরূপ উল্লেখ যথেষ্ট ও যথার্থও মনে করা হয়নি। বরং 'আমলে সালেহ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'আমলে সালেহ' কুরআন মজীদের একটা ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা পর্যায়ের 'যৌগিক শব্দ'। এ শব্দটি দ্বীন ও দুনিয়া উভয় সংক্রান্ত কাজকে বোঝায়। তা যেমন ব্যক্তির কাজ বোঝায়, তেমনি বোঝায় সমষ্টির কাজও। মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক বা আধ্যাত্মিক কাজও সমানভাবে এ শব্দে শামিল রয়েছে।

মুমিনের কর্ম-প্রেরণার উৎস তার অন্তর্নিহিত

সাধারণভাবে কোনো-না কোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং বিশেষভাবে ইসলামী আকীদা মানুষের হৃদয়-কন্দরে অন্তর্নিহিত থেকেই মানুষকে কর্মের প্রেরণা দিতে থাকে। এছাড়া কোনো শাসন ব্যবস্থার তীব্র কঠোর অত্যাচারী আদেশ বা বাহ্যিক কোনো চাপ মানুষকে কর্মে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। কোনো প্রশাসন শক্তির আরোপিত ক্ষুধা, বঞ্চনা আর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শাস্তির ভয় ও আতংকের দরুনও তারা কাজের উদ্যোগী হয় না। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আদর্শের এতদ্সংক্রান্ত সব চিন্তা ও মত পুরোপুরি অর্থহীন এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।

আসলে ইসলাম বিশ্বাসীরা কর্মে উদ্বুদ্ধ হয় নিজেদের মনে তীব্র তাগিদে। এ পর্যায়ে তার প্রেরণা নিতান্তই ব্যক্তিগত। তার হৃদয় মন অন্তর্নিহিত থেকে কর্মের যে প্রেরণা দেয়, তাই চাবুক হয়ে তাকে কঠোর পরিশ্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করে। এছাড়া উপর থেকে কিংবা বাইরে থেকে যে চাবুক পড়ে বা চাবুকের যে ভয় প্রদর্শন করা হয়, মানুষ তার প্রতি বৃদ্ধাংগুষ্ঠি প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হয় না। আর ব্যক্তিগত প্রেরণা ব্যক্তি হৃদয়ে নিহিত কর্মোদ্দীপনার মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, সাধারণ দায়িত্ববোধ পৃথিবীর আবাদকরণের স্বতঃস্ফূর্ত বাসনা-কামনা এবং সৃষ্টিলোকের উপর প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তারের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহকালের সাফল্য ও পরকালীন সৌভাগ্য লাভ কেবলমাত্র আমল ও কর্মের উপর নির্ভরশীল। পরকালীন জান্নাত বে-আমল বা অকর্মাদের জন্য নয়। অলস ও কর্মবিমুখ লোকেরা স্বপ্নযোগে জান্নাতগামী হতে পারে। বাস্তবে তা সংঘটিত হবে না। পরকালীন জান্নাত পাবে তারাই, যারা কর্মে

নিষ্ঠাবান, ইচ্ছা ও সংকল্পে সুদৃঢ়, অবিচল এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রমী। তাই কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

এই হচ্ছে জান্নাত, যার অধিকারী তোমরা হবে তোমাদের করা আমলের দৌলতে।

فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

তাদের আমলের বিনিময়ে চোখের যে শীতলতা তাদের জন্য প্রচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে, তা কেউ-ই জানতে পারে নি।

পরকালীন সাফল্য আমলের ফসল— অমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষার নয়

যে চাওয়ার পিছনে চেষ্টা নেই এবং যে কামনা-বাসনা পূরণে কর্মের বাস্তবতা অনুপস্থিত, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস তার ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দিয়েছে। কেননা ওসবের ফলেই দুনিয়ায় এমন এক-শ্রেণী লোকের উদ্ভব হয়েছে, যারা ধারণা করে যে, জান্নাত তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করে অপেক্ষমান রাখা হয়েছে; কিংবা তারা জান্নাত লাভ করবে বাপ-দাদার উত্তরাধিকারের সম্পত্তিরূপে আপনা-আপনি। তাদের বিশ্বাস, জান্নাত লাভ কেবলমাত্র একটির সাথে সম্পর্ক-স্থাপন কিংবা বিশেষ একটা ধর্মীয় পরিচিতির ফলেই সম্ভবপর।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের ধারণা-বিশ্বাস ও কামনা-বাসনার মূলে কোনো সত্য নেই, নেই কোনো যুক্তির ভিত্তি। বরং ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, জান্নাত লাভ কেবলমাত্র সত্যিকার নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান ও তদনুযায়ী বাস্তব কাজের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কুরআন মজীদ উল্লেখ করেছে, ইহুদী ও খৃস্টানরা বলত ঃ

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى -

জান্নাতে দাখিল হতে পারবে কেবল তারাই, যারা হয় ইহুদী হয়েছে না হয় হয়েছে খৃস্টান।

অতপর কুরআন তীব্র কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে ঃ

تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْابُرْهَا نَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ

وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ - وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

এ সব হচ্ছে ওদের মনের অমূলক কামনা-বাসনা। তুমি বলো, তোমাদের এসব দাবির মূলে কোনো যুক্তি-প্রমাণ থাকলে তা পেশ করো— যদি তোমরা এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো— না, ও কথা সত্য নয়, সত্যি কথা হলো, যে লোকই নিজের সমস্ত সত্তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য অনুগত ও উৎসর্গিত করে দেবে এবং এ কাজে সে হবে পুরোপুরি নিষ্ঠাপূর্ণ, কেবল তারই জন্য তার আল্লাহ্‌র কাছে শুভ প্রতিফল বিদ্যমান। এই ধরনের লোকদের কোনো ভয় নেই, নেই তাদের কোনো দুঃখ বা দুশ্চিন্তা।

বস্তুত জান্নাতের পথ কর্মের কন্টক দিয়ে বাঁধা। কর্মময় কন্টকাকীর্ণ জীবন-পথ অতিক্রম না করে কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ আয়াত অনুযায়ী সে কর্ম হচ্ছে স্বীয় সমগ্র সত্তা আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গিত করা এবং উত্তম কর্ম সুসম্পন্ন করা।

কিন্তু ইহুদী ও খিস্টানরা এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধারণা পোষণ করত। উত্তরকালে এ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও এই ভিত্তিহীন-যুক্তিহীন ধারণা সংক্রমিত হয়েছে। অসলে এরাও নির্বোধ, আহাম্মক। এদের মনে যে কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়, তারা তারই পিছনে অন্ধভাবে ছুটতে থাকে। আর মনে করে, তাদের এ কামনা-বাসনা বুঝি আল্লাহ বাস্তবে প্রফিলিত করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহ কারোর মানসিক বিকাশের অধিন নন, কারো অযৌক্তিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতেও বাধ্য নন তিনি। এদের ধারণাটা এরূপ যে, কেবল ইসলামের কলেমাটা পড়লেই কিংবা মুসলমান নামধারী হলেই অথবা মুসলমান বংশে ও পরিবারে মুসলমান মা-বাবার ঔরসজাত হলেই জান্নাতের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করার ও তাতে অবাধে প্রবেশাধিকার লাভ করার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু কুরআন মজীদ স্পষ্ট অকাট্য ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিফল দানের বিধান তাঁর সমস্ত বান্দার জন্য অমোঘ, নির্বিশেষ ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে তাঁর কাছে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্বের আশা করা বৃথা। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্য একবিন্দু পার্থক্য নেই।

তাফসীরের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে, মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের একটি যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি দলই দাবি করছিল যে, বেহেশতে যাওয়ার জন্য তারাই অন্যদের তুলনায় বেশি অধিকারী। ইহুদীরা বলছিল, আমরা মূসার অনুসারী। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্‌র স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলেছেন। খ্রিস্টানরা বলছিল, আমরা ঈসার লোক। আর তিনি তো আল্লাহ্‌র রূহ, আল্লাহ্‌র কালেমা।

অতঃপর মুসলমানদের দাবি ছিল, আমরা হলাম হযরত মুহাম্মদের উম্মত। তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। আর তারা সমস্ত জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ্ তাদের বানিয়েছেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য। কিন্তু সত্যি কথা হলো কুরআন মজীদ এদের কারো দাবিরই একবিন্দু সমর্থন করেনি।

কুরআনের সুস্পষ্ট, অকাট্য, দৃঢ় ও দৃপ্ত ঘোষণা হচ্ছে ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ - مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا -

না তোমাদের অমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষায় কিছু হবে, না আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আশা–আকাঙ্ক্ষায়। অকাট্য কথা হলো, যারাই অন্যায় পাপ কাজ করবে, তাদেরই সে কাজের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এ ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীরূপে পাবে না। আর যে লোক ঈমানদার হয়ে নেক আমল করবে— সে পুরুষ হোক কি স্ত্রী— তারাই জান্নাতে যেতে পারবে। আর এ ব্যাপারে তাদের উপর একবিন্দু জুলুম করা হবে না।

দুনিয়ার সাফল্যের জন্য আমল অপরিহার্য

এ দুনিয়াটা নিরেট বাস্তব। এখানে অমূলক ধারণা-অনুমান ও ভিত্তিহীন আশা আকাঙ্ক্ষার একবিন্দু মূল্য নেই। মানুষ কর্মের পরিণতিরূপে যে সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভ করবে, তা কেবলমাত্র পরকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ্র প্রতিফল দানের বিধান মাত্র একটি এবং তা অনন্য। আর দুনিয়ার আল্লাহ ও পরকালের আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন। কর্মফল দানের যে বিধান আল্লাহ তা'আলা ইহকাল ও পরকালব্যাপী কার্যকর করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত ঘোষণা হলো ঃ

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا -

যে লোক উত্তম ও নিখুঁতরূপে কাজ সম্পন্ন করল, তার শুভ প্রতিফলকে আমরা কখনোই বিনষ্ট ও ব্যর্থ করে দেব না।

فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ -

কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য অতীব উত্তম কর্মফল বর্তমান।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

যে লোক একবিন্দু ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে লোক একবিন্দু মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

দেখতে পাবে অর্থ, কর্মের ফল পুরোপুরিই পাবে, ভোগ করবে।

কুরআন আরও ঘোষণা করেছে, আল্লাহ্‌র সুন্নত— আল্লাহ্‌র সামষ্টিক নীতি ও রীতি চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয়। আর সে সুন্নত কোনো অকর্মা-নিষ্কর্মা, নিষ্ক্রিয়, অলস, কর্মবিমুখ ব্যক্তির জন্য কোনো সাফল্য সম্ভব করেনি। এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনো পূরণ হবার নয়। উপরন্তু কর্মফল দানের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সুন্নত মুমিন-কাফের, আল্লাহ্‌র অনুগত-আল্লাহ্‌দ্রোহীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। যে-ই যে কাজ করবে, সে-ই সে কাজের ফল ভোগ করতে বাধ্য হবে এবং যে লোক কাজ করবে না, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, সে বঞ্চিত হবে। তার দ্বীন বা ধর্ম যাই হোক, আকীদা-বিশ্বাস যে ধরনেরই হোক না কেন। এ কারণেই মুমিন সব সময়ই কর্মনিরত ও কর্মব্যস্ত হয়ে থাকতে বাধ্য। কেননা নিষ্কর্মা হয়ে থাকলে বিশ্বলোকে সদা চলমান আল্লাহ্‌র বিধানের সাথে সংঘর্ষ বাঁধবে। আর তার পরিণাম অনিবার্য ধ্বংস।

মুমিন আল্লাহ্‌কে ভয় করে বলে নিখুঁত কাজ করে

মুমিন নিজস্ব অন্তর্নিহিত প্রেরণায় কর্মে নিবিষ্ট হয়, শুধু তাই নয়, সে কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু, নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত করতেই চেষ্টা করে প্রাণপণে। তার সমস্ত লক্ষ্য এর উপরই নিবদ্ধ থাকে। যে কাজই সে করে মূল কাজটা যাতে করে নির্ভুল, সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হলো তার জন্য তার চেষ্টার অন্ত থাকে না। কেননা এ ব্যাপারে তার চেতনা হয় খুবই তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং সুগভীর। তার দৃঢ় ঈমান হয়, তার কাজ করাটা আল্লাহ্‌র দৃষ্টির মধ্যে। সে কিভাবে কাজ করছে, গুরুত্ব ও আন্তরিকতা সহকারে কিংবা হেলা ভরে, তা আল্লাহ তা'আলা পুরোপুরি লক্ষ্য করছেন। তার শিল্প-কারখানা বা ক্ষেতে-খামারে কিংবা অফিসে, অথবা দোকানে সে কি আচরণ অবলম্বন করছে এবং কি ভূমিকা পালন করছে, তার কোনোটিই আল্লাহ্‌র অগোচরে থাকছে না। আর হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী তিনি كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ (مسلم) প্রত্যেকটি জিনিসে ও কাজে পুরোপুরি ইহ্‌সান— নির্ভুল, নিখুঁত, সুন্দর-সুষ্ঠু করণ প্রচেষ্টাকে অনিবার্য করে লিখে দিয়েছেন। আর নবী করীম (স) এবাদত পর্যায়ে ইহসান-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ - فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ -

আল্লাহ্‌র ইবাদতের কাজ এই মনোভাব ও চেতনা নিয়ে করো যে, তুমি যেন আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে নাও পার, তবু এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

বস্তুত শুধু এবাদতই নয়, মুমিন ব্যক্তি জীবনে যে-কোনো সময় যে কাজই করে, তা-ই করে এই চেতনা নিয়ে। প্রত্যেকটি কাজের সময় তার অন্তর জুড়ে এই চেতনা তীব্র-তীক্ষ্ণ হয়ে বর্তমান থাকে। আর তার প্রত্যেকটি কাজে চরম লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা। মানুষ যখন এবাদতে মশগুল, আল্লাহ্ কেবল তখন-ই তাকে দেখেন না, সে যখন দুনিয়ার অন্য যে-কোনো কাজ করে, তখনও আল্লাহ্ তাকে দেখেন, দেখেন তার অন্তরকে, তার কর্মতৎপরতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মে গুরুত্ব আরোপকে।

আর মুমিন যেহেতু প্রত্যেক কাজের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন করতে চেষ্টিত হয়, এজন্য তাকে প্রত্যেকটি কাজ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে করতে হয়। অন্যথায় আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। নবী করীম (স) কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের পন্থা বলে দেয়া প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন ঃ

اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يُّتْقِنَهُ - (بيهقى، شعب الايمان)

তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করে, তখন সে সেই কাজটি খুব নিখুঁত সুন্দর সুদৃঢ়ভাবে করবে— এটাই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন।

এ কাজ বলতে কেবল এবাদতের কাজ নিশ্চয়ই নয়। এ কাজ দুনিয়ার বৈষয়িক ক্ষেত্রের যেমন, তেমন পরকাল সংক্রান্তও। প্রত্যেকটি কাজের সুষ্ঠুতা, উত্তম ও নিখুঁত হওয়া নির্ভর করে দুটি মৌল গুণের উপর— কাজের উত্তম ফল ও উৎকৃষ্ট ফসল লাভও এর উপর নির্ভর করে। সে দুটি গুণ হলোঃ আমানতদারী ও ইখ্‌লাস। আমনদারী অর্থ, পূর্ণ বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরতা এবং ইখ্‌লাস অর্থ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাও।এ দুটি গুণ মুমিনের অন্তরে ও চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকা স্বাভাকি এবং কাম্য।

অতএব ঈমানদার শিল্প কর্মী তার শিল্প কর্ম দিয়ে কেবল বৈষয়িক ও বস্তুগত মুনাফা বা নির্দিষ্ট মজুরীই লাভ করতে চায় না। চায় না কেবল শিল্প মালিকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র কিংবা পুরস্কার লাভ করতে। বরং সে তো তার শিল্পের ব্যাপারে পুরাপুরি দায়িত্বশীল, আমানতদার। সে কারণে সে মূল শিল্প কর্মের মান ও মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকতার সাথে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাবেই। আর এ কাজটি করার সময়ই তার লক্ষ্য আরোপিত থাকবে আল্লাহ্‌র দিকে, আল্লাহ্‌র

সন্তোষ পাওয়া এবং আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি না হওয়ার দিকে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সে লক্ষ্য রাখবে এই শিল্প-কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট তার অন্যান্য শত-সহস্র ভাইদের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে। কেননা তার এই মুমিন ভাইরা যেমন তার উপর অনেক নির্ভর করেছে, তেমনি তারা তার উপর পর্যবেক্ষণও রেখেছে— সে ভালো করে কি মন্দ করে তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। আর এইসব কিছু করার ভিতর দিয়ে সে চূড়ান্তভাবে চায় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শুভ প্রতিফল লাভ করতে এবং তা পরকালে।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - (التوبة : ١٠٥)

আর বলে দাও, তোমরা সকলে কাজ করো। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের কাজকে দেখবেন তাঁর রাসূল এবং সব মুমিনগণও। আর তোমরা সকলেই যিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন তাঁর সমীপে উপস্থিত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আমরা বহু বইতে পড়েছি, লোকদের মুখে শুনেছি, সংবাদ-পত্রাদিতে দেখেছি, আর বর্তমানকালে নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষও করছি যে, শিল্প-কারখানায় পণ্যদ্রব্য তৈরীকালে বহু মূল্যবান উপাদান বিনষ্ট করে ফেলা হয়। অথচ সে পণ্যটির উৎকৃষ্টতা সে সব উপাদানের উপর নির্ভর করে। ফলে একটা সাধারণ কল্যাণকর পণ্য বহু কোটি মানুষের জন্য হয়ে যায় ক্ষতিকর। একে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় 'সাবোটাজ'। 'সাবোটাজ'-এর যে কত রূপ, কত ধরন, তার আর কিছু লেখাজোখা নেই। বর্তমান শিল্প-সভ্যতার যুগে মানবতার প্রতি এ একটা মারাত্মক ও গোপন শত্রুতা বিশেষ। এ 'সাবোটাজ' বোধ করার জন্য আধুনিক উন্নত মানের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথাসাধ্য গৃহীত হয়ে থাকে সব দেশেই। কিন্তু স্বয়ং শিল্পকর্মীদের এ 'সাবোটাজ' শয়তানী ক্রিয়া বন্ধ করা সাধারণত সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এর মূল কারণ কি ? শুধু মাত্র আইনের কড়াকড়ি, শাস্তির ভীতি এবং পাহারাদারীর ব্যাপকতা 'সাবোটাজ' রোধ করতে সক্ষম নয়। সে জন্য এর মূল উৎপত্তির কারণ সন্ধান করতে হবে এবং কারণটা সমূলে বিনাশ করতে হবে। সাবোটাজ-এর মূল কারণ হচ্ছে আমনতদারী ও আন্তরিক নিষ্ঠার প্রচণ্ড অভাব ও অনুপস্থিত, মন-মানসিকতার পাপ-প্রবণতা। আর তারও মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস না থাকা এবং পরকালে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব হওয়ার ব্যাপারকে অগ্রাহ্য করা।

পণ্যোৎপাদনের মানসিক প্রশান্তির প্রভাব

পূর্বে যেমন ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি, মুমিন তার জীবনে পরম মানসিক প্রশান্তি ভোগ করে। তার হৃদয়ে গভীর নিশ্চিন্ততা, হৃদয়ের উদারতা-উন্মুক্ততা। উচ্চাশায় তার হৃদয় থাকে আলোকোদ্ভাসিত হয়ে, সন্তোষ ও নিরাপত্তাবোধ হয় তার মনের বড় সম্পদ। প্রেম, ভালোবাসা ও অকপটতা মুমিনের হৃদয়ে আকর্ষণীয় শোভা। আর এ মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রতিফলন শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অস্থিরচিত্ততা, ইতস্তত মন-মানসিকতা, কুণ্ঠা, সংকোচ নৈরাশ্য ও হিংসা-বিদ্বেষ যে শ্রমিকের মনে বাসা বেঁধেছে, সে কক্ষনোই নিখুঁত সুষ্ঠু পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। এমন শিল্প সৃষ্টি তার দ্বারা কখনোই সম্ভবপর হয় না, যা দেখে লোকেরা সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

উৎপাদনে দৃঢ় মানসিকতার প্রভাব

সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করা সীমাকে লংঘন করে না। কাজ করতে করতে যেখানেই নিষেধ ঠেকবে, সেখানেই সে থেমে যাবে। একবিন্দু অগ্রসর হবে না। এ কারণে সে কোনো ক্ষেত্রেই নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে না। নিষিদ্ধ কাজ তার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। সে তার লালসার অশ্বকে কখনো লাগামহীন করে ছেড়ে দেয় না। অকারণ অর্থহীন ব্যস্ততায় সে রাত জাগরণ করে না। নিষিদ্ধ বা হারাম খেল-তামাশায় সে মেতে ওঠে না, নিমগ্ন হয় না। তার ঈমানই এ কাজ করতে তাকে বাধা দেয়। রঙ্গিন সুরাপাত্র তার হাতকে কখনো স্পর্শ করে না, জুয়া খেলাকে সে সব সময়ই পরিহার করে চলে। ফেতনা-ফাসাদের কাজ বা ঘটনা থেকে সে দূরে সরে থাকে। ফলে সে তার কাজকে তার হৃদয় দিয়ে মনোযোগ দিয়ে ও সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে করতে চেষ্টা করে, তাকে সুন্দর ও নিখুঁত করতে একটুও কসুর করে না। ফলে তার উৎপাদন সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে কোনো প্রকার অসুবিধা দেখা দেয় না। কেননা এ উপার্জন যেমন তার নিজের জন্য, তেমনি তার বংশ, পরিবারবর্গ ও গোটা সমাজের জন্য— সে তো এদেরকে নিয়ে এবং তাদের মধ্যেই বসবাস করে। সে এ কাজ করে সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য।

অবৈধ লালসা, ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম ও পাপের নানাবিধ খেলা মানবতার নৈতিক ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়ে কত যে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে, তা যদি আমরা একত্রিত করি, তাহলে তা এক ভয়াবহ রূপ নিয়ে আমাদের সম্মুখে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এ আমেরিকাতেই ৭২ মিলিয়ন লোক মদ্যপান অভ্যস্ত। আর তাদের মধ্যে ২০ মিলিয়ন লোক মদ্যাপানের দরুন কাজে অনুপস্থিত থেকে

সরকারকে বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য করছে। কেবলমাত্র মদ্যপানের ধ্বংসকারিতা যদি এই হয়, তাহলে সমাজের অন্যান্য বহুশত সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের দরুন উৎপাদন কার্য যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার অনুমান করাও সম্ভব নয়।

মুমিনের সময়ানুবর্তিতা— সময়ের মূল্যবোধ

মুমিন সময়ের মূল্য বুঝে। সময়ের মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। এ জন্য তার চেতনা সময়ের ব্যাপারে থাকে সদা-তীব্র, তীক্ষ্ণ। সে বিনা কাজে কিংবা অর্থহীন কাজে এক মুহূর্ত সময়ও অতিবাহিত করতে প্রস্তুত হয় না। কেননা তার ঈমান রয়েছে, তার জীবন— জীবনের এক-একটি মুহূর্ত কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার জীবনের প্রধান কর্মক্ষমকাল অর্থাৎ যৌবনকাল কোন কাজে কাটিয়েছে, তা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তার কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব গ্রহণ করবেন। কাজেই সে খেলাধুলা করে বা অকারণ ঘোরাফিরা করে এক মুহূর্তকালও ব্যয় করতে প্রস্তুত হতে পারে না। এই সময়-ই তার প্রধান ও একমাত্র মূলধন। কাজেই সে মহামূল্য মূলধন অযথা ব্যয় করে শূন্য হস্তে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? সময় হচ্ছে আল্লাহ্র দেয়া একটি বিরাট নেয়ামত। সে তো সময়ের প্রতি কণা শুভ ও কল্যাণকর কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্র শোকার আদায় করবে— সময় নেয়ামতের শোকর আদায়ের একমাত্র উপায়। এই সময়কে অকাজে অতিবাহন করে মুমিন আল্লাহ্র নেয়ামতের অবমাননা করে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করতে পারে না। হযরত উমর ইবনে আবুল আযীয (র) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَعْمَلَانِ فِيْكَ فَاعْمَلْ فِيْهِمَا -

রাত ও দিন তোমার মধ্যে কাজ করছে। আতএব তুমিও এ দুটির মধ্যে কাজ করো।

প্রতিদিন যখন সূর্যোদয় হয়, মুমিন শুনতে পায়, তা থেকে উচ্চ স্বরে ডেকে বলছে ঃ হে মানুষ, আমি এক নতুন সৃষ্টি। তোমার কার্যকলাপের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। অতএব তুমি আমার দেয়া এ সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করা। আমার এ সময়ের সুযোগে তুমি করো সব ভালো ভালো ও কল্যাণকর কাজ। কেননা আমি যখন চলে যাব, তখন আর কোনো দিনই ফিরে আসব না।

মুমিন তার দিনগুলোকে কোনোরূপ শুভ কাজ ও উৎপাদনহীন অবস্থায় তার হাত থেকে চলে যেতে দিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। এজন্য সে আজকের কাজ

কালকের জন্য রেখে দেয় না। কেননা কালকের কাজগুলো তার এ কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। ফলে তার কাজ কোনো দিনই সম্পন্ন হতে পারবে না।

অনুরূপভাবে সে কামনা করে যে, তার আজ কালকের তুলনায় উত্তম ও অধিক কল্যাণপূর্ণ হবে। আর আগামীকাল হবে আজকের তুলনায় অধিক মংগলময়। সে চায়, তার জীবন দীর্ঘ হোক, চলুক তার নিরবচ্ছিন্ন ধারা মৃত্যুর পরও। তার জীবন যত দীর্ঘ হবে তার কর্ম হবে ততই বিপুল। আর তার সমস্ত জীবন কালটাই হবে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সে চায়, দুনিয়ায় সে এমন জ্ঞান রেখে যাবে, যা থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষ কল্যাণ লাভ করতে থাকবে। এমন একটা বৃক্ষ রোপন করে যাবে, যা চিরকালই মিষ্টি ফল দিতে থাকবে। এমন একটা সদ্‌কা করে যাবে, যা কোনো দিনই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এমন সন্তান রেখে যাবে, যারা উত্তম বংশ সৃষ্টি করবে। এমন এমন কাজ করে যাবে, যা অন্তহীন সময় পর্যন্ত মানুষকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারবে। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে এ ধরনের কাজের মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশি। এই পবিত্র ভাবধারাই সৃষ্টি করেছিলেন হযরত আবুদ্‌দারদার মতো ব্যক্তি। তিনি রাসূলে করীমের সাহাবী। তিনি বৃদ্ধাবস্থায়ও ফলের গাছ রোপণ করতেন। লোকেরা বলত এই বৃদ্ধ বয়সেও আপনি বৃক্ষ রোপণ করছেন ? আপনার জীবনে এ গাছে ফল ধরবে, এমন তো আশা করা যায় না ? তিনি জবাবে বলতেন ঃ

وَمَاذَا عَلَىَّ اَنْ يَّكُوْنَ لِىْ ثَوَابُهَا وَلِغَيْرِ هَا ثَمْرَتُهَا -

তাতে আমার কি ক্ষতি ? আমি মরে গেলে এর সওয়াব তো পাব, আর লোকেরা পাবে এর ফল খেতে।

তিনি সর্বশেষে একটি জয়তুন গাছ রোপণ করেছিলেন এবং তখন বলেছিলেন— আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা আমাদের জন্য বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। আমরা তার ফল খেয়েছি। আর আমরা এখন গাছ লাগাচ্ছি, যেন আমাদের পরবর্তী লোকেরা তার ফল্ খেতে পারে।

ইবাদত ও উৎপাদন

অনেকে বলে থাকেন যে, কোনো কোনো ধর্ম-বিশ্বাস তার বিশ্বাসীদের উপর নানা রকমের এবাদত ও উপাসনা-আরাধনার বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়। কত রকমের অনুষ্ঠান পালন করতে হয় তাদের তার হিসাব করাও কঠিন। আর তাতে অতিবাহিত হয়ে যায় মানুষের অনেক মূল্যবান সময়। দৃষ্টান্ত হিসাবে মুসলমানদের নামাযের কথাই ধরা যাক। দিন-রাতে অন্তত পাঁচটি সময় নামায পড়তে হয়। এ নামায পড়ায় কি কাজে ক্ষতি হয় না ?

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, সাধারণভাবে সব ধর্মই নানা প্রকার এবাদত-উপাসনা পালন করতে তার বিশ্বাসীদের বাধ্য করে। আর এতে সময় ক্ষেপণও হয় অনেক। তা অস্বীকার করা যেতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব এবাদত-বন্দেগীতে মানুষের জীবনের কতটা সময় অতিবাহিত হয় ? অতি সামান্য ও নগণ্য, সময় স্রোতের কয়েকটি বিন্দু ও কণামাত্র। কিন্তু এই সময় ক্ষেপণ কি নিতান্তই অযথা সময় অতিবাহন ? এতে কি সময় নষ্ট হয় ? এবং একে কি বলা যায়, সময় নষ্ট করা হচ্ছে ? না, আল্লাহ্র এবাদত উপাসনায় অতিবাহিত সময় সময়ের অযথা ব্যয় নয়। এ হচ্ছে নতুন করে শক্তি অর্জন, নিজের মধ্যে সাহস, হিম্মত ও কর্ম-প্রেরণার নব জাগরণ সৃষ্টি, শক্তির উৎপাদন। মনের কল-কজাগুলোকে নতুন করে ঝালাই করে নেয়া। যেন পর মুহূর্তের জীবন সংগ্রামের কঠিন-কঠোর ব্যবস্থা ও তৎপরতায় নতুন শক্তি ও নবতর উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়। অ-বস্তুগত কাজে সামান্য সময় ব্যয় দেখে তাকে অর্থহীন সময় ক্ষেপণ বলা এবং তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন নিতান্ত জুলুম। উপরন্তু এ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক কাজে ব্যয়িত সময়ে যে নৈতিক বল পুনর্গঠিত হলো, তার দরুন বৈষয়িক কাজে যে নব যুগের সূচনা হচ্ছে, তার প্রতি মূল্য আরোপ না করা অনেক বড় অবিচার। সে কথা কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কোনো জিনিসের মূল্যায়ন নির্ভুল হতে পারে তখন, যখন তার সমস্ত দিককে সামনে রাখা হবে। একটা দিক বাদ দিয়ে যে মূল্যায়ন হয়, তা হয় নিতান্তই অবিচারপূর্ণ।

মুসলমানদের নামাযের ব্যাপারটাই ধরা যাক। দিন-রাতে মাত্র পাঁচবার নামাযের জন্য দাঁড়াতে হয়। খুব বাড়িয়ে হিসাবে করলেও এতে বড়জোর ঘন্টা খানিক সময় লাগতে পারে। দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র একটি ঘন্টা! এই একটি ঘন্টা সময়ও আল্লাহ্র এবাদত বন্দেগীতে ব্যয় করতে আপত্তি! অথচ কত কত মূল্যবান সময় কেটে যায় তাশ খেলতে, গল্প-গুজব করতে, অকারণ শুয়ে থেকে, তার কোনো হিসাব নেই। না, অন্য কাজে যে সময় ব্যয় করা হয়, তা ব্যয়ই এবং তা নিতান্ত অপচয়; কিন্তু আল্লাহ্র এবাদতে যে সময় কাটে, তা ব্যায় নয়, তা রীতিমত বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগ যে বিনাশ নয়, তা সবারই জানা কথা। বস্তুত আত্মশক্তি পুনরুদ্ধারের যত উপায় আজ পর্যন্ত জানা গেছে, তার মধ্যে নামায সর্বোত্তম উপায়। মানুষ কাজ করতে করতে যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখনই নামাযের সময় উপস্থিত হয়। আর সে নামাযে দাঁড়ালে নতুন কর্মশক্তি লাভ করা যেতে পারে। নামায যে রেডিয়ামের আকর। বিদ্যুতের পাওয়ার হাউজ। কর্মোদ্যম ও কর্মের নবতর উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হচ্ছে এই নামায। মানুষের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধ কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায় হচ্ছে নিয়মিত নামায পড়া। নামাযে যে আত্মশক্তি ও কর্মশক্তি উদ্ধারকৃত হয় তা কখনোই ধ্বংস হয় না, নিঃশেষ হয়ে যায় না।

কেননা আমরা যখন নামায পড়ি তখন কার্যত আমরা আমাদের আত্মশক্তিকে একটি বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করি। এই আত্মশক্তিই আসলে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। আমরা নামাযে সেই শক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি। জীবনের প্রতি কদমে সেই শক্তির সাহায্য চাই। এই প্রার্থনাই আমাদের শক্তি ও কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করার কাজ অনেকটা করে দেয়। আর বাস্তবিকই কেউ যদি আল্লাহ্‌র কাছে শক্তি প্রার্থনা করতে পারে, তাহলে সে কখনোই তা থেকে বঞ্চিত হয় না।

এই হচ্ছে নামাযের বৈষয়িক ও বস্তুগত কল্যাণ। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নামায নিছক আরাধনা-উপাসনা পর্যায়ের কাজ নয়, জীবনের দৃষ্টিতেও তা নয় তৎপর্যহীন। নামাযের কল্যাণ এক সঙ্গেই দ্বিবিধ। তা যতটা আরাধনা উপাসনা এবং পরকালীন, ততটাই ইহকালীন অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাতে। যদিও কেউ নিছক বৈষয়িক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়ে না। নামায এক সাথে বহুবিধ কল্যাণের বাহন। তা পরিচ্ছন্নতা, সংস্কৃতি, কৃচ্ছসাধনা এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ। নামায হচ্ছে ইসলামী সমাজের সংস্থা। সামাজিক জীবনের মৌল আদর্শ ও রীতি-নীতির শিক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে এই নামায। ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য প্রভৃতি সুকোমল ভাবধারার বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যম হচ্ছে এই নামায।

যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের বেশ পূর্বে শয্যাত্যাগ করে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়, ওযু করে, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে, বিশ্বস্রষ্টার সম্মুখে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়ায়, অতি প্রত্যূষকালে পরিচ্ছন্ন মন-স্ফূর্তি ভরা দেহ উদার দৃষ্টিকোণ ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার দ্বারা উৎপাদন প্রকল্প সার্থক হবে—মুনাফাদানকারী হবে, না ক্ষতিগ্রস্ত হবে, একথা মানুষই বিবেচনা করে দেখতে পারে। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম সংঘর্ষ মুখর এই বিশ্বের একজন মানুষ দৈনিক পাঁচবার করে পরম গভীর প্রশান্তির পরিমণ্ডলে কিছুক্ষণ সময় ধরে থাকবার সুযোগ লাভ করতে পারে এই নামাযের মাধ্যমে, মানবতার প্রতি এটাও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের একটা বিরাট অবদান। দুনিয়ায় মানুষে মানুষে যখন হানাহানি, বিরোধ-বিচ্ছেদ, অসাম্য, পারস্পরিক শত্রুতা ও অমিল প্রলয়ংকর, সেই মুহূর্তে কিছু সময়ের জন্যও নামাযের কাতারে সম্পূর্ণ একাত্ম ও একাকার হয়ে দাঁড়াতে পারাটা কোনো অংশেই উপেক্ষার ব্যাপার হতে পারে না। নামাযের কাতারে কেবলামুখী হয়ে এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ানোও মানুষের বাস্তব জীবনে মনে ও চরিত্রে প্রভূত প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করে থাকে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বহু মানুষের একত্রিত হয়ে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা-সদিচ্ছ-সহৃদয়তার পবিত্র ভাবধারা নিয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া ও সিজদায় অবনত হওয়া কক্ষনোই ব্যর্থ ও নিষ্ফল যেতে

পারে না। এর ফলে একদিকে যেমন পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ-দূরত্ববোধ বিদূরিত হয়, পারস্পরিক ঐক্য, একাত্মতা ও সহযোগিতা গড়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের হৃদয়-মনে জাগে আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহ্‌র অনুগত্যের গভীর ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা।

এ একটা মহামূল্য নেয়ামত। বাস্তব জীবনের জন্য এ থেকে উজ্জ্বল শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ সম্ভব। মানুষকে তো এ দুনিয়ার নিত্যকার দ্বন্দ্বসংগ্রাম ও সংঘর্ষ বিরোধের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। এ সত্ত্বেও মানুষ প্রতিদিন নিজেকে এ বিষাক্ত পরিবেশ থেকে অন্ততঃ পাঁচবার করে টেনে বের করে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও ভালোবাসার মুক্ত পবিত্র পরিবেশে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত মানবিক সৌভাগ্যের উৎসমূল। এ কারণে মানুষ যখন অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট না করে সে সময়টা নামাযে ব্যয় করে, তখন সে বিপুল কল্যাণের অধিকারী হয়ে যায়। মানবতার জন্য বাস্তব কর্মপ্রেরণায় নিজের হৃদয়-মনকে ভরে নিতে পারে। আর এর দরুনই লাভ করতে পারে তা জীবনকে প্রকৃত সত্য ও সততার ভিত্তিতে অতিবাহনের যোগ্যতা। দৈনন্দিন জীবনে এর যা প্রতিফলন হয়, তা নানাদিক দিয়ে বিশ্বমানতার জন্য কল্যাণবহ।

মুমিন কর্ম দ্বারাই আল্লাহ্‌র পৃথিবীকে উন্নত করে

এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করে বসে আছে যে, বর্তমান জগতে মুমিন হতে হলে তাকে দরবেশ হয়ে খানকায় কিংবা পাদ্রী-পুরোহিত হয়ে গির্জার অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে থাকতে হবে এবং বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করতে হবে, তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রীতিমত বিবাগী বা বৈরাগী হয়ে যেতে হবে।

এই ধারণা অন্য কোনো ধর্ম সম্পর্কে সত্য হলেও হতে পারে; কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে যে আদৌ সত্য নয়— বরং অবৈধ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী মানুষ তো হয় কর্মী, সদাকর্মব্যস্ত, পরিশ্রমী, জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব এক সঙ্গে ও সুচারুরূপে সুসম্পন্নকারী। অন্য কথায়, দুনিয়ার অন্যান্য সব দুনিয়াদার মানুষের চাইতেও অধিক ও বড় দুনিয়াদার হয় মুসলিম ও মুমিন ব্যক্তি। কেননা মুমিন ব্যক্তিকে ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম পুরোপুরি পালন করতে হয়, অক্ষরে অক্ষরে আদায় করতে হয় ইসলাম আরোপিত সমস্ত ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। আর এই সব তাকে করতে হয় পরিবারের ও সমাজের মধ্যে থেকে এই কর্মময় পৃথিবীতে বসবাস করে। সর্বোপরি তাকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করতে হয়। তার জন্য দিনরাত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয় যাকে

আধুনিক 'সিকিউলার' দৃষ্টিকোণে নিতান্তই বৈষয়িক ও দুনিয়াবী কাজ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মুমিন এই দুনিয়ার মানুষ, সমাজেরই লোক। সেই এই দুনিয়ার উন্নয়ন ও এই সমাজেরই সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا - (هود : ٦١)

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এখানেই তোমাদেরকে উন্নয়ণ ও নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে আসীন করেছেন।

ইসলামে আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য সপ্তাহে একটি দিন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নয়। এমন নয় যে, ব্যাস, সারা সপ্তাহে কাউকে কিছু করতে হবে না। সপ্তাহের সেই নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহ যথারীতি পালন করলেই আল্লাহ্‌র এবাদতের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে যাবে, অতঃপর আগামী সাপ্তাহিক দিনটি পর্যন্ত কখনো কিছু করতে হবে না। না ইসলাম এমন আকীদা দেয়নি, এবাদতের জন্য সপ্তাহে কেবলমাত্র একটি দিনকেও নির্দিষ্ট করেনি। ইসলামী আকীদায় সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই যেমন এবাদতের দিন, তেমনি এই দিনসমূহে করা যাবতীয় বৈষয়িক (?) কাজকর্মসমূহও পুরোপুরি এবাদতের পর্যায়ে গণ্য— অবশ্য নিয়্যত যদি তাই হয়।

তবে সপ্তাহে জুম্‌আর দিনে যে ব্যাপক পর্যায়ে জুম্‌আর নামায পড়া হয়, তাও এমন নয় যে, সেদিন ব্যাস্ এই নামাযই পড়তে হবে, আর কোনো কাজ করা চলবে না। বরং এই নামাযের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে দুনিয়ার কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ারও নির্দেশ। কুরআনের আয়াত হলো ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - (الجمعة : ٩-١٠)

হে ঈমানদার লোকেরা; জুম'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়া হবে, তখন তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র যিকির-এর দিকে অবিলম্বে চলো। আর ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করো। এই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানো। পরে নামায পড়া যখন শেষ ও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন সকলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো ও খুব বেশি বেশি করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

জুম'আর দিনে মুমিনের জীবন হচ্ছে কাজ-কর্ম-ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয় নামাযের পূর্ব পর্যন্ত। প্রথম আযান হওয়া মাত্রই নামাযে উপস্থিত হওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ। নামায পড়া শেষ হলে আবার দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া, যার যার কাজে চলে যাওয়া, নিমগ্ন হওয়া এবং সেই কাজ থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পেতে চাওয়া— চেষ্টা করা, আর তখনও আল্লাহ্‌কে ভুলে না যাওয়া।

হযরত উমর ফারুক (রা) দেখতে পেলেন, কিছু সংখ্যক লোক জুম'আর নামায পড়ার পর মসজিদে একটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কারা ? তারা বললেন, আমরা হচ্ছি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি। তখন তিনি তাদের কাঁধ ধরে উপরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

> তোমরা কেউ রিযিক লাভের জন্য কর্মে ব্যস্ত হওয়া থেকে বিরত হয়ে বসে থাকতে পারবে না। আর বসে বসে শুধু দো'আ করবে ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের রিযিক দাও— তা হবে না। কেননা এটা তো জানা কথা যে, আকাশ থেকে স্বর্ণরৌপ্য বর্ষিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তো বলে দিয়েছেন ঃ যখন নামায সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করে বেড়াবে।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করা অর্থ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে রিযিক পেতে চাওয়া কোনো-না কোনো কর্মের মাধ্যমে। আর কাজ করলে রিযিক পাওয়া আল্লাহ্‌র একটা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

পরকালের প্রতি ঈমান নিষ্কর্মতা শিখায় না

কোনো কোনো লোক মনে করে, পরকালের প্রতি ঈমান আনলে বা পরকার বিশ্বাসী হলে দুনিয়ার কাজ-কর্ম অচল হয়ে যাবে। দুনিয়ার সমস্যাবলীর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবার ও তার সমাধান বের করার জন্য কেউ চেষ্টানুবর্তী হবে না। মানুষ যাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে। তারা এ কথার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য একটা 'লজিক'-ও দাঁড় করিয়েছে। এ পর্যায়ে তারা বলেছে, ইহকাল ও পরকাল দাঁড়িয়ে থাকে দুদিকে ঝুলন্ত দুটি পাল্লার মতো। তার একটা ঠিক ততটাই উপরে উঠবে, যতটা নীচের দিকে যাবে অপর পাল্লাটা। কিংবা পূর্ব ও পশ্চিমের মতো। তার একটার দিকে যতটা এগুনো যাবে, অপর একটি থেকে ঠিক ততটাই দূরত্বে চলে যাওয়া হবে। অথবা এরা যেন দুই সতীন। একজনকে খুশি করলে অপরজনকে অসুন্তুষ্ট করা হবে অনিবার্য ভাবে। দুনিয়া ও আখেরাত, ইহকাল ও

পরকালও ঠিক এই রকমই। তার একটার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলে অপরটি থেকে বিমুখ হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

যুক্তির মতো যুক্তি বটে। এর সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রথমত মনে রাখা আবশ্যক যে, এই লজিকের সত্যতা নির্ভর করে মানুষের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিকোণের উপর। এ লজিক নিরংকুশ ভাবে সত্য নয়। দ্বিতীয়ত ইসলাম যে 'ঈমান বিল্ আখেরাত' শিক্ষা দেয়, সেখানে এ লজিক সম্পূর্ণ অচল।

বস্তুত, যে লোক দুনিয়াকেই নিজের সমগ্র কর্ম তৎপরতার মূল লক্ষ্য ও চরম উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছে, যে লোক তার সমস্ত কাজকর্মের ফল কেবল এ দুনিয়ায়ই লাভ করতে চায়, সে যেন পরকাল থেকে ততটুকুই দূরে সরে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। ঠিক এর বিপরীত কথাটিও সত্য। অর্থাৎ যে লোক দুনিয়ায় যে যে কাজ করবে তার চরম লক্ষ্য যদি একান্তভাবে নিবদ্ধ হয় পরকালের উপর কেবল পরকালেই লাভ করতে চায় সবকিছু তাই হবে তার মন-মানসিকতা, তার দৃষ্টিকোণ। সে পরকালেই সব কিছু পাবে। দুনিয়ায় সে বঞ্চিতই থেকে যাবে।

ইসলামের পরকাল-বিশ্বাসের দৃষ্টিতে এ কথা অচল এই জন্য যে, ইসলামের মুমিন দুনিয়া-আখেরাত, ইহকাল-পরকাল উভয়কে সম্মিলিত ও সংযুক্ত করে দেয়। সে দুটোকেই বাস্তব ও সত্যরূপে গ্রহণ করে। এ দুনিয়া তার কাছে পরকালের কৃষিক্ষেত। আর কৃষিক্ষেত এর দাবি হলো তাতে চাষাবাদ করা হবে, করা হবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। আর এ পরিশ্রমের ফলে যে ফসলটা ফলবে, তা পাওয়া এবং ভোগ করা যাবে পরকালে, পুরোপুরি মাত্রায়। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ায় তার কোনো ফলই পাওয়া যাবে না, এমন কথা নয়। কুরআন মজীদের ঘোষণা হলো ঃ

قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ – (الاعراف : ٣٢)

বলো, আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ মুমিনদের জন্য দুনিয়ার জীবনে এবং কেয়ামতের দিন ঐকান্তিকভাবে।

এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র পবিত্র রিযিকসমূহ মুমিনরা দুনিয়ায় পাবে। পাবে মুমিন ছাড়া অন্যান্য লোকও। এখানে এ রিযিক পাওয়ার ব্যাপারে মুমিনরা অন্যদের সাথে শরীক। কিন্তু পরকালে মুমিনরা পাবে ঐকান্তিক ও নিরংকুশ ভাবে। সেখানে তার শরীক অন্য কেউ হবে না। তারা এককভাবেই পাবে। এর আর একটা অর্থ হতে পারে এই যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র রিযিকসমূহ কেয়ামতের দিন খালেস ভাবে কেবলমাত্র মুমিনরাই পাবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থই গ্রহণযোগ্য।

মুমিনরা দুনিয়াকে নিজের করায়ত্ত্ব করে, নিজেকে দুনিয়ার করায়ত্ত হতে দেয় না। মুমিনরা দুনিয়াকে 'আল্লাহ' বানায় না, নিজেরাও হয় না তার দাসানুদাস। বরং তারা বিশ্ব-প্রকৃতিকে জয় করে এবং সমস্ত শক্তি ও উপাদানকে মানুষের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োগ করে। দুনিয়ায় গড়ে তোলে নিত্য নতুন সভ্যতা। মুমিন হচ্ছে সমাজদেহে কর্মী অংগ; সমাজদেহের ধমনীতে সদা প্রবহমান রক্তধারা। সে সমাজ-দেহে শক্তির সঞ্চার করে, এনে দেয় ক্রমবৃদ্ধি, ক্রমবিকাশ। সে যখন ক্ষেতে খামারে চাষের কাজ করে, তখন তা করে অতি উত্তম রূপে। যখন শিল্প গড়ে, তখন তা গড়ে সুদৃঢ় ও নিখুঁত ভাবে, যখন ব্যবসা করে, তখন সে হয় একজন সততা ও ন্যায়বাদী ব্যবসায়ী। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কর্মে সে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে এবং স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে পূর্ণ দক্ষতা ও নিপুণতা সহকারে।

রাসূলে করীমের সাহাবীরা কৃষক ছিলেন, ব্যবসায়ী ছিলেন, শিল্পপণ্যোৎপাদক ছিলেন, ছিলেন দক্ষ কারিগর। তাঁরা পরকালের প্রতি পুরোপুরি ঈমানদার হয়েও কোনো দিন কর্মবিমুখ, দায়িত্বহীন, অলস, বৈষ্ণব-বৈরাগী বা দুনিয়া ত্যাগী ছিলেন না। আর তাঁরা তা হতে পারেনই বা কি করে ? যখন তাঁদের রাসূলে (স) নিজেই এই শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِىْ يَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَلَّا يَقُوْمَ حَتّٰى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا -

খেজুরের একটি চারা রোপনের উদ্দেশ্যে হাতে নেয়া অবস্থায় যদি কেয়ামতও কায়েম হয়ে যায়, তখনও যদি তোমাদের পক্ষে তা রোপণ করা সম্ভবপর হয়, তবুও তা অবশ্যই রোপণ করবে।

কথাটির গুরুত্ব অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। কেয়ামত কায়েম হয়ে যাওয়ার সময়ও গাছ রোপণ করার এই তাগিদ কেন দেয়া হয়েছে ? সেই সময়কার রোপা গাছের ফল যে দুনিয়ার কোনো মানুষ ভোগ করতে পারবে না, তা তো সুস্পষ্ট কথা। তবু এরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো কর্মের তাগিদ, কাজের গুরুত্ব বোঝানো এবং কাজ করা, কেয়ামত পর্যন্ত কাজ করতে বলাই এর উদ্দেশ্য এবং এ ব্যাপারে ফল কে ভোগ করবে, আদৌ কেউ ভোগ করবে কিনা সে ব্যাপারে নির্বিকার হয়ে কাজ করতে থাকার জন্যই রাসূলে করীম (স)-এরূপ কথা বলেছেন।

আল্লাহ্ ভরসা অর্থ নিষ্কর্মতা নয়

'আকাশ স্বর্ণ-রৌপ্য বর্ষণ করে না' কথাটি হযরত উমর ফারুকের। একটু পূর্বেই আমরা তা উদ্ধৃত করেছি। এ কথাটি দ্বারাই নানা লোকের মনে উদ্রিক্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়া উচিত। মুমিনদের একটা বড় পরিচয় হলো, তারা আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা গ্রহণকারী তাওয়াক্কুলকারী। তাদের সবকিছুই তারা একমাত্র আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে দেয়, একান্তভাবে নির্ভর করে আল্লাহ্র উপর। এক কথায় তাদের আর এক নাম 'আল্লাহ্ ভরসা'। কুরআন মজীদ এই তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দিয়েছে, নানাভাবে ও নানা ভাষায় এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا -

তাওয়াক্কুল করো একমাত্র আল্লাহ উপর। কর্মের দায়িত্ব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুমিন হও।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ -

যে লোক আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট।

এভাবে শত শত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার সংখ্যা গণনাও সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'তাওয়াক্কুল' শব্দের অর্থ কি ?

'তাওয়াক্কুল' করার অর্থ সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহ্ই সবকিছু করে দেবেন মনে করা নয়। আল্লাহ্ এ দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পাদনের নিয়ম-বিধান ঠিক করে দিয়েছেন ও যে-সব উপায়-উপকরণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে সবকে বর্জন করা এবং তা গ্রহণ না করা কখনোই তাওয়াক্কুলের অর্থ নয়। আল্লাহ আসমান ফুঁড়ে খাবার পাঠাবেন, তা যোগাড় করার জন্য কিছু করার দরকার নেই— এটা তাওয়াক্কুল নয়। আল্লাহ্ও এমন 'তাওয়াক্কুল' (?) করতে বলেন নি। আসমান উপর থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য বর্ষণ করবে, এবং পায়ের তলা থেকে আপনিই খাবার জেগে উঠবে, এরূপ ধারণা কেবলমাত্র নির্বোধ-আহাম্মক লোকেরাই করে বসে থাকতে পারে।

'তাওয়াক্কুল'-এর অর্থ, মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা ও কাজ করে যাবে। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে দেবে। সে জমি চাষ করে বীজ গ্রহণের

উপযোগী করবে— সেজন্য যত খাটুনির প্রয়োজন হবে তা দেবে, তারপর তাতে বীজ বপন করবে, আর আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ফসল পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করবে। কেননা বান্দার কাজ যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হয় একমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। এমনিভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজে-কর্মে মানবীয় অংশ পুরোপুরি আদায় করবে, অবশিষ্ট অংশ ছেড়ে দেবে আল্লাহ্‌র হাতে। কাজের ফল শুভ ও প্রচুর পাওয়ার জন্য যতটা কার্যকারণের প্রয়োগ প্রয়োজন— তা করবে, ফসল ফলার পথে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক দূর করে দেবার পরেও তাতে অবশ্য অনেক কিছুই অপূর্ণতা থেকে যাবে, তাই পরিপূরণের জন্য প্রয়োজন আল্লাহ উপর তাওয়াক্কুল করা, তাই করবে। কেননা সে অপূর্ণতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোই জানা নেই, আর কেউ পূরণও করতে পারে না।

একজন মরুবাসী রাসূলে করীমের সমীপে উপস্থিত হলো। সে তার উটটি মসজিদের সামনে খোলা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। মনে করেছিল, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করলে সে উট কোথাও চলে যাবে না। বেঁধে রাখার প্রয়োজন নেই। তখন নবী করীম (স) তাকে যে বাক্যটি বললেন, তা তাওয়াক্কুল পর্যায়ে দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য চিরন্তন আদর্শ। তিনি বলেছিলেন ঃ

اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ -

আগে তুমি উটটি রশি দিয়ে বাঁধ, তারপর তওয়াক্কুল করো।

তাওয়াক্কুল পর্যায়ে রাসূলে করীমের এই প্রখ্যাত হাদীসটিও স্মরণীয় ঃ

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর যেমন তাওয়াক্কুল করা উচিত সেইরূপ তাওয়াক্কুল করো, তাহলে তিনি তোমাদের রিযিক দেবেন, যেমন পক্ষীকুলকে তিনি রিযিক দেন। ওরা সকালবেলা শূন্য পেটে উড়ে যায়, আর সন্ধ্যাবেলা পেট ভর্তি হয়ে নীড়ে ফিরে আসে।

তাওয়াক্কুরের যারা কদর্থ করেন, এ হাদীস তাদের পক্ষের নয়— বিপক্ষের দলীল। কেননা এ হাদীসে পক্ষীকূলের উদর ভর্তি হওয়াটা সকালবেলা খাদ্য সন্ধানে বের হয়ে পড়া ও সেজন্য চেষ্টা করার উপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে। নীড়ে বসে থাকলেই খাবার পাবে, তা বলা হযনি। বরং বের হয়ে যাওয়া ও খাদ্যের সন্ধানে সারাটি দিন লেগে থাকা একান্তই জরুরী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত ইসলামে এই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। মুমিন এই তাওয়াক্কুল করেই বিশ্ব জয়ের অভিযান চালায়। এ ছাড়া তাওয়াক্কুলের ভিন্নতর কোনো অর্থ করা যেতে পারে না।

ঈমান ও সমাজ সংস্কার

সমাজ ও জাতির সংশোধন-সংস্কার কখনো আপনা-আপনি হয় না, হয় না অনিয়ম-উচ্ছৃংখলভাবে। জাতিকে পতন থেকে উদ্ধার করতে হলে, দুর্বল জাতিকে শক্তিশালী করবার জন্য, অধঃপতিত অবস্থা থেকে উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করতে হবে। অন্য কথায় বলা চলে সেজন্য মন-মানসিকতার গভীর পরিবর্তন সাধন করা আবশ্যক। তাহলেই স্তব্ধ নিষ্ক্রিয়তায় আসতে পারে প্রবল তৎপরতা ও গতিশীলতা। তন্দ্রাচ্ছন্নতা দূর হয়ে স্বাভাবিকতা ও নিদ্রাভঙ্গ হয়ে পূনর্জাগরণ সৃষ্টি হতে পারে। অস্থির চিত্ততার স্থানে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা, বন্ধ্যাত্ব নিঃশেষ হয়ে উৎপাদন প্রবণতা এবং মৃত্যুর করাল ছায়া বিলীন হয়ে জীবনের নতুন উন্মেষ ঘটতে পারে। বস্তুত মন ও মানসিকতার পরিবর্তনই বাস্তব জগতে বিপ্লবের সূচনা করে। এ বিপ্লবে গোটা জাতির শুধু চেহারাই বদলায় না, নৈতিকতায়ও আসে আমূল পরিবর্তন। মানুষের পুরাতন অভ্যাস ও আদতের বন্ধন চূর্ণ হয়ে নতুন স্বভাব ও অভ্যাসের প্রচলন হয়। মন ও মানসিকতার পরিবর্তন কর্মে আনে তৎপরতা ও চাঞ্চল্য, সমাজে আনে সাধারণ জাগৃতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন। নতুবা সে পরিবর্তন বা জাগরণ হবে পানির উপর লেখার মতো; কিংবা হবে ঢোলের বাদ্যের মতো, যার শব্দ আছে কিন্তু ভিতরে বস্তু নেই।

এই আল্লাহ্‌র কায়েম করা সাধারণ ও নির্বিশেষ নিয়ম। কুরআন মজীদ এই জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে একটুখানি কথায় সুন্দর করে বলে দিয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিতে পরিবর্তন আনেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনবে।

জাতীয় পরিবর্তনের পূর্বে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে জাতীয় পর্যায়ে পরিবর্তন আনা— এই হচ্ছে সমাজ সংশোধন বা সমাজ বিপ্লবের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া স্থায়ী নিয়ম। প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে এ নিয়ম পুরোপুরি ভাবে সংগতিপূর্ণ। এর ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। এক কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। এজন্য ক্রমাগত অবিশ্রান্ত ও হাড়ভাঙ্গ পরিশ্রমের প্রয়োজন, কেননা মানুষ এক জটিল সৃষ্টি। বহু শত উপাদান উপকরণ ও বিভিন্ন প্রকারের পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক ভাবধারায় মানব প্রকৃতি গঠিত। আর সবচাইতে কঠিনতম কাজ হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা দৃষ্টিকোণ ও মূল্যমানে পরিবর্তন সৃষ্টি করা।

বড় খালের পানির উপর হুকুম চালানোর বা তার প্রবাহের গতি ফেরানো, কিংবা পাহাড় উত্তোলন অথবা বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম-নিদর্শনে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু তাও মানুষের মন-মানসিকতায় কোনোরূপ পরিবর্তন আনার তুলনায় অনেক সহজ এবং কম কঠিন ব্যাপার। মানুষের মনে একবার যে চিন্তা-বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে বসে, তাকে উৎপাটিত করে সেখানে ভিন্নতর কোনো চিন্তা-বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে বসানো চাট্টিখানি কথা নয়।

বড় বড় শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়ন, কল-কারখানা স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা, বাঁধ বাঁধা খুবই সহজ। মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার আওতাধীন কাজ। কিন্তু কঠিনতম কাজ হচ্ছে মানুষ গড়া। মানুষ নিজের উপর কর্তৃত্ব চালাতে সক্ষম। নিজের কামনা-লালসা দমন করা তার নিজের পক্ষেই সম্ভব। মানুষ নিজের জীবনকে তাই দেয়, যা সে তার কাছ থেকে পেতে চায়। সে তার সে-সব কর্তব্য পালন করে, যে সব কর্তব্য পালন করা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে নেয়। মানুষ সত্যকে জানতে পারে, সত্যকে সত্যরূপে গ্রহণও করতে পারে। তার প্রতি যথার্থভাবে ঈমান আনতে পারে, পারে তার পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে। মানুষ কল্যাণকে চিনতে পারে, তাকে ভালোবাসতে পারে সমস্ত মানুষের জন্য, যেমন তার নিজের জন্য। বিপর্যয় রোধ করার জন্য, জঞ্জালকে পরিষ্কার করার জন্য যে শ্রম অপিরহার্য তা গ্রহণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। পারে কল্যাণের দিকে মানুষকে আহবান জানাতে, ভালো কাজের আদেশ করতে ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের নিষেধ করতে— বিরত রাখতে। পারে সত্যের পথে নিজেকে— নিজের ধন-মালকে অকাতরের দান করতে।

কিন্তু এরূপ মানুষ রচনার কাজ কিছু মাত্র সহজ নয়, অত্যন্ত দূরূহ ও কষ্টসাধ্য এ কাজ। একমাত্র ঈমানই এমন শক্তি, যা বিস্ময়কর ভাবে এই দুঃসাধ্য কাজকে সহজ করে দিতে সক্ষম। ঈমান বিস্ময়ের স্রষ্টা উদ্‌গাতা। ঈমানই মানব মনকে কল্যাণের আদর্শ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে পারে, সেজন্য যত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হোক না কেন। মানব মনকে পুরোমাত্রায় পরিবর্তিত করার জন্য ঈমানই হচ্ছে একমাত্র উপাদান। ঈমান যদি একবার হৃদয়-মনে-মগজে যথার্থ

স্থান দখল করে বসতে পারে তাহলে নিমেষের মধ্যে মানুষ এক নতুন মানুষ বানিয়ে দিতে পারে, পারে এক নবতর সত্তা সৃষ্টি করতে। তখন তার মানসিকতা বদলে যায়, বদলে যায় তার দৃষ্টিকোণ, মূল্যমান, কর্মনীতি ও কর্মসূচী। ঈমান মানুষের জীবন গতির দিক পরিবর্তন করে, তার আচার-আচরণ, রুচি ও ধ্যান ধারণাকে পর্যন্ত সহজে পরিবর্তন করে দেয়। একজন মানুষের দুটি কাল বা দুটি পর্যায় বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য বোঝা যাবে অর্থাৎ তার কুফরী কাল এবং তার ঈমানী পর্যায়। স্পষ্ট দেখা যাবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষটি সম্পূর্ণ নতুন, প্রথম অবস্থা লোকটির সাথে এর কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেবল আকার-আকৃতির সাদৃশ্য ছাড়া আর সর্বদিক দিয়েই সে হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর মানুষ।

মনোবিজ্ঞানী ও প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞরা মানুষের অবস্থা ও বয়সের বিভিন্ন স্তর দাঁড় করিয়েছে এবং প্রশিক্ষণের সাহায্যে কঠিনতম কার্য সিদ্ধির যে শর্ত আরোপ করেছে, ইসলামী ঈমান তার কোনো গুরুত্ব স্বীকার করে না। তাদের মতে একটা বিশেষ বয়সে মানুষ কতগুলো অভ্যাস ও গুণ গ্রহণ করে নেয়। তার প্রকৃতি ও স্বভাব একটা বিশেষ ধরনে ও ছাঁচে গড়ে ওঠে। সে বয়স হচ্ছে বাল্যকাল। অতঃপর সে যখন বড় হয় একটা বিশেষ স্বভাব ও গুণাগুন নিয়ে উত্তর কালে তা খুবই বদ্ধমূল হয়ে যায়, তা কোনোরূপ পরিবর্তন স্বীকার করতে রাজি হয় না, তাতে কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হয় না। যে লোক যে-সব গুণ বিশেষত্ব নিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে সে তাই নিয়েই অবিচল হয়ে থাকে। তাতেই তার জীবন কাটে এবং তাই নিয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ঈমানের প্রভাব ও ক্ষমতার দৃষ্টিতে এ তত্ত্ব অচল— অগ্রহণযোগ্য। কেননা ঈমান মনস্তত্ত্ব ও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধারার প্রবর্তন করেছে। ঈমান যখন বস্তুতই কারো হৃদয়-মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসে, গভীর সদূরে ছড়িয়ে যায় তার শিকড়, তখন তার দিক পবির্তন হয়ে যায়, তার দৃষ্টি বদলে দেয়, জীবন ও বিশ্বালোক সম্পর্কে তার দৃষ্টিকোণ দেয় আমূল পরিবর্তন করে। কর্মে ও বস্তুতে নতুন ধরন সূচিত করে। আল্লাহ্ ও মানবতার ব্যাপারে তার নীতি ও আচরণ সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রবর্তিত হয়। আর এ পথে যৌবনের কাঠিন্য, পূর্ণবয়স্কতার পরিপক্কতা এবং বার্ধক্যের অবিচলতা অচলায়তন হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

কুরআন এ পর্যায়ে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছে, তা থেকে আমাদের এ কথার সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। ফিরাউনের ভাড়া করে আনা জাদুকরদের কাহিনী প্রত্যেক কুরআন পাঠকেরই জানা আছে। সূরা শু'আরায় এ কাহিনী এভাবে বলা হয়েছে ঃ

হযরত মূসা (আ) যখন তাঁর লঠির মুজিযা দেখালেন, তখন ফিরাউন তার দলবলকে ভাষণ দিয়ে বলল, "এই ব্যক্তি একজন সত্যিকার দক্ষ জাদুকর। সে তার জাদুর জোরে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে চায়। অতঃপর তার লোকজনের পরামর্শক্রমে দেশের চারিদিক থেকে সমস্ত দক্ষ যাদুকরদের একত্রিত করা হলো এবং বিরাট জনতাকে সমবেত করা হলো। যাদুকররা যখন ময়দানে উপস্থিত হলো, তখন ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করল, আমরা বিজয়ী হলে পুরস্কার পাব তো ? সে বলল, হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তোমরা আমার পরিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারপরে তারা তাদের জাদু শক্তির প্রদর্শন করল এবং বলল ঃ

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ - (الشعرآء : ٤٤)

ফিরাউনের শক্তির দোহাই, আমরাই বিজয়ী হব।

তখন হযরত মূসা (আ) নিজে লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সহসা দেখা গেল, তা দেশি জাদুকরদের সব কীর্তিকলাপকে গিলে ফেলল। এ অভাবিত ও বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে সমবেত জাদুকররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিজদায় মাথা লুটিয়ে দিল এবং বলে উঠল ঃ

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ -

আমরা সারে জাহানের আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম। সেই আল্লাহ্, যিনি মূসা ও হারুনের আল্লাহ।

এ অবস্থা ফিরাউনের পক্ষে যেমন ছিল ভয়ানক অপমানকর, তেমনি অসহ্য। সে বলল ঃ আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মূসার দ্বীনের প্রতি ঈমান গ্রহণ করলে ? এ নিশ্চয়ই তোমাদের অপেক্ষাও বড় জাদুকর এবং তোমরা এর কাছ থেকেই জাদু বিদ্যা শিখেছ হয়ত! সে যাই হোক, এর পরিণতি তোমরা এখনি দেখতে পাবে এবং বলল ঃ

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِ يَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ -

আমি তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব। অতঃপর তোমাদের সকলকে শুলে চড়াব।

ফিরাউনের এই হুমকির জবাবে জাদুকররা অত্যন্ত ধীর-স্থির গভীর কণ্ঠে বলল ঃ

لَاضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

কোনো পারোয়া নেই। আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র সমীপে পৌঁছে যাব। আর আমাদের আশা আছে, আমাদের আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। কেননা, আমরা তো এই সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।

আর সূরা ত্বা-হায় ফিরাউনের এই হুমকিটি উদ্ধৃত হয়েছে এ ভাষায় ঃ

فَلَا قَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰى -

আচ্ছা এখন আমি তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কাটাচ্ছি, খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শুলবিদ্ধ করছি। তখন তোমরা জানতে পারবে, আমাদের দুজনার মধ্যে কার দেয়া শাস্তি তীব্র, কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। (অর্থাৎ আমি তোমাদের বেশি কঠিন শাস্তি দিতে সক্ষম, না মূসা অধিক ক্ষমতাবান)

ফিরাউনের হুমকি শুনে সে ঈমানদার যাদুকররা জবাবে বলল ঃ

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ط اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى - (طٰهٰ : ٧٢-٧٣)

সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সত্য সমুজ্জ্বল প্রমাণ নিদর্শনাদি দেখতে পাওয়ার পরও সত্যকে বাদ দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করব তা কক্ষনোই হতে পারে না। তুমি যা করতে চাও করে ফেল। তুমি তো বেশি করলেও শুধু এই বৈষয়িক জীবনের ব্যাপারেই ফয়সালা করতে পার। আমরা তো আমাদের মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেন। আর তুমি যে জাদুগিরি করতে আমাদের বাধ্য করেছ— তাও তিনি মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ই সর্বোত্তম এবং তিনিই শাশ্বত।

এ কাহিনী কত না মর্মস্পর্শী, বিপ্লবাত্মক, তা সংবেদনশীল যে-কোনো লোকই অনুধাবন করতে পারে। ব্যক্তিত্বে ও ব্যক্তিসত্তায় কি বরাট পরিবর্তন এসে গেলে এরূপ ঘটতে পারে। মন-মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যমানে কতখানি বিপ্লব সাবিধত হলে পরে এই ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

এ যাদুকররা ছিল অর্থলোভী। অর্থের বিনিময়ে তারা কাজ করত। এই জন্য হযরত মূসার সাথে মুকাবিলায় ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পরও টাকা-পয়সা

সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিকঠাক করা কথাকে নতুন করে ঝালাই করে নিল এই বলে ঃ

إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا -

আমাদের মজুরী ঠিক আছে তো ? পাব তো তা ?

আর তারা ছিল ফিরাউনের প্রতি বিশ্বাসী এবং তার উপর নির্ভরশীল। তাই তারা মুকাবিলার ময়দানে নেমে ফিরাউনের নামের কসম খেয়ে বলেছিল ঃ ফিরাউনের মান সম্মানের দোহাই! আমরা জয়ী হবই।

এ অবস্থা তাদের ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার পূর্বে। কিন্তু হযরত মূসার মুজিযা দেখে যখন তারা ঈমান আনল, ঈমানের মিষ্টি স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের সবকিছুতেই আমূল পবির্তন এসে গেল। তখন তারা ফিরাউনের সব হুমকির জবাবে দৃঢ় প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিল ঃ আমরা অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়ার পর তোমার কথা আর মেনে নিতে পারি না— তোমাকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়া আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়।

অতঃপর তারা দুনিয়ার সব ভাবনা-চিন্তা ত্যাগ করে পরকাল সম্পর্কে বেশিকরে ভাবিত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিজেদের গুনাহ-খাতার মাফি পাওয়ার ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। পূর্বে তারা ফিরাউনের দোহাই দিয়েছিল। কিন্তু ঈমান গ্রহণের পর তারা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছিল।

বস্তুত এ এক আমূল পরিবর্তন। চূড়ান্ত অন্তবিপ্লব। লক্ষ্য পরিবর্তিত হলো, কথাবার্তা এবং তার ধরন ও ভঙ্গি বদলে গেল। আচার-আচরণ বদলে গেল। কথার শব্দ ও স্টাইল বদলে গেল। তখন তারা সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে গেল। পূর্বে তাদের যে অবস্থা ও যে পরিচিতি বা চরিত্র ছিল তার কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। এসব কিছুই ঈমানের কীর্তি, ঈমানের অবদান।

মুসলিম শরীফে এমন একটি ছোট্ট কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে, যা ঈমানের প্রভাব ও ব্যক্তি জীবনে ঈমানের বিপ্লব সাধনের একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। একজন লোক একবার নবী করীমের ঘরে মেহমান হিসাবে অবস্থান করল। সে তখনও ঈমান আনেনি। নবী করীম (স) তাকে একটি ছাগীর দুধ পান করতে দিলেন। সে তা পান করল। তিনি বুঝলেন, এতে তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়নি। তখন আর একটি ছাগীর দুগ্ধ দেয়া হলো। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ছাগীর দুধ তাকে পান করতে দেয়া হলো। লোকটি সেখানে রাত যাপন করল। এর মধ্যে তার দিলে বিপ্লব সূচিত হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ করে। সে

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার কথা ঘোষণা করল। সকাল বেলা রাসূলে করীম (স) তার জন্য ছাগীর দুধ দিতে বললেন। পরে আরও একটি ছাগীর দুধ দেয়া হলো, কিন্তু প্রথমটির দুগ্ধ পানের পর এই দ্বিতীয়বারের দুগ্ধ সে পান করে শেষ করতে পারল না। এরূপ অবস্থা দেখেই নবী করীম (স) তাঁর সেই প্রখ্যাত কথাটি বললেন, তাহলো ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْرَبُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ لَيَشْرَبُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ -

মুমিন ব্যক্তি এক-পেট ভরে পান করে, আর কাফের পান করে সাত পেট।

পান করে পরিতৃপ্ত হওয়ার ব্যাপারে একই ব্যক্তির রাত্র ও সকাল বেলার মধ্যে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে গেল! একজন পেটুক, যার পেট ভরতে রাত্রিবেলা পর পর সাতটি ছাগীর দুগ্ধ পান করতে হয়েছিল, সে লোকই সকালবেলা মাত্র একটি ছাগীর দুগ্ধ পান করেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় ছাগীর দুগ্ধ সম্পূর্ণ পাণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হলো না— একি বিরাট বিস্ময়! কে লোকটিকে এভাবে বদলে দিল ?

এ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার হৃদয় মনে। তার হৃদয়-মন রাত্রিকালে ছিল বেঈমান, কাফের। সেজন্য তার ক্ষুধা ছিল সর্বগ্রাসী। ছিল লোভী, অতৃপ্ত মন। কিন্তু ঈমান গ্রহণের পর তার এই মনের অতৃপ্তি ও ক্ষুধার সর্বগ্রাসিতা দূরীভূত হয়ে গেল। ঈমান মানব মনে ও প্রকৃতিতে কত তীব্রভাবে পরিবর্তন আনে, এ তার এক উজ্জ্বল অকাট্য নিদর্শন।

নবতর ঈমান লোকটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, রুচি ও দায়িত্ববোধে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছিল। তার রুচি ও ধ্যান-ধারণা আমূল বদলে গেল। আর তা তার দেহ-ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এনে দিল। পানাহারের মাত্রাজ্ঞানে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হলো। আর এ পর্যায়ে কেবল এই একটিমাত্র ঘটনাই উল্লেখযোগ্য নয়। কত শত ঘটনা এ ধরনের ঘটেছে ঈমানের অবদান রূপে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। স্বয়ং আরব সমাজের ক্ষেত্রে ঈমান যে অবিস্মরণীয় বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তাও কি কোনো দিন ভুলবার মতো ?

এ পশ্চাদপদ, অসভ্য, বর্বর আরব সমাজের এ পরিবর্তন পাশ্চাত্যের ও প্রতীচ্যের ঐতিহাসিকদের কাছে একটা কঠিন, দুর্বোধ্য রহস্যময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সকলেরই প্রশ্ন, উষ্ট্র ও ছাগলের রাখাল জাতিকে কোন জিনিস দিয়ে বিশ্বজাতির রাখাল বা নেতা-পরিচালক বানিয়ে দিল ? ইতিহাস-বিজ্ঞান তো এ জিজ্ঞাসার কোনো জাবাব দিতে পারে না। যারা আবহমানকাল থেকে নিতান্ত বস্তু-জীবন যাপন করত, তারা কি করে হলো সভ্যতার স্রষ্টা ও উদগাতা ?

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় জীবন কাকে বলে তা তাদের জানা ছিল না, তারা কি করে শত বছরের সভ্যতার পাদপীঠ কিস্‌রা ও কাইজারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল, রোমান ও পারসিক সভ্যতার কবর রচনা করল এবং মাত্র দশ বছরের মধ্যে প্রাচীন পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের বিজয় কেতন উড়াতে পারল, এ প্রশ্নের নির্ভুল জবাব বিশ্বের ইতিহাসবিদগণ দিতে পারিন— পারবেও না।

কিন্তু প্রকৃত ওয়াকিফহাল লোকদের কাছে এটা এমন কোনো দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়। তাদের কাছে এর অন্তর্নিহিত রহস্য দিনের আলোর মতোই শুভ্র-সমুজ্জ্বল। এর কারণও তাদের জানা। এর মূল কারণ হচ্ছে একমাত্র ঈমান— ঈমানের জীয়নকাঠিই এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) ঈমানের যে সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়েছিলেন, তাই তাদের অবস্থার এ পরিবর্তনটা সাধন করেছে। তা-ই তাদের মূর্তি প্রস্তর পূজারী থেকে তওহীদবাদী এক আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ বানিয়ে দিয়েছিল। তা-ই টেনে এনেছিল জাহিলিয়াতের অন্ধকূপ থেকে ইসলামের উদার বিশাল উন্মুক্ত অঙ্গনে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা এখানে একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী উদ্ধৃত করতে চাই। তাঁরা যেমন জাহিলিয়াতের যুগেও সুপরিচিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন ইসলামের যুগেও।

পুরুষ হলেন হযরত উমর ফারুক (রা)। জাহিলিয়াতের যুগে তাঁর বুদ্ধি-বিবেক কতটা বাঁকা ছিল, তা এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি একদিন দেবতার সামনে দেবতার ভোগ হিসেবে হালুয়া পেশ করলেন। কিন্তু পরে তাঁর যখন ক্ষুধা বোধ হলো তখন তিনি নিজেই তা খেয়ে ফেললেন। দ্বিতীয় তাঁর স্নেহ-মমতায়ও বিকৃতি এসে গিয়েছিল। তিনি নিজ হাতে নিজের কন্যাকে হত্যা করেছিলেন। ছোট মেয়েটি তাঁর শ্মশ্রু থেকে মাটি ঝেড়ে দিচ্ছিল, আর তিনি তার কবর রচনা করছিলেন তাকে জীবন্ত প্রোথিক করার জন্য।

এই উমর যখন জাহিলিয়াত ও কুফরী থেকে ঈমানের দিকে ফিরে আসলেন, গ্রহণ করলেন ঈমান, তখন সেই গাছটি কেটে ফেলবার সময়ও তাঁর অন্তর ও বিবেক-বুদ্ধি দৃঢ় হয়েছিল, যে গাছটির তলায় বসে নবী করীম (স) চৌদ্দশত জান উৎসর্গকারী মুজাহিদ সাহাবীর কাছ থেকে মৃত্যুবরণের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। গাছটি কেটেছিলেন শুধু এই ভয়ে যে, উত্তরকালে লোকেরা এই গাছটিকে পবিত্র গাছ মনে করে এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা উৎসর্গ করে বসতে পারে। কেননা তাতে শির্‌ক হয়ে যাবে, যা ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই হযরত উমর (রা)-ই কাবার সঙ্গে গ্রথিত 'হাজরে আসওয়াদ'-এর কাছে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, হে

পাথর! আমি তোমায় চুম্বন করছি। অথচ আমি জানি, তুমি একটা পাথর খণ্ড ছাড়া কিছু নও। কোনোরূপ ক্ষতি করার বা কল্যাণ করার কোনো ক্ষমতাই তোমার নেই। আমি যদি রাসূলে করীম (স)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি কক্ষনোই তোমাকে চুম্বন করতাম না।

এই নির্মম (?) উমর ফারুকই স্নেহ-মমতার উচ্চমার্গে উন্নীত হয়েছেন। হৃদয় তাঁর ছিল সদা দয়ার্দ্র, দ্রবীভূত, তাঁর ভয় ছিল একমাত্র আল্লাহ্কে। দুনিয়ার জন্য কাউকে তিনি একবিন্দু ভয় করতেন না। তাঁর দয়া-সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা ছিল মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মানুষ ছাড়িয়ে জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, সম্প্রসারিত। ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোতে তাঁর দয়ার কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যানুভূতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেই বলেছিলেন ঃ

لَوْعَثَرَتْ بَغْلَةٌ بِشَطِّ الْفُرَاطِ لَرَأَيْتَنِىْ مَسْئُوْلاً عَنْهَا اَمَامَ اللّٰهِ .... لِمَ لَمْ اُسَوِّلَهَا الطَّرِيْقَ -

কোনো একটা খচ্চরও যদি ফুরাত নদীর বেলাভূমে পা পিছলিয়ে পড়ে যায়, তাহলে আমাকেই সেজন্য আল্লাহ্র সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে বলে আমি অনুভব করি। আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি কেন তার চলার পথ সমান ও সমতল করে দেই নি ?

এই হচ্ছে একজন পুরুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ঐতিহাসিক অমর কাহিনী।

আর যে স্ত্রীলোকটির কথা বলতে চাই, তিনি হচ্ছেন হযরত খান্সা (রা)। তিনি জাহিলিয়াতের সময়ে তাঁর সৎ ভাইকে হারিয়েছিলেন। তার মৃত্যু সংঘটিত হলে তিনি শোক ও ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মথিত করে তুলেছিলেন। এ জন্য তিনি এক শোকগাঁথাও রচনা করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল ঃ

প্রতিদিনের সূর্যোদয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়
আমার ভাইয়ের কথা
আমি তাকে স্মরণ করি প্রত্যেক দিন সূর্যাস্ত কালের।
আমারই মতো আরও অনেক ভাই হারা বোনদের ক্রন্দনরোল
চারদিকে যদি শুনতে না পেতাম,
তাহলে আমি আমার ভাইয়ের শোকে আত্মহত্যা করতাম।

কিন্তু তিনি যখন ইসলাম কবুল করলেন, তখন তিনি হয়ে গেলেন এক সম্পূর্ণ নতুন মহিলা। তখন তিনি মা হয়ে নিজে নিজেই কলিজার টুকরা সন্তানদের

যুদ্ধের ময়দানে— নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে— ঠেলে দিলেন। তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ সন্তুষ্টচিত্ত— নিশ্চিন্ত। তেজবীর্যে ভরা এক সংগ্রামী মহিলা।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মুসলমান ও পারসিকদের মধ্যে। হযরত সায়াদ ইবনে আবুওআক্কাসের নেতৃত্বে। এই যুদ্ধে তিনি তাঁর চারই পুত্র সন্তান সঙ্গে নিয়ে যোগদান করেছিলেন। এই সময় এক রাত্রে তিনি তাঁর সন্তানদের কাছে বসিয়ে যুদ্ধে যোগদান এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে দৃঢ় ও অবিচল হয়ে সংগ্রাম করবার বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাদের উদ্বুদ্ধ-উৎসাহিত করছিলেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। তিনি বলছিলেন ঃ হে আমার স্নেহের পুত্ররা! তোমরা তো নিজেদের ইচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছ, তোমরা হিজরতও করেছ নিজেদেরই আগ্রহে। যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই সেই আল্লাহ্র কসম, তোমরা একজন পুরুষ ও এজন মেয়েলোকের সন্তান। তোমাদের পিতা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। তোমাদের মা-বোনেরাও করেনি কোনো লজ্জাকর কাজ। তোমাদের বংশে কোনো বিকৃতি দেখা দেয়নি। তোমাদের বংশীয় সুমান-সুখ্যাতিও বিনষ্ট হয়নি কখনো। তোমরা জানো, কাফেরদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করায় আল্লাহ তা'আলা কত বেশি সওয়াব রেখেছেন। তোমরা এও জানো যে, পরকালের চিরস্থায়ী ঘর এই নশ্বর জগত থেকে অনেক বেশি কল্যাণময়, আর আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেরা ধৈর্য ধারণ করো, অন্যদের ধৈর্য-ধারণ করতে বলো এবং শক্ত হয়ে প্রতিরক্ষা কাজে দাঁড়াও। আর আল্লাহ্কে ভয় করো, সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

আগামীকাল সকাল বেলা তোমরা যখন সহীহ্ সালামতে থাকবে তখন তোমরা প্রবল বিক্রমে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্র অনুগ্রহে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যখন দেখবে যুদ্ধ ঘোরতর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তোমরা মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর মস্তকে কঠিন আঘাত হানবে। তাহলে তোমরা গনীমত স্বরূপ লাভ করবে পরকালের জান্নাত।

সকাল বেলা যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, সেই চারজন পুত্র যৌবনদীপ্ত তেজবীর্য লয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের একজনের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা দেখতে পেলে অন্যজন তাদের মায়ের নসীহত তাকে স্মরণ করিয়ে দিত। ফলে তারা বাঘের মতো হামলা চালাল, তীরের বেগে ছুটতে লাগল এবং বজ্রের মতো শত্রুর উপর নিপতিত হতে লাগল। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তারা চার ভাই

একের পর এক শহীদ হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষে মার কাছে যখন চার ভাইর একই দিনে শাহাদত লাভের মর্মান্তিক খবর পৌঁছল, তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না, কোনো হা-হুতাশও করলেন না, শোক-বিলাপে নিজেকে ছিন্ন ভিন্ন ও আকাশ বাতাস মথিতও করলেন না। বরং তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্য সহকারে এই সংবাদ গ্রহণ করলেন। এ ঘটনাকে সম্বর্ধনা জানালেন। ঈমানী ধৈর্য সহকারে তিনি বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ شَرَّفَنِىْ بِقَتْلِهِمْ وَاَرْجُوامِنْ رَبِّىْ اَنْ يَّجْمَعُنِىْ بِهِمْ فِىْ مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ -

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র যিনি ওদের শাহাদত দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। আমি আশা করি, তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে তার রহমতের ঘরে একত্রিত করবেন।

দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনা পেশ করা হলো। প্রশ্ন হচ্ছে—

পুরাতন উমরকে পরিবর্তন করে নতুন উমর ফারুক কে বানিয়ে দিল ? ভাই-এর শোকে বিলাপকারী ক্রন্দসী খান্‌সাকে নিজের কলিজার টুকরার এই আত্মদান অবিচল ধৈর্যশীল কে বানিয়ে দিল ?

এই বিস্ময়কর অবদানের মূলীভূত কারণ হচ্ছে ঈমান।

একমাত্র ঈমান ছাড়া এরূপ অবদান আর কোনো কিছুতেই হতে পারে না।

জীবনের বন্ধ তালা খোলার একমাত্র কুঞ্চিকা ঃ ঈমান

বর্তমান দুনিয়ার মানুষ যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন, যে-সব সমস্যা দুনিয়ার মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংস করছে, ধ্বংস করছে আকস্মিক প্রলয়ের, তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি ঈমানের দিকে ফিরে আসা। এই ঈমানকে পুরোপরি গ্রহণ করা এবং তদনুষায়ী জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ছাড়া এ জটিলতম অবস্থা থেকে মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ বা উপায় হতে পারে না। এ ঈমানের একটা বিশেষত্ব যেমন আভ্যন্তরীণ, তেমনি এর আর একটা বিশেষত্ব বাহ্যিক। এই ঈমানের দৌলতেই মানুষ 'মানুষ' হতে পারে। এই ঈমানের দরুনই মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র খলীফা হওয়ার অনন্য সাধারণ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

বস্তুত যে সত্যিকার ঈমান গ্রহণের আহবান ইসলাম পেশ করেছে, তাই হচ্ছে বর্তমান কালের জীবন সমস্যার বন্ধ তালা খোলার একমাত্র কুঞ্চিকা; তাই হচ্ছে সমস্যার একমাত্র সমাধান। অথচ এ কালের সর্বোন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন—

সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্র দর্শন— এ সব সমস্যার কোনো সমাধানই পেশ করতে পারে নি। উপরন্তু একালের চিন্তাবিদ, আইন প্রণেতা ও সমাজ সংস্কারক এই সব সমস্যার সমাধান চিন্তায় অস্থির হয়ে গিয়েও এবং দিন রাত চিন্তা-গবেষণা চালিয়েও মুক্তির কোনো উপায়ই বের করতে পারেনি, দিতে পারেনি নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোনো নির্ভুল পথের সন্ধান। এ পর্যায়ে তাদের সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তাদের নিত্য নতুন আজগুবি ধরনের চিন্তা-কল্পনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা এ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে এবং এর সমাধানকে বানিয়ে দিয়েছে আরও অসম্ভব।

কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) কেবল 'ঈমান' কুঞ্চিকার দ্বারাই মানব জীবনের সমস্যা-সংকুল বদ্ধ তালা অতি সহজেই খুলে দিয়েছিলেন। মানব জীবনের অসংখ্য জটিল ও কঠিনতম সমস্যাসমূহের নির্ভুল সমাধান করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন মানুষের জীবন কঠিন সমস্যাবলীর চাপে সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। জীবনের দ্বারসমূহ ছিল রুদ্ধ। মানুষের সহজাত বিবেক-বুদ্ধিতে এসেছিল চরম বিকৃতি। তদানীন্তন বুদ্ধিমান ও দার্শনিক লোকেরা তা ঠিক করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তখনকার মানুষের হৃদয়-মন ছিল তালাবদ্ধ, ওয়ায়েয ও আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শকরা তা খুলবার জন্য বহু চেষ্টা করেছে; কিন্তু তারা তা খুলতে পারে নি। এমন কি ঘটনা-দুর্ঘটনার আবর্তে পড়েও তখনকার মানুষের চোখ খুলেনি, অন্তর জাগ্রত হয়নি, বিবেক সাড়া দেয়নি। কেননা বদ্ধ তালা চাবি ছাড়া খোলা যায় না। আর দীর্ঘ দিন ধরে তারা সে চাবি হারিয়ে ফেলেছিল। তারা নতুন গড়া বহু চাবি দিয়ে সে বদ্ধ তালা খুলতে চেষ্টা চালিয়েছে; কিন্তু সে চাবি সে তালায় বসেনি, লাগেনি, খুলবার জন্য ঘুরেনি। ফলে বদ্ধ তালা বদ্ধই রয়ে গেছে। অনেক দুঃসাহসী লোক অগ্রসর হয়ে কঠিন আঘাত হেনে তালা ভাঙতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে তালা তো খুলেইনি, মাঝখান থেকে তাদের হস্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এই সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবুয়ত ও রিসালাত দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি চিরকালীন শাশ্বত অনুগ্রহ দান করলেন। এর ফলেই বিশ্বমানবতা মানব-জীবনের বদ্ধ তালা খোলার সে হারানো চাবিটি ফিরে পেল। হযরত মুহাম্মাদ (স) এ চাবি দিয়েই একটা একটা করে সবগুলো তালা খুলে ফেললেন, খুলে দিলেন মানব জীবনের সব কটি বদ্ধ দরজা। মানুষের বদ্ধ বিবেক উন্মুক্ত হলো, বিশ্ব প্রকৃতির চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে ফেলল। বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলো বিশ্ব স্রষ্টার। আবহমান কাল থেকে পুঞ্জীভূত শিরক, মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারের জঞ্জাল দূর করা নিমেষের মধ্যে সম্ভবপর হলো। মানুষের চেতনা জেগে উঠল। সততা, বিশ্বস্ততা

ও ন্যায়পরতার স্বর্ণকান্তি বিচ্ছুরিত হয়ে সমস্ত পরিবেশকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে তুলল। একটা মৃত জাতির নিষ্প্রাণ দেহে নতুন জীবনের সঞ্চার হলো। অপরাধীরা নিজেরা এসে ধরা দিতে ও শাস্তি গ্রহণ করতে লাগল। দরিদ্র সৈনিক কিস্‌রার মহামূল্য স্বর্ণমুকুট ছেড়া কম্বল তলে লুকিয়ে এনে পূর্ব নির্দেশ মতো অতি সংগোপনে সেনাপতির সম্মুখে পেশ করেছিল। কেননা এ সরকারী সম্পদ, তা কোনোক্রমেই আত্মসাৎ করা যেতে পারে না।

জাতীয় সমস্যার সমাধান করার এই চাবি দেয়া হলো একটা ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রর্তঙ্গসম্পন্ন জাতির হাতে, বিলীয়মান মানব-প্রতিভার হাতে। ফলে সে জাতি নবতর জীবনী শক্তি নিয়ে জাগ্রত হলো, প্রতিভা-অগ্নিস্ফূলিঙ্গ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। চারদিকে যেন একটা প্রবল বন্যা প্রবাহ ছুটতে লাগল। ফলে উষ্ট্র চালকরা হলো বিশ্বচালক। সাধারণ মানুষ হলো রাষ্ট্রকর্তা, বিশ্বের উপর চালাতে লাগল আইন ও শাসন। চারদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়ে গেল। প্রতিটি ঘর পরিণত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রতিটি ব্যক্তি গড়ে উঠল মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী হয়ে। দ্বীন সেখানে দুনিয়ার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। দ্বীনই হলো সেখানে সমগ্র জীবন প্রসাদের একমাত্র ভিত্তি, জীবন সংগ্রামের একমাত্র নেয়ামক।

রাসূলে করীম (স) তখন মানুষ গড়ার যে কারখানা চালু করেছিলেন, তা থেকে তৈরী হয়ে বের হতে লাগল এক একজন সত্যবাদী, সত্যাশ্রয়ী ও সত্যপন্থী ব্যক্তি। সে আল্লাহ্‌র প্রতি পুরোপুরি ঈমানদার, কেবল আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, আমানতদার বিশ্বস্ত। তার কাছে এ দুনিয়ার পরিবর্তে পরকাল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সে এই বস্তুলোকের উপর বিজয়ী— তা ব্যবহারকারী, স্বীয় ঈমান ও আত্মশক্তির বলে। সে বিশ্বাস করে, এ জগত তার জন্য সৃষ্ট হয়েছে, আর সে সৃষ্ট হয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য পরকালের জন্য। এই ব্যক্তি যখন ব্যবসা শুরু করে দিত, তখন সে হতো অত্যন্ত সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী। যখন সে হয় রাষ্ট্রশাসক, জননেতা, তখন সে সমগ্র জাতি ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে আল্লাহ্‌র দ্বীনের ভিত্তিতে। তার অন্তর প্রতি মুহূর্তে এ জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে, সে যদি মানুষকে আল্লাহ্‌র আইন-বিধানের পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা ও মর্জী মেনে চলতে বাধ্য করে, তাহলে তাকে পরকালে ফিরাউন-নমরূদের সঙ্গী হয়ে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। সে যদি কোনো ক্ষেত্রে কর্মী নিযুক্ত হয়, তাহলে সে হয় আন্তরিক পরিশ্রমী ও সততা রক্ষাকারী। যদি সে হয় ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোক, তাহলে সে নিজেকেই সব ধন-সম্পদের মালিক-মুখ্‌তার মনে করে না। সে মনে করে, এই ধন-মালে জনতার অংশ ও অধিকার রয়েছে। অতএব সে তা পুরোপুরি

আদায় করে দেয় হৃদয় মনে এই ভয় রেখে যে, আমি যদি তা আদায় করে না দেই, তাহলে কেয়ামতের দিন এই ধন-সম্পত্তিই এক বিষধর বিরাট অজগর হয়ে তাকে দংশন করবে। সে যখন হয় বিচারপতি, তখন সে বিচার করে আল্লাহ্‌র আইনের ভিত্তিতে, অত্যন্ত ন্যায়পরতা ও সুবিচার নীতি অনুযায়ী। কেননা তার ঈমান হলো, সে যদি মানুষের রচিত আইনের ভিত্তিতে বিচার করে, তাহলে সে ঈমানদার থাকবে না, কাফের-ফাসেক ও জালিম হয়ে যাবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে তাকে। রাসূলের গড়া এই ধরনের ব্যক্তিদের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছিল তার ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর সত্যি কথা এই যে, মানবতার সার্বিক কল্যাণও কেবলমাত্র এই ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন সাধিত হতে পারে।

এ কালের কিছু লোক বলে বেড়াচ্ছে, ঈমানের এই যে সব কীর্তিকলাপ ও বিস্ময়কর অবদানের কথা প্রচার করা হয়, এগুলো সেই মান্ধাতার আমলের প্রাচীন বর্বর যুগের কথাবার্তা। এখন যুগ পাল্টেছে, অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন সেই সমস্যা বা সমস্যার সে ধরন নেই। এখন সব নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজেই সে চাবি দিয়ে এ যুগের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এখন সমস্যাও যেমন নতুন, চাবিও তেমনি নতুন গ্রহণ করতে হবে।

এর জবাবে প্রথম প্রশ্ন হলো, একালের এসব সমস্যার বদ্ধ তালা খুলবার জন্য সেই পুরাতন চাবিটি কি ব্যবহার করা হয়েছে ? সেই পুরানো চাবি দিয়ে কি খুলতে চেষ্টা করা হয়েছে নতুন যুগের নতুন তালা ? যদি তা না করা হয়ে থাকে আর করা যে হয়নি তা সকলেরই জানা, তাহলে সে চাবি দিয়ে এ তালা খোলা যাবে কি যাবে না, তা কি করে বোঝা গেল ? আর আদৌ খোলা যাবে না এমন দাবিই বা জোর করে কিভাবে করা যেতে পারে ?

দ্বিতীয় কথা, আজকের দিনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যাগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন প্রকৃতির বলে দাবি করাই মূলত ভুল। যে মানুষ সেকালে বাস করত, একালেও সেই মানুষই। সে কালের মানুষের যা সমস্যা ছিল, এ কালের মানুষেরও ঠিক সেই সমস্যা। বড় বেশি বললে শুধু এতটুকুই বলা চলে যে, সমস্যার মাত্রা Volume বেড়েছে মাত্র। কিন্তু সমস্যার প্রকৃতি যা সেকালে ছিল, এ কালেও তাই রয়েছে, হাজার লক্ষ বছর পরের মানুষের সমস্যার মূল প্রকৃতিও তাই থাকবে। তাতে কোনো পরিবর্তন আসবে না, আসতে পারে না। তাই চাবি যেমন পুরাতন, তালাও সেই পুরাতন। কাজেই সেকালে যে চাবি দিয়ে সেকালের তালা খোলা গিয়েছিল, এ কালের তালা খোলাও কেবল সেই চাবি দিয়েই সম্ভব হবে। এজন্য নতুন চাবি ব্যবহার করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আর তালা খুলতে পারে এমন চাবি পাওয়াই বা যাবে কোথায় ?

আসলে সমস্যার মূল কেন্দ্র হলো ব্যক্তি। এই ব্যক্তিই সর্বকালের সমাজ-সংস্কার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইষ্টক খণ্ড। সেকালে এই ব্যক্তিই যখন ঈমানের আদর্শে গড়ে পরিপক্ক হয়েছিল, তখনই তাদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শ ভিত্তিক হয়েছিল। একালের সমাজ কাঠামোর এই ব্যক্তি-ইট জড়বাদি ও শক্তি বিশ্বাসী হয়ে গেছে। তার নিজের মনের বাসনা পরিপূরণ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর দিকেই তাদের গুরুত্ববোধ নেই। তারা কেবল এই জীবন নিয়েই সদা ব্যস্ত— ব্যক্তি পূজা, ব্যক্তি পরিচর্যা ও ব্যক্তি সন্তোষ বিধানেই নিয়োজিত তার সমস্ত সত্তা, সমস্ত শক্তি। ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্তির স্রষ্টার সাথে আজ বিচ্ছিন্ন। নবীগণের নবুয়ত-রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস আজ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বর্তমানেও এই ব্যক্তি সত্তাই বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার যাবতীয় ব্যাধি ও সমস্যার মূল কার্যকারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কালের ব্যক্তি ব্যবসা করতে গিয়ে হয়েছে কোটি মানুষের রক্ত শোষক, হয়েছে মজুদকারী, চোরাকারবারী, চোরাচালানকারী। ফলে দেশ ও সমাজের কোটি মানুষ রক্তহীনতায় মৃত্যুমুখে নিপতিত, অভাব-অনটন ও অনশনে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। এ কালের সরকারী কর্মচারী আমানতদার না হয়ে হয়েছে ঘুষখোর। ঘুষ ছাড়া তার নিজের পদ সম্পর্কিত কাজও করতে সে প্রস্তুত নয়। এ কালের ব্যক্তি বিচারাসনে বসে হয়েছে চরম অবিচারক। মানুষের বিচার মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ও নিজের ইচ্ছানুরূপ করতেও একবিন্দু কুণ্ঠিত হচ্ছে না। ফলে আজকের মানুষ চরম অবিচার ও নির্যাতন ভোগ করতে করতে জর্জরিত ও নিষ্পেষিত হয়ে পড়ছে। আজকের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার মূলত সেই এক ব্যক্তিই। গণতন্ত্রের যত দোহাই দেয়া হোক না কেন, আর সেই এক ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষকে নিজের হুকুমের দাস ও মর্জির অনুগত বানাতেও দ্বিধা বোধ করছে না, আল্লাহ্‌র কাছে কঠিন জবাবদিহির ভয়ে তার কলিজা কেঁপে উঠছে না। আজকের শ্রমিক কর্মীরাও তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বলিষ্ঠ না থাকলে আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে না। আর আত্মবিশ্বাস না থাকলে দায়িত্বের কোনো কাজই যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। আজকের বন্ধু বন্ধু নয়, পরম শত্রু। আর এই ধরনের চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারাই গঠিত হয়েছে আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র। এই কারণেই আজ মানুষ বাঁচতে চায় না— কেননা বেঁচে সুখ নেই। আজ মানুষ মরেই বাঁচে। আজকের সমাজ ও সভ্যতা মানুষকে একবিন্দু শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারছে না। কেননা হিংস্র শ্বাপদ চরিত্রের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই সমাজ ও সভ্যতা। এ সমাজের রাষ্ট্রপ্রধান বা মন্ত্রী পরিষদ সদস্য নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখে না। এ সমাজের সেবক

দুর্বল, বিশ্বাসঘাতক। এ সমাজের ধনভাণ্ডারের রক্ষক চোর, অপহরণকারী। এ সমাজের জননেতা দেশমাতৃকার পূজারী, স্বজাতিবাদী। সে তার নিজের মাতৃভূমি ও স্বজাতির পবিত্রতা রক্ষা করলেও অন্যান্য দেশের সীমানা লংঘন করতে ও পবিত্রতা বিনষ্ট করত লজ্জা পায় না। অন্যান্য অঞ্চল ও দেশের জনতাকে গোলাম বানাতে ও তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। এ জাতির আইন প্রণেতারা অত্যাচার নিপীড়নমূলক আইন রচনা করে। দেশবাসীর মৌলিক অধিকারও খর্ব করে, হরণ করে। এ কালের আবিষ্কারকরা আবিষ্কার করে ধ্বংসাত্মক ও বিনাশক উপাদান। উৎপাদন করে আনবিক বোমা, হাউড্রোজেন বোমা— যা দেশ, সভ্যতা ও মানব বংশকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। আর এরা যখন তা ব্যবহার করার সুযোগ পায়, তখন তা নিক্ষেপ করে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দেয়।

স্পষ্ট বোঝা যায়, এই স্বভাব ও প্রকৃতির ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত যে মানব সমাজ ও জাতি, সে সমাজ ও জাতি বস্তুবাদী হবে অনিবার্যভাবে। ব্যক্তিদের সমস্ত 'গুণ' সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে এক মহা আগ্নেয়গিরি হয়ে দাঁড়াবে। সে সমাজ ও জাতি কেবল নিজেদেরই ধ্বংস টেনে আনবে না, তারা সারা দুনিয়ায় সমস্ত মানুষকেও ধ্বংস করে ছাড়বে। এই সমাজ ও জাতি একটার পর একটা সমস্যা ও ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। একটা থেকে কোনোক্রমে নিষ্কৃতি পেলেও সঙ্গে সঙ্গে আর একটার মধ্যে পড়ে যাবে। এ রাষ্ট্র তথাকথিত গণতন্ত্রের ধারক হলেও কার্যত হবে স্বৈরাচারী। জনগণের অভাব দারিদ্র ও দুঃখ-দুর্দশার দোহাই দিয়ে সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করবে; কিন্তু কার্যত তা হবে পুরোপুরি পুঁজিবাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক। কেননা মূল প্রকৃতি তো বদলে যায়নি। যে ব্যক্তিই হচ্ছে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি, সে-ই তো রয়েছে সকল রোগের লীলাকেন্দ্র হয়ে। আর ব্যক্তির পরিবর্তন ছাড়া যে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন সম্ভব নয়, তা সমাজবিজ্ঞানের একটা মৌলিক তত্ত্ব হলেও এ কালের সমাজবিজ্ঞানীরা তা জানে না, বোঝে না। আর তাও এ জন্য যে, ব্যক্তি সংশোধন সম্ভব হয় যে মন্ত্র দ্বারা, তাই রয়েছে তাদের অজানা— সম্পূর্ণ অগোচরে। ঈমানের সম্পদ হারিয়ে এরা হয়ে গেছে আত্মজ্ঞান বঞ্চিত। অন্তরকে খোরাক দিতে পারে, ঈমানের বৃক্ষ রোপণ করতে পারে যে মন্ত্র, সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এখানে বান্দাহ আর তার স্রষ্টার মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এ জীবন ও পরবর্তী জীবনের মাঝে। এখানে বস্তু ও প্রাণের সাথে সম্পর্ক নেই, জ্ঞান ও নৈতিকতার সাথে সম্পর্ক নেই, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক নেই নৈতিকতার। শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মিক ও নৈতিক দারিদ্র, বস্তুগত অন্ধত্ব এবং অহংকার দাম্ভিকতা সর্বশেষ মারণাস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য করেছে, যা ধ্বংস করে দিচ্ছে দেশের পর দেশ,

সমাজের পর সমাজ এবং সভ্যতার পর সভ্যতা। গোটা মানবতাই আজ চরম ধ্বংসের মুখে উপনীত।

সুস্থ ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা মানবতার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সেই সুস্থ আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুস্থ ও আদর্শ ব্যক্তিসত্তা। পরিপক্ক ইট না হলে যেমন পাকা প্রাসাদ রচনা সম্ভব হয় না, তেমনি পরিপক্ক ব্যক্তিসত্তা ব্যতিত উত্তম আদর্শ সমাজ রাষ্ট্র ও সভ্যতা রচনা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। আমি তুমি সে নিয়েই তো সমাজ। এই সমাজের লোকেরাই তো গড়ে রাষ্ট্র ও সভ্যতা। কাজেই উত্তম মহৎ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়বার জন্য আমি, তুমি, সে-কে উত্তম চরিত্রে ও আদর্শে গড়ে তুলতে হবে সর্বপ্রথম। আর তুমি, আমি সে-কে গড়বার একমাত্র কুঞ্চিকা হচ্ছে ঈমান। ইসলাম এই ঈমানেরই দাওয়াত জানায় সর্বপ্রথম।

ঈমান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

বস্তু বিজ্ঞানের অহমিকতা

এক শ্রেণীর লোক মনে করছে, মানুষ দ্বীন ও ধর্ম ছাড়াও সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে। ঈমানের বাধ্যবাধকতা ও নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ না করেও মানুষ মুক্ত-স্বাধীন হয়ে বসবাস করতে পারে, বিশেষ করে, এই যুগে। কেননা এ যুগটা তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ও পরম বিকাশের যুগ। এ যুগেই মানুষ এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌলতে বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করতে, করায়ত্ত করতে এবং নিজের ইচ্ছেমতো প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে পেরেছে। এ কালের মানুষ বিজ্ঞানের জোরে প্রস্তর কেটে প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছে, ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত করেছে। মানুষ মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশে পৌঁছেছে। মহাশূন্যে পাড়ি জামিয়েছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অক্টোপাস কাটিয়ে তারা চন্দ্রপৃষ্টে কদম রেখেছে, মানুষের বিজয় পতাকা চন্দ্রের বুকে উড্ডীন করেছে। ফলে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের গর্ব এতটা উচ্চমার্গে আরোহণ করেছে যে, মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চাইছে। বলছে মানুষ মানুষ সৃষ্টি করবে, সেদিন বহু দূরে নয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানই কি যথেষ্ট ?

এ কালের মানুষ বলতে চাচ্ছে, তারা বিজ্ঞানের জোরে যেমন ইচ্ছা জীবন গড়তে পারে। ঈমান গ্রহণ না করেও আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করেও এবং তাঁর দেয়া দায়িত্বসমূহ পালন না করেও তারা তাদের জীবনকে সুন্দর করতে পারে, উন্নত করতে পারে, পারে মহিমামণ্ডিত বানাতে।

তারা এই বিজ্ঞানের বলে মানুষের জন্য অপরিহার্য এ জিনিসগুলোও বানাতে সক্ষম ঃ

প্রথম, মন-মানসিকতা ও বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা। দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস ও গায়েবের প্রতি ঈমান আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সন্দিগ্ন ও কুণ্ঠিতমনা বানিয়ে দেয়। আর তাদের এ ঈমান হলো যুক্তি-ভিত্তিহীন। বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও তার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা। কেননা আল্লাহ, পরকাল ও রিসালাতের প্রতি ঈমান ব্যক্তির উপর অনেক বাধ্যবাধকতা, অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য চাপিয়ে দেয়। তাতে

মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হয়, আযাদী বন্দীত্বে পরিণত হয়। তা ব্যক্তিকে এক সুদৃঢ় লৌহ পিঞ্জরে বন্দী করে, দুনিয়ার পদে পদে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েযের রশি পা জড়িয়ে থাকে এবং তাতে চলার গতি স্তিমিত হয়ে যায়। কোনো ধর্মই এ থেকে মুক্ত নয়। অথচ ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকলে সে জীবনের মহাকল্যাণ স্বতঃই পেতে পারে। কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে না, কারো আধিপত্য নিজের উপর চাপিয়ে নিতে হয় না।

তৃতীয়, কোনো দ্বীন ও ধর্ম স্বীকার না করেও বৈষয়িক জীবনের জন্য কাজ করা যায় এবং তাতে উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ সম্ভব হয়। কেননা ধর্মের যে পরহেযগারী, কৃচ্ছ্র সাধনা এবং পরকালমুখিতা রয়েছে, তা দুনিয়ার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করায় এবং তার বিষয়াদির গুরুত্ববোধ লাঘব হয়। যারা দুনিয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে তাদের আল্লাহ বিমুখ ও পরকালের ব্যাপারে বে-পরোয়া প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কেননা দুনিয়া ও আখেরাত দুই সতীন। একজনকে খুশি করলে অন্যজন অসন্তুষ্ট হবেই।

এসব কথার অসারতা

কিন্তু এসব চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তিধারা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মূলতই এসব কথার সমর্থনে অকাট্য কোনো যুক্তি পেশ করা যেতে পারে না। এসব চিন্তাধারা সর্বপ্রথম ইউরোপে উন্মেষ লাভ করে, সে অনেক দিন পূর্বের কথা। উত্তরকালে ইউরোপের শিষ্য-শাগরিদ ও ইউরোপীয় চিন্তা ও সভ্যতার অন্ধ অনুসরণ অনুকরণকারীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এতদ্দেশেও এই চিন্তা দৃষ্টিকোণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর পেছনে যেমন সুস্থ কোনো 'লজিক' নেই, তেমনি নেই নির্ভুল বিজ্ঞানের কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণ। বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েও এসব কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়নি। পূর্বে তিনটি পর্যায়ে যে কথাগুলো সাজানো হয়েছে, তা যে সম্পূর্ণ অসত্য ও বাতিল, তা একটু গভীর সূক্ষ্মভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের আলোকে পর্যালোচনা করলেও তার বাতুলতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ক্ষেত্র একটি নয়— দুইটি

প্রথম কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব ক্ষেত্র ও একান্ত নিজস্ব পরিধি রয়েছে। সেই ক্ষেত্র ও পরিধি-সীমা তা কখনোই লংঘন করে না। বস্তুত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও আলোচনা-গবেষণার ক্ষেত্র হলো বস্তুজগত, প্রাকৃতিক বিশ্ব। অনুভূতির ও ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্ব চরাচরের মধ্যেই তার বিচরণ এবং এই বিশ্বের উপাদান-উপকরণ লয়েই তার সমস্ত চিন্তা-গবেষণা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন।

মানুষের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ জগতেই চলে, এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এবং সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-গবেষণার ফল কেবলমাত্র বস্তু কেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। তার বাইরে তার গমনাগমন, বিচরণ ও পদচারণা সম্ভব নয়। এ জগত সম্পর্কিত জ্ঞান, তার চর্চা-গবেষণা ও ফলোৎপাদনকেই বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। এর বাইরে যা রয়েছে, যা এই জগত বহির্ভূত, যা বস্তুর অতীত, যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূত নয়, তা কখনোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত নয়। তা হচ্ছে মূলত ও প্রধানত ওহীর জগত। দর্শনও এই জগতে বিচরণ করে থাকে বটে। এমতাবস্থায় একজন বিজ্ঞানী যখন উদাত্ত কণ্ঠে দাবি করে বলে ঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, নবী-রাসূলগণের সত্যতা কিংবা ফেরেশতাদের অবস্থিতির কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাইনি, তখন আমরা তাকে বলব, তুমি তোমার নিজেরই ভুল মূল্যায়ন করেছ। তোমার নিজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশ্বস্ততা নষ্ট করেছ। একে তো তুমি একজন বিজ্ঞানী মাত্র। বস্তুজগত নিয়েই তোমার সমস্ত কারবার। আল্লাহ্‌র ফেরেশতার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং নবী-রাসূল সত্য কিনা, এটা মূলতই তোমার গবেষণার বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, তুমি যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এতবড় কথা বলছ, সেই বিজ্ঞানকে তুমি এমন এক ক্ষেত্রে ও পরিবেশে টেনে নিয়ে এসেছ, যেখানে তার পদচারণা তো দূরের কথা, তা বেঁচেও থাকতে পারে না। তিমি মাছকে মরুভূমির বালুকা-সমুদ্রে ফেলে যদি তাকে সেখানে সাঁতার কাটতে বলা হয়, তাহলে যেমন নির্বুদ্ধিতা হবে, এও তেমনি। শেষতঃ প্রশ্ন হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, নবী-রাসূলগণের সত্যতা এবং ফেরেশতাদের অবস্থিতির কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওনি বুঝলাম; কিন্তু এদের অবর্তমানতা-অস্তিত্বহীনতার পক্ষে কোনো অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছ কি ?

বস্তুজগতকে জানবার বুঝবার জন্য বিজ্ঞান হচ্ছে একটা সত্যিকার উপায় ও পন্থা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বস্তুর অতীত, বস্তুজগত বহির্ভূত কোনো জিনিস জানবার ও বুঝবার জন্য তা মানুষের কোনো কাজেই আসে না। বস্তুজগত কিভাবে চলছে, বস্তুর নিয়ম প্রণালী কি, বিজ্ঞান তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু বস্তুর মূলতত্ত্ব ও সত্যতা Ultimate reality কি এবং কেন তার অস্তিত্ব, কেন তার আবর্তন-বিবর্তন ও গতি— তা জানবার কোনো সাধ্যই বিজ্ঞানের নেই। বিজ্ঞানীরা বস্তুলোকের আবর্তন-বিবর্তন ও গতি জানবার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে, চিন্তা-গবেষণা করছে। এই ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছে, এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং এর ফলে তারা অনেক কিছু জানতে পেরেছে, যা পূর্বে দুনিয়াবাসীরা জানত না, বুঝতও না। কিন্তু তা এই বস্তুলোকের স্রষ্টা এবং এর গতির উদ্‌গাতার দিকে কোনো লক্ষ্য আরোপ করেনি। আর তাও এজন্য যে,

সেটা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুও নয়, নয় তার সাধ্যয়ত্ত। বিজ্ঞান তো ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল, তারই উপর একান্তভাবে ভিত্তিশীল, নির্ভরশীল। তার পক্ষে সম্ভব নয় গতির মূল উদ্‌গাতাকে জানা। কেননা তা না দেখা যায়, না ধরা-ছোঁয়া সম্ভব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত যেখানে শেষ, সেখানেই তার অবস্থিতি— এই জগত পরিচালনার জন্য। গতিদানকারীকে তো আর গবেষণা কক্ষে উপস্থিত করা যায় না, না অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সে ধরা পড়ে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আওতা ও পাল্লা অত দূরত্বেও পৌঁছাবে না, তা স্রষ্টার ব্যাপ্তিহীন মালাকুতী জগতকে আয়ত্ত করতে পারে না।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে অনেক। কিন্তু এই অগ্রগতি বাস্তবে যতটা না ঘটেছে, বিজ্ঞানীদের চাইতেও বিজ্ঞানের দোহাইদাতা এক শ্রেণীর মানুষের মনে দাম্ভিকতা ও অহমিকতার সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহ যে, বিজ্ঞানের দাপট বিশ্বলোকের শুধু বহির্দেশ, পৃষ্ঠ ও উপরের স্তর (Sarface) ও বাহ্যমূর্তি (Pheno menon) পর্যন্তই পৌছতে পেরেছে। তাকে ভেদ করে গভীর অন্তর্দেশে প্রকৃত অন্তর্নিহিত মহাসত্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। 'কি ভাবের' জবাব দেয়া ছাড়া তার পক্ষে অন্য কিছু সম্ভব নয়। 'কেন'র জবাব তার নিজস্ব ব্যাপ্তি বহির্ভুত। তাই সৃষ্টির প্রথমে কার্যকারণ কি? বিশ্বের প্রথম কোষে Cell জীবনের উন্মেষ কে ঘটাল ? এর জবাব দেয়া বিজ্ঞানের কর্ম নয়। বিশ্ব প্রকৃতির বুকে যে অসংখ্য বিস্ময়কর মহাসত্য নিহিত, তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান কি করে দিতে পারে ? মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে বিস্ময়করতা, তার ব্যাখ্যা দান বিজ্ঞানের শক্তির আওতায় পড়ে না।

বিজ্ঞান যা কিছু অর্জন করেছে কিংবা বিজ্ঞানের যে বিচরণ ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছে, তাকে বলা যায় মূল মহাসত্যের অর্ধেক। আর তা হলো সৃষ্টির বহির্দেশ মাত্র এবং কিভাবে ? —এর জবাব দানই তার একমাত্র কাজ। কিন্তু বাকী অর্ধেক আর এই অর্ধেকই হচ্ছে প্রধান ও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ— এ হচ্ছে অদৃশ্য, মানবীয় শক্তির আওতা বহির্ভুত মহাসত্য। তা কি এবং তা কেন ? এর জবাব দানের কোনো ক্ষমতাই বিজ্ঞানের নেই। এ পর্যায়ে বিজ্ঞান একটা কথাও বলতে পারে না।

যে লোক শুধুমাত্র বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসী, বিজ্ঞান বহির্ভুত জিনিসের প্রতি অবিশ্বাসী এবং যে লোক কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক নিয়ম-বিধানকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে ও তার বিপরীতকে অস্বীকার করে, সে হয়ত বলতে পারে, আমি বিশ্বলোকের 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্তকার সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারি। এমতাবস্থায় সে হয়ত 'যন্ত্র' বা কার্যের ব্যাখ্যা দিতে পারবে; কিন্তু যন্ত্র চালক বা কারণের

কোনো ব্যাখ্যা দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে হয়ত জীবনের ক্রমবিকাশ ও ক্রম-অগ্রগতির বিশ্লেষণ করতে পারবে, কিন্তু বিশ্বলোকের প্রথম অস্তিত্ব লাভের কোনো কারণ দর্শানো তার সাধ্যে কুলোবে না। আমি আছি, জগত আছে এবং কি ভাবে ও কি অবস্থায় আমি আছি ও জগত আছে, তা বলা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে; কিন্তু আমি কেন, কেন এই বিশ্বলোক, এর জবাব তার জানা নেই। একজন বালক যখন বলে আমি জানি না, তার অর্থ এই নেয়া যেতে পারে যে, বর্তমানে জানা না থাকলেও সে জানবার ইচ্ছা রাখে। উক্ত লোকের কথাকেও এই পর্যায়ে ধরা যেতে পারে।

কিন্তু যারা প্রথম কার্যকারণকেই অস্বীকার করে, যে প্রজ্ঞা বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করছে তাকে যে স্বীকার করে না, তাদের প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। কেননা তারা বাস্তব জগতে বাস করছে না, স্বপ্নলোকে বিচরণ করা ছাড়া তাদের আর কাজ নেই বলে অনায়াসেই ধরে নেয়া যেতে পারে।

এই বিশ্বেলোক তার অস্তিত্ব দিয়ে আমাদের বিস্ময়বোধকে প্রবৃদ্ধ করছে, এর কোনো বিশ্লেষণ দিতে পারছে না আমাদের বস্তু বিজ্ঞানীরা, জ্যোতিশাস্ত্রবিদরা তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে, সূক্ষ্ম গণিত জ্ঞান ও অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মহাকাশের শক্তি কেন্দ্রে শত-সহস্র মিলিয়ন সংখ্যক গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে অবস্থিত রয়েছে, অথবা আবর্তন সম্পন্ন করেছে। আর মাধ্যাকার্ষণ শক্তি এ সবের মাঝে সুদৃঢ় ভারসাম্য সংস্থাপন করে রেখে এগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হতে দিচ্ছে না। অতঃপর সূর্যের ও গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের ওজন করতে ও সেগুলোর ব্যাস-পরিধি, গতি ও পৃথিবী থেকে সেগুলোর দূরত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছে। এতে করে আমাদের বিস্ময়বোধ কমেনি, বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের জিজ্ঞাসা তীব্র হয়েছে, নিবৃত্ত হয়নি। আমাদের মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে, মাধ্যাকর্ষণ কি ? কিভাবে তা হচ্ছে ও কাজ করছে ? শক্তি কেন্দ্রটা কি, কিভাবে তার উৎপত্তি, কে তার উৎপত্তি দান করল ? এই সূক্ষ্ম জটিল মহাকাশ ব্যবস্থা কিভাবে ও কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করল ? ..... এ এমন জিজ্ঞাসা যা যেমন জটিল, তেমনি অন্তহীন। জ্যোতির্বিদ এসব প্রশ্নের জবাব দিতে সম্পূর্ণ অপরাগ। ভূ-তাত্ত্বিকরা আমাদের জন্য শিলালিপি পাঠের পথ প্রশস্ত করেছে এবং পৃথিবী কত কোটি বছর অতিক্রম করে এসেছে, কতকাল পরে শীতল হয়েছে, তা বলা যেতে পারছে। শিলা-বর্ষের হিসাবে তার উপর দিয়ে কত মিলিয়ন বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, তা হিসাব করা আর অসম্ভব থাকে নি, কিভাবে পানি শুকিয়ে তার বক্ষ দীর্ণ করে ভূ-পৃষ্ঠ জেগে উঠল এবং ভূমিকম্প ও আগ্নেয়উদ্গীরণের কারণ কি, এসবই আজ বলা চলছে। অনুরূপভাবে জীববিজ্ঞানীরা প্রাণীর জীবন ও মনস্তত্ত্ববিদরা মানুষের মানসলোকের তত্ত্ব ও

কার্যকরতা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব উদঘাটন করেছে। কিন্তু তারা যা কিছু বলেছে, তাকে আমের খোসা চোষণই বলা যেতে পারে। সৃষ্টিলোকের অন্তর্নিহিত মৌল রহস্য উদঘাটন তারা করতে পারে নি। তারা এসব আমাদের বিস্ময়বোধকেই বরং অধিকতর বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তাদের নিকট সব প্রশ্নের শেষে বলতে হয়, তোমরা এ বিস্ময়ভরা বিশ্ব গ্রন্থখানির কিছু কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছ, আর অধিকাংশ বিষয়েই তোমরা চরম অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কথা স্বীকার করে নিয়েছ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই গ্রন্থখানি কি আপনা-আপনি রচিত ও গ্রন্থিত হয়েছে, না এর রচয়িতা ও গ্রন্থকার কেউ আছে ? এই বিশ্বলোক কি এমন একটা ব্যবস্থা ও সংস্থা যার ব্যবস্থাপক ও পরিচালক কেউ নেই ? এটা কি এমনই এক উদ্ভাবন, যার উদগাতা কেউ নেই ? এই জগতে প্রাণের সঞ্চার করল কে, কে দিল জীবদেহে এই সদা-সক্রিয় চলৎ-শক্তি ? কোন প্রজ্ঞা বিশ্বলোকের এই বিশাল ও ব্যাপ্তিহীন কারখানা পরিচালনা করছে ?

প্রথম উন্মেষ এবং ক্রমবিকাশতত্ত্ব কোনো উদ্‌গাতার সন্ধান দেয় না, উদ্‌গাতা সম্পর্কিত প্রশ্নের কোনো জবাবই তাতে নেই। এ তত্ত্বের বিশ্লেষণে বিশ্বলোকের গভীর ঐক্য ও একত্বতা জানা গেছে, জানা গেছে এর উৎসের অভিন্নতার কথা। বিশ্ব রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলে, তার ঐক্য ও একত্বের এবং তার ক্রমবিকাশ ও ব্যবস্থাপনা সংস্থার অভিন্নতার কথা প্রকাশিত হলে মানুষের বিস্ময়বোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মানুষ এ পর্যন্ত যত চিন্তা-গবেষণাই চালাবে, যত জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা রাখবে এবং তার জবাব খুঁজে বের করবে, ততই তার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে বসবে, এক আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনই এই বিস্ময় ভরা বিশ্বের প্রথম কার্যকারণ, এর ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সংশয়মুক্ত নয়

পূর্বোদ্ধৃত কথাগুলোর জবাবে আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, বিজ্ঞানের জ্ঞান ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ সংশয়মুক্ত নয়। লোকেরা বিজ্ঞান সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, তার মূলে উচ্ছ্বসিত আবেগের ফেনার তলায় বস্তুর অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত শতকরা একশভাগই দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে না। তার প্রায় সিদ্ধান্তেই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সন্দেহ হয় তার কথার ধরনেঃ হয়ত এরূপ হয়েছে; কিংবা এরূপ থাকবে, ইত্যাদি। তার কারণও রয়েছে। আর সেই কারণ হলো, বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষা বহিরেন্দ্রিয় ও ভিতরেন্দ্রিয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর মানুষের এসব ইন্দ্রিয় প্রায়ই ধোঁকা দিয়ে থাকে মানুষকে। এটা কোনো উড়ো বা চলতি কথা নয়। বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা নিজেরাই একথা স্বীকার করেছে।

বস্তুত বিজ্ঞান বাস্তব পরীক্ষালবদ্ধ জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য। তা সত্ত্বেও এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালের মানুষের নিজস্ব চিন্তা-রুচি ও দৃষ্টিকোণের বিরাট প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে তার সিদ্ধান্তের উপর— সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর। বস্তুর পর্যবেক্ষণ, তার গুণাগুণ বিচার ও তা থেকে ফলাফল গ্রহণের সূক্ষ্মদর্শিতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, তা বস্তু-বিজ্ঞানে সম্ভব হলেও মানব সংক্রান্ত বিষয়াদিতে অনেক সময়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্ত বস্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়, মানব-সংক্রান্ত বিষয়াদিতে নয়। কেননা বিজ্ঞানের বিচরণ বস্তুর পরিমাণ ও গুণগত সীমার মধ্যে বন্দী। তা শুরুও হয় সম্ভাব্যতা নিয়ে এবং তার শেষও হয় সম্ভাব্যতা সহ। ফলে এতে দৃঢ় প্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটতে পারে না কোনো এক পর্যায়েও। ফলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা অনেক বেশি। তার কাজ চলে প্রায়ই নিছক ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে। আর ফলাফল ও সিদ্ধান্ত নিতান্তই উজ্‌তিহাদ Inference পর্যায়ের। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেমন এদিক ওদিক হয়ে যাওয়া সম্ভব, তেমনি একটি প্রতিজ্ঞাকে তার সঙ্গে সংশ্রবহীন অপর এক প্রতিজ্ঞার সাথে যোগ করে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়াও বিরল ঘটনা নয়। বিরল ঘটনা নয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণের কিছু অংশ বাদ দেয়া বা কিছু অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা। যার ফলে অনিবার্যভাবে বিপরীত সিদ্ধান্ত হয়ে যায় অতি স্বাভাবিক নিয়মে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, বৈজ্ঞানিকদের অনেক সিদ্ধান্ত এমন, যা এককালে 'বৈজ্ঞানিক একমাত্র সত্য' রূপে সাধারণ্যে গৃহীত ছিল এবং যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ আছে বলে মনে করা হতো না। তার উপর দিয়ে আকাশমণ্ডলের অনেক আবর্তন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, পরবর্তীকালে তাতেই দেখা দিয়েছে অনেক ভুল, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনেক ভ্রান্তি। যে সব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সে সিদ্ধান্ত অতীতে এক সময়ে গৃহীত হয়েছিল, উত্তরকালে সে যুক্তি আর যুক্তি বলে গ্রহণ করা হয় না, সে প্রমাণ আর প্রমাণ পর্যায়ে গণ্য হওয়ার যোগ্য থাকেনি।

শুধু তাই নয়, অনেক মৌলিক বিজ্ঞান এককালে যে ভিত্তি গ্রহণ করেছিল উত্তরকালে সে ভিত্তি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নবতর ভিত্তি গ্রহণ করেছে, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি বদলে গেছে, এমন দৃষ্টান্তেরও কোনো অভাব নেই— বিশেষ করে বর্তমান বিশ শতকের এই যুগের বিজ্ঞানে।

লোকেরা দ্বীন ও ঈমানের মৌল মূল্যমানের পরিবর্তে বিজ্ঞানকে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর এই বিজ্ঞান বিগত শতক পর্যন্ত দুটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল। একটি ছিল 'ফিজিয়া' Physia আর দ্বিতীয়টি 'লজিক' Logic, এ

দুটি ভিত্তির উপরই পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমান শতকে এ দুটি ভিত্তি আত্মহত্যা করেছে, নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস সাধন করেছে। বিগত পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে 'লজিক' তার রূপ পরিবর্তন করেছে। 'ফিজিয়া'ও পুরাতন রূপ ত্যাগ করেছে। এখনকার বিজ্ঞানীদের মত হলো সভ্যতার জননী হচ্ছে দারিদ্র। দারিদ্রাবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করে সভ্যতার শিশু। কিন্তু এ ব্যাপারে তার নিজের প্রতিই রয়েছে সংশয়। কেবল সংশয় দূর করে দিলেই সভ্যতা মরতে পারে না। বরং তার বিপরীত, সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটে আকীদা বিশ্বাসের স্থবিরতা ও জড়ত্বে। এর যে কোনো মতের দৃষ্টিতেই বিচার করা হোক, পাশ্চাত্যের মনঃপূত সভ্যতার রূপ শুকিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে।

প্রকৃত বিজ্ঞান ঈমান প্রবর্ধক

এ পর্যায়ে তৃতীয় কথা হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ঈমানের সতীন নয়, নয় ঈমানের শত্রু, নয় ঈমানের পরিপন্থী। বরং সত্যি কথা এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে, উদ্বুদ্ধ করে। বহু পারদর্শী ও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীই তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণার ফলেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন যে, এই বিশ্বলোকের অন্তরালে এক মহাশক্তির অবস্থিতি বিদ্যমান, যিনি এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা করছেন ও প্রতি মুহূর্তে এর নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রাণীর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণ ও হিসাবে ভারসাম্য রক্ষা করেই বর্ষণ করছেন তাঁর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ। সমগ্র সৃষ্টিলোকে যে পারস্পরিক সম্পর্ক, পারম্পর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও অত্যুজ্জ্বল বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে এই পৃথিবী। প্রত্যেকটি জীব-কোষে তিনিই জীবন সৃষ্টি করেন, প্রতিটি অণুকণা তাঁরই অনুগ্রহে বর্তমান। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত্র-দিনের সুনিয়ন্ত্রিত আবর্তন, নদী-সমুদ্রে মানুষের কল্যাণবহ দ্রব্যাদিসহ ভাসমান-চলমান নৌকা-জাহাজ, বৃষ্টি বর্ষণে মৃত জমিনের পুনরুজ্জীবন লাভ এবং তাতে গাছপালা, গুল্মলতা ও ঘাষের উৎপাদন, পৃথিবীর বুকে চলমান জীব ও জন্তু, বাতাসের প্রবাহ ও দিক পরিবর্তন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যলোকে ভাসমান মেঘপুঞ্জে এক আল্লাহ্‌র শাশ্বত অস্তিত্ব ও সদা সক্রিয় অশেষ শক্তি ও ক্ষমতার অকাট্য নিদর্শন নিহিত রয়েছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র বা গণিত বিদ্যা ও জীবতত্ত্বের বহু বিজ্ঞানীর লেখনীতে স্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রাসূলের সত্যতাকে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় এ কথা সব সমঝদার মানুষের কাছেই স্পষ্ট যে, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার এবং দ্বীন ও রাসূলের সত্যতা অবিশ্বাস করতে চায়, তারা আসলে হাওয়াই কথা বলে। তাদের এ পর্যায়ের কোনো কথার মূলেই একবিন্দু সত্য নিহিত নেই।

যেসব লোক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে দ্বীন ও ধর্মের প্রতি অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, কিংবা জীবন, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে ধর্মের স্পর্শ মুক্ত করে রাখতে বদ্ধপরিকর, তারা আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঊনবিংশ কিংবা অষ্টাদশ শতকে বাস করে। তাদের জ্ঞান এ শতকের নবতর আলোক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। বিংশ শতকের এ বছরগুলো চিন্তা-মননশীলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অবদান রেখেছে, এবং তার ফলে মানুষ প্রজ্ঞার যে বিকাশ ঘটেছে তারা সে বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। ফলে তারাই বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তাদের এই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা আধুনিক দৃষ্টিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চরম অন্ধত্ব স্থবিরতা ও জড়ত্বের সৃষ্টি করেছে। তার কারণ, তারা এ যুগেও যে-সব মত পোষণ করছে, তা নিতান্তই পুরাতন হয়ে গেছে। বিজ্ঞান ইতিহাসের যে পৃষ্ঠায় তারা আটকে গেছে, বিজ্ঞানের দ্রুত তীব্র অগ্রগতি সে পৃষ্ঠাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। সে যুগের গন্ধ উবে গেছে, সে যুগের বিজ্ঞান বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে। কাজেই এ যুগের বিজ্ঞানীরা কি বলে, তা কান পেতে তাদের শোনা উচিত।

বস্তুত বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা যত বেশি অগ্রসর ও সম্প্রসারিত হচ্ছে, মহান শাশ্বত সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তি তত বেশি অকাট্য রূপ পরিগ্রহ করছে। আল্লাহ্‌র শক্তির কোনো সীমাও নেই, শেষও নেই। জীব-বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতিশাস্ত্রবিশারদ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের চিন্তা-গবেষণা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করণে এবং তার মহানত্ব ও বিরাটত্বের বিশ্লেষণে যুক্তির মান অনেক বেশি উন্নত হয়েছে।

বিজ্ঞান কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পরিপন্থী। কিন্তু বিজ্ঞান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বা ধর্মের সত্যতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। প্রাচীন জীববিজ্ঞান বা প্রকৃতি বিজ্ঞানে নাস্তিক্যবাদের ভাবধারা প্রবল। কিন্তু সে সব প্রাথমিক ও অপরিপক্ক তত্ত্বও তথ্যভিত্তিক। আধুনিক বিজ্ঞান সে বাহ্যিক স্তর ভেদ করে প্রকৃত সত্যের সূক্ষ্মতর গভীরতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বিজ্ঞানের দেহ থেকে নাস্তিক্যবাদের বা ধর্ম অস্বীকৃতির কিংবা এ কালের ধর্ম এড়ানোর ভুত বিতাড়িত হয়ে গেছে। এখনকার বিজ্ঞান এ অন্ধত্বের ভুতের কু-প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এখনকার বিজ্ঞান প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বা প্রাণীবিদ্যা— কোনোটিই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, কোনোটিই ধর্মবিরোধী নয়, কোনোটিই নয় ধর্ম এড়িয়ে চলার ও ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজ ও সভ্যতা পরিচালনার পক্ষে। এখনকার প্রকৃতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন শুধু মৌলিক উপাদানের সংযোজন-বিশ্লেষণেরই অধ্যয়ন নয়, তার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের বিস্ময়কর

তৎপরতারও অধ্যয়ন। পূর্বের অধ্যয়ন ছিল অন্ধ উপাসনা পর্যায়ের। কিন্তু এখনকার অধ্যয়ন কর্মের বিপুল প্রেরণার উৎস। এ অধ্যয়ন অযথা সময়ের অবক্ষয় নয়। এ হচ্ছে সময় চিন্তা ও কর্মের ফলপ্রসূ ব্যবহার।

আধুনিক বিজ্ঞান পানির এক বিস্ময়কর জগতের পরম সত্যের সাথে মানুষকে পরিচিত করেছে। এক বিশেষ অনুপাতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে পানির উৎপত্তি। কিন্তু অনুপাতে পার্থক্য ও তারতম্য ঘটে গেলে তখন পানি হবে না, সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক বস্তু তৈরী হবে। এতে করেও আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও যুক্তিশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, তাঁর জ্ঞান প্রকৃতির জগত সংক্রান্ত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা তার চাইতেও অনেক বেশি প্রশস্ত, অনেক বিরাট ও বিশাল এবং অনেক শক্তিশালী। যে জগতে এক ফোঁটা পানিই শুধু দৃশ্য, সে জগত থেকে এ জগত অনেক উচ্চ ও বিরাট, অসীম। একখণ্ড শিলা যদি কেউ ধরে দেখে, তাহলে তাতে এক বিস্ময়কর ত্রিকোণ বিদ্যার বা জ্যামিতির এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্তু দেখতে পাবে। আর তা দেখে তার স্রষ্টার বিস্ময়কর সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণও পাওয়া যাবে, দেখা যাবে সূক্ষ্ম সৃজনশক্তির অপূর্ব কীর্তি এবং তা সেই জগত ও বিদ্যা থেকে ভিন্নতর, উন্নততর, যেখানে শিলাকে 'এক ফোটা' জমাট বাঁধা বৃষ্টি-পানি বলে মনে করা হয়।

বস্তু-বিজ্ঞানীদের নির্বুদ্ধিতাজনিত উক্তি হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছি না বলে তাঁকে বিশ্বাসও করি না। কেননা যা দেখা যায় না, তা বিশ্বাস করা অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যা দেখা যায় না, তা কি বিজ্ঞানীরা আদৌ বিশ্বাস করে না ? কত লক্ষ্য ধরনের জিনিস রয়েছে যা মানুষ বা বিজ্ঞানীরা সকলেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। বিশ্বাস করে নিচ্ছে এজন্য যে, তাছাড়া এক কদমও অগ্রসর হওয়া যায় না, এক মিনিটও বাঁচা যায় না এই পৃথিবীতে। একটা ফল বৃন্তচ্যুত হয়ে যখন মাটিতে পড়ে, তখন সকলেই বলবে এ মাধ্যাকর্ষণের কীর্তি। অথচ সে মধ্যাকর্ষণের বস্তুসত্তা কারোই নজরে পড়েনি। ইথার কেউ দেখতে পায়নি বলে আমার কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হতে কোনোরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। সকলেই একবাক্যে বলবে, শব্দ তড়িৎ বেগে ওষ্ঠাধর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইথারের স্কন্ধে ভর করে কানের পর্দায় আঘাত হানছে। এসব না দেখেও যদি বিশ্বাস করা যায়— কারোই একবিন্দু অবিশ্বাস নেই এর প্রতি। তাহলে আল্লাহ্‌কে না দেখেও বিশ্বাস করা যাবে না কেন— এই বিশাল পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, চোখের সামনে ভাসমান থাকা সত্ত্বেও ? আমরা এমন কালে বাস করছি যখন পৃথিবী খোলস বদলিয়েছে এবং ইথার-এর বস্তুগত ব্যাখ্যা দেয়া চলে না, তার বিশ্লেষণের শেষ পর্যন্ত এমন জিনিস সামনে আসে, যা আর যাই হোক, 'বস্তু' নয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক প্রকাশ ও উৎকর্ষে সবচাইতে বেশি উল্লসিত হবে দুনিয়ার আল্লাহ বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষেরা। কেননা এখনকার প্রকৃতি বিজ্ঞান আল্লাহ্‌হীন নয়, তার গতি প্রকৃতিও নয় আল্লাহ্‌হীনতার দিকে। আর বিশ্ব প্রকৃতি থেকেই যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অতিপ্রাকৃতিক Super natural or spiritual সত্তার অকাট্য স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়, তখন প্রতিজ্ঞার তুলনায় সিদ্ধান্ত অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। এজন্য আমরা অনায়াসেই গৌরব বোধ করতে পারি। কেননা প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা দ্বীন ও ধর্মের পক্ষে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও উচ্চতর পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করার অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ এই সুযোগ আমাদের বাপ-দাদা, পূর্ব পুরুষদের ভাগ্যে জোটেনি। তাই আমাদের বিশ্বাস, এ কালের বিজ্ঞানী দ্বীন ও ধর্মের অনুকূলে বিরাট অবদান রাখছে। এখানকার মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর বিরাট-বিশাল সাম্রাজ্য, সদাবর্ধমান তাঁর অফুরন্ত অসীম রহমতের কথা অধিক গভীর ও সূক্ষ্মভাবে জানতে, বুঝতে ও অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছে এই বিজ্ঞানের আলোকে। আমরা যদি বলি, এখনকার বিজ্ঞান মানুষের জন্য দ্বীন ও ধর্মের দিক দিয়ে নতুন আকাশমণ্ডল উচ্চতর মান ও নবতর জমিন তৈরী করে দিয়েছে, তাহলে একটুও মিথ্যা বলা হবে না। আজকের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় না এনে কোনো স্বস্তিই পাচ্ছে না, এটা খুব ছোট কথা নয়। ফলে একালে বড় বড় বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত এমন সব মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করছে, যার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই মানুষকে আল্লাহ বিশ্বাসের শাশ্বত আদর্শের দিকে পথ-প্রদর্শন করছে, তার ভিত্তিতে ও আদর্শে নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জ্ঞানকে গড়ে তুলবার ও জীবনকে উন্নত করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করছে।

এই পর্যায়ে দুখানি বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তার একখানি লিখেছেন ক্রেসী মরিসোন। তিনি নিউইয়র্ক বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যালোচনা কেন্দ্রের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য এবং একালের মহা বিশ্ববিজ্ঞানের একজন দিকপাল। তার বইর নাম ঃ Man Cannot Live Alone এবং এ বই তিনি লিখেছেন জুলিয়ান হাক্সলির নাস্তিকতাবাদী গ্রন্থ Man can live alone এর জবাব ও প্রতিবাদ স্বরূপ।

আর দ্বিতীয় বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে ঃ The Evidence of God in An Expanding Universe গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন John Clever Monsma এবং তাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় চল্লিশজন পণ্ডিত ও মনীষী নিজ নিজ বিজ্ঞানগত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে মেনে চলার বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা প্রমাণ করে যে প্রবন্ধাবলী রচনা করেছেন, তাই সংকলিত হয়েছে।

এ ছাড়া খোদ ইংরেজী ভাষায়ই এই পর্যায়ে আরও বহু বৈজ্ঞানিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বহু প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

আমরা এই গ্রন্থের পাঠক সুধীমণ্ডলির আশু দৃষ্টি এই গ্রন্থাবলীর দিকে আকর্ষণ করছি। বর্তমান কালের কিছু লোক মনে করতে শুরু করেছে যে, মানুষের জন্য দ্বীন বা ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই, আল্লাহ বিশ্বাস ও ধর্মপালন ব্যতীতও মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে, এই কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, অমূলক ধারণা ও আত্ম-প্রতারণার শামিল, তা এ সব গ্রন্থ পাঠ করলে স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যাবে।

আর এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মানুষ এখন পর্যন্তও বিজ্ঞানের সাহায্যে যা কিছু অর্জন করেছে তা যে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং তা যে একটা বিরাট ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা সুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের নিকটই স্পষ্ট।

মানসিক ও বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতার ধোঁকা

ধর্ম পরিহার করে চললে মানুষের মন-মানসিকতা ও বিবেক-বুদ্ধি সুস্থ থাকে বলে যে এক শ্রেণীর অর্বাচীন মনে করতে শুরু করেছে এবং তারা নিজেকে ধর্ম-বিবর্জিত মনে করে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, তা যে একেবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন, তা বাস্তব ঘটনাবলী থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্যের বর্তমান বস্তু ও যন্ত্র সভ্যতার ক্ষেত্রে চাকচিক্যময় ও চোখ ঝলসানো যা কিছু দেখা যায়, তাও এ কথার সত্যতা অস্বীকার করে। লোকদের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ জ্ঞান এবং প্রকৌশলী অগ্রগতিই যে মানুষের সঠিক কল্যাণের একমাত্র নেয়ামক নয়, তা পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাবিদরা অকপটে স্বীকার করছেন। বস্তুত বর্তমানের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগত এক বিশেষ ধরনের মানসিক ও বিবেক-বুদ্ধির অসুস্থতাজনিত কঠিন রোগে আক্রান্ত যে, তার রাত্র নিদ্রাহীন ও দিন বিশ্রামহীন হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এ অবস্থা দেখে বিপদের সংকেত দিতে শুরু করেছে বহু বছর আগে থেকেই। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মনীষী এবং সাহিত্যিক-চিন্তাবিদরা পূর্ব থেকেই এজন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেছে। তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক দার্শনিক মিঃ টয়েনবি (Toyenbee) বিশেষভাবে উল্লেখ। এ পর্যায়ে তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে একটি অংশের সারমর্ম এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

শিল্পের বিভিন্ন প্রকাশ ও উৎকর্ষতা মানুষকে চরমভাবে প্রতারিত করছে। তারা তাদের পুরাতন প্রদীপকে নতুন প্রদীপের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়ে তাদের

নেতৃত্ব তার হাতে তুলে দিচ্ছে। এরা আসলে মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে গেছে। ফলে তারা নিজেদের বিবেক ও আত্মাকে বিক্রয় করে তার পরিবর্তে ছায়াছবি ও রেডিও গ্রহণ করছে। ফলে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় সংঘটিত হচ্ছে। যা তাদের আত্মাকে হাত থাবড়ি দিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে রাখছে। প্লেটো একেই বলেছেন শূকরের আখড়া। আর ডস্ হাক্সলি বলেছেন 'আহাম্মকের নতুন জগত।'

ঐতিহাসিক টয়েনবি দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অর্থনীতির দিক থেকে দ্বীন ও ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া এ চরম দুরবস্থা থেকে পাশ্চাত্য জগতের মুক্তি ও নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য এ প্রত্যাবর্তন কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে তা তিনি বলতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, পাশ্চাত্য জগত দ্বীন ও ধর্ম পালনের সাহায্যে এমন এক আত্মিক শক্তি লাভ করতে পারে, যা পাশ্চাত্য শিল্প যান্ত্রিকতা তাদের যে বস্তুশক্তির ধারক বানিয়েছে তার ধ্বংসকারিতা থেকে তাদের নিরাপত্তা দান করবে। বস্তু বিধ্বংস রূপ মানবাত্মা কি করে দমন করতে পারে, এ পর্যায়ে একজনের জিজ্ঞাসার জবাবে মিঃ টয়েনবি এ কথা বলেছিলেন এবং তিনি যে যথার্থ কথাই বলেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ কালের আর এজন চিন্তাবিদ দার্শনিক বলেছেন ঃ এ কালের মানুষকে বুদ্ধিবাদের উন্মত্ততা চরমভাবে প্রতারিত করেছে। তাদের আত্মাকে পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ থেকে বিরত রাখছে, যে জীবনটা মনের গভীরতর ভাবধারার সাথে পুরোপুরিভাবে সংগতিপূর্ণ হতে পারত। আজকের মানুষ একদিকে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিজের মনের সাথে কঠিন দ্বন্দ্বে লিপ্ত, অপর দিকে বাস্তব রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে লিপ্ত অন্যদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। সে নিজেকে তার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে পারছে না। ধন-সম্পদের মায়া ভালোবাসায় তার মন পাগলপ্রায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে তার নিজের সত্তাকে তিল তিল করে ক্ষয় করছে, হত্যা করছে। আর তার ফলে তার জীবন হয়ে উঠছে ক্লিষ্ট, ক্লেদাক্ত এবং জর্জরিত। সে চলমান দুনিয়ার নিত্যকার ঘটনাবলীর মধ্যে বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রলোভনে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়েছে যে, সে তার নিজের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। এ অবক্ষয় তার বস্তুবাদী দর্শনের অবদান। আর এ এমন একটি কলংক, যা তার কর্মস্পৃহাকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত অপদস্থ করে ছেড়েছে। ইউলিয়ম হাক্সলি তা বুঝতে পেরে এ অবস্থার প্রতি অসন্তোষ ও আক্রোশ প্রকাশ করেছেন।

এ্যালিক্সি কারেল Alexi Karel একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় তাঁর গবেষণা কক্ষে নানা জটিল বিষয়ের পরীক্ষা

নিরীক্ষার কাজে অতিবাহিত করেছেন। তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুস্থ চিন্তাধারায় একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি তিনি তাঁর Man the Unknown গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থের একস্থানে তিনি বলেছেন ঃ

> এটা সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একালে বিবেক-বুদ্ধি সংক্রান্ত রোগের সংখ্যা অন্যান্য সব রকমের রোগের সামষ্টিক সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। ফলে এসব রোগের হাসপাতালগুলো চিকিৎসার্থে আগমনকারীদের ও ভর্তি হওয়ার লোকদের দেখে চিৎকার করছে এবং যাদের চিকিৎসার্থে আশ্রয় দান ও সংরক্ষণ একান্তই কর্তব্য তাদের অভ্যর্থনা জানাতে অক্ষমতা প্রকাশ করছে। এস, ও, বেরস বলছেন, নিউইয়র্ক শহরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি ২২ জনের মধ্যে একজনকে পাগল চিকিৎসার হাসপাতালে অনতিবিলম্বে ভর্তি করা একান্ত আবশ্যক।

যুক্তরাজ্যের হাসপাতালগুলোতে পাগল রোগের চিকিৎসার পর যারা ছাড়া পেয়ে বের হয়ে যায়, তাদের অন্তত আটগুণ বেশি লোক হাসপাতালে চিকিৎসার্থে ভর্তি হয়। এ ধরনের পাগল চিকিৎসার হাসপাতাল ও অন্যান্য ক্লিনিকে প্রতি বছর প্রায় ৮৬ হাজার লোক ভর্তি হয়ে থাকে। এভাবে যদি এ পর্যায়ে রোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে আজ হোক কাল হোক সব রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী সব শিশু ও যুবককে এ সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি গ্রহণ করতে হবে।

১৯৩২ সনে সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা প্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা ছিল ৩,৪০,০৯০ জন পাগল। এছাড়া অন্যান্য বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্য নিকেতনে পাগল রোগের রোগীদের সংখ্যা ছিল ৮১,৫৮০। আর সৌজন্যমূলকভাবে ছেড়ে দেয়া লোকদের সংখ্যা ছিল ১০, ৯৩০ জন। এ ছাড়া অন্যান্য বিশেষ ধরনের ক্লিনিকে চিকিৎসিত লোকদের সংখ্যা এর মধ্যে গণ্য করা হয়নি। এদের ছাড়াও বিভিন্ন শহরের এই পাগল রোগে আক্রান্ত লোকদের মোট সংখ্যা রয়েছে ৫,০০,০০০ জন। অনুসন্ধান পরিদপ্তরের তদন্তে জানা গেছে, দেশের অন্তত ৪,০০,০০০ শিশু অত্যন্ত নিম্নমানের মেধাসম্পন্ন। ফলে সাধারণ শিক্ষালয়ে এরা বেশি দিন লেখাপড়া করতে পারে না। যা কিছু তারা শেখে, তা নিজেদের জীবনে কোনো কাজে লাগাতে পারে না। আর আসল কথা হলো, জ্ঞান ও বিবেকের সুস্থ মান থেকে পতিত লোকদের প্রকৃত সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশি। এ ছাড়া হিসাবে ধরা হয়নি এমন মানসিক রোগাক্রান্ত লোকদের সংখ্যা বহু লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ সব পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে

মানবতা ধ্বংসের মুখে সমুপস্থিত। উপরন্তু সেসব দেশের মানুষ বর্তমানে যে কঠিন মানসিক রোগে তিল তিল করে ক্ষয় হচ্ছে, তা এক সর্বগ্রাসী মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কেননা মানসিক রোগ মূলতই অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির পূর্বাভাস। এ রোগ ক্ষয় টিউবার ক্লিউয়াস, যক্ষ্মা ও হৃদয়োগ প্রভৃতির তুলনায় অনেক মারাত্মক। কলেরা, প্লেগ ও মহামারীর চাইতেও কঠিন ও সংক্রাক। কাজেই মানসিক রোগের যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করা কর্তব্য। শুধু এ জন্য নয় যে, তা অপরাধপ্রবণতা তীব্র ও অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, বরং এ জন্যও যে, তা করা না হলে বর্তমান দুনিয়ায় শ্বেতাংগরা যে জাতীয় সুখ-সমৃদ্ধি উপভোগ করছে তা থেকে তাদের চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া অবধারিত।

বস্তুত যে সভ্যতা এক-একটা সমাজে এত বেশি সংখ্যক পাগল ও মানসিক রোগীর উদ্ভব করেছে সে সভ্যতার প্রভাব-প্রতিপত্তি যতই ব্যাপক হোক, তার সূর্য অস্ত যেতে খুব বিলম্ব আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। এ সভ্যতায় কোনো লোকই সুস্থ নয়, তা এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, সেখানকার কবি-সাহিত্যিকরাও— যারা সমাজের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবান ও শীর্ষস্থানীয় তারাও বিবিধ মানসিক রোগে আক্রান্ত। আমেরিকার পুলিশ একবার সেখানকার সাহিত্য সমিতির দশজন সদস্যকে গ্রেফতার করে। তার কারণ তাদের শিল্পগত কোনো অপরাধ ছিল না, বরং আফিম সেবনই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ। এই মাদক দ্রব্য সেবন থেকে তাদের বিরত রাখাই ছিল এই গ্রেফতারের মূল উদ্দেশ্য। এই সময় ইউলিয়াম রোরাক নামক একজন সাহিত্যিক গ্রেফতারীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন এই বলে ঃ

> জীবনের স্বাদ তিক্ত কটু। আর মানুষ এক চিরন্তন দুঃখে নিপতিত, কিন্তু এ রোগ নতুন করে লেগে যাওয়া থেকে পালিয়ে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে শুভ স্বপ্নে বিভোর হওয়ার ও সুস্বাদু আলস্যের কোলে ঢলে পড়া।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বর্ণহরিণ

বস্তুবাদী নাস্তিক্যবাদী চিন্তাবিদরা দাবি করছে, ধর্ম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এবং অদৃশ্য জগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বর্ণহরিণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এর জবাবে আমরা বলতে চাই, স্বাধীনতার অর্থ যদি কামনা-লালসার যথেচ্ছ ও নির্বিরোধ চরিতার্থতা এবং ব্যক্তি স্বার্থের বেদীমূলে মানবতার সব সুকুমার বৃত্তিকে নির্লজ্জভাবে বলিদান বোঝায়, দীর্ঘ ইতিহাসের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক মূল্যমানকে ঘৃণাভরে পদদলিত করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ এমন একটা মহামূল্য জিনিস নয়, যে জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা

চলানো বা কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হতে পারে। এ কোনো লোভনীয় বস্তুও নয়, যার জন্য মানুষের সমস্ত অমূল্য ধন জলাঞ্জলি দিতে হবে। বরং এ তো মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি, সেরা সৃষ্টি মানুষের মনুষ্যত্বের চরমতম অবমাননা এবং মানব সমাজকে আনবিক বোমা মেরে ধ্বংস করার চাইতেও অধিক মারাত্মক অপরাধ। এজন্য সোজাসুজি কর্মনীতি তো এই হতে পারে যে, সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে মহাসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে যে, অতঃপর তারা আর মানুষ থাকবে না। এখন থেকে তারা শিয়াল-কুকুর-হায়েনা পর্যায়ের জন্তু হয়ে যাবে।

দ্বীন ও ধর্ম মানুষের উপর যেসব নিয়ম-নীতি ও দায়িত্ব কর্তব্যের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, তদ্দ্বারা মানুষকে কোনোরূপ অনাহুত কষ্ট দেয়া বা অকারণ বঞ্চিত করা উদ্দেশ্য নয় কখনো। বরং সেসবের একমাত্র লক্ষ্য হলো, মানুষকে পাশবিকতার হীনতা-নীচতা থেকে উন্নত মানবতার পর্যায়ে উন্নীত করা। মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে দুটি প্রকৃতি বিদ্যমান। একটি আসমানী আর একটি পার্থিব। মানুষ তার দ্বীন পালনের সাহায্যেই পার্থিব প্রকৃতির হীনতা-নীচতা থেকে মুক্তি লাভ করে অপার্থিব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। মানুষ যদি এ অপার্থিব বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব ধর্ম পালনের সাহায্যে অর্জন না করে, তাহলে তাকে অনিবার্যভাবে নিম্নতা, হীনতা, নীচতা ও পাশবিকতার পংকিল কদর্যতায় নিমজ্জিত হতে হবে। সে কারণেই দ্বীন ও ধর্ম পালন করা— তার ভিত্তিতেই জীবন যাপন করা মানুষের পক্ষে একান্তই কর্তব্য। তা হলেই তার নির্মল, নিষ্কলংক, পবিত্র, স্বচ্ছ আত্মা তার দেহের কদর্য ভার বহন থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি বিজয়ী হতে পারে তার পাশবিক লালসা ও হিংস্রতার উপর।

এরূপ বিজয় লাভের ফলেই মানব সত্তা তার নিজস্ব ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব সহ জীবনের গভীরতর স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। আর এ স্বাদ আস্বাদন লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার যথেচ্ছ বিচরণজনিত স্বাদ আস্বাদনের তুলনায় অধিক সুস্বাদু যেমন, তেমনি অধিক কাল স্থায়ী ও মানবতার মান-মর্যাদা ও শান্তি-নিরাপত্তার দৃষ্টিতেও অনেক বেশি মূল্যবান। লাগাম ছাড়া স্বাদ আস্বাদন তো মুহূর্তের স্ফুলিংগ। যা নিমিষের মধ্যে জ্বলে উঠে চিরনির্বাণ লাভ করে। তা মরুভূমির বিশাল বুকে ক্ষণিকের জন্য জমে ওঠা বালুকা স্তুপ। বাতাসের যে-কোনো ঝাপটায় তা উড়ে একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়, বিলীন হয়ে যায় মহাশূন্যের অকুল পাথারে।

দ্বীন ও ধর্ম মানুষের উপর যে সব নিয়ম-নীতি পালন কর্তব্য করে দেয়, তার আরও একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে মানুষের সামাজিক-সামষ্টিক জীবন

দ্বীন ও ধর্ম ছাড়া কখনোই সুন্দর ও সুখময় হতে পারে না। মানুষের জীবন এমনি বহু শত বন্ধনে ন্যুজদেহ হয়ে থাকে। আর সে সব বন্ধনের পরস্পরে অহর্নিশ লেগে থাকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। মানুষ কোনো প্রকারের বন্ধনই মানবে না— সর্বপ্রকার বাধ্যবাধকতা থেকেই হবে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরংকুশ, তা স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব। সৃষ্টিলোকের কোনো একটি জীবন কোনো একটি বস্তু ও বিন্দুও কি নিয়ম-নীতি বন্ধন মুক্ত আছে ? নেই। মহাকাশের মহাশূন্যে ঝুলন্ত রয়েছে যে লক্ষ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য, তার প্রত্যেকটিই একটা চিরস্থায়ী নিয়মের কঠিন বন্ধনে বন্দী হয়ে আছে। শহর নগরের বিস্তীর্ণ সড়কে সদা চলমান গাড়ীগুলো পথের বাম বা ডান দিক থেকে চলতে আইনত বাধ্য। বিদ্যুৎ বেগে চলমান গাড়ীগুলো বাধ্য ট্রাফিক পুলিশের বা লালবাতির সিগন্যালে চলৎশক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে। এ হচ্ছে মানুষের গড়া ট্রাফিক আইনের বাধ্যবাধকতা। এগুলো কি অন্যায়ভাবে বা অকারণ চালু করা হয়েছে ? তা মোটেই নয়। এ সব আইন চালু করে গাড়ীগুলো কিংবা গাড়ীর চালক ও আরোহীদের উপর দিয়ে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদের অকল্যাণ কামনাও নেই এর মূলে নিহিত। বরং এ হচ্ছে সামাজিক-সামষ্টিক জীবনের অপরিহার্য দিক। গাড়ী ও মানুষগুলোকে সংঘর্ষের কঠিন আঘাত থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। শহর-নগরের রাজপথগুলোকে যদি সম্পূর্ণ জনশূন্য মনে করা যায়, তাহলেই গাড়ী চালকরা যথেচ্ছ ভাবে যত্রতত্র গাড়ী চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এরূপ মনে করা কেবল পাগলদের পক্ষেই সম্ভব।

এ ধরনের সামাজিক, সামষ্টিক বা নাগরিক আইন ও নিয়ম-বিধান পুংখানুপুংখ পালন করে চলাতেই মানুষের মুক্তি ও নিষ্কৃতি নিহিত। আল্লাহ্র দেয়া দ্বীন ও ধর্মও অনুরূপভাবে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির নেয়ামক ও সংরক্ষক। দ্বীনও মানুষের নির্বিঘ্ন-নিশ্চিন্ত চলার সুস্পষ্ট পথ বেঁধে দিয়েছে মাত্র এবং পথের বাঁকে বাঁকে জ্বালিয়ে রেখেছে লাল বাতির সিগন্যাল। এ হচ্ছে মানুষের স্বচ্ছন্দ গতি পথের শৃঙ্খলা বিধান। মানুষের জীবন পথে যে সব সংঘর্ষ অনিবার্য, যে সব ভুল-ভ্রান্তি মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, তা থেকে রক্ষা করাই দ্বীনের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও ব্যাক্তিতে সমষ্টিতে যে সংঘর্ষের আশংকা, তা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র দেয়া আইন বিধানেরই নাম হচ্ছে দ্বীন। এ দ্বীন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চললেই মানুষ অনিবার্য সংঘর্ষ ও গভীর খাদে নিপতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। অন্যথায় পারস্পরিক সংঘর্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া কিংবা গভীর খাদে পড়ে চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়া অথবা ভ্রান্ত পথে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌছার পরিবর্তে লক্ষ্যস্থল থেকে বহু দূরে চলে গিয়ে জীবনটাকে চূড়ান্ত ব্যর্থতার আঘাতে বিষাক্ত, জর্জরিত করে তোলা

নিতান্তই অবধারিত। দুনিয়ার যেসব ব্যক্তি ও সমাজ বা জাতি আল্লাহ্‌র দেয়া দ্বীনকে অস্বীকার করেছে, নিজেদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রসংস্থা থেকে তা তাড়িয়ে উৎখাত করেছে, তাদের সকলেই এই নির্মম পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে।

মনস্তত্ত্ব বিদ্যা মোটেই যথেষ্ট নয়

এখানে আরও একটি ভুল ধারণার অপনোদন জরুরী হয়ে পড়েছে। কিছু সংখ্যক লোক মনে করতে শুরু করেছে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিদ্যা এ পর্যন্ত যা কিছু উদ্ভাবন করেছে এবং ভবিষ্যতে তার যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, মানব মনের গভীরতর কন্দরে নিহিত যে সব বিস্মৃত তত্ত্ব ও তথ্য লোকদের সামনে পেশ করেছে, যার নাম রাখা হয়েছে Psycho Analysis বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—তা-ই মানুষের মন-মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে এবং সর্বপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সুষ্ঠু সমাধান দিতে সক্ষম। এক কথায়, তা সেই কাজ করতে পারে, যা অতীতকাল থেকে দ্বীন ও ধর্ম করে এসেছে। আর তা করতে পারে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পন্থা ও পদ্ধতিতে। তার সমস্ত কারবার পৃথিবীর বাস্তবতা নিয়ে, অদৃশ্য অলৌকিক বিষয়াদির প্রতি তার নেই কোনো ঔৎসুক্য।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এ অহমিকা চূর্ণ করবার জন্য আমি নিজেকে পেশ করব না, এ জন্য পেশ করব না, কেননা তা হবে ধর্মবিশ্বাসী মনীষীদের অভিমত বা উক্তি, সমালোচনা। কেননা প্রত্যেক পণ্যের ব্যবসায়ী নিজের পণ্যের ব্যাপক প্রচলনের জন্য তার চটকদার বিজ্ঞাপন দেবে এবং অন্যদের পণ্যের দোষ গাইবে, ত্রুটি প্রচার করবে, সে তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এ পর্যায়ে বাস্তবতা ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত বৈজ্ঞানিকদের মতামত অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। এ আলোচনায় সংক্ষেপে কয়েকজন আধুনিক চিন্তাবিদ মনোবিজ্ঞানীর অভিমত উল্লেখ করব। কিন্তু শুরুতেই একটা প্রশ্ন রাখতে চাই, ফ্রয়েডের 'সাইকো এ্যানালাইসিস' বাহ্যত এক সুসংবদ্ধ অত্যাধুনিক বিজ্ঞান বলে মনে হলেও জীব-বিজ্ঞান ও পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের আধুনিক আবিষ্কৃতির আলোকে তার পর্যালোচনা ও যাঁচাই করা হলে তা নিতান্তই অর্থহীন প্রমাণিত হবে। কেননা যে কালে ফ্রয়েড মানব মনকে নিতান্ত কাল্পনিকভাবে চেতনা, অবচেতনা ও অনবচেতনা এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন, তখন মানুষের মগজের গঠন প্রকৃতি এবং তার ক্ষমতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব নাম কা ওয়াস্তের মানে লোকদের আয়ত্ত হয়েছিল। নিশ্চিত, নির্ভুল ও সন্দেহমুক্ত ভাবে তখন কোনো কিছুই জানা ছিল না। বিভিন্ন বিভাগের অস্তিত্ব ও সে সবের কার্যক্রমের স্বরূপ ফ্রয়েড কেবলমাত্র নিজের কল্পনার জোরেই ও অযৌক্তিকভাবে ধরে নিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁর নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ আদপেই ছিল না।

তাই আমেরিকার প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক জোসেফ জেষ্ট্রো। (Joseph Jastrow) তাঁর Freud, his dream and Sex Theories নামের সমালোচনা গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সর্বশেষ বলেছেন ঃ

> আমি এই দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ফ্রয়েডের অবচেতন অনবেচতন নিতান্তই ভিত্তিহীন কল্পনা।

> জন লপ বলেছেন, ফ্রয়েডের অবচেতন ও অনবেচতনের প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

মোট কথা, সর্বাধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে 'মনোবিজ্ঞান' বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কোনোক্রমেই মানুষের জন্য অপরিহার্য দ্বীন বা ধর্মের বিকল্প হতে পার না। ঈমান সত্যভিত্তিক এবং তা এক উচ্চতর মহান সর্বজয়ী শক্তির সাথে সম্পর্কশীল। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এমন একটা প্রয়োজন, যার অপরিহার্যতা আধুনিক বিজ্ঞানও অকপটে স্বীকার করে। মানুষ এই জগতের জীবনে যে-সব কঠিন সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হয়, বিজ্ঞান বলো আর মনোবিজ্ঞান কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কোনোটাই তার সমাধান দিতে পারে না। এ দুনিয়ায় নিত্য এমন সব ঘটনা-দুর্ঘটনা নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ঘটছে, যার বোধগম্য কোনো কারণ থাকে না। আমরা স্বভাবত সে সব ঘটনা-দুর্ঘটনাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আমাদের তক্‌দীর বলে তার ব্যাখ্যা দেই। আল্লাহ্ ও তক্‌দীরের প্রতি ঈমান না থাকলে এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি আমরা তার কোনো তাৎপর্যও খুঁজে পাইনে। মা তার সন্তান হারায়, এ একটি মর্মান্তিক ঘটনা। পিতা বা মাকে হত্যা করে শিশু সন্তানদের জীবিত রাখা হয়; কিংবা শিশু সন্তানদের হত্যা করে পিতা ও মাতাকে জীবিত রাখা হয়। এই সবই দুর্ঘটনা পর্যায়ের ব্যাপার। এ ছাড়া ঝড়-বন্যা, নৌকা বা লঞ্চ-জাহাজডুবি, উড়োজাহাজ ধ্বংস, ভূমিকম্প— এগুলো প্রকৃতির আক্রোশ, তার বাহ্য রূপ যাই হোক। রোগ, মহামারী— যার কোনো চিকিৎসা নেই। এসবই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, চেতনা-অনুভূতি বা দেহের উপর কঠিন আঘাত হানে। কিন্তু মানুষ সে সব থেকে নিজেদের রক্ষ্য করার কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারছে না। এ ছাড়া আমরা চারদিকে দেখতে পাই, কত শত মানুষ হাসপাতালে ও ঘরে কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে, এখানে ওখানে রয়েছে কত পংগু, অপূর্ণাঙ্গ দেহের মানুষ। এ সবই এমন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা যে, তা থেকে মুক্তিদানের কোনো পন্থাই বলে দিতে পারে না আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মানুষের রয়েছে কত শক্তি, দাপট-প্রতাপ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বুদ্ধি ও কৌশল-জ্ঞান, কিন্তু এসব থেকে নিষ্কৃতি লাভের ব্যাপারে তা সবই ব্যর্থ ও নিষ্ফল। কিন্তু যারা এসবে নিমজ্জিত, বিপদে

নিপতিত, তারা এর কষ্ট ও যন্ত্রণা কি করে ভোগ করতে পারে; তারা নিজেদের কি বলে প্রবোধ দেবে ? যদি না তাদের ঈমান থাকে, ঈমানের ব্যাপারে তারা হয় সচেতন ? যেসব ব্যক্তি, শক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বা কৌশল মানুষকে এ চরম দুরবস্থা থেকে মুক্তি দানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে, তাদের সান্ত্বনার একমাত্র পথ পচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্র দিকে ফিরে তাকানো। বিশ্বলোকের অন্তরালে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রয়েছেন, যিনি বিপন্নের ফরিয়াদ শুনতে পান এবং সর্ববিধ বিপদ আপদ থেকে মুক্তি দিতে কেবল তিনিই সক্ষম, এই বিশ্বাস না থাকলে বিপদাপন্ন নিরুপায় মানুষের আর কোনো সান্তনা থাকে না। এ দুনিয়ার সর্বত্র এমন অনেক জিনিসই ছড়িয়ে রয়েছে, এমন সব ঘটনা-দুর্ঘটনা নিত্য ঘটে যাচ্ছে, মানুষের অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মানুষের আয়ত্তাধীন উপায় ও কৌশল তা রোধ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ফলে আমরা সেগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করব এবং এও স্বীকার করব যে, আমরাও সব জিনিস ও ঘটনা-দুর্ঘনার গভীরতর রহস্য অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম— এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই।

তার মানে এ নয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করছি, মানছি না তার অফুরন্ত কল্যাণময় অবদান। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভকে ব্যাপক অর্থেই স্বীকার করি। সেই সঙ্গে স্বীকার করি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ স্বাধীনতা ও যথেচ্ছ বিচরণের অবাধ অধিকার। তবে আমাদের বক্তব্য হলো, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত যে সব তত্ত্ব ও তথ্য আল্লাহ্র দেয়া কিতাবের অনুরূপ অন্তত তার পরিপন্থী নয়, তা আমরা স্বীকারও করব, মানুষের কল্যাণে তা কোনো অবদান থাকলে তার প্রয়োগেও আমাদের কোনো অস্বীকৃতি থাকবে না। কিন্তু যে সবের আদৌ কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যায় না, যেসব তত্ত্ব ও তথ্য আল্লাহ্র কিতাবের পরিপন্থী, তা আমরা মানি না। আমরা উচ্চতর মহান শক্তি আল্লাহ্র প্রতিই ঈমানদার। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে ইতিহাস জানা গেছে এবং জানা গেছে তার বিরাট সাফল্যের বিজয় কাহিনী, তা সামনে রেখে বলতে চাই, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাস্তবিকই কিভাবে কাজ করে, বিজ্ঞান তা আজও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। কিভাবে মানবদেহ নিহিত শক্তি স্পন্দিত হয়, কর্মপ্রেরণা সূচিত ও উৎসারিত হয়, কিভাবে এবং কেন রোগাক্রান্ত হয়, কিভাবে এবং কেন মানবদেহের মৃত্যু সংঘটিত হয়— তার আসল রহস্য এখন পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে। স্বীকার করব, অনেকগুলো রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেকগুলো রোগের ক্ষেত্রে মানুষের অর্জিত জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে গেছে, মানবদেহের কোনো কোনো কাজের ও কার্য পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে— যদিও তা অসম্পূর্ণ এবং মাঝখান থেকে বলতে শুরু করা হয়েছে, মূলকে সামনে বের করে আনা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির অনেক আধুনিকতম ব্যাখ্যাই নির্ভুল নয়। মানব দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যংগের সমস্ত কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির ব্যাখ্যা দান আজও মানুষের ক্ষমতার বাইরে রয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে যে বিরাট রহস্য নিহিত, তার ব্যাখ্যাদানের বুদ্ধি ও প্রতিভা মানুষের নেই। মানুষ কিভাবে সৃষ্ট হলো, কেন মানুষ এ দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করল ? মানুষ এখানে চিরঞ্জীব নয় কেন ? মানুষের মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হয়, কেন মৃত্যু ঘটে ? মৃত্যুর পর কি হয়, এ জীবনের পূর্বে কি অবস্থা ছিল ? ... এসব প্রশ্নের নির্ভুল ও সান্তনা দানকারী জবাব দানে আধুনিকতম জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অক্ষম।

আসলে এসব প্রশ্ন এমন, যা এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের নিকট জবাব বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এ সবের জবাব জানবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করা হয়নি একবিন্দু। কিন্তু কোনো চেষ্টা-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণা সফলতা লাভ করতে পারেনি। আসলে এই সব ক্ষেত্রেই ঈমানের বিষয়ভুক্ত হয়ে রয়েছে এবং চিরকালই তা থাকবে। মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণায় যত উন্নতি ও অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, কোনো দিনই এসব প্রশ্নের জবাব দান বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা মূলত এটা বিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও নয় এটা। মানুষের মন বিবেক ও প্রকৃতি সত্তার কথাই ধরা যাক। এই মন ও বিবেক একটা মহামূল্য সম্পদ। এতে আনবিক শক্তি নিহিত। এ শক্তিই মানুষকে সৌভাগ্যবান বানায়, বানায় হতভাগ্য, দুর্ভাগ্যশীল। এ মনই মানুষকে রোগাক্রান্ত করে, করে মানুষকে রোগমুক্ত। এ মন মানুষকে এতটা অহংকারী বানিয়ে দেয় যে, সে মনে করে, সারাটি দুনিয়াই তার পদতলে, তার মুঠোর মধ্যে। আবার হঠাৎ করে এই বিশাল জগতটা তার কাছে হয়ে যায় সংকীর্ণ— যেন সূঁচের ছিদ্র। তাও এই মনের কারণেই। এ মন অনেক সময় হয় বিভ্রান্ত, বিপথগামী। অনেক সময় সোজা পথে চলতে থাকে। অনেক সময় তা পরিশুদ্ধ হয়। অনেক সময় তা হয়ে যায় দুর্বোধ্য, রহস্যময়। যেমন তার কাছে আকাশ থেকে ওহী নাযিল হচ্ছে। অনেক সময় তা দুষ্ট প্রবণতায় আকীর্ণ ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন তা হয়ে যায় জাহান্নামের লেলিহান শিখা। কিন্তু মানুষের এই মনকে কি আমরা চিনতে পেরেছি ? বুঝতে পেরেছি এর অন্তর্নিহিত গভীরতর রহস্য। মনের রোগগুলো নির্ধারণ করা এবং তার চিকিৎসা পদ্ধতি জানতে পারা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে ? আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। ... কে তা অস্বীকার করবে ? কিন্তু এ উৎকর্ষলব্ধ মনোবিজ্ঞানও শত রকমের চেষ্টা ও গবেষণা চালাবার পরও এখনো তা বেলা-ভূমে দাঁড়িয়ে। আসল পানিতে উত্তরণ এখনো সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া আধুনিক 'সাইকোলজি' নানা মত ও নানা সন্দেহ-সংশয়ের পাদপীঠে পরিণত হয়ে আছে। আর এ মতবিরোধ ও

সন্দেহ-সংশয় ক্রমশ বৃদ্ধিই পাবে, উদ্ভাবিত হবে তার নিত্য নতুন পথ, যার কোনো শেষ নেই।

মিঃ ফ্রয়েড এই মনোবিজ্ঞানেরই গুরু। তার শিষ্য-শাগরিদ দুনিয়ায় অনেক হয়েছে। তাদের কেউ কেউ তার বিশ্লেষণকে শাশ্বত মনে করে তা-ই আনুসরণ করেছে। অনেকে আবার তাঁর সাথে কঠিনভাবে মতবিরোধ করেছে। অবশ্য এ কালে এমন মনোবিজ্ঞানীও আছে, যারা ফ্রয়েডের তীব্র সমালোচনা করেও তাঁরই দেখানো পথে অগ্রসর হচ্ছে। এমনও অনেক মনস্তত্ত্ববিদ রয়েছে, যারা ফ্রয়েডকে সোজাসুজি 'ফ্রড' বা প্রতারক বলে অভিহিত করেছে। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হচ্ছে, এই মনস্তত্ত্বও কি সর্ববাদীসম্মত ? সব মনস্তত্ত্ববিদের কি এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? তাহলে সেই গোড়ার প্রশ্ন, মনকে কি আমরা চিনতে পেরেছি ? মনস্তত্ত্বের কোনো কোনো প্রকাশ ক্ষেত্রে এবং নিষ্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে ঐকমত্য হয়ে থাকতে পারে। কখনো তার কার্যকার নির্ধারণে মতৈক্য হয়ে থাকতে পারে, যা সত্যও হতে পারে, হতে পারে মিথ্যাও, কিন্তু এ ব্যাপারে মূল রহস্য যে আজও অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লোকেরা মনস্তত্ত্ব বুঝবার জন্য যথেষ্ট মনোনিবেশ করেছে। করেছে এ জন্য যে, তা জীবন সংক্রান্ত একটা জরুরী জ্ঞান। তারা এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে, শক্তি নিয়োগ করেছে। তাদের আশা ছিল, মনস্তত্ত্ব তাদের সব রকমের বিভ্রম-বিভ্রান্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবে। স্নায়বিক ও বিবেক-বুদ্ধি সংক্রান্ত রোগ থেকে তা মানুষকে রক্ষা করবে। কিন্তু তাদের এ আশা কি ফলপ্রসূ হয়েছে? তার কোনো অংশও কি পূরণ হয়েছে ? তার জবাব এই যে— না, তা হয়নি। আমেরিকায় এই মনস্তত্ত্ব রোগীর সংখ্যা অন্যান্য সব রোগীর সংখ্যা থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি। এ রোগের চিকিৎসার্থে রোগীরা তথাকথিত 'সাইকো এ্যানালাইসিস্ট'দের দ্বারস্থও হয়েছে। কিন্তু রোগমুক্তি কি সম্ভব হয়েছে ? জীবনের প্রতি যারা ছিল হতাশাগ্রস্ত, তারা কি আশাবাদী হয়ে উঠেছে ? না, তাও হয়নি। তারা অধিক মানসিক দ্বন্দ্বে নিমগ্ন। তার পরিসংখ্যান আয়ত্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। এমন কি, মানসিক রোগগ্রস্ত যেসব লোক রোগমুক্তি লাভ করেছে, তাদের বেলায়ও এই 'সাইকো এ্যানালাইসিস'ই কি মূল কারণ ছিল ?

কেবল আমেরিকাতেই মনস্তত্ত্ব ও বিবেকগত রোগ এত বেশি ও মারাত্মক যে, তার দৃষ্টান্ত বিরল। আর সেই সঙ্গে এই মনস্তাত্ত্বিক রোগের এত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, যার সংখ্যা হিসাব করা কঠিন। 'সাইকো এ্যানালাইসিস্ট'রা যা কিছু দাবি করে, তার অধিকাংশই কেবল সেসব ক্ষেত্রে সত্য, যেখানে এ রোগীর আসল কারণ হলো, জীবন সংগ্রামে পরাজয়, ঘাত-প্রতিঘাত, জীবন পথের সংঘাত,

ভয়-ভীতি, ক্রণিক রোগ। কিন্তু তার ফল কি দাঁড়িয়েছে ? চিকিৎসাপ্রাপ্ত এসব রোগী কি তাদের আশানুরূপ নিরাময়তা লাভ করতে পেরেছে।

আমাদের বক্তব্যও এই। আমরা মনোবিজ্ঞানের যথার্থতা অস্বীকার করিনি কখনো। আমরা শুধু এই কথা বলতে চাই যে, মনোবিজ্ঞান এখনো সেই উচ্চ মান পর্যন্ত উন্নীত হয়নি, ততটা উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি, যার সাহায্যে দুনিয়ার ঘটনাবলীর নির্ভুল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়া যেতে পারে। 'সাইকো এ্যানালাইসিস্' পর্যায়ে যা কিছু বলা হয়, তার দু' একটা সত্য হলেও তার অধিকাংশই নিছক কাল্পনিক এবং ভিত্তিহীন। জীবন ও তার গভীরতর রহস্য পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও উৎকর্ষ, চিন্তা ও গবেষণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অগ্রগতির ফলে আমরা এ পর্যন্ত যতটা জানতে পেরেছি, তা অত্যন্ত সামান্য ও নগন্য তার তুলনায়— যা আমরা জানতে পারিনি, যার কোনো সংজ্ঞা দান বা কারণ নির্ধারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা বলব, আমাদের জ্ঞানের বাইরে যে বিশাল ক্ষেত্র অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ঈমানের বিষয়বস্তু। সে ঈমান অদৃশ্যের প্রতি, আল্লাহ্‌র প্রতি। আর সামান্য যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিশ্বাসের ক্ষেত্র এবং তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অতীব নগণ্য। আর এ দু'টি কথার মাঝে কোনো আমিল (Inconsistancy) বা বিরোধ নেই। বরং এ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, নিকটত্ব ও পরিপুরকতা সম্ভব।

আল্লাহ্ তা'আলা চেষ্টা সাধনা করার জন্য জানতে, চিন্তা-গবেষণা ও তর্ক-বিতর্ক করবার আদেশ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের সামনে বিশাল বিশ্ব-চরাচরকে একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে রেখে দিয়েছেন। আমরা এই ক্ষেত্রে যত্রতত্র বিচরণ করতে পারি, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। যা ইচ্ছা করতে পারি। এই কাজের জন্য তিনি তার কাছে থেকে একটি অত্যন্ত তেজস্বী স্ফুলিংগ বা অগ্নিশিখা আমাদের দিয়েছেন। তা-ই হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা ও গবেষণা শক্তি। এ শক্তির কাজই হচ্ছে অজানাকে জানতে চেষ্টা করা, সব রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা, জীবনকে সহজতর করা, জীবনের সমস্যার সমাধান করা এবং জীবনকে সম্ভব ও বিপুল সম্ভাবনাময় করে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। তার এ অবদানকে বিশ্বাস করলে সে বিশ্বাস হবে মহান উচ্চতর শক্তির অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রতি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কোনোক্রমেই ভুলে যাওয়া চলবে না যে, এ বিবেক-বুদ্ধি খুবই সীমাবদ্ধ শক্তির অধিকারী, তার বিচরণ ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। তা যত শক্তিশালীই হোক, আর যত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই চালাক, তা কখনোই সর্বাত্মক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে

না। সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই রয়েছে। কেবল তিনিই হচ্ছেন সর্বাত্মক সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধিকারী।

يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّابِمَاشَاءَ -

আল্লাহ্‌ই জানেন মানুষের সামনে যা আছে তা, আর যা আছে তাদের পিছনে। আর তারা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের একবিন্দু জিনিসও আয়ত্ত করতে পারে না, তবে আল্লাহ্ নিজে যা চান। ...

বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, সে তো আল্লাহ্‌রই দেয়া জ্ঞান-স্ফুলিংগকে বিশ্বাস করা, যদিও তা কোনো সীমাকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না। আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সে তো মূল জ্ঞান-উৎস, ওহী, অনাদি-অনন্তর সর্বাত্মক জ্ঞানের প্রতি ঈমান। এই সূত্র থেকে জ্ঞান না নিয়ে লোকেরা যা কিছু বলে তারা শুধু বড় বড় দাবি করে বটে; কিন্তু সে দাবির সমর্থনে তারা কোনো যুক্তি বা প্রমাণই পেশ করে না।

দুনিয়ার অন্যান্য সব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানও সম্মানার্হ, উৎসাহিত করার যোগ্য। কিন্তু কেবল তারই ওপর যদি নির্ভর করা হয়— এ আশায় যে, তা-ই সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেবে, তাহলে সে নির্ভরতা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তার মূলে কোনো সত্য নেই। তার ওপর নির্ভরতা গ্রহণ করা যেতে পারে, এমন মান পর্যন্ত মনোবিজ্ঞান আজও পৌঁছতে পারে নি, কোনো দিন পৌঁছতে পারবে— এমন আশা পোষণ করাও নির্বোধের স্বর্গবাসের মতোই হাস্যকর।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি-চিকিৎসা ঈমানের দ্বারাই সম্ভব

বহু সংখ্যক মনস্তাত্ত্বিক রোগ চিকিৎসকের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান বহু সংখ্যক মনস্তাত্ত্বিক রোগ চিকিৎসার জন্য অতীব কার্যকর ও ফলপ্রসূ ঔষধ। তারা এ পর্যায়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং বারবার সফল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বহু সংখ্যক চিকিৎসক তাদের রোগীদের চিকিৎসার্থে দ্বীনকে প্রয়োগ করেছে, দ্বীনের সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং তাতে তারা সফলতা লাভ করেছে। তারা নিজেরাই তাদের এ সাফল্যের কথা বহু আলোচনা, রচনা ও গ্রন্থে অকপটে স্বীকারও করেছে।

এ পর্যায়ে আমেরিকার প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ হেনরী লিংক এর কথা উল্লেখ। তিনি তাঁর পৈতৃক ধর্ম মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন এবং পুরাতন জুতা

ত্যাগ করার মতোই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কয়েকটি বছর পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ নাস্তিক ও আল্লাহ-অবিশ্বাসী হয়েই অতিবাহিত করেছিলেন। এ সময় তিনি না আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতেন, না পরকাল। আর এসব কিছুই তিনি করেছিলেন বিজ্ঞানের প্রতি বিস্মিত-বিমুগ্ধ হয়ে। কেননা সে বিজ্ঞান ছিল ধর্মের পরিপন্থী। বিজ্ঞান না সে ধর্মকে সত্য প্রমাণ করত, না তার কোনোরূপ সমর্থন দিত। তিনি যেমন বলেছেন, বিজ্ঞান আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, তেমন তাঁর অস্তিত্বহীনতার কথা প্রমাণ করাও ছিল তার সামর্থের অতীত। এ পর্যায়ে একজন বুদ্ধিমান লোক শুধু এতটুকুই বলতে পারেঃ আমি জানি না বা আমি চিনি না। অর্থাৎ সে সংশয়বাদী, কিংবা নাস্তিক— বিজ্ঞানই এ ব্যক্তিকে ধর্মে অবিশ্বাসী বানিয়ে দিয়েছিল, সে-ই পূনর্বার এই বিজ্ঞানের পথেই দ্বীন ও ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করল। এ পর্যায়ে তাঁর এ মানসিক বিপ্লবের কাহিনী সমন্বিত একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সে গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন'। এ গ্রন্থ ১৯৪৭ সনে আমেরিকায় প্রকাশিত হয়।

ডাক্তার হেনরী তাঁর ঈমানের দিকে ফিরে আসার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর কিছু কিছু সারাংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি—

> আমার ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন বিশ্ববিধ্বংসী অর্থনৈতিক সংকটের ফলশ্রুতি ছিল না। তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করব, এই অন্তর্বর্তীকাল আমার জন্য উপকারী বহু তত্ত্বের পরিপক্কতা লাভে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমার বয়োবৃদ্ধি ও বার্ধক্যের নিকটবর্তিতাও— যা মানুষের চিন্তা-বিশ্বাসে পরিবর্তন আনবার ব্যাপারে অনেক প্রভাব বিস্তার করে থাকে— আমার ঈমানের দিকে ফিরে আসার কারণ ছিল না। কেননা আমি তখন জীবনের ৪৫ বছর অতিক্রম করছিলাম। আর জীবনের এই পর্যায়টি জীবনের সূচনা ও প্রাথমিক রূপেই গণ্য হয়, আল্লাহ্র শোকর, আমি কোনো স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিও ছিলাম না; বরং শক্ত সুঠাম দেহসম্পন্ন ছিলাম ... এক কথায় ঈমানের দিকে আমার ফিরে আসা স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের কারণে নয়, আমার উপর পাগলত্ব রোগেরও কোনো চাপ ছিল না। কেননা এর দরুন মানুষ অনেক সময় এ জীবন থেকে নিষ্কৃতি ও পরকালীন চিরন্তনতা লাভের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বরং আমার জীবন মহা সুখ-আনন্দ ও নিশ্চিন্ততায় ভরা ছিল। অনুরূপভাবে আমি এ-ও স্বীকার করব যে, কোনোরূপ কঠিন বিপদে পড়ে মানুষ যেভাবে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে তেমন কিছুও আমার জীবনে ঘটেনি; বরং ঘটেছিল তার বিপরীত। আমি যখন সুখী দাম্পত্য জীবনের ষোলটি বছর অতিক্রম করেছি, তখনই এমনটা ঘটেছিল। মূলত আমি এক সৌভাগ্যবান সুখী ব্যক্তি, আমার তিনটি সন্তান

—২৭

রয়েছে, তারাই আমার এ সৌভাগ্যের কেন্দ্র। ... এ থেকে তোমরা বুঝতে পার, প্রচলিত ধরনের কোনো কঠিন বিপদ কিংবা দুঃখময় অভিজ্ঞতার দরুন আমার মনের এ পরিবর্তন ঘটেনি। কোনো আঘাতও আমার চেতনার উপর পড়েনি, যার দরুন এটা হয়েছে বলা যেতে পারে। আমার ঈমানে নতুন কোনো তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার জীবনে এত বড় ঘটনা কি করে ঘটল, তাই আমি এখন বলতে চাই।

আমার জীবনে হেদায়েত এসেছে অতি গোপনে, প্রথম পর্যায়ে তা টেরই পাইনি। তবে একজন মানসিক রোগের চিকিৎসক হিসেবে আমাকে যা কিছু করতে হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছে ও এর ভিতর দিয়ে আমি যেসব অবিজ্ঞতা অর্জন করেছি, বস্তুত তাই হচ্ছে আমার এ মানসিক ও চিন্তা-বিশ্বাসগত পরিবর্তনের আসল কারণ।

এই সুবিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কোনো সাময়িক প্রতিক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে অথবা উপস্থিত কোনো কারণের প্রভাবে পড়ে ঈমানের দিকে ফিরে আসেন নি। কোনো মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শে বা দার্শনিক কোনো তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হওয়াও তাঁর এদিকে ফিরে আসার কারণ নয়। কেননা মতাদর্শ ও মতবাদ বা চিন্তাবিদ্‌দের মতামতে সত্য-মিথ্যা ও ভুল-শুদ্ধ দুটিরই সম্ভাবনা থাকে। তিনি নিজের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কার্যব্যপদেশে অর্জিত অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভিত্তিতেই ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি নিজ চক্ষে বারবার যা কিছু প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন, তা-ই হচ্ছে তাঁর ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তনের মৌল কারণ। আর এই হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানের ভিত্তি। এ বিজ্ঞানে মনস্তত্ত্বের বাহ্যিক প্রকাশকে অধ্যয়নের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং ধারণা, অনুমান ও পরিসংখ্যানতাত্ত্বিক তথ্যের ব্যাপক সাহায্য লওয়া হয়। বস্তুত মনস্তত্ত্ব এ পদ্ধতিতেই একটি বিজ্ঞান বলে অভিহিত হয়েছে, দর্শন নামে পরিচিত হয়নি। আলোচ্য মনস্তত্ত্ববিদ একথাই বলিষ্ঠভাবে বলেছেন ঃ

আধুনিক মনোবিজ্ঞান, গণিত বিদ্যা ও পরিসংখ্যানগত তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তিশীল। আর তা ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়, কেবল কাগজ কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আর এ জিনিসই পিছন দিয়ে আমার মত বদলে দিয়েছে। অথচ দীর্ঘ দিন ধরে ঘটে যাওয়া এ পরিবর্তন আমি টেরই পাইনি।

এখানে 'মনোবিজ্ঞান' ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ (Psycho analysis) কে পরস্পর সংমিশ্রিত করে বিবেচনা করা উচিত নয়। কেননা এ শেষোক্তটি মনোবিজ্ঞান পর্যায়ের এমন কতগুলো মতবাদের জন্ম দিয়েছে, যার নির্ভুলতা সম্পর্কে কিছুমাত্র নির্ভর করা চলে না।

.... মনোবিজ্ঞানের যে শাখা আমাকে ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে তা— যেমন পূর্বে বলেছি— জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারিত ও প্রচলিত মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। খুব বেশি প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের এই শাখার দিকে আমি যখন অগ্রসর হতে লাগলাম তখন তা গ্রহণ করা গেল না। এ পর্যায়ে আমার কাছে যা কিছু উদ্‌ঘাটিত হলো, পরে তারই উল্লেখ করা হবে। ফলে আমাকে ছাড়া অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদ যেসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, সেসব বাদ দিয়ে অন্য কোনো পন্থায় গবেষণা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। এসব অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে যে বিশেষ ফলাফল আমি লাভ করলাম, তার অনেকটাই ধর্মের মৌল আকীদা-বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ— বরং তা এদিকে বড়ই সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছে। আর কালক্রমে তা যে সকলকেই স্পর্শ করবে, তা নিঃসন্দেহ। মনোবিজ্ঞান উদ্ভাবিত অনেক তত্ত্ব ও তথ্য মানবীয় বড় বড় সমস্যার উপর ব্যাপক ক্ষেত্রে আমি প্রয়োগ করেছি। নিউইয়র্ক শহরে বেকার লোকদের কর্মে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনায় আমি ১৫, ৩২১ জন পুরুষ ও নারীর উপর পরীক্ষা কার্য চালিয়েছি। এসব পরীক্ষার আলোকে এই লোকদের প্রত্যককে তার উপযোগী কাজে নিয়োগ করা এবং তাকে বাঞ্ছিত কাজে অভ্যস্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

অনেক সময় উপদেশ ও কল্যাণ কামনাই সমস্যার সমাধান এবং তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বে যে জটিলতা ছিল তা বিদূরণে সাহায্য করত। আর তাদের বেকারত্বের মৌল কারণ দূর করাও সম্ভবপর হতো। এই কার্যক্রমে আমি দুই লক্ষ ডলারেরও অধিক ব্যয় করেছি। তার অধিকাংশই কার্ণেগী ফাউণ্ডেশন থেকে প্রাপ্ত। নিউইয়র্ক শহরের বেকার শ্রমজীবীদের সাহায্যার্থে গঠিত সমিতিরও অবদান এতে রয়েছে। আমি যখন এই প্রকল্পে বিশেষ পরামর্শ দাতারূপে নিযুক্ত হই, এবং দশ হাজার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান ও কর্মপদ্ধতি অধ্যয়নের সুযোগ যখন আমার ঘটল, তখন আমি তাদের উপর ৭৩,২২৬ বার মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা চালালাম। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি ব্যক্তিগত চার্ট তৈরী করলাম। বিশেষ করে এই সময় মানব জীবনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের গুরুত্ব তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলাম। তখন আমার রোগীদের উপর প্রয়োগকৃত অভিজ্ঞতাসমূহের সাহায্যে এবং এই বিরাট পরীক্ষা কার্যের মাধ্যমে বহু মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভ করতে সক্ষম হলাম। আর সে ফল হলো এই—

যে লোক কোনো ধর্ম পালন করে কিংবা উপাসনালয়ে বারবার যাতায়াত করে, সে সেসব লোকদের তুলনায় অনেক উত্তম ও অধিক শক্তিশালী

ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, যাদের কোনো ধর্ম নেই, কিংবা যারা কোনো রকমেরই কোনো এবাদাত বা উপাসনা করে না।

এর ফলে বলা যায়, ধর্মের প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন সেই পথভ্রষ্ট লোকটির মতো ছিল না, যে একটা যথার্থ ধর্মের সন্ধান পেয়েছে। অর্থাৎ আমার এ প্রত্যাবর্তন কোনো তেজস্বী চেতনা কিংবা বিরাট গৌরব বোধ আমার ভিতরে জাগালো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ ছিল বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের পথ থেকে প্রত্যাবর্তন। ধর্ম পালনকারী সব লোক এ সত্য স্বীকার করবে বলে আমি মনে করিনে। এমনকি আমি নিজেও এটাকে কোনো উন্নত ও আদর্শ পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করিনে। ফলতঃ ধর্মের ব্যাপারে আমার চিন্তা এমন কয়েকটি বিশ্বাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, যা কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম সমর্থন করে না। বরং তা কতগুলো নির্দিষ্ট ধর্মের মত ভেঙে দেয়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম কি ?

ধর্ম হচ্ছে জীবনের উৎসরূপ কোনো শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন। আর এ শক্তি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনিই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপক, পরিচালক, সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা। আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিলোকের জন্য যে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-বিধান ধর্মগ্রন্থসমূহে বলে দিয়েছেন তার অনুসরণকে যথেষ্ট মনে করা। আসমান হতে নাযিল হওয়া শিক্ষাকে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ-সম্ভার গণ্য করা— যার মধ্যে সব ধর্মীয় তত্ত্ব সন্নিবদ্ধ রয়েছে। আর জীবন-লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তা অন্যান্য সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমষ্টি থেকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উন্নত ও মূল্যবান। (মূল বইয়ের সার-নির্যাস)

বস্তুত এই ব্যক্তি এবং এর মতো আরও অনেকে যখন কুফরী ও নাস্তিকতা গ্রহণ করেছে; তখনও আল্লাহ্র নাযিল করা সত্য ও বরহক দ্বীনের প্রতি কুফরী করেনি। কুফরী করেছে মূল দ্বীনের উপর বাইরে থেকে জমে ওঠা বহু বিকৃতি ও কুসংস্কারের প্রতি। অস্বীকৃতি জানিয়েছে গির্জার মনগড়া ধর্মের প্রতি। কেননা তাকে অনেক কিছুই উত্তরকালে মনগড়াভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আর এ যখন পুনর্বার ঈমান আনল এবং প্রত্যাবর্তন করল, তখন ঠিক প্রকৃত দ্বীনের প্রতিই ঈমান আনল এবং প্রত্যাবর্তন করল। যে ধর্মকে পূর্বে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছিল তার দিকে নয়। বরং ফিরে এল এমন দ্বীনের দিকে যা মানব প্রকৃতি ও নির্মল বিযুক্ত বিবেক-বুদ্ধি সম্মত। অবশ্য এটা কোনো কোনো গির্জা কেন্দ্রিক ধর্মের পছন্দ হয়নি। অনেক প্রাচীন ধর্মের আকীদা বিশ্বাসকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ধরনের লোকদের সামনে ইসলামকে সঠিকভাবে পেশ করা হলে তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে যে, তারা যে দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, তা হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম। আর তাই হচ্ছে মানব-প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি সম্মত দ্বীন।

তাই জীবনের দ্বীন, শক্তির দ্বীন। আর এই দ্বীনই হচ্ছে শক্তিশালী লোকদের হাতিয়ার, দুর্বলদের আশ্রয়স্থল নয়। ডাঃ হেনরী লিংক নিজেই বলেছেন ঃ

> ব্যক্তি-প্রকৃতির এই গভীর অধ্যয়ন আমাকে সেই স্ফুলিংগ দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে, যা প্রকৃত হেদায়েতের নূর থেকে সমুজ্জ্বল। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভালো কাজ লাভ করা হোক, কিংবা অর্থনৈতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অথবা সামাজিক শান্তি নিশ্চিন্ততা কিংবা দাম্পত্য জীবনের সৌভাগ্য— যাই হোক, সাধারণ কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ সম্ভব হবে কেবলমাত্র তখন, যদি লোকেরা আবহমানকাল থেকে চলে আসা জীবন ধারা এবং সাম্প্রতিক সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়। সে সংগ্রামের ফলে প্রকৃত উন্নত আদর্শের আগুনে সে সমাজ কাঠামোর শিকড় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।
>
> অতএব যে দ্বীনের কথা আমি বলছি, তা দুর্বলদের আশ্রয় নয়। বরং তা শক্তিমানদের অস্ত্র। তাই হচ্ছে কঠোর জীবনের উপায়, যা মানুষকে তার পরিবেশের প্রধান ও তার উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন বানিয়ে দেবে, পদদলিত ও হীন-নীচ দাসমাত্রে পরিণত করবে না।

কেবলমাত্র হেন্‌রী লিংকই বিজ্ঞান ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার বলে ঈমান ও দ্বীনের প্রতি ফিরে আসেন নি, এ পথের পথিক তাঁর মতো আরও অনেক রয়েছেন। তাঁরাও ঠিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্বীন ও ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ডিয়েল কারেঞ্জী লিখেছেন, সংশয় ও সন্দেহ তাঁর জীবনকেও ঈমান বর্জিত করে দিয়েছিল; কিছুকালের জন্য পুরোপরি নাস্তিক ও আল্লাহ্ অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর জীবনটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিহীন হয়ে চলছে। আর উচ্চতর মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবর্তিত মানুষ 'ডাইনোসর' জন্তুর মতোই, যারা দীর্ঘ দুইশত মিলিয়ন বছর কাল পর্যন্ত পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে বেড়িয়েছে। এরূপ মানুষ শেষ পর্যন্ত 'ডাইনোসর' জন্তুর মতোই বিশ্বের বুক থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ফলে তাঁর হৃদয়ে ঈমানের চেতনার পুনরাবির্ভাব ঘটে। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন, ঈমানের কল্যাণ স্পর্শ না পেলে জীবনটা দুঃসহ, উষ্ণ, শুষ্ক, ধুসর, দুর্গম ও বিধ্বংসী মরুভূমি হওয়া ছাড়া আর কোনো পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। তিনি বলেছেন, মানুষের জীবনের জন্য যেমন বিদ্যুৎ শক্তি, উত্তম উৎকৃষ্ট খাদ্য ও স্বচ্ছ সুপেয় পানি প্রয়োজন, দ্বীন ও ধর্ম পালনও অনুরূপ ভাবেই অপরিহার্য। প্রথমোক্ত জিনিসগুলো মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন-যাত্রা সহজতর করে দেয়, কিন্তু দ্বীন

মানুষকে দেয় তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ জীবনগতি। দ্বীন মানুষকে আত্মিক ও নৈতিক সম্পদে অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও বৈভবশালী বানিয়ে দেয়। আর স্যার উইলিয়ম জেমস্-এর ভাষায় সন্তোষপূর্ণ সৌভাগ্যশালী অবাধ প্রশস্ত পরিপূর্ণ জীবন গঠন ও পরিচালনের এক বিরাট শক্তিতে মানুষকে বলিয়ান করে দেয়। দ্বীন মানুষকে দেয় ঈমান, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাহাস-বিক্রম এবং ভয়-ভীতি, আকশংকাবোধ, মনের ভারাক্রান্ততা ও দ্বন্দ্ব-কুণ্ঠা থেকে চিরতরে মুক্তি ও নিষ্কৃতি দান করে। জীবনে নিয়ে আসে উচ্চতর মহান মানবিক লক্ষ্যপানে স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য। ব্যক্তির সম্মুখে উদ্ভাসিত করে দেয় সৌভাগ্যের বিশাল দিগন্ত। আমাদের জীবন-মরুভূমির মাঝে এনে দেয় সৌভাগ্য, সজলতা ও গতিশীলতার ওয়েসিস। দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন সত্যই বলেছেন ঃ

> দর্শনের ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে খুব কম মানুষই নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বরং দর্শনের গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান মানুষকে দ্বীন ও ঈমানের দিকে ফিরিয়ে আনে অনিবার্য ভাবে।

বস্তুত মূল জ্ঞানের অধিকারী ও আধা-দর্শনবিদগণ এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের খোসা চর্বণকারী প্রতারিত ব্যক্তিরাই অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় এতটা মেতে যায় যে, তারাই এ ক্ষেত্রে বড় ভুল করে বসে। তারাই দ্বীনের অস্বীকৃতি ও বিরুদ্ধতায় দুঃসাহসী হয়ে থাকে, তারাই আল্লাহ্‌র ওপর খোদকারী করবার হিম্মত করে। এমন কি, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অনেকে আবার এ কাজ করে সহজ খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে, সর্বপ্রকার নৈতিকতার বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে যথেচ্ছ বিচরণকারী লাগামবিহীন পাগলা ঘোড়া সাজবার ইচ্ছায়। অনেকে নিজেদের পংকিল লালসার গড্ডালিকা প্রবাহে অবাধে ভেসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, নিষিদ্ধ ও অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার ও স্বাদ-আস্বাদনের লিপ্সায় পড়ে। ওরা চায় দ্বীন ও ধর্মকে মূলোৎপাটিত করে দিতে, যেন নিজেদেরকে অধঃপতনের নিম্নতর পংক ঢেলে দিতে পারে নিঃসংশয়ে অকুণ্ঠিত ও নির্লজ্জভাবে, যেন মনে কোনো সময় অনুতাপের সামান্য দংশনও জাগতে না পারে।

কিন্তু গভীর দৃঢ় জ্ঞানসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিরা ঈমানের অনির্বান দীপ-শিখার আলোকধারা থেকে নিজেদেরকে কোনো মুহূর্তেও বঞ্চিত করতে প্রস্তুত হয় না। কেননা ঈমানের নূর ও দৃঢ় প্রতয়ের শক্তিই হচ্ছে এই দীর্ঘ বন্ধুর জীবন-পথের কস্মিন কালেও ফুরিয়ে না যাওয়া একমাত্র পাথেয়।

সুস্থ, সুন্দর, নিষ্কলংক জীবন যাপনকারীদের একটা নিজস্ব দর্শন— একটা চিন্তা-পদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ এবং মূল্যমান ও মূল্যবোধ রয়েছে। একটা নিজস্ব

চিকিৎসা প্রক্রিয়া রয়েছে নিজেদের মন-মানসিকতার সব রোগের জন্য আর তা হচ্ছে দুশ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্ন এক সুদৃঢ় শক্ত রশি ধারণ করা। তারা নিজেরা এ রশি কঠিন শক্ত হস্তে ধরে থাকে, তাই ধরবার জন্য তারা উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানায় নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে।

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিশারদ উইলিয়ম জেমস্ বাস্তবভাবে ধর্ম পালনের শুভ কল্যাণ অনুভব করে বলেছেন ঃ

আমাদের ও আল্লাহ্র মাঝে এমন একটা শক্ত বন্ধন রয়েছে, যা কোনো দিনই ছিন্ন হয়ে যায় না। আমরা যখন তাঁর কাছে আমাদের কাতর ফরিয়াদ পেশ করি তখন আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

শক্তিশালী ঈমান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা তা ব্যক্তির বাস্তব জীবন যাপনে বিশেষ সাহায্যকারী হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্বল ঈমান ব্যক্তির জীবনে কোনো সাহায্যই করতে সক্ষম নয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা কালে তিনি বলেছিলেন ঃ

মানসিক অশান্তি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ ও সংশয় প্রবণতার প্রধান ও বিরাট প্রতিবিধান হচ্ছে এক আল্লাহ্র প্রতি যথার্থ ঈমান।

কেননা মানসিক রোগের চিকিৎসকরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন— সুদৃঢ় ঈমান, দ্বীন ও ধর্মকে শক্ত করে ধারণ করা এবং নিয়মিত এবাদত-বান্দেগী মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ ও অশান্তি, ভয়-ভীতি, আশংকা বোধ এবং সর্বপ্রকার স্নায়ুবিক দুর্বলতার প্রতিষেধক। সে কাজ দ্বারা যে-কোনো মানুষ দুনিয়ার অর্ধেক রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এই জন্য বিশেষজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেছেনঃ দ্বীন পালনকারী কোনো ব্যক্তিই কখনোই কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় না।

কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদদের ধর্মবোধ নিতান্ত বস্তুনির্ভর ও বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তার ফলশ্রুতি। প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস, ধর্ম পালন প্রবণতা ও ধর্মানুরাগ বস্তুবাদী হয় না। কেবল মানসিক রোগমুক্তির ইচ্ছায় কেউ ধর্ম পালন করে না। আর কেউ তা করলে বৈষয়িক সুখ-শান্তির জন্য একটা বৈষয়িক প্রক্রিয়া আবলম্বন করা হবে, প্রকৃত পক্ষে ধর্ম পালন হবে না।

আসলে এ সব মানসিক রোগ চিকিৎসকরা এক নতুন ভংগীতে নতুন ওয়ায শোনাচ্ছেন মাত্র। তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহ্র বান্দা হয়ে আল্লাহ্কে একমাত্র

মাবুদ রূপে গ্রহণ করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার ও তার সন্তোষ লাভের ফলে পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্ম পালন করতে বলছেন না। তাঁরা ধর্মকে বড়জোর জীবনের একটা আনুসংগিক— জীবনের বিপুল ব্যস্ততা ও তৎপরতার মাঝে একটা আংশিক কাজ রূপে গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এবং তাদের মতে ধর্মকে এতটুকু স্বীকৃতি দিলেই নাকি সব রকমের মানসিক রোগ থেকে নিষ্কৃতি ও রক্ষা পাওয়া যাবে। ধর্মের কল্যাণ, অবদান সম্পর্কে তাঁদের হৃদয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এ অনুভূতির গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের মতে এটা ধর্মের নিতান্তই অবমূল্যায়ন এবং অবমাননা। ধর্মের এ অতিসামান্য অবদান মাত্র। আমরা যে ধর্মের কথা বলি, তার কল্যাণ এ পর্যন্তই সীমিত নয়। তাঁরা যে ধর্মের কথা বলেন, তা মানুষের কেবল এ দুনিয়ার জাহান্নাম যন্ত্রণা থেকেই রক্ষা করতে বা মুক্তি দিতে পারে। আর আমাদের ধর্ম মুক্তি দেবে— রক্ষা করবে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার আযাব ও জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে। শুধু তাই নয়, তা ইহকালের মানুষকে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমতের অধিকারী বানাবে, সেই সঙ্গে ও প্রধানত এবং মুখ্যত পরকালে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও জান্নাত লাভেও ধন্য করে দেবে। আর এর চাইতে বড় কোনো জিনিসই মানুষের কাম্য হতে পারে না, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

আমেরিকার আর একজন প্রধান মানসিক রোগ চিকিৎসক ডাঃ কার্ল ইউঙ্গ বলেছেন ঃ

> বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে সাম্প্রতিক জগতের বিভিন্ন পর্যায়ের বহু শত লোক চিকিৎসার্থে আমার কাছে এসেছে। তাদের কয়েকশত রোগীর আমি চিকিৎসাও করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে মধ্যম বয়স অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ কিংবা তদূর্ধ্ব বয়সের লোকদের চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, সে রকম অসুবিধা আর কখনো আমার সামনে আসেনি। কেননা এ বয়সের লোকেরা সাধারণত ঈমানহীন এবং ধর্মশিক্ষা বিবর্জিত ও ধর্মীয় পরিবেশ বহিষ্কৃত ছিল। এদের প্রত্যেকেই মানসিক রোগে ছিল বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত। কেননা দ্বীন বা যে-কোনো ধর্ম মানুষকে যে মানসিক শান্তি ও স্বস্তি দেয়, তা থেকেও এরা ছিল নিতান্তই বঞ্চিত। এই পর্যায়ের লোকেরা নিজেদের অন্তরে ঈমান ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত এবং জীবন ক্ষেত্রে ধর্মের বিধি-নিষেধ পুরোপুরি পালন করতে শুরু না করা পর্যন্ত তারা তাদের রোগ থেকেও মুক্তি লাভ করতে পারে নি।

কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলে এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা গ্রহণ করলে শান্তি-স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ হয় কেন? কেমন করে?

উইলিয়ম জেমস্ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ঃ

চারদিকে সর্বগ্রাসী ও বিধ্বস্তকারী উত্তাল তরঙ্গমালা সমুদ্রের গভীর তলদেশস্থিত পর্বতকে যেমন একবিন্দু নড়াতে পারে নাম, মানব-হৃদয়ে হয়ে বসা ঈমান ও ঈমানলব্ধ মানসিক শান্তি ও স্বস্তিকেও একবিন্দু বিধ্বস্ত ও বিপন্ন করতে পারে না সাময়িক স্থূল পরিবর্তন। প্রকৃত দ্বীন পালনকারী ব্যক্তি তো সর্বপ্রকার উদ্বেগ, অশান্তি-অস্বস্তি ও আবর্তন-বিবর্তনের মুকাবিলায় সুদৃঢ়, অচলায়তন। সে তার ঈমান ও মূল্যমান মূল্যবোধ নিয়ে সুরক্ষিত অপরাজেয় হয়েই থাকে। কালের অবস্থার আবর্তনে যে পরিবর্তনই আসুক, তাকে মুকাবিলা করতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৯৬২ সনের ২৯ নভেম্বর একটি বিশ্ববিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় এই হেডিং উজ্জ্বল অক্ষরে ছাপা হয়েছিল ঃ

বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিক রোগে আক্রান্ত লোকদের চিকিৎসার্থে দুনিয়ার বড় বড় বিজ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনেরা ধর্মের সাহায্য গ্রহণ করছে।

সত্যি কথা, বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিক রোগবিশারদরা বর্তমান সময় আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও দ্বীন পালন অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ও সুতীব্র শানিত হাতিয়ার আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আল্লাহ্র রহমতের প্রতি ঐকান্তিক আশাবাদ এবং তার উপর অবিচল হয়ে থাকার ভাবধারা সৃষ্টি করাই হচ্ছে এই রোগের সর্বাধিক কার্যকর চিকিৎসা। কেননা এ উপায়ে মহা শক্তিমান আল্লাহ্র নিরংকুশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা হয়, একান্তভাবে গ্রহণ করা হয় তাঁরই আশ্রয়— তখন, যখন দুনিয়ার অন্যান্য সব শক্তির চূড়ান্ত অক্ষমতা ও চরম ব্যর্থতা নিঃসন্দেহ রূপে প্রকট ও প্রমাণিত হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, উর্ধ্বদিকে তারা হস্ত উত্তোলিত করেছেন। তাঁরা নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন এবং সারা বিশ্বের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ বিজ্ঞান— আধুনিক বিজ্ঞান আরও বেশি করে— আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবান জানায়। বিজ্ঞান— সত্যিকার বিজ্ঞান কক্ষনোই নাস্তিকতা শিখায় না। আর এ ব্যাপারটা কেবলমাত্র মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। কেবল তাদের উপর এর স্বীকৃতি নির্ভরশীল নয়। দৈহিক রোগের চিকিৎসকরাও এ কথার সত্যতা স্বীকার করছেন। তাঁরা বলছেন ঃ 'বহু প্রকারের দৈহিক-স্নায়ুবিক রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্যও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান একান্তই জরুরী। বিশেষ করে রোগ চিকিৎসায় ব্যাপারে ঈমান ও চিকিৎকের ঈমান যখন সংযুক্ত ও সম্মিলিত হবে,

তখন চিকিৎসার সময়কাল হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং নিরাময়তা হবে অতীব সহজ, নিকটবর্তী ও নিশ্চিত।

আমেরিকার একজন বড় প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ হচ্ছে ডঃ পল আর্নেস্ট এ্যাডল্‌ফ। তিনি স্যান্ট জন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আমেরিকার শল্য চিকিৎসক সমিতির একজন সদস্য। তিনি বলেছেন ঃ

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃত চিকিৎসা তখনই সম্ভব ও সফল হতে পারে যখন চিকিৎসার ব্যাপারে একই সময় দেহ ও আত্মা সম্মিলিত হবে। চিকিৎসাকালে শল্য সাধারণ চিকিৎসা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্যকে আল্লাহ্‌র প্রতি আমার ঈমান ও আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যকে সুসংহত ও পরস্পর সামঞ্জস্যশীল করে তোলা আমার ঐকান্তিক কর্তব্য বলে আমি অনুভব করছি। আর এ দুটো অবস্থাকেই আমি এক সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। কেবলমাত্র এ পন্থায়ই আমি আমার রোগীদের সেই পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা দিতে পারি, যা তাদের জন্য দরকার এবং তারাও তার মুখাপেক্ষী। আমি গভীর সূক্ষ্ম চিন্তা ও গবেষণার পর এই সত্যে উপনীত হতে পেরেছি যে, আল্লাহ্‌র প্রতি আমার বিশ্বাস ও আমার চিকিৎসা জ্ঞান দুটো মিলে এমন একটা ভিত্তি রচিত হচ্ছে, যার উপর আধুনিক চিকিৎসা দর্শন সংস্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্নায়বিক রোগের প্রধান ও মৌল কারণ কি? .... এ নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করলেই আমরা দেখতে পাই, পাপের অনুভূতি, ভয়-ভীতি, হিংসা-পরশ্রীকাতরতা, গোপন শত্রুতা, আতংক-বিহবলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ-অস্থিরতা, সংশয়-সন্দেহ প্রবণতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, মৃত্যুবোধ— প্রভৃতিই হচ্ছে স্নায়ুবিক রোগের মৌল কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানসিক রোগ চিকিৎসার আত্মনিয়োগকারী বহু লোকই মানসিক অস্থিরতা ও রোগাক্রান্ততার মৌল কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারলেও তার চিকিৎসা করার কনো ক্ষমতা বা যোগ্যতাই তাদের নেই। কেননা তারা এ রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের হৃদয় মনে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে জাগাতে ও সুদৃঢ় করে রাখতে চেষ্টা করে না— কিংবা বলা যায়, তারা এখনো তার প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি।

এতদঞ্চলের লোকদের যখন এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা কেবল পাশ্চাত্য দেশ থেকে আসা মতবাদ ও মতাদর্শের প্রতিই 'ঈমান' এনে থাকে এবং যে মতের পশ্চাতে পাশ্চাত্য দেশের সমর্থন নেই তাকে তারা 'সেকেলে' ও 'অবৈজ্ঞানিক' বলে নাক সিটকাতে শুরু করে তখন পাশ্চাত্য দেশের এসব চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিদের কথা-বার্তা কান লাগিয়ে শোনা উচিত এবং মনে প্রাণে গ্রহণও করা উচিত। বিশেষ করে এসব লোক

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিশু বা বালক নয়। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিকপাল। এরা দিবা-স্বপ্নে অভ্যস্ত নয়। এরা প্রত্যেকেই বাস্তববাদী। এরা মরুভূমিতে সাঁতার কাটার লোক নয়। এরা সত্যিকার বিজ্ঞানী। গভীর দৃষ্টি ও জ্ঞানের অধিকারী। আধুনিক বিজ্ঞানে এদের দক্ষতা ও পারদর্শিতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কেউ নেই।

আর বিস্ময়ের বিষয়, দ্বীন ও ঈমানের পক্ষে বর্তমানের এ উচ্চ ডাক বিশেষ করে সে অঞ্চল থেকে উঠেছে, যা বর্তমান কালের অত্যাধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও বস্তুগত ধন-ঐশ্বর্যে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত। সেখানকার লোকই চাঁদের উপর কদম রাখতে সক্ষম হয়েছে, যাদের কাছে বাস্তব সুখ-সুবিধা ও বৈষয়িক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির প্রতি অন্য কারো চাইতে কম আকর্ষণ রাখে না— এরা সমস্বরে দ্বীন ও ঈমানকে শক্তভাবে ধারণ করবার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত এ বিরাট মিথ্যা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে যে, বিজ্ঞান ধর্ম ও ঈমানের পরিপন্থী; কিংবা দ্বীন ও ঈমানহীন জীবন ও সমাজ কখনো সুখের হতে পারে। বড় আনন্দের কথা, সে মিথ্যার আঁধার রাত্রির অবসান হয়ে গেছে এবং দিগন্তে সত্যের শুভ্র সমুজ্জ্বল নবীন সূর্যের উদয় ঘটেছে —

শেষ কথা

এ বিরাট গ্রন্থ এখানেই আমরা শেষ করছি। আমরা মনে করি, এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে উন্নত জীবনের আদর্শ কি হতে পারে তা পাঠকদের সামনে স্পষ্ট ও শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে আদর্শ এক ও অনন্য, সমগ্র মানুষের জন্যই তা কল্যাণময় আদর্শ। এ দুনিয়ার উন্নত জীবন প্রত্যেকেরই কাম্য— প্রার্থিত। কিন্তু উন্নত জীবন লাভের একটি মাত্র পথ ও উপায় হলো এই আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করা। সে আদর্শকে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজের বিশাল অংগনে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করা। আমরা ইহকাল ও পরকালে যা কিছু পেতে চাই, যে কল্যাণই আমাদের কাম্য হোক, যা পাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষায় আমাদের হৃদয়-মন উদ্বেলিত হয়ে উঠক— তা যদি সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিভিত্তিক হয়ে থাকে, তা হলে তার জন্য এই একটি পথই উন্মুক্ত রয়েছে।

আমরা যদি পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে চাই
তা হলে দ্বীন ও ঈমানই হচ্ছে একমাত্র পথ।
আমরা যদি বৈষয়িক জীবনে এই দুনিয়ায়-সত্যিকার
কল্যাণ পেতে চাই, তাহলে তারও পথ এই ঈমান।
আর আমরা যদি ইহকাল-পরকাল উভয় জীবনের সম্মিলিত কল্যাণ
ও সাফল্য চাই, তা হলেও ঈমানই হচ্ছে তার একমাত্র উপায়।
পরকালীন কল্যাণ ও সাফল্যের কথা অন্যত্র বলা যাবে।

নিছক দুনিয়ার ক্ষেত্রে বস্তুগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সৌভাগ্য লাভের বিষয়ও আমাদের এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, তার জন্যও সত্যিকার ঈমান— প্রকৃত ঈমানই হচ্ছে একমাত্র উপায়। এই ঈমান ছাড়া তাও লাভ করা যেতে পারে না।

যাদি ব্যক্তিগত সৌভাগ্যই আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে সে সৌভাগ্যের জন্য মানসিক শান্তি ও স্বস্তি অপরিহার্য। আর মানসিক শান্তি ও স্বস্তি ঈমান ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়।

আমরা যদি এখানে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল জীবন লাভ করতে চাই, তাহলে তার জন্য নৈতিক ও আদর্শিক দৃঢ়তা জরুরী। আর দ্বীন ও ঈমান ব্যতিরেকে তা পাওয়া যেতে পারে না।

আমরা যদি সামাজিক, সামষ্টিক বা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি লাভ করতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদের লোকদের মধ্যে সত্যিকার ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাতে হবে। আর ঈমান ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যে এই ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা যেতে পারে না, তা স্পষ্ট।

আমাদের বুকে কঠোর আঘাতকারী শত্রুদের উপর আমরা যদি প্রকৃত সামরিক সাহায্য লাভ করতে চাই এবং তা করতে গিয়ে কোনো বৃহৎ শক্তির তল্পিবাহী বা লেজুড়ে পরিণত হতে প্রস্তুত না হই, তাহলে আমাদের নিজেদের মধ্যেই বীরত্ব ও সাহসিকতার সঞ্চার করতে হবে। কিন্তু এই বীরত্ব ও সাহসিকতা অর্জনের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষ ও আত্মদানের ভাবধারা লোকদের মধ্যে বর্তমান থাকা আবশ্যক। অথচ এই ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মাদানের প্রকৃত ভাবধারা ঈমান ছাড়া কখনো সৃষ্টি হতে পারে না।

আমরা যদি অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি পেতে চাই, তাহলে আমাদের ক্ষেত-খামারে ও কল-কারখানায় ব্যাপক উৎপাদন তৎপরতা চালাতে হবে। কিন্তু এই তৎপরতা চলতে পারে কেবল তখন, যদি আমাদের সর্বক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যে নৈতিক চরিত্র পুনর্বহাল হতে পারে। কিন্তু ঈমান ছাড়া যে কোনোরূপ নৈতিকতার আশা করা যায় না, তা আজ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা যদি প্রকৌশলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই কোনো অগ্রগতি বা উন্নতি হতে পারে না। আর কারো মধ্যে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা তবেই আসতে পাবে, যদি জীবনের সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু ঈমান না থাকলে জীবনের যে কোনো লক্ষ্যই থাকতে পারে না— ঈমানহীন জীবন যে লক্ষ্যহীন জীবন, একথা অন্তত একালের সুধী সমাজের কাছে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট ও ভাস্বর হয়ে আছে।

আমরা যদি আমাদের জীবনের মৌলিক, সার্বিক ও স্থায়ী সংশোধন চাই তাহলে আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, মন ও মানসিকতার পরিবর্তন ভিন্ন মৌলিক সংশোধন কখনো সাধিত হতে পারে না। আর মন ও মানসের পরিবর্তন হতে পারে; যদি তার উপর কোনো কল্যাণময় আদর্শ শক্ত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু এক আল্লাহ্ ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের প্রতি পুরোপুরি ঈমান গ্রহণ ব্যতীত কল্যাণময় আদর্শ আর একটিও নেই।

আমরা যদি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উপর একান্ত নিরপেক্ষ, সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা চাই, তাহলে সেজন্য নিরপেক্ষ ও সুবিচার পূর্ণ আইন বিধান কার্যকর করতে হবে। কিন্তু ঈমানের কার্যকরতা একান্তভাবে নির্ভুল করে জনতার মনে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের ভাব জেগে থাকার উপর। আর মানব মনে এ ভাবধারা জাগাবার জন্য ঈমান অপরিহার্য।

বস্তুত ঈমান হচ্ছে চরিত্রের শক্তি ও শক্তির চরিত্র। ঈমান হচ্ছে জীবনের প্রাণ, প্রাণের জীবন। বিশ্বলোকের রহস্য ঈমান। ঈমান হচ্ছে রহস্যলোকের বিশ্ব। এ দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য ঈমান, ঈমান শোভা ও সৌন্দর্যের জগত। পথের আলো ঈমান, আলোর পথ ঈমান।

ঈমান হচ্ছে পথিকের পাথেয়। নৌচালকের জন্য ধ্রুবতারা, বিভ্রান্ত ব্যক্তির পথ-প্রদর্শক যোদ্ধার শানিত অস্ত্র, নিঃসঙ্গের বন্ধু-সাথী। দিশেহারার দিশারী। শক্তিমানের নিয়ন্ত্রণ, দুর্বলের শক্তি।

দুঃসাহসী বীর লোকদের সাহস ও বীরত্বের উৎস ঈমান। ঈমান এক মহাবিস্ময়, সমস্ত রুদ্ধলোক উন্মুক্ত করার একমাত্র চাবিকাঠি। জীবনের সমস্ত দিকে ও পথে হেদায়েতের উজ্জ্বল মিনার এই ঈমান।

এক কথায় ঈমান মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন, প্রয়োজন ব্যক্তির জন্য। ব্যক্তির নিশ্চিন্ততা, সৌভাগ্য ও উন্নতি ঈমানের উপর নির্ভরশীল। তা-ই প্রয়োজন সমাজ-সমষ্ঠির জন্যও। সমাজ দৃঢ়তা লাভ করতে পারে, সুসংহত-সুসংবদ্ধ হতে পারে ঈমানের বলে। ঈমানই হচ্ছে উন্নত জীবনের চাবি-কাঠি। উন্নত জীবনের একমাত্র আদর্শ এই ঈমান— সে ইহকালীন জীবনে যেমন, পরকালীন জীবনেও তেমনি।

আমরা এখানে যে ঈমানের কথা বলছি, তা ইসলামের ঈমান। দ্বীন-ইসলাম যে ঈমানের কথা বলে, যে ঈমান গ্রহণের আহবান জানায়, সেই ঈমানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামের এই ঈমান ব্যাপক— সর্বাত্মক ভারসাম্যপূর্ণ, অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত তার উপস্থিতি। এ ঈমান ইতবাচক। আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নত যে ঈমানের আহবান জানিয়েছে, যে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ন ও তাবে'তাবেয়ীন— এই ঈমানের কথাই আমরা বলছি এবং এই ঈমান পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করার জন্য আমরা আহবান জানাচ্ছি। এ ঈমান কেবল কবুল করতে হয় না, তদনুযায়ী মন-মগজ ও জীবন গড়বার দৃঢ় সংকল্পও গ্রহণ করতে হয়। এ ঈমান নিছক একটা বিশ্বাসের ব্যাপারই নয়, ঈমান অনুযায়ী কাজ করাই হয় বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ঈমান কেবল বিবেক-বুদ্ধির ও যুক্তির বিচারে মেনে নেয়া নয়, নয় কেবল অধ্যাত্মবাদের

মারেফাতী ঈমান। আর ফিকাহবিদরা ঈমানের যে শুষ্ক ও অন্তঃসারশূন্য রূপ পেশ করেন, তার কথাও এখানে বলা হচ্ছে না। এ ঈমান কেবল বাইরে দেখাবার ঈমান নয়; কিংবা লোকদের ধরে ধরে কালেমা পড়ানোর ঈমানও নয়। এ হচ্ছে জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। তা ব্যক্তির জীবনে অনুসরণীয় যেমন, তেমনি অনুসরণীয় সমষ্টি ও জাতির জন্যও। এ ঈমান সর্বদিক উজ্জ্বলকারী এক আলোকবর্তিকা। তা যেমন ব্যক্তির চিন্তায়, মননে ও ইচ্ছায় প্রধান প্রভাবশালী হয়, প্রবাহিত হয় জীবনের সমগ্র দিকে ও বিভাগে, শাখায় ও প্রশাখায়। যা মানুষকে সম্পূর্ণ নতুন বানিয়ে দেয়। আর সমাজকে বানায় সম্পূর্ণ নতুন সমাজ। হিংস্র পশু চরিত্রের মানুষকে বানিয়ে দেয় ফেরেশতা তুল্য। সমাজ ও সমষ্টির প্রতিটি দিকের উপর ঈমান যে আলো বিকীরণ করে তাতে সকল দিগন্ত হয় উদ্ভাসিত, শুভ্র সমুজ্জ্বল।

এ ঈমান মানব দেহের রক্তের মতো সদা প্রবহমান। জীবনের প্রতি ধমনীতে তা সঞ্চালিত হয়ে জীবন দেহটিকে তরুণ, তাজা, সতেজ, সক্রিয় ও সজীব করে রাখে সর্বক্ষণ। পরিচ্ছন্ন রক্ত যেমন দেহের ক্লেদ নষ্ট করে, নির্ভুল সঠিক ঈমান তেমনি দূর করে জীবন ও সমাজের আবর্জনা।

সত্যিকার ঈমান সমগ্র জীবনের উপর প্রভাবশালী হয়। সমগ্র জীবনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত রঙে রঙীন করে তোলে। চিন্তা, বুঝ-সমঝ, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিকোণ-দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যমান-মূল্যবোধ, চরিত্র-স্বভাব, অভ্যাস-আদত, সংগঠন-সংস্থা, আইন ও শাসন, শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতি সবকিছুই সম্পূর্ণ নতুনভাবে ও পূর্ণরূপে গড়ে ওঠে সেই অনুযায়ী। এরূপ গড়ে ওঠাই ঈমানের চরম লক্ষ্য।

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً –

রঙ আল্লাহ্‌র, আর আল্লাহ্‌র রঙের চাইতে উত্তম রঙ আর কারো হতে পারে না।

যে সমাজ ও জাতির এ ঈমানকে নিয়ে বাঁচতে ইচ্ছা করে, তার কর্তব্য হলো এ ঈমান অনুযায়ী সমস্ত জীবনকে গড়ে তোলা। চিন্তা-বিশ্বাসের, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের, আইন ও শাসনের, নীতি ও পন্থা নির্ধারণের, যুদ্ধ ও সন্ধির, বন্ধুত্ব ও মিত্রতার একমাত্র ভিত্তি হিসাবে এই ঈমানকে গ্রহণ করা।

এই আহবানই আমার আহ্বান এবং এই আহবান জানিয়েই এ গ্রন্থ সমাপ্ত করছি। আমীন।

গ্রন্থ পঞ্জী

১. কুরআনুল করীম
২. বুখারী শরীফ
৩. মুসলিম শরীফ
৪. ইহ্য়া-উল-উলুম— ইমাম গাযালী
৫. মাদারিজুস্ সাবেকীন— ইবনুল কাইয়্যেম
৬. রওযুল ইউসুফ (সাময়িক পত্রিকা)
৭. মুসনাদে আহমাদ
৮. তিরমিযী শরীফ
৯. নাসায়ী শরীফ
১০. বায়হাকী শরীফ
১১. আল্ মুস্তদরাক হাকেম
১২. Gude to Modern wickedness
১৩. মুসনাদে ইবনে হাব্বান
১৪. আবু দাউদ শরীফ
১৫. মুসনাদে তাবারানী
১৬. মুসনাদে বাজ্জার
১৭. Man Not Live Alone
১৮. The Evidence of God in An Expanding Universe
১৯. Man the unknown
২০. Freud His Dream and Sex Theories
২১. ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন— ডঃ হেনরী লিংক

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সূদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসসাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব' ও 'ইসলামের ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থ দু'টি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন)